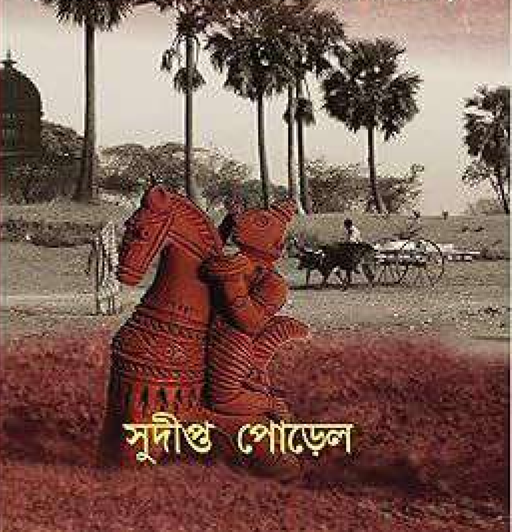
অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি

(প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঔপনিবেশিক কালপর্ব)



সুদীপ্ত পোড়েল

অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি • সুদীপ্ত পোড়েল

অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি

(প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঔপনিবেশিক কালপর্ব)

সুদীপ্ত পোড়েল

কলকাতা প্রকাশন

অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি
(প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঔপনিবেশিক কালপর্ব)
সুদীপ্ত পোড়েল

GRAM

(A Project of *Group for Rural Alternative Movement*)

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২২

মানিক ফকিরের বাড়ি (GRAM) -র পক্ষে ৪৮/১২, এন এস সি বোস রোড কলকাতা ৭০০০৪০ থেকে সৌরভ মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত, অক্ষর বিন্যাসে অশোক এবং মহামায়া অফসেট, ১নং খাসমহল স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : প্রণব হাজরা

ATIT BANKURAR SAMAJ O ARTHANITI
(Pragoitehasik theke Oipanibesik Kalaparba)
by
Sudipta Porel, porel2008@gmail.com

Published by Manik Fakirer Bari (GRAM)
48/12, N S C Bose Road, Kolkata - 700040
www.kolkataprakashan.com
Mobile ; 9836327536

৩৮০.০০

উৎসর্গ

ননীগোপাল রায়

নিবাস হদলনারায়ণপুর

বাঁকুড়ার কৃষক আন্দোলনের সেনানী

মুখবন্ধ

বিশাল সময়সীমা জুড়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলকে কীভাবে চেনা যায়, আঞ্চলিক জনসমাজকে কীভাবে বোঝা যায়, সেই চেনা ও বোঝার নিরিখগুলো কী কী হতে পারে, সেই প্রশ্ন যে কোনো অঞ্চলের অতীতচর্চার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। কালের প্রেক্ষিতে দেশের পরিসরের কোন বৃত্তগুলি আলোচক নির্দেশ করেছেন, সেই নির্দেশই আলোচনার অভিমুখ নির্ণয় করে। একজন আলোচকের বৃত্ত নির্দেশ থেকে অন্য আলোচকের বৃত্ত নির্দেশ স্বতন্ত্র হতেই পারে। শুধু ইতিহাস-বিদ্যার খাতিরে আভিপ্রায়িক স্বাতন্ত্র্যটি স্পষ্ট করা দরকার, তবেই আলোচনার ফ্রেমটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমলার লেখা জেলা গেজেটিয়ার, গান্ধীবাদী ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীর লেখা আদর্শ প্রাণিত জেলা বিবরণী বা পেশাদার গবেষক রচিত কোনো এক অঞ্চলের বস্তুনিষ্ঠ সমাজ বিবর্তনের অভিসন্দর্ভ, সবই মূল্যবান। কেবল প্রত্যেকের রচনার প্রেক্ষিত আলাদা। আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার প্রেক্ষিতের ভিন্নতাই বৃহৎ স্ব-দেশ বা বি-দেশ, সারনিষ্ঠ অঞ্চল ও সেই অঞ্চলাশ্রিত নানা স্থানসমূহের টানাপোড়েনকে নতুনভাবে অর্থবহ করে তোলে।

ফ্রেমের স্বাতন্ত্র্যের কথা খেয়াল রেখে সুদীপ্ত পোড়েলের রচনা পড়লে বোঝা যায় যে বাঁকুড়ার অতীত সমাজ ও অর্থনীতির সামগ্রিক বিবরণ লেখা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এমনকী জনসমাজের ধারাবাহিক বিবর্তনের অনুপুঙ্খ বিচারও তাঁর অন্বেষার বাইরে। তাঁর গ্রাহ্য ধারণাসিদ্ধ বাঁকুড়া বলে জেলার সমাজ ও অর্থনীতির বৃত্তে নানা জনগোষ্ঠীর জীবনচর্চায় যে যে ঐতিহাসিক

অভিজ্ঞতাগুলি আলোড়ন তুলেছিল, সেই অভিঘাতগুলির ফলাফল বিষয় হিসাবে তিনি তথ্য সহকারে বিচার করেছেন। তাঁর আলোচনার সময়পটটি বিশাল, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্যন্ত; তুলনায় দেশ ও লোকবৃত্তের সমীক্ষাপর্ব একক মাত্রায় আবদ্ধ, বৈচারিক বর্গগুলির ক্ষেত্রে রদবদল ঘটে না।

বাঁকুড়ার জনসমাজ ও লোকযান এক বৃহত্তর সীমান্ত সংস্কৃতির অংশ, সেই সীমান্ত সংস্কৃতির নির্মিতি, বিনির্মাণ ও পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে এই পশ্চিম রাঢ় এলাকার সমাজ ও অর্থনীতি আবর্তিত হয়েছে। বাংলার রাঢ়ীয় সীমান্ত এলাকার সার্বিক ইতিহাস আজও অপেক্ষিত। ভবিষ্যতে সেই ইতিহাস লেখার কোনো কোনো সূত্র ধরিয়ে দিতে সুদীপ্ত পোড়েল-এর 'অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও সংস্কৃতি' সাহায্য করবে, এই ভরসা রাখি।

কলিকাতা ২০১৬

গৌতম ভদ্র

প্রস্তাবনা

আদি মানবের প্রথম পদচারণা ঘটেছিল হিমালয়ের পাদদেশে ও ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তদেশে, বর্তমানে যা বাঁকুড়া নামে পরিচিত। কয়েক সহস্র শতাব্দী অতিক্রম করে বর্তমান বাঁকুড়ার সামাজিক স্থিতি ও অর্থনৈতিক অবস্থান বিস্ময় জাগায়। এই প্রাচীন ভূমির ইতিহাস বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তার অতীত সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির নির্মাণের ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক অবমূল্যায়নের ধারাভাষ্য একটি অনালোচিত অধ্যায়ের সন্ধান দেবে।

দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ লোকাচার ও লোক সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পুষ্টি যে ভূমিতে, তার বৈচিত্র্য ও বিস্তার আকাশছোঁয়া হবে এটাই স্বাভাবিক। পাশাপাশি আদিম জীবনাচার থেকে আধুনিক জীবনে উত্তরণের ছায়াপথ অনেক চড়াই উৎরাই সমাকীর্ণ। এমন ভূম সংস্কৃতি, ভৌম শাসনাধার ও রীতি-নীতির বিস্তার ভূ-ভারতে বিরল। ভৌম রাজ্যের অস্তমিত গরিমা ও ঔপনিবেশিক শাসনের রৌদ্রতাত এই আখ্যানের অন্তিম ভাগে আলোচিত হয়েছে।

সাঁওতাল জীবন ও সংস্কৃতির অধিষ্ঠান ও বিকাশ ছিল এই ভূমিখণ্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও শাসনের ভারে অচিরেই উপজাতীয় জনজীবন বিপর্যয় ও অভিঘাত আলোড়িত হয়ে ওঠে। প্রাক্ ব্রিটিশ শাসন পর্বে বারংবার এই ভূমিভাগ রাষ্ট্রীয় টানাপোড়েনের বলি হয়েছে, যেমন নন্দবংশীয় রাজনৈতিক আগ্রাসন, মৌর্য সাম্রাজ্যবাদ ও বৌদ্ধ ধর্মাচরণ, গুপ্তরাষ্ট্রবাদ, ওড়িয়া-বঙ্গ রাষ্ট্রবিবাদ, জৈন ও বৈষ্ণবীয় ভাবধারা, মোঘল-আফগান বিরোধ, কালাপাহাড়ের ও মারাঠাদের প্রজাপীড়ন। ইংরাজ শাসকদের ভূমি ও বাণিজ্য নীতির যাঁতাকলে বিপর্যয়ের কিনারায় পৌঁছেছিল বাঁকুড়া। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাক্ষ্য ছড়িয়ে পড়েছিল বাঁকুড়ার ঊষর প্রান্তরে,

সড়কে, গৃহের আঙিনায়।

গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রাঢ় বাঁকুড়ার প্রথম মানব অবস্থিতি, আদিমানবের শিকার জীবন থেকে উত্তরণ, সমাজ ও গ্রাম নির্মাণ, কৌম সংস্কৃতির বিকাশ, ডিহড় ও পোখন্না নগরীর পত্তন। তুষার যুগের ভোরে রাঢ়ের এ অংশ ছিল সমুদ্র প্লাবিত। সে প্লাবন থেকে একসময় মাথা তোলে শুশুনিয়া। আদিযুগে প্রথম মানব বিচরণের প্রমাণ মিলেছে হিমালয় ও শুশুনিয়া পাদদেশে। শিকার জীবন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নদী উপত্যকা বরাবর কৃষি সভ্যতার প্রবর্তন যুগান্তরের ইঙ্গিতবহ। প্রস্তর যুগের অন্তভাগে সবুজ ক্ষেতের সন্নিকটে গ্রাম গঠনের কারিগর ছিলেন সম্ভবত অসুর ভাষাভাষী সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে এরাই লৌহশিল্পের সূত্রধর ও নগর নির্মাণের কর্মি। উপজাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছিল রাঢ়ের নিজস্ব আঙ্গিকে। ঘাট, চৌকি, পত্তনি কেন্দ্রিক গ্রামকর্মির দল এর অন্যতম নজির।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপজীব্য সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিকাশের ধারা। ভৌম শাসনাধিষ্ঠানের উন্মেষের কালেই কৈবর্ত বিদ্রোহের মত সামাজিক সংকট ও কালাপাহাড়ের ধর্মীয় আক্রমণ ও বর্গীদের রাজস্ব হাঙ্গামা রাঢ়ভূমিতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমাজ সৃষ্টির আদিতে অসুর ভাষা, পাল শাসনের কালবেলায় রাঢ় পদকর্তাদের যোগদানে চর্যাপদের সৃষ্টি, মুসলিম শাসনের সমকালীন মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব ধারা, সেন শাসনপূর্ব শূরীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সেন যুগের কৌলিন্যবাদ, মুসলিমধারা ও সুফীবাদ রাঢ়ের সামাজিক মোজাইকের অন্যতম উপাদান। রাঢ়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বড় ঘটনা জৈন ভাবধারার প্রবেশ ও পুষ্টি। পাশাপাশি ওড্রদেশ থেকে ওড়িয়া জাতি ও সংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ দক্ষিণ বাঁকুড়ার পরিমণ্ডলকে অভিযোজিত করেছিল। রাঢ় বাঁকুড়ার ইতিহাসে উপজাতীকরণ (ট্রাইবালাইজেসন) ও উপজাতি উৎসাদনের (ডিট্রাইবালাইজেসন) মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ সুরক্ষার অনুষঙ্গে। বিভিন্ন বর্ণেতর জাতি ও উপজাতির জীবন ও সংস্কৃতি, রাঢ়ের মেলা ও পার্বণ, নাগরিক স্বাচ্ছন্দে উপনীত হওয়ার কাহিনি, রাঢ়ে রণোদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচিত হয়েছে রাঢ় বাঁকুড়ার কৃষি জীবনের দুঃখগাথা। পোখন্ন-ডিহড়ের গুপ্তসমকালীন কৃষি প্রাচুর্য, রাইপুর-ওন্দা সহ শুভঙ্করী সেচসিক্ত মল্লভূমের কৃষি সমৃদ্ধি ঔপনিবেশিক ভূমিব্যবস্থার গরল মন্থনে অজন্মা ও মন্বন্তর ক্লিষ্ট বিষণ্ণ গাথায় রূপান্তরিত হয়। ফারগুসনের রাজস্ব সমরাভিযান,

একসালা-পাঁচসালা-দশসালা-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিঘাত সাবেকি জমিদারির পতন ঘটায়। চেতুয়া-বরদার বর্ধমান বিজয়ের তাৎপর্য এই যে ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া সহ অন্যান্য রাজস্ব আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এ ছিল প্রজাসাধারণে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। দক্ষিণ রাঢ়ে ওড়িয়া প্রভাবে ঘটে কৃষির আধুনিকীকরণ। ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও শোষণের অনুষঙ্গে ঘটে কৃষকায়ন (পেজেন্টাইজেসন) ও অকৃষকায়ন (ডিপেজেন্টাইজেসন), পাইকস্ত ও খুদকস্ত কৃষকের বিভাজন ও বিরোধ। বিবিধ ও বিচিত্র ভূমিসত্ত্বের সৃষ্টি এবং তার বিলোপ এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায় জুড়ে আছে বাণিজ্য কথা। কেমন করে সড়ক গড়ে ওঠে, বাণিজ্য জনপদের গোড়াপত্তন ঘটে তার বিস্তৃত অভিজ্ঞান এ অধ্যায়ে। আদি যুগে যেমন পাথর, লোহা কেন্দ্রিক শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল, মধ্যযুগে বস্ত্র, লাক্ষা, ইক্ষু, তাম্বুল/তামাক, লৌহ, শঙ্খ, মৃৎ শিল্পের মতন বিষয়গুলিতে রাঢ়ের মানুষের শিল্প দক্ষতা প্রমাণিত হতে থাকে। এই সমৃদ্ধির টানেই মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। সমকালীন পাহাড়িয়া ও সন্ন্যাসী হাঙ্গামা তখনকার বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি করে। ভৌম শাসনে নৌবাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যের ভাষ্যে। বাণিজ্যে ব্যক্তি উদ্যোগ, নগর-বাণিজ্য বাণিজ্যিক বিস্তৃতির অন্যতম দিক। হান্টার, ও'ম্যালী, হরচন্দ্র, রামানুজের বিবরণে তৎকালীন বাণিজ্যের হালহকিকতের সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রাক্ ব্রিটিশ বাণিজ্য, ব্রিটিশ বেনিয়াতন্ত্র, বৃত্তি বিবর্তনের বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে প্রাণিত করে "খেয়ালী পত্রিকা গোষ্ঠী" এই গ্রন্থের ভিত্তিমূল প্রস্তুত করেছে। সেজন্য আমি তাদের কাছে ঋণী। 'কলকাতা প্রকাশন' এই গ্রন্থ প্রকাশের গুরু দায়িত্ব নিয়ে তাদের প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য করেছে। লেখাটি নির্মাণের ক্ষেত্রে যাদের অবদান ভোলার নয় তাঁরা হলেন অধ্যাপক রথীন্দ্র মোহন চৌধুরী, ডঃ শক্তিনাথ সাহা, সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত, মানিক মন্ডল, অজয় কুমার ঘোষ, অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট গুণীজন। ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও গ্রন্থের মুদ্রণ প্রমাদ পাঠককুল নিজগুণে ক্ষমা করবেন, এ আশা রাখি।

সুদীপ্ত পোড়েল

কলিকাতা
জানুয়ারি, ২০১৬

বিষয় সূচি

প্রথম অধ্যায় : গ্রাম গঠন ও গ্রাম শাসন

দ্বিতীয় অধ্যায় : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন

তৃতীয় অধ্যায় : কৃষি জীবন

চতুর্থ অধ্যায় : শিল্প ও বাণিজ্য জীবন

প্রথম অধ্যায়

গ্রাম গঠন ও গ্রাম শাসন

বাঁকুড়ার মাটি ও মানুষ অতি প্রাচীনত্বে মহিমান্বিত। এখানের মাটি গঠিত হয়েছে কোটি বছরের বিবর্তনে আর আদি মানুষের আগমন ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে।[১] মানুষের আগমন, সমাজ গঠন, গ্রামপত্তন ঘটেছিল অবশিষ্ট বাংলার অনেক আগে। সমাজ বিকাশের চালচিত্রে এর সংস্কৃতির সৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তা হল 'বাঁকুড়া জনের' সংস্কৃতি। যে ইতিকথা কথিত হল তা হল 'বাঁকুড়াজনে'র ইতিকথা। যে প্রস্তর সংস্কৃতি থেকে অসুর সংস্কৃতিতে উত্তরণ তা একান্তই বাকি বঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র। জনজাতি সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ, বাঙালি সংস্কৃতির একাধিপত্যে অস্তমিত কৌম, কৃষ্টি ও শাসন একমাত্র বাঁকুড়া ভূমিরই বিষন্ন গাথা। মণ্ডলীপ্রথা, ঘাটোয়ালী প্রথা ও চৌকিদারিপ্রথাও ছিল এই ভূমিখণ্ডের স্বাতন্ত্র্যের সোনালী আলোকচ্ছটা।

তুষারযুগের ভোরে :

সৃষ্টির ঊষালগ্নে এই ভূমিখণ্ড ছিল তুষারশুভ্র উপকূলভূমি। তার উত্তরভাগের কয়লাস্তর নির্মিত হয়েছিল ১৮-২০ কোটি বছরের বিবর্তনে এক উপকূলীয় আবহে[১ক]। গুঁজ, মিণ্ডেল, রিস্, উরম্ তুষারযুগ পেরিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। পার্মিয়ান তুষারযুগের সমকালীন ও উত্তরকালীন উপকূলীয় আবর্তের বড় প্রমাণ বাঁকুড়ার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষত: কাঁসাই-শিলাই-ধানকোরা-শালী-গন্ধেশ্বরী-দ্বারকেশ্বর ও সন্নিহিত খালপার্শ্বে চুনাপাথর, খড়িমাটি, ঘুটিং পাথরে ব্যাপক অধঃক্ষেপণ যা সামুদ্রিক প্রবাল, শামুক, ঝিনুক ক্ষরিত। জীবাশ্মীভূত এই সামুদ্রিক প্রাণীর ন্যায় প্রস্তুর ঘুটিং-এর সন্ধান পাওয়া গেছে গুনিয়াদা-হরিরামপুর, শিলাইপাহাড়ী, জুনবেদিয়া, মানকানালী, ধানকোড়, শালী, পুনিশোল-নতুনগ্রাম, খড়িয়া, কাদাঘোট, মনিহারা, গঙ্গাজলঘাটি, শালতোড়া, সিমলাপাল, ইন্দপুর, খাতড়ার বিভিন্ন স্থানে[২]। হরিরামপুর-শালুই পাহাড়ীতে

চুনাপাথরের সঞ্চয়, নদী-খাল সংলগ্ন জমির উপরিস্তরে সাদা চুনের আস্তরণ, উঁচু অনুর্বর টিলায় খড়িমাটি এই অঞ্চলে সামুদ্রিক সংস্পর্শকে প্রমাণিত করে। এই ভূখণ্ডে বৃষ্টিপ্রাচুর্যের যুগ ও শুষ্কতার যুগের পর্যায়ক্রম ভূতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ধারাকে প্রভাবিত করেছে। ১২০০০ বৎসর থেকে ১০০০০ বছর পূর্বে শুষ্কতার যুগ বিরাজিত ছিল আর ১০০০০ থেকে ৫০০০ বছর কাল পর্যন্ত ছিল অতিবর্ষণ কাল। ৫০০০ থেকে ৩৫০০ বছর আগে পর্যন্ত শুষ্কতার যুগ ফিরে আসে বাঁকুড়ার ভূতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক বিকাশকে বিড়ম্বিত করে[৩]। প্লিস্টোসীন মহাপর্বের (যার বিস্তৃতি ৬ লক্ষ থেকে ১০০০০ বছর কাল পূর্ব) মহাদেশীয় বিচলন, হিমবাহ সম্প্রসারণ ও তটরেখা উন্নীতকরণের ফলে বর্তমান উচ্চ বাঁকুড়া ভূখণ্ডের জন্ম হয় নিম্ন জলাভূমি থেকে। ক্রমবিবর্তনের পথে ছোটনাগপুর মালভূমির (গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড) আর্চিয়ান-ধর্মবীয়ান প্রস্তর স্তরের প্রান্তিক ক্ষয়িত ভূমিরূপ হয়ে দাঁড়ায় বাঁকুড়া। এর ৯০ শতাংশ মাটিই এনথ্রোসিস-নিস এবং অবশিষ্টাংশ অ্যালুভিয়াল-ল্যাটেরাইট। অতিবৃষ্টির যুগে শুশুনিয়া ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চ অঞ্চলের প্রস্তরখণ্ড, ঘুটিং, প্রত্নদৃষ্টান্ত নদী উপত্যকা বরাবর প্রবাহিত হয়েছে। শুষ্কতার যুগে নদীপ্রস্থের সংকোচন ঘটে। নদী তীরবর্তী সমতলভূমির আয়তন বাড়ে, যা হয়ে ওঠে আদিম মানুষের বিচরণস্থল। এসময় বৃক্ষাদি বিশেষত তৃণজাতীয় গাছের অবলুপ্তি বা সংকটের কারণে বিশালদেহী তৃণভোজী প্রাণীর প্রাণধারণ ও বংশবিস্তার সংকটগ্রস্ত হয়। বাঁকুড়ার তৎকালীন বন্য প্রাণীকুলের (বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, গরু, মহিষ ইত্যাদি) একাংশ এই কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নদীবাহিত ও নদী উপত্যকায় প্রাপ্ত অস্থি ও জীবাশ্মর বিশ্লেষণে এটি প্রমাণিত হয়[৪]। এই প্রেক্ষাপটে আদিম মানুষ শিকার নির্ভরতা কমিয়ে কৃষিকাজ ও পশুপালনে বাধিত হয়। বৃষ্টিদৈন্য ও অধিকতর নদীশুষ্কতার কারণে নদীগর্ভের Paleo-clay-layer বিনষ্ট হয়ে নদীর জলধারণ ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।[৫] জলজ প্রাণী-মৎস্য ও বন্যপ্রাণী শিকার থেকে পশুপালন ও কৃষিকাজ জীবিকায় আদিম মানুষের রূপান্তর হলোসীন মহাপর্বের (১০০০০ বছর পূর্ব থেকে) বিশিষ্ট ঘটনা। প্রস্তরযুগের অনুসারী রূপান্তর যুগ বদলের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেয়।

আদি মানবের আগমন :

অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে গারো ও রাজমহল পর্বতের মধ্যবর্তী অংশে অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গে মৃত্তিকা গঠন সম্পূর্ণ হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর বা তারও আগে।[৫ক] স্পষ্টতই পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান বাঁকুড়া ও সন্নিহিত উচ্চভূমি গঠিত হয়েছিল এর অনেক আগেই। অধিক সমাদৃত তত্ত্ব হল সুদূর অতীতে আফ্রিকা, এশিয়া

ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে জলপথ ও স্থলপথে মানবস্রোত প্রবাহিত হয়।[৬] এই যাযাবর আদিম মানুষের এক বা একাধিক শাখা অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে[৭]। এরা মূলত প্রোটোঅস্ট্রেলীয় হলেও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর অবদানে বাঙালি এক মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়।[৮]

বাঁকুড়া ও সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে আদিম মানুষের আগমন বাকি বাংলার অনেক আগে ঘটেছে। তদের বাসযোগ্য উচ্চভূমি, অস্ত্র উপকরণের প্রাচুর্য ও বন ও বন্য পশুর আধিক্যের কারণে। কাঁসাই-শিলাই-কুমারী-জয়পণ্ডা-তারাফেনী-দ্বারকেশ্বর ইত্যাদি নদী উপত্যকা ও পাহাড়ের নাইস, গ্রানাইট, গ্রাফাইট, কোয়ার্টজাইট ছিল আদিম আয়ুধের প্রকৃষ্ট উপাদান।[৯] ছেঁদা পাহাড়ের উলফ্রাম ও পূর্ণাপাণির তামার খনি এই অঞ্চলের অস্ত্র উপকরণ সমৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। ভবিষ্যপুরাণের ভাষায়, "লৌহধাতোঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ আকরো ভবিতা" অর্থাৎ এ দেশের কোথাও কোথাও লোহার খনি আছে।

এই ভূখণ্ডে মানব বিচরণ ঘটেছিল প্লিস্টোসীন মহাপর্বের (বিস্তৃতি দশ লক্ষ থেকে দশ হাজার বছর কাল আগে) শেষ অধ্যায়ে। যদিও পাত্রসায়েরে প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের শিবকোণ্ডা ঢিলা, মোষখুল কাল সন্নিহিত কুশদ্বীপ সাংস্কৃতিক অবক্ষেপে (Cultural Deposit) পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার থেকে দশ হাজার দু'শ পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার আয়ুধের অস্তিত্বের দাবি আছে। এই নদীখাত থেকে মাওসিন যুগীয় পলিস্তর, ক্ষুদ্র কাচ, বালু, নুড়ি, বৃক্ষ-ফসিল, পাথর-ফসিল, হাড়-ফসিল, কাঠ, পাথুরে কয়লা, সামুদ্রিক শাঁখ নির্মিত তিন প্রাচীন যুগায়ুধের অবশেষে মিলেছে বলে দাবি।[১০] রাইপুরের কাঁসাই নদীর অববাহিকায় ৪০ ফুট গভীরতায় প্রাপ্ত ২৫ বর্ষীয় যুবকের ফসিলের বয়সকাল (দশ হাজার বছর পূর্বের) অধিকতর গ্রহণীয়।[১১] অর্থাৎ মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা বিকাশের পূর্বেই এখানে আদি মানুষের সমাগম হয়েছিল বলা যায়। গ্রিয়ার্সনের মতে, বাঁকুড়ার আদিবাসীদের একাংশ (সাঁওতাল, ওঁরাও ইত্যাদি) নিজেদের খেরওয়াল বা খেরওয়ার বলে মনে করে যারা মূলত মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী।[১২] কুশদ্বীপ কালচারে হরপ্পা বিপর্যয়োত্তর মানবাগমনের অনুমান ও গ্যারিসনের তত্ত্ব সংশয়াতীত নয় যেহেতু এই অঞ্চলে মহেঞ্জোদাড়ো - হরপ্পা অনুরূপ সভ্যতার কোনো বিকাশ ঘটেনি। তবে হরপ্পা সভ্যতাপূর্ব মানব বসতির প্রমাণ ছিল অনেকস্থানে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় অধীক্ষক বি.বি. লাল দুর্গাপুর-বাঁকুড়া সড়কের ধারে দুর্গাপুর থেকে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দেজুড়ি নামক স্থানে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্ম সম্পর্কে বলেছেন। — "We do have here microlithic industry, which is definitely pre-harappan and may therefore be placed at least in the third millennium B.C. if not earlier"

প্রস্তরযুগ ও অসুর সংস্কৃতি :

ফিওদর করোভকিনের আদি মানবের মহানিষ্ক্রমণ তত্ত্ব ও অনুকূল পরিবেশ সেই মানবস্রোতের অংশ বিশেষের অবস্থান বর্তমান বাঁকুড়া ভূখণ্ডে আদিমানবের আগমনের অনুমানকে সমর্থন করে। তবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের প্রথম বিচরণকাল সুনিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়নি। তবে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদশঙ্কুল এই রাঢ়ীয় উচ্চভূমিতে বাকি বঙ্গীয়ভূমি থেকে অনেক পূর্বেই প্রোটোঅস্ট্রালয়েড বা দ্রাভিডিয়ান মানুষের আগমন নৃতাত্ত্বিক নিরিখে অনেকটাই প্রমাণিত। দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার আদি মানবস্রোত ও মানব অবস্থিতির প্রমাণ মিলেছে জাভাদ্বীপে যার সময়কাল লক্ষ বা লক্ষাধিক বছর আগের।[১৩]

যদিও কুশদ্বীপ সাংস্কৃতিক সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধ ৪-৫ লক্ষ বছর পূর্বেকার আদিমানবের (হোমোইরেক্টাস প্রকৃতির) ব্যবহৃত বলে সুধীরচন্দ্র দুয়ারী দাবি করেছেন। রাইপুরের কাঁসাই নদী অববাহিকায় প্রাপ্ত যুবকের ফসিলের আয়ুষ্কাল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের বিশ্লেষিত শুশুনিয়া পাহাড় সন্নিকটস্থ গন্ধেশ্বরী নদীতটের সাংস্কৃতিক সঞ্চয়ের আয়ুষ্কাল অনেক বেশি গ্রহণীয়। প্রথম ক্ষেত্রে ফসিলের আয়ুষ্কাল অন্তপ্রিস্টোসিন যুগের অর্থাৎ ১০০০০ বছর পূর্বের এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রের শুশুনিয়া-গন্ধেশ্বরী অববাহিকার মানবগোষ্ঠী ১ লক্ষ বছর প্রাচীন বলে বিশ্লেষিত। অধ্যাপক কান্তি হাজরার মতে, "শুশুনিয়া পাহাড়ে আদি নিয়ানডারথাল মানবগোষ্ঠীর বিচরণভূমি ছিল বলে পুরাতাত্ত্বিকরা প্রায় নিঃসংশয়। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথরের অস্ত্রের নির্মাণ শৈলী, শিলীভূত মহাগজ ও অন্যান্য প্রত্নবস্তুর নিরিখে বলা যায় এখানে যে জনগোষ্ঠীর ইঙ্গিত তারা সম্ভবত দুলক্ষ পঁচিশ হাজার বছর থেকে এক লক্ষ বছর আগে বসতি স্থাপন করেছিল' (বিষ্ণুপুর তথ্যগ্রন্থ, পৃঃ ৩৮)। সুতরাং বলা যায় এই অঞ্চলে মানব অবস্থিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতম মানব অবস্থিতির সমকালীন। প্রস্তর যুগীয় মানবের আয়ুধ উপকরণের অফুরান যোগান, জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক বনজ খাদ্যের প্রাচুর্য এবং হিমগলন বা অতিবৃষ্টিজনিত জলপ্রবাহ থেকে রক্ষা পেতে উচ্চভূমিতে অবস্থান এই অঞ্চলে আদিম জনজাতির আগমনের ও অবস্থিতির প্রধান কারণ। শালি-কাঁসাই-কুমারী-তারাফেনী-ভৈরববাঁকি নদী উপত্যকায় উদ্ধার হওয়া প্রচুর প্রত্নপোলীয়-নবপোলীয়-এ্যাথিউলিয়ান -তাম্রাশ্ম হাতিয়ার থেকে ডি.ডি. কৃষ্ণস্বামী, স্বামী শংকরানন্দ, কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীরা এতদাঞ্চলে পুরানো প্রস্তর যুগীয় মানব-অস্তিত্বের কথা বলেছেন।[১৪] প্রস্তর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে অম্বিকানগর, হাতিখেদা, ভেদুয়া, বড্ডি, পুড্ডি, চিয়াদা, পরেশনাথ, সারংগড়, মুকুটমণিপুর, বসন্তপুর, কাজলকুড়া, ভূতশহর, ধলডাঙ্গা, দামোদরপুর, মাঞ্জুরিয়া, উপরশোল, কৃষ্ণনগর,

নুনিয়াবাইদ, চিকচিকা প্রভৃতি গ্রামে। উপরশোলে একমুখী কর্তরি, চিকচিকায় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম কোয়ার্টজাইট হাতকুঠার, দামোদরপুরে অ্যাশিউলিয়া সংস্কৃতির, মাঞ্জুরিয়ায় আবিভিলি-অ্যাশিউলিয় সংস্কৃতির আয়ুধ, বাঁশি-মোলবোনায় অ্যাশিউলিয়া মুস্টেরিয় এ্যালুভিয়ান রিংষ্টোন-ক্ষুদ্রাশ্ম, উপারশোলে প্রাপ্ত নুড়ির ডিম্বাকার হাতিয়ার, সূক্ষাগ্র হাতকুঠার, পত্রাকার হাতকুঠার, ছেদক, লেভালয়সীয় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ডিসকাস-ক্ষেপাণাস্ত্র পুরাতন প্রস্তর যুগের আয়ুধ। আড়ালবাঁশি-মাঞ্জুরিয়ার প্রাপ্ত গোলাকৃতি অর্ধচন্দ্রাকৃতি আয়ুধ, ক্ষুদ্র বাটালি, ছিদ্রযুক্ত হাতিয়ার মধ্য প্রস্তরযুগের নিদর্শন। এইসব প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত রিংস্টোন, গোল-ছিদ্রের প্রস্তর, কুঠার, বাটালি, ব্লেডসহ শল্কায়ুধ, স্ক্রেপার, বোরার, ব্যাকডব্লেড, নচ, ডেন্টিকুলেট, কোয়ার্টজ-ব্যাসাল্টের সূক্ষ্ম দানা ক্রিস্টাল পাথরের চার্ট কোয়ার্টজের ক্ষুদ্রাশ্ম নবপ্রস্তর যুগের দৃষ্টান্ত। এই যুগগুলি সুনির্দিষ্ট কালসীমায় আধারিত না হলেও নব প্রস্তরযুগের বিস্তার ছিল মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-১৫০০ অব্দ পর্যন্ত।[১৫] পুরাতন প্রস্তরযুগ সম্পর্কে District Census Handbook (census 1961) Bankura (পৃষ্ঠা ২৫) তে লেখা হয়েছে "It appears that gravels with palaeoliths were fairly widespread at Baddih, Hatikheda and Chiada, particularly in the horizon of the contour of about 150 feets above mean sea level, its thickness being approximately 450 feet, the pebbles were of dyke quartzite, stained red by iron oxide. The cementing material in the gravel was areneous and was stained red by iron oxide as a result of capillary action. Artefacts, found at all levels of the deposits, consisted mostly of handaxes, a few arates and some cleavers. The hand axes showed the crude pebble butts but were mostly flat due to controlled flaking. The cleavers were thicker. A unifacial chopper was found on a thick and extensive deposit at Uparsol, close to the town of Bankura. All the tools were found at the Junction of the red alluvium superimposing the Archaean bed-rock and the modern greyish loam. No pottery was associated with them," পুরাতন প্রস্তর যুগে যাযাবর জনগোষ্ঠী মূলত শিকার নির্ভর ছিল বলে, প্রস্তরায়ুধের গঠন ছিল শিকারোপযোগী। প্লিস্টোসীন মহাযুগের অবসানে পুরাতন প্রস্তর যুগের সমাপ্তি ঘটে ও হলোসীন যুগে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার সূচনা ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই মধ্য প্রস্তরযুগের কালসীমা ছিল আপেক্ষিকভাবে সংক্ষিপ্ত। এই যুগে ক্রমবর্ধমান নদীতটে কৃষি ও পশুপালনের বিস্তার ঘটে। কৃষি উপযোগী প্রস্তরায়ুধ এই প্রবণতাকে সমর্থন করে। নদীতটে প্রাপ্ত ১১ সেমি ব্যাসের কাঠদণ্ডে পাথরের কোদাল, লাঙ্গল, পরপর রিংস্টোন চাপিয়ে ভারি দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্র প্রান্ত ভূমিকর্ষণে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া কৃশ আকৃতির পালিশযুক্ত ছোট রিংস্টোন সুতা কাটার

তকলি বলে অনুমিত। সুতরাং নব্যপ্রস্তরযুগের সূচনা ঘটেছিল আনুমানিক ১০০০০ বছর আগে। নব্যপ্রস্তর যুগ সম্পর্কে District Census Handbook (1961) এর মন্তব্য “Three neoliths were found at Kurkutia, two of them, both tines celts,characteristic of east India, being of particular interest, Both were completely smoothed and polished at the working-edge and were traingular in from, with a roughly long transverse section. The third neolith was reworked after use. the material in all the three cases was phyllitic schist.”

নবপোলীয় কৃষিভিত্তিক কৌম আদিম জনসমাজ গঠন পর্যায়ে অসুর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। যারা ছিল “প্রস্তরযুগীয় পরম্পরার প্রতি অনুগত জনগোষ্ঠী”। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে “মুণ্ডা ও অসুর শব্দের এ উপস্থিতি ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে বোধহয় একেবারে আকস্মিক নয়। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক গ্রন্থে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের লোকেরা ‘অসুর’ ভাষাভাষীরূপে কথিত। এখনো মুণ্ডা গোষ্ঠীর প্রধান বুলির নাম ‘অসুর বুলি’। অর্থাৎ এদেশ আদিতে ছিল অসুর ভাষাভাষী অধ্যুষিত।”[১৬] আবার বান্দোয়ানের তামাখুন, বিনপুরের তামাজুড়িতে তাম্র সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। উক্ত এলাকার দ্রাবিড় জনজাতিকে ‘অসুর’ জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হত। অসুর সংস্কৃতির যুগচিহ্ন তাম্রাশীয় এমনকি মৌর্য সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৭] এই সংস্কৃতির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে সুশীল মাহাত তাঁর ‘রাঢ় বাঁকুড়ার অসুর সংস্কৃতির গ্রাম নাম’ প্রবন্ধে লিখেছেন — “এদের বিবাহে আম-বিহা, মহুল-বিহাতে প্রকৃতি বন্দনার স্থান রয়েছে। আম ও মহুল গাছের মতো সন্তান-সন্ততি লাভের আকাঙ্খা এতে সুপরিস্ফূট। সামাজিক উৎসব, পর্ব-পার্বণে আলপনা, বাঁশ-বেতের কাজ, চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালা, আখড়া, মাড়ো (থান), ঠাকুরের চালচিত্র, মনসার চালি, দারুশিল্প, নক্সা, ডাকের সাজ, আটকৌড়িয়া ভাইফোঁটা, অন্নপ্রাশন, পৌষপার্বণ, নবান্ন, কাঁথা সেলাই, ব্রত (বারতি), শ্রাদ্ধ বিবাহে মড়লি হাঁড়ি, ডোমদের প্রথম নিমন্ত্রণ, নাচনি, পাতানাচ, জাওয়া-করম-ধরম, গরাম, বড়াম, কুদরা, আহিরা (বাঁধনা) সারস্থল, শালই, মামড়ে জাহের এরা, ভূত-প্রেত, ঝাড়ফুঁক, মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর প্রস্তর দেওয়া, মঠ নির্মাণ, বৃষকাষ্ঠ, কুশগাছ স্থাপন, দাঁতনকাঠি দিয়ে জলদান, পিণ্ডদান — আত্মার পুনর্জীবন লাভের উদ্দেশ্যে। ইজোলো - পিজোলেতে আলো দেখানো, কার্তিক মাসে স্বর্গবাতি পূর্বপুরুষদের আর্শীবাদ লাভের উদ্দেশ্যজাত। অচেতন বস্তুর প্রাণসত্তার আরোপ, বৃত্তাকার নৃত্য, টোটেম পূজা, জীবজন্তুর পূজা, পাথর পূজা, শিলা পূজা প্রাগার্য অসুর সংস্কৃতির অন্তর্গত। ..... মহুল ও বট গাছের নীচে এসব প্রস্তর খণ্ড প্রোথিত আছে। মৃত ব্যক্তির অস্থি নূতন মাটির ভাঁড়ের ভিতর নূতন লাল শালুতে তামার পয়সা, খই, কড়ি, আতপ চাল, সিঁদুর প্রভৃতি

রেখে পুঁতে দেওয়া হয়। পৌরোহিত্যের কাজ করে ‘লায়া’ -এ পদটি বংশানুক্রমিক। নতুন অকর্ষিত লোহার তৈরী হালের ফাল দিয়ে সমাধির মাটি খোঁড়া হয়। এই ফালটি লায়ার প্রাপ্য। একটি মুরগী মেরে তার রক্ত সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই মুরগীর মাংস মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয় খায় না। অন্য শ্মশানবন্ধুগণ সেখানে রান্না করে খায়।” অসুর সংস্কৃতির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সমাধি প্রস্তর বা মেগালিথিক কালচার এবং উর্বরতাভিত্তিক উৎসব বা ফার্টিলিটি কাল্ট। বীরযোদ্ধার চিত্রাঙ্কিত এই প্রস্তর খণ্ডগুলির ব্যাখ্যায় ভিন্নতা আছে। বিনয় ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি) এগুলিকে মেনহির বলেছেন। নীহারঞ্জন রায় (বাঙালীর ইতিহাস -আদিপর্ব) এগুলিকে বীরস্তম্ভ বলে চিহ্নিত করেছেন। মাণিকলাল সিংহ (পশ্চিম রাঢ় ও বাঁকুড়া সংস্কৃতি) এগুলিকে জয়স্কন্ধবার বলে অভিহিত করেন। ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যাকে এই প্রস্তর পূজাকে ‘পূর্ব পুরুষ পূজা’ বলে অভিহিত করেছেন। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা গেজেটিয়ার্সে বলেছেন, “Beside the grave stones monumented stones are set up outside the village to the memory of men of note.” স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে বহুমত থাকলেও এর প্রাচীনত্ব নিয়ে সহমত আছে। নৃতাত্ত্বিক অতুলকুমার সুর, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বিনয় ঘোষ, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই এগুলিকে ‘প্রাগৈতিহাসিক’ বলে চিহ্নিত করেছেন। সুখময় চট্টোপাধ্যায় শুশুনিয়া সন্নিকটস্থ বীর প্রস্তর বা বীরকখল বা থুম পাথরকে বৈদিক যজ্ঞ প্রস্তুর ‘স্তোম প্রস্তর’ বললেও রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী এগুলি মেগালিথিক সংস্কৃতিরই অংশ বলে মনে করেন। তেমনই পাহাড় পাদদেশের সিংহমূর্তিকে তিনি আদিম কৌম টোটেম বা জীবকের প্রতীক বলে মনে করেন।

নব্যপ্রস্তরযুগে কৃষি ও কৃষি সমাজের বিকাশের ধারার সাথে অসুর সভ্যতার Fertility cult সঙ্গতিপূর্ণ। কৃষির সাথে কৃষিজ সম্পদের সংরক্ষণের অভ্যাস গড়ে ওঠে এযুগে। গাছ, নদী, পাহাড়, শিলার উপাসক এই জনগোষ্ঠীর বাঁধনা, ভাদু, টুসু, জিতা সবই উৎপাদন কেন্দ্রিক উৎসব। অসময়ে গৃহকর্ত্রীর সঞ্চিত ফল নষ্ট হলে বাড়ির কাছে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া, তার থেকে নতুন ফসল জন্মানো এবং উর্বরতাবাদে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা, এসবই ছিল বিবর্তন জারিত যুগ লক্ষণ।

অসুর সংস্কৃতি মূলত কোল, মুণ্ডা বা পরিবর্তিত ভূমিজ সম্প্রদায়ের। নৃতাত্ত্বিক নিরিখে কোল-ভীল-মুণ্ডাদের আগমন সাঁওতাল সহ অন্য জনজাতির আগে ঘটেছিল।[১৭ক] অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গেজেটিয়ার্সে লিখেছিলেন। “There was once a big munda tribe which inhabited a wide spread area. Bhumij - originally a Mundari speaking people” অন্যদিকে বিহারে ‘অসুর’ গোষ্ঠী সম্পর্কে ‘The Tribal communities of Bihar, Part III’ থেকে জানা যাচ্ছে ‘The

Modern Asur tribe consists of three subtribal divisions, namely Bir, (Kol) BirJia, Agaria.”

অসুর সংস্কৃতির মুণ্ডা জনজাতির প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও মন্টু দাস অসুরদের মুণ্ডাদের দ্বারা বিতাড়িত উত্তর ভারতীয় উপজাতি বলেছেন। যারা ছোটনাগপুর মালভূমি অতিক্রম করে দামোদর নদ অববাহিকা অনুসরণে শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, ছাতনা, বড়জোড়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।[১৮] অসুর সংস্কৃতির কিছু গ্রাম হল অসুরাল (জয়পুর), কোড়াসুরগড় (পাত্রসায়ের), আসরাবাইদ, হেত্যাসুর (ছাতনা), হাট আসুরিয়া, বন আসুরিয়া, আসুরি মাধবপুর (গঙ্গাজলঘাটি), অসুরগেড়্যা (রাইপুর), অসুরদা (কোতলপুর), মুড়াগ্রাম (খাতড়া) প্রভৃতি। অস্ট্রিক শব্দ ‘দহ’ (জলপূর্ণগর্ত) যুক্ত গ্রামনাম বাকাদহ, চাকদহ, মুণ্ডারি প্রভাবিত ‘মুড়া’ যুক্ত পাথরমুড়া, পাঁচমুড়া, কুড়মুড়া, মাঞ্চমুড়া গ্রামনাম কোল-মুণ্ডা বিধৃত অসুর সংস্কৃতির পরিচায়ক। অসুর জাতির সমাধিক্ষেত্র ছিল সুরগেড়্যা গ্রামের দক্ষিণস্থ অঞ্চল, ঝিলমিল-বাঁশডিহা, সাবড়াকোণ-পিয়ারডোবা। মেগালিথিক নিদর্শন মিলেছে মৌলবোনা, চাঁদড়া, জিড়রা, তিলুড়ী, থুমকোড়, কামারকুলি, ভৈরবস্থান প্রভৃতি স্থানে। বাঁকুড়া শহর সম্পর্কে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “There are sufficient ethnic evidence to show that the region in which the town Bankura stands now was once inhabited by tribal speaking one or the other of the Munda or Kol languages,” নিষাদ, চণ্ডাল, চুয়াড় অভিধায় ভূষিত এই জনগোষ্ঠী শুধু কৃষিকাজ নয়, কায়িক সামর্থ্যে লোহা নিষ্কাষণ, গালাই, ঢালাই, স্থাপত্য কাজে নৈপুণ্য অর্জন করেছিল তাম্রাশীয় ও লৌহযুগে। পাটলিপুত্রে মৌর্য রাজপ্রাসাদ গঠনে প্রয়োজনীয় লৌহ ও লৌহাস্ত্র অসুর জাতির অবদান বলে মনে হয়।[১৯] সিং-সর্দার-ভূমিজ-মুণ্ডা লালিত অসুর সংস্কৃতি ছিল বৈদিক বাঁধনের বাইরে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা, যাতে আত্তীকৃত হয়েছিল অনেক কৌম জনজাতির সংস্কৃতি।

সাঁওতাল সমাজ, সংগঠন ও অবক্ষয় :

বাঁকুড়া ভূখণ্ডে ভূমিজ-মুণ্ডারি-কৃত অসুর সংস্কৃতি প্রথম সামাজিক জীবনের আভাস দিলেও, পরবর্তীকালে সাঁওতাল সমাজই বৃহত্তম জনজাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডব্লু.ডব্লু. হান্টার ‘অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল’ এ লিখেছেন “The Santals inhabits the whole western frontier of lower Bengal, from within a few miles of the sea to the hills of Bhagulpore. Their country is the shape of a curved strip, about four hundred miles long by a hundred broad giving an area of forty thousand square miles. In the western jungles they are the sole population, in a large tract toward the north they form

nineteen twentieths of it, in the plains the proportion is much smaller, and indeed the race gradually slides into the low-caste Hindus. They certainly number a million and a half and probably approach two millions of human beings, claiming a common origin, speaking one language, following similar customs, worshipping the same gods, and forming in all essentials a distinct ethnical entity among the aboriginal races" (পৃ: ১০২)। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, 'বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি' গ্রন্থে (পৃ:১৩৩) সুস্পষ্ট বিশ্লেষণে বলেছেন, "জনবিন্যাসের দিক থেকে বিশাল বিস্তৃত বাঁকুড়া-মানভূম- সাঁওতালভূম-ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলে সাঁওতাল-হো-মুণ্ডা-ওরাঁও-কোল-ভীল ও তাদের জ্ঞাতিত্বে সংস্পৃক্ত ভূমিজ, মোদি, মাহাতো শবর এবং অর্ধ-উপজাতীয় বাউরি-বাগদি-হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-মালপাহাড়ীয়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। ......আদিম উপজাতীয় কৌম সমাজ বিন্যাস হলো বাঁকুড়া তথা পশ্চিম রাঢ়ের জনতাত্ত্বিক স্বরূপ। সংক্ষেপতঃ ছোটনাগপুর থেকে বাঁকুড়া ভূভাগ পর্যন্ত প্রসারিত পশ্চিম রাঢ়ের আদিম অধিবাসী হল কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, তাম্রকেশ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্ত নাসা আদি-অস্ট্রাল জনগোষ্ঠীর বশংধর সাঁওতাল-হো-মুণ্ডা-ওরাঁও উপজাতীয়গণ ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব বন্ধনে আবদ্ধ কুর্মী-ভূমিজ -কোড়া বা মোদিরা এবং সাঁওতাল-মুণ্ডা-ওরাঁওদের সঙ্গে রক্তের অবাধ সংমিশ্রণজাত বাউরি-বাগদি-হাড়ি-ডোম-মাল-খয়রা-লোহার উপজাতিগণ। এরাই বাঁকুড়া তথা পশ্চিম রাঢ় সংস্কৃতির স্রষ্টা।" সাঁওতালদের পুর্বপুরুষ সম্পর্কে হান্টার লিখেছিলেন (পৃঃ ৩৬৭) "The Sonthals, who it is propable were one of the numerous branches of the ancient Gonds of vast Gondwana tract of central india were then scattered over a large extent of country, including Cuttak, Singbhoom, Dhulbhoom, Midnapore, Bancoorah, Manbhoom, Barabhoom..." মূলত নবপোলীয় যুগ থেকে মুণ্ডা ইত্যাদি জনবসতির আগমনের সাথেই বনজঙ্গল কেটে বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে মুণ্ডা ও সাঁওতাল উভয় জনগোষ্ঠীর বসতাঞ্চল ও কৃষিজমি ছেড়ে নূতন স্থানে যাওয়ার প্রবণতা সুবিদিত। অসুরদের সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে "Their cultivated land is mainly unterraced, which becomes unfit for further plough cultivation after a continuous use of 15 to 20 years due to heavy annual soil erosion....."[20] তেমনি সাঁওতালদের ক্ষেত্রে "If circumstances compel a sonthal to leave his settlement, he finds little trouble in taking to another, clearing a patch of grounds for his crops, and erecting his long hut ... As he never manures his land, and generally occupies an indifferent soil, a constant change in his abode is necessary"[২১] পরবর্তীকালে রাজানুকূল্যে জঙ্গল কেটে বসতি ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের হার বৃদ্ধি ঘটে কারণ,[২২] "It was the wise policy of the government of the

day (Lord W. Bentinck GG) to encourage these simple agriculturists to clear away gradually the vast jungles ...... to cultivate its rich fertile soil and settle themselves and their families upon the lands. Many immigrant sonthals from differerent quarters followed the first settlers, and imitated their example....” বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঁকুড়ার বিভিন্ন থানাতে সাঁওতাল ও ভূমিজদের সংখ্যা পর্যালোচনা করে এই দুই জনজাতির আগমন, অবস্থিতি, বিকাশ ও অবক্ষয়ের ধারা অনুমান করা যাবে। (ম্যাকালপিন প্রতিবেদন, পৃ. ৮)

থানা	মোট জনসংখ্যা	ভূমিজ	সাঁওতাল
শালতোড়া সহ গঙ্গাজলঘাটি	১২২৩৯৯	—	২৫৯৩১
ছাতনা সহ বাঁকুড়া	১৪৮৬৭০	১৭১৪	২৪৬০৬
ইন্দপুর সহ খাতড়া	১১৫৩১৩	১১৪৪০	২০১৪৭
রাইপুর	১০১৩৪৫	৫৪৮০	৭১৭২
সিমলাপাল	৩৮১০৯	৫৫০	৩০৭৮
তালডাংরা সহ ওন্দা	১২২৯১৭	১৪৭	৯৫৮০

অর্থাৎ ইন্দপুর - খাতড়া - রাইপুর থানাঞ্চলে ভূমিজদের জনগাঢ়ত্ব সর্বাধিক। অন্যদিকে ছাতনা - শালতোড়া - বাঁকুড়া - গঙ্গাজলঘাটিতে সাঁওতাল জনবসতির ঘনত্ব বেশি। ইন্দপুর-খাতড়া থানাঞ্চলেও সাঁওতাল জনবসতি লক্ষণীয়। দামোদর সন্নিহিত শালতোড়া - গঙ্গাজলঘাটি-ছাতনা-বাঁকুড়াতে এই সাঁওতাল আধিক্য হান্টারের সাঁওতাল জনজাতির উৎস সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর মতে “I have enumerated the various countries through which the santals say they travelled toward their present territory,.... by identifying them, establish conclusively the santal line of march. Where Hihiri pipri may be, or where Chai Champa and Silda may be, I know not for certain,... with Sikar, the fourth on the list, we touch solid ground. It lies upon the Damooda, almost within the ancient district of Beerbhoom and now froms one of the chief place of pilgrimage of the race. While the santals to the south of the Damooda say they come from country. So that it may be assumed that they reached the valley of that river not from the north or the south the east or the west,...... they have carried with them from the plains a love of order, a genial humanity, with a certain degree of civilizatoin and agriculture habits, which hundreds perhaps thousnds, of years have not been able to efface”[২৩] ম্যাকালপিনের বিশ্লেষণে এবং কর্নেল ডাল্টনের ‘সাঁওতাল জনজাতির উপনিবেশ তত্ত্ব’ থেকে জানা যায়

পরবর্তীতে ছাতনাঞ্চলই সাঁওতাল জনজাতির আদি নিবাস হয়ে দাঁড়ায় ও এই সামন্ত-শিখরভূমি থেকে মেদিনীপুর ও সেখান থেকে খাতড়া-রাইপুরে এদের বিস্তার ঘটে। ম্যাকলপিনের ভাষায়, "The sonthal occupation is old, how it is impossible to say. Chhatna, or the pargana of Samantabhum (called by the santhal "Santbhum")..... is recognised by the sonthals of the south as having almost an equal claim to that of Sikherbhum, which is coterminus with it, to be regarded as their original home in comparatively recent times,"[২৪] কর্নেল ডাল্টন ও রেভাঃ স্ক্রেফশ্রুডের মতে মেদিনীপুরের শিলদা বা সাঁতভুঁই বা সামন্তভুঁই এবং বাঁকুড়া-ছাতনার সাঁওৎভূম বা সামান্তভূম থেকে সাঁওতাল বা সামন্ততাল জনগোষ্ঠী নামের উৎপত্তি, যেহেতু তারাই এখানকার আদি বাসিন্দা।[২৫] রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে এই সামন্তভূম এলাকার বিভিন্ন অংশে মেগালিথিক কালচার বা প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি-প্রবাহ, তাদের টোটেম বা জীবক সিংহ এখানে অস্ট্রিক গোষ্ঠী সংস্কৃতির প্রমাণ, যারা ছিল ছোটনাগপুর পার্বত্যভূমির সাঁওতাল-হো-মুণ্ডা-ওরাঁওদের প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির উত্তর সাধক।[২৬] এই প্রেক্ষাপটেই এখানে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আর ছাতনার রাষ্ট্র ক্ষমতাও ছিল সাঁওতালদের হাতে।[২৬ক]

সামন্তভূমে সাঁওতাল শাসন ছিল ১২টি সাঁওতাল কৌম গোষ্ঠীর রাষ্ট্রচেতনা ও সম্মিলিত প্রয়াসের ফসল। এই বারোটি গোষ্ঠী হল ১) মুর্মু ২) কিস্কু, ৩) হেমব্রম, ৪) সরেন, ৫) মাণ্ডি, ৬) বাস্কে, ৭) টুডু, ৮) হাঁসদা, ৯) বেসরা, ১০) চঁড়ে,১১) পাউরিয়া, ১২) বেদেরা বা সোয়ালী। এই উপগোষ্ঠীগুলিতে সর্দারতন্ত্র বা শাসনতান্ত্রিক বিকাশের পাশাপাশি উপগোষ্ঠীভিত্তিক বংশগত বৃত্তি বিভাজন রীতিও চালু হয়ে গিয়েছিল। ১নং থেকে ৭ নং উপগোষ্ঠীর বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১) পুরোহিত ভূমিকা ২) দেশ শাসন ৩) সচিব বা পরামর্শ দাতা ৪) দেশরক্ষা ও নিরাপত্তা ৫) কৃষিকাজ ও মহাজন বৃত্তি, ৬) ব্যবসা-বাণিজ্য ৭) নৃত্যগীত-লোহার দ্রব্য নির্মাণ। বৃত্তিবিভাজনে মুর্মু ব্রাহ্মণ্য কর্মে, কিস্কু-হেমব্রম-সোরেন ক্ষত্রিয় কর্তব্যে, মাণ্ডি-বাস্কে-টুডু বৈশ্য কর্মে, হাঁসদা-বেসরা-চঁড়ে-পাউরিয়া-বেদেরা গোষ্ঠী সেবা কর্মে নিষ্ঠ ছিল। তুঙ্গভূমে (রাজগ্রাম বা সাঁয়ত-সামন্তসার রাজ্য) সাঁওতাল শাসন সংক্ষিপ্ত হলেও সামন্তভূমে সাঁওতালদের সামাজিক বিকাশ ও রাষ্ট্রভাবনার উন্মেষ ছিল একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। অনুমান করা যায় এই অস্ট্রিক প্রথাগুলি আদিতে আর্যসমাজের গুণ-কর্ম ভিত্তিক চতুর্বর্ণ সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল।[২৭]

ম্যাকলপিন প্রতিবেদনে সাঁওতাল সামাজিক কাঠামোর অবক্ষয়িত রূপ ধরা পড়েছে। গ্রামীণ সাঁওতাল সমাজের মুখ্যব্যক্তি হল মাঝি ও দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি

হলেন পামাণিক। 'লায়া' যেমন ছিলেন ভূমিজ সমাজের পুরোহিত, তেমনি সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত হলেন 'নাইকে'। সহকারী পুরোহিত হলেন 'কুড়াম নাইকে'। গোড়েত নামক গ্রামকর্মি ছিলেন সংবাদবাহক ও সভার আয়োজক। লাসেরসাল নামক তথ্য ও জনসংযোগ কর্মিরও নাম পাওয়া যায়। বিচারের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিল পারাণিক ও যোগ পারাণিকের। গ্রামীণ সভায় বিভিন্ন পাড়া বা গ্রাম থেকে আসতেন ভুদস নামক প্রবীণ গ্রাম প্রতিনিধি, যিনি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ভূমিজ বা অসুর সংস্কৃতিতে যুবক যুবতী অবাধ মেলামেশার স্থল 'ধূমকুড়িয়া' থাকলেও সাঁওতাল সমাজে যুব সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ অক্ষত রাখতে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন 'যোগ মাঝি'। ভূমিজ - অসুর সংস্কৃতিতে যেমন ফার্টিলিটি কাল্ট ও মাতৃতান্ত্রিকতার সম্মান ছিল, সাঁওতাল সমাজ ও প্রশাসনে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ছিল। মাঝি বুড়ি, পারাণিক বুড়ি, নাইকে বুড়ি ও যোগমাঝি বুড়ি ছিল গ্রাম প্রশাসনের অন্যতম অংশীদার। বোঙ্গা গাছ নিম্নস্থ মাঝির থান ছিল গ্রাম সাধারণের সভাস্থল। মাঘের বার্ষিক উৎসবে জমির অধিকার, জমিকর, গ্রাম প্রশাসনের কাজকর্ম আলোচিত হত। মাঝি পদ যদিও ছিল বংশানুক্রমিক, প্রশাসন পরিচালনায় গণতান্ত্রিক প্রকরণের অভাব ছিল না। ম্যাকালপিন প্রতিবেদনে এর সমর্থন মেলে। ডাব্লু. ডাব্লু হান্টারও সাঁওতাল সমাজকর্মিদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের অপব্যবহার ঘটতে দেখেননি। ১০-১২টি গ্রাম প্রশাসনের মাথা ছিলেন পরগণাইত (খাতড়া পরগণাতে চাকলাদার পরগণাইতকে সাহায্য করতেন)। সাঁওতাল সমাজের সর্বোচ্চ সভা হল লোবীর বা খুন্ত কাউন্সিল (দেহড়ি পরিচালিত)। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের সভা হল মোরেহড়। গ্রামীণ বিচারসভায় (মাঝি বৈশি) দুপক্ষের বক্তব্য শুনে মাঝির সভাপতিত্বে রায় ঘোষিত হত। সেই রায় সম্পর্কে অন্যবিধ মত এলে তা বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হত।[২৮] অনেক সময় একাধিক গ্রামের বিষয় হলে একাধিক মাঝি মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন (মাপানজি বৈশি)। পরগণান্তরের বিচারসভা ছিল পরগণা বৈশি ও সর্বোচ্চ বিচারসভা ছিল লোবীর বৈশি। সবক্ষেত্রেই বিচারসভা ছিল প্রকাশ্য এবং অনেক আগেই তা বিজ্ঞাপিত হত শালপাতা পাঠিয়ে (শালগিরা), ব্যক্তি মাধ্যমে, বাদ্যযন্ত্র সম্প্রচারে। সাঁওতাল মাঝিতন্ত্র সম্পর্কে W.W Hunter লিখেছিলেন " The village government is purely patriarchal. Each hamlet has an original founder (the Manjhi-Hanan,) who is regarded as the father of the communites. He receives divine honours in the sacred grave, and transmits his authority to his descendants. The head-man for the time being (Manjhi) bears the undisputed way which belongs to a hereditary governor, but he interferes only on great occasions, and leaves the details to his deputy (Paramanik)....... As

the adults of the village have their headman and his deputy, so also have the children. The juvenile community are strictly controlled by their own officer (the Jog-Manjhi and Jog-Paramanik), whose superintendence continues till the Youth or maiden enters on the responsibilites of married life. A watchman complete the list of village officers, but among the pure santals crime and criminal officers are almost unknown'. (Annals of Rural Bengal, page-150) সাঁওতাল সমাজের এই সুখী বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায় অনুপজাতীয় 'দিকু'দের অর্থগৃধ্নুতা, সামাজিক আগ্রাসন ও শোষণের ফলে। হান্টার, এ্যানালসে (পৃ. ৩৭২) সুন্দর কিন্তু বিষণ্ণ একটি লেখচিত্র এঁকেছিলেন, "Durga Momin was once a contended, if not a happy man. The four of five log houses, which stood on his humble enclosure,..... As evening came he shouldered his plough, while his sons herded the buffaloes, and wended home,.... In his father's days and in the days of his youth he had never seen a mahajun, probably had never known such a thing as a debt. But in an evil hour came one and then another commercial adventurer from the neighbouring districts of Bengal, until perhaps in the course of a few short years he found some fifty mahajuns and beniahs located in his own and the neighbouring villages. In command of money, they presently monopolised the trade of serveral description of goods, and encouraged the rude and ignorant cultivators to accept their proffered loans. One day Durga Momin was in a desponding mood, the harvest was near, promising a plentiful income, but he wanted ready-money for some urgent purposes; or it was a reason of scarcity, and his field was his sole dependence; or some domestic calamity had befallen him and for a time louded or seems to cloud him prospects; or there was some want of forethought; from Buldev Singh, trader, he is constrained to receive 4Rupees, he feels that he will soon be able to repay it, with 4 As in the Rupee, or 25 percent interest which he is willing to do, and his intentions are honest in that respect as Buldev knows full well; but when the day of payment arrives, Buldev demamds and receives 8 rupees and then offers no receipt. Haladhar Chowdhuri also advanced him 6 Rupees, but no consideration only of a bond for thirteen, and this in fact is the general mode of repayment which the Mahajun has adopted,wing short weight, and taking many times more grain than amount to the value of the debt, and thus forestalling the sonthals labourer's harvest prospect. Where the sonthals had not the required sum to pay, an equivalent for the deficiency is taken in his grain, fruit, cattle, an other stores...... if a mahajun entertains a special

grudge against some indiviual sonthal, a bribe to the police can once effect his arrest on some ground less accusation. In the judicial counts are amlah not less given to illicit gains of a like nature. In the Revenue department of the public offices are the suzawuls who collect the rents from the pergunnaits, the Manjhis, of the villagers generally; and where authorise to receive some six repees on behalf of the sircar, (government) they will lay some six other repees for their private benefit, of where a rent of 4 as. for a plot and all it contained was fixed in the settlement, they take a rupee more for sapling bamboo clump, or a solitary fruit tree, growing there on..... have exercised a combined system of extorsion, opperssive exactions, forcible dispossession of property, abuse and personal voilence, and variety of petty tyrannies upon the and yielding sonthals. the non-payment of a debt, be it a just or unjust demand, is followed by a petition by the claimant in the nearest Moonsiff's court, the issue of a notice to the defaulter, of which probably the prosecutor takes care he shall not be aware at all, or not too late to take the necessary measures for his clearance, and by a writ of attachment on his movable property, which may be excuted, and the victim reduced to beggary and ruin,.... In 1848 the sonthals of three entire villages suddenly absconded, and never returned, in consequence of the fradulent, false, or exaggerated suits of the mahajuns in the civil court" এই বিষণ্ণ চিত্রায়ণ থেকেই বোঝা যায় একদা সুখী ও সমৃদ্ধ সাঁওতাল সমাজ কেমনভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় অনুপজাতীয় শোষক শ্রেণির হাতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল এবং অনুকরণীয় সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ বিশাল ভূমিখণ্ডের অধিকারী সাঁওতাল সমাজ ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হল। ম্যাকালপিন প্রতিবেদনে এর ছায়াপাত ছিল, "There are legends relating how the Mahajun of that period gave the headman a loan of 2 pies of grain, and in exchange took the whole village...... In almost every village there are to be found three or more houses of non-cultivators, who eke out a living by labouring in the neghbourhood, by biennial journeys to burdwan for the sowing and harvesting of the rice crop, and by cultivating bhagti or krishani for Dikkus. On the outskirts of the area in Taldangra and Simlapal, it is reported that there are several sonthal villages contanining a purely labour population" সাঁওতালদের উপর শেষতম আঘাত ছিল তাদের অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। ম্যাকালপিনের প্রতিবেদনে দেখি, "The proprietors appear to be alive to the profits to be gained from the forest, for almost everywhere the Sonthals are forbidden to cut sal trees. In Raipur they are allowed to take other

wood from the jungle, at a rate of Rs. 1 or Rs. 2 a cart load, or at a rate of 2 pies in the repee of rent." মূলত তাম্বুলী-চৌধুরী জাতির মহাজনদের হাতে সাঁওতালরা জমি হারাতে থাকে। "They find it more advantageous to involve the Sonthal in debts, Then buy his land and resettle it at a high produce rent." (Macalpin Report p-17) বিংশ শতকের শুরুতে ম্যাকাল্পিন সাঁওতাল সমাজের যে ভাঙনের চিত্র সমীক্ষা করেছিলেন তা নিম্নরূপ— (প্রতিবেদন পৃঃ-১)

থানা	থানায় মোট সাঁওতাল গ্রাম	কটি গ্রামে সমীক্ষা চলেছে	সমীক্ষাকৃত গ্রামগুলিতে কয়টিতে সাঁওতাল সমাজ কাঠামো অক্ষত ছিল	সমীক্ষাকৃত গ্রামগুলির কটিতে সামাজিক বাঁধনে ভাঙ্গন
ছাতনাসহ বাঁকুড়া	১৪৫	১৪৫	০	১৪৫
শালতোড়াসহ গঙ্গাজলঘাটি	৯০	৯০	৩	৮৭
ইন্দপুর	৫৬	৩২	৮	২৪
খাতড়া	১২৫	৮৪	২০	৬৪
রাইপুর	৪৫৭	২০২	২৬	১৭৬
সিমলাপাল	১১৯	৮৪	২৯	৫৫
ওন্দা	৪৮	২২	০	২২
তালডাংরা	১০০	৭১	২৯	৪২
মোট	**১১৫৮**	**৭৩০**	**১১৫**	**৬১৫**

অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ায় মাত্র ১৫ শতাংশ সাঁওতাল গ্রামে এই উপজাতির সামাজিক সংস্কৃতি অক্ষত ছিল। যে সমস্ত গ্রামে সামাজিক কাঠামো তখন অক্ষত ছিল তার অনেক গ্রামেই এরা ভূমি অধিকার হারিয়ে থাকতে পারে। এ বিষয়ে সারেঙ্গার ওয়েসলিয়ান মিশনের জি.ই. উডফোর্ড সঠিক মতামত দিয়ে লিখেছিলেন, "It is exceedingly tenacious of life, and not likely, in my opinion, to disappears altogether. The village officials still hold sway in the sonthal villages of this area, even where the Morols (mandals of Manjihis) no longer own the village lands, and where the khem lands have passed out of the hands of the officials. But this village system is so intimately associated with the social and religious customs of the people that it is practically impossible of it to disappear altogether so longer the sonthal race retains any individuality at all" সাঁওতাল সামাজিক কাঠামোর

বিভিন্ন গ্রামকর্মি প্রশাসকের সেবার পরিবর্তে যে নিষ্কর জমি (খেম) ভোগ করত তাও হাতছাড়া হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ম্যাকালপিন কিছু কিছু গ্রামে গোড়েত ও নাইকের খেম জমি অক্ষত দেখতে পেয়েছিলেন। রাইপুরের কোসাই গ্রামে যোগমাঝির খেম জমি ছাড়া অন্যান্য গ্রামকর্মি-আধিকারিকের খেম জমির সন্ধান পেয়েছিলেন। ম্যাকালপিনের মতে সাঁওতাল গ্রামগুলিতে অন্তত পাঁচ ধরনের গ্রাম সংগঠকের নাম শোনা যেত। পারাণিক বা যোগপারাণিকের পদ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া ও ছাতনায় বিরল বা অশ্রুত ছিল। কুড়াম-নাইকে পদটিও বিরল ছিল। কখনো কখনো চার পাঁচটি গ্রামে একজন নাইকে বা কুড়াম নাইকে থাকত। রাইপুর ও খাতড়া থানা ছিল ওই দুই সাঁওতাল সামাজিক- পরগণার সমতুল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে এই দুই পরগণার দুই তরুণ পরগণাইত থাকলেও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অস্তমিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের চরম সময়ে ছাতনায় সাঁওতালদের একটি মহাসমাবেশের কথা জানা গেলেও সর্বোচ্চ বিচারসভা লোবীর বা খুঁট কাউন্সিলেরও অস্তিত্ব ছিল না।

বাঁকুড়ার বহু স্থান বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় মণ্ডল প্রথার সাথে মাঝিতন্ত্র আত্মীকৃত হয়েছিল। জঙ্গল সাফ করে বসতি স্থাপনকালেই গ্রাম প্রতিনিধি হিসাবে 'মণ্ডল' ভূমিকর আদায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মাঝি মণ্ডলের দায়িত্ব নিলে কোথাও কোথাও খেম জমিতে (সেবা বিনিময় ব্যক্তি জমি) অল্প কর (পঞ্চকি) দিতে হত নিজ জোত মালিক বা ভূস্বামীকে। বিশ শতকের শুরুতে এমন মণ্ডল-মাঝির সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ (ম্যাকালপিন প্রতিবেদন, পৃ:১৭)

জমিদারি	জমিদার	সাল	মণ্ডল-মাঝির আওতাধীন সাঁওতাল গ্রাম সংখ্যা
শ্যামসুন্দরপুর	সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১৮৯২	১৪
		১৯০৯	১০
		১৮৮৪	০৪
অম্বিকানগর	সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১৯০৯	০১
রায়পুর	মেসার্স গিসবর্ন এণ্ড কোং	১৮৮৪	১৯
		১৯০৯	০২

আবার সাঁওতালদের নিম্নমুখী সংখ্যাতত্ত্বের প্রেক্ষিতে হান্টার বলেছিলেন '.... indeed the race gradually slides into the low caste Hindu" অর্থাৎ অন্যান্য হিন্দুকৃত শ্রেণী ও বর্ণে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সাঁওতাল সংখ্যা হ্রাস পায় ও সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক - সামাজিক বিপর্যয় তরান্বিত হয়।

বলা যায় নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় যুগোত্তর অস্ট্রাল - কৌম সভ্যতা সাঁওতাল জীবন ধারায় বিকশিত হলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে বা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঔপনিবেশিক ঔদাসীন্য ও মহাজনী অত্যাচারে স্তব্ধ ও সমাহিত হয়।

তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা : ডিহর ও পোখন্না পরিমণ্ডল

বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রত্নস্থলের প্রত্নবস্তু থেকে এই অঞ্চলে জনবসতির প্রাচীনত্ব সংশয়াতীতভাবে প্রামাণিত। নবাশ্মীয় যুগে যেমন আদিম জনজাতির যাযাবর শিকারবৃত্তি থেকে পশুপালন ও কৃষিনির্ভর সমাজজীবনে উত্তরণের আভাস মেলে, তেমনি তাম্রাশ্মীয় ও লৌহযুগের প্রত্নদৃষ্টান্ত উন্নততর জীবনযাত্রায় জনজাতির সমাজজীবন প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাক্ষ্য।

কানা দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী ২৩°৭১/ অক্ষাংশ ও ৮৭°২১/ দ্রাঘিমাংশে ১৫-২০ একরে বিস্তৃত প্রত্নতাত্ত্বিক জনপদ ডিহরের বিকাশ মূলত তাম্রাশ্মীয় যুগে। কিছু নবাশ্মীয় আয়ুধ, মুদ্রা, মৃৎপাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিনিময় ব্যবস্থায় নবাশ্মীয় প্রত্নস্থল থেকে এখানে আনীত হয়েছিল বলে অনুমান।[২৯] এই তাম্রাশ্মীয় যুগের বিস্তৃতি ছিল খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ বছর পর্যন্ত এবং সভ্যতার ভারকেন্দ্র লালগড় কেন্দ্রিক ল্যাটেরাইট অঞ্চল থেকে তার অনুভূমিক বিস্তার ঘটে। ডিহর পরিমণ্ডল ব্যাপ্ত ছিল উচ্চ লালগড় গঠনের লাল মৃত্তিকাঞ্চলে এবং পোখন্না পরিমণ্ডল ছিল পুরাতন অ্যালুভিয়ান মৃত্তিকার সিজুয়া গঠনে।[৩০] ডিহর পরিমণ্ডলের বসতিস্তরকে সাতটি স্তরে ভাগ করলে পঞ্চম থেকে সপ্তম স্তর পর্যন্ত ছিল তাম্রাশ্মীয় যুগ নিদর্শন সম্পৃক্ত। আদি-ঐতিহাসিক যুগস্তর ছিল প্রথম চারটি বা ২.৫ মিটার ভূগর্ভ পর্যন্ত প্রসারিত। তাম্রাশ্মীয় যুগের প্রমাণ স্বরূপ এখানে পাওয়া গেছে সরল বা জ্যামিতিক নক্সায় কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র, ধূসর বর্ণের, কালো প্রলেপের বা চন্দন বর্ণের মৃৎপাত্র, খোলামুখ বেড়িযুক্ত বাটি, উত্তল পার্শ্বদেশ - গড়ানে তলযুক্ত বাটি ইত্যাদি। ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রস্তরায়ুধের উপকরণ অপ্রতুলতার কারণে বিকল্প হিসাবে বন্য ও পালিত পশুহাড়ের ফলা, সূচালো যন্ত্র, ছুরি, ছুঁচ, বাটালি, খাদ্যোপযোগী মূল উৎপাটনের পশু সিং প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া গেছে। উৎখননে প্রাপ্ত খুঁটি পোঁতার ধরণ থেকে ডিহরের তাম্রাশ্মীয় গৃহপ্রণালী অনুমিত হয়। সাধারণ বা গোলাকার বাড়ির মেঝে নির্মিত হত পোড়ামাটির শক্তপিণ্ড ও চুনাপাথর কাঁকর মিশ্রিত উপকরণে। দেওয়াল ছিল মাটির পুরু প্রলেপযুক্ত। ডিহরে প্রাপ্ত বৃক্ষ, হস্তী ইত্যাদি চিত্রিত ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রাকে ডিহরের অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

উৎখননে প্রাপ্ত কুঁড়োর বিশ্লেষণে এখানকার কৃষি ফসল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে ওরাইজা স্যাটিভা প্রকৃতির ধানকে। কিন্তু এই কৃষিশস্য ডিহরের জনগোষ্ঠীর সার্বিক

পুষ্টি চাহিদার একশো ভাগ পূরণ করতে পারেনি এবং সেকারণেই ডিহরবাসীর পশুপালন ও পশুশিকার নির্ভরতা ছিল যথেষ্ট। সভ্যতার বিকাশের সাথে পশুপালনের প্রবণতা বৃদ্ধি ছিল লক্ষণীয় কারণ এলাকায় প্রাপ্ত পশু হাড়ের বিশ্লেষণে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ছিল মোট পশুসংখ্যার ৭১.৯৩ শতাংশ।

তাম্রাশ্মীয় যুগে লোহার ব্যবহার বিরল হলেও ঐতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক স্তরে লোহার পেরেক, ছোরা, তরবারির অস্তিত্ব মিলেছে। এই স্তরে সংগৃহীত গোল, লম্ব, বেলন, তারা, সমতল, উত্তলাকার চ্যালসিডোনি কার্নেলিয়ন, অ্যাগেট, স্টিয়াটাইট, কোয়ার্টজ পাথরের পুঁতিগুলি থেকে তাম্রাশ্মীয় ডিহরবাসীর উন্নত ভোগবাদী শৌখিনতর জীবনধারাতে আকর্ষিত ও অবস্থিত হওয়ার প্রমাণ মেলে। ডিহর সাংস্কৃতিক সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত পাঞ্চমার্কড ও ঢালাই তাম্র মুদ্রা মৌর্য ও শুঙ্গযুগীয় মুদ্রার অনুরূপ।[৩১] ঐতিহাসিকরা মৌর্যশাসনের যে পরিধি নির্দিষ্ট করেছেন তার অন্তর্গত ছিল রাঢ় অঞ্চল। এখানে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের মুদ্রা রাঢ় ভূখণ্ডে মৌর্য আধিপত্যকেই স্বীকৃতি দেয়। মৌর্যসম্রাট আশোকের সময় সিংহলরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সঙ্গীরা যখন বোধিদ্রুম শাখা নিয়ে দেশে ফিরছিলেন, সম্রাট অশোক সেনা সহ পাটলিপুত্র থেকে রাজগৃহ, রাজমহল, ঝড়িয়া, রঘুনাথপুর, ছাতনা, ঘাটাল হয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসে তাদের জাহাজে তুলে দেন, যা এই অঞ্চলে মৌর্য আধিপত্যকে প্রমাণিত করে।[৩১ক] মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় মৌর্যশাসনে সর্বাধিক গুরুত্বের বিষয় ছিল কৃষির বিকাশ। এর জন্য কৃষিগ্রাম তৈরী করে মূলত অনার্য শূদ্র জাতি দ্বারা কৃষিকাজ হত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও রাজানুকূল্যে। ইন্ডিকায় লেখা হয়েছিল — 'As they were exempted from fighting and other public service, they devoted the whole of their time to tillage. Nor would an enemy, coming upon a husbandman at work on his land, do him any harm, for, farmers were regarded as public benefactors and were protected. The land thus remaining unravaged, and producing heavily crops, supplies the inhabitants with all that is requisite to make life enjoyable' অন্য সমস্ত কিছু থেকে স্বতন্ত্র রেখে গ্রামগুলিতে নিরুপদ্রবে কৃষিকাজে ব্যাপ্ত রাখা, বিশেষত অনার্য-শূদ্রদের দিয়ে, ছিল মৌর্য শাসনের বিশেষ দিক (The seclution of villages belonging to the sudra families was a Mauryan innovation)।[৩২] মৌর্য সাম্রাজ্যে রাঢ় বা বাঁকুড়াক্ষেত্রের প্রান্তিক অবস্থান ও দুর্গমতা, এখানে মৌর্যশাসনের সবল উপস্থিতির অন্তরায় হলেও কৃষি বিকাশ প্রচেষ্টার স্রোত রাঢ়েও পৌঁছেছিল মনে করা যায়। ডিহরের মানুষরা ছিল মূলত অনার্য এবং উৎখননে প্রাপ্ত ওরাইজা স্যাটিভা প্রজাতির ধানের ফসিল, হারপুর বোন পয়েন্ট, জালের কাঠি, পাষাণচক্র (যাঁতা), পশুর হাড় ও পাথরের কৃষি সহকারী উপকরণ,

সংক্ষণের বড় মৃৎপাত্র এখানে কৃষি উন্নয়নের প্রমাণ দেয়। গরু, মহিষ, ছাগলের ৭১.৯৩ শতাংশই ছিল গৃহপালিত যা ডিহরের প্রাচীন অধিবাসীদের কৃষি-পশুপালনের ঝোঁককে প্রতিষ্ঠিত করে। অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তীর মতে ডিহরের চার একরেরও বেশি স্থান জুড়ে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সংস্কৃতি বিস্তৃত ছিল।

চিত্রিত ও অচিত্রিত কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের একত্র উপস্থিতি ও অন্যান্য প্রত্নদ্রব্যের রেডিও কার্বন পরীক্ষায় প্রাপ্ত তারিখের নিরিখে ডঃ অনিলচন্দ্র পাল তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কাল ৩০০০ বছর প্রাচীন বললেও কৃষি সংস্কৃতির বিকাশের কালসীমা মৌর্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে ডিহরের তাম্রাশ্মীয় সাংস্কৃতিক সঞ্চয়ে দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এখান থেকে তামার কানের দুল ও বালা সংগৃহীত হয়েছে। নবীনতর পর্যায়ে লৌহ ব্যবহারের অকিঞ্চিৎকর ব্যবহার থাকলেও আদি পর্যায়ে এর ব্যবহার ছিল না। ডিহরে কোনো উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণচিক্কণ মৃৎপাত্র পাওয়া যায়নি। নবীনতর স্তরে সংগৃহীত মৃৎপাত্রের চাকচিক্যহীনতা, জ্যামিতিক ও বিবিধ চিত্রায়ণের স্বল্পতা ডিহর সংস্কৃতির নিম্নগামিতাকে নির্দেশ করে।[৩৩] দ্বারকেশ্বর নদীপথের পরিবর্তন ডিহরের বাণিজ্যিক ধারাকে ব্যাহত করে। গুপ্তযুগের বহু পূর্বেই ডিহর সংস্কৃতি বার্ধক্যে উপনীত হয়। ফলে ডিহর পরিমণ্ডলে উন্নত নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেনি। পোখন্না পরিমণ্ডলের অবস্থিতি পুরাতন এ্যালুভিয়ান স্তর বিন্যাসে এবং সাংস্কৃতিক সঞ্চয়ের গভীরতা ১.৫-২.৫ মিটার। কাশীনাথ দীক্ষিত, ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার ১৯২৭-২৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, "পোখন্না দামোদরের দক্ষিণ তীরবর্তী প্রাচীন বৃহৎ গ্রাম। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে 'রাজগড়' নাম্নী বৃহৎ টিপিতে সর্বত্র ভাঙ্গা ইট, মাটির বাসনকোসনের টুকরো প্রভৃতি পুরাবস্তু মেলে।"[৩৪] উৎখননে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির পাত্রসমূহ, টেরাকোটা মূর্তি, তাম্র মুদ্রা, পুঁতি ইত্যাদি থেকে এই পরিমণ্ডলের বয়সকাল অনুমিত হয়েছে খ্রিস্টিয় অষ্টম-নবম শতাব্দী পর্যন্ত। ডিহর পরিমণ্ডল অপেক্ষা এর কালসীমার ব্যাপ্তি এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন অনেক বেশি ছিল। এখানকার বিবিধ ছাপমারা মুদ্রা, ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রার সাথে গুপ্তপূর্ব ও গুপ্তযুগের মুদ্রার মিল আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক সীমার মধ্যেই ছিল বাঁকুড়া তথা রাঢ়ভূমি। সুখময় চট্টোপাধ্যায় শুশুনিয়া সন্নিকটের 'হাউসি' সম্পর্কে বলেন হাউসি শব্দটি সংস্কৃত 'হতশ্রী'র অপভ্রংশ। তাঁর মতে গ্রামেই সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণপতি চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করেন।[৩৪ক] পোখন্নাতে কৃষিব্যবস্থার সুদৃঢ় অস্তিত্বের পাশাপাশি বাণিজ্যের বিকাশ ছিল লক্ষণীয়। ডিহর সভ্যতার পরিসর যেখানে ছিল আপেক্ষিকভাবে সংক্ষিপ্ততর, পোখন্না পরিমণ্ডলের ব্যাপ্তি সেখানে গুপ্তোত্তর যুগেও। ডিহর দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী হওয়ায় তার কৃষিব্যবস্থা নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল সহজ বিপণনও বাণিজ্যিক আনুকূল্যে। পোখন্না - বাঁকুড়া ও রাঢ়ে গুপ্ত আধিপত্য একটি ইতিহাস স্বীকৃত সত্য।[৩৪খ]

গুপ্ত যুগে সাম্রাজ্য ব্যাপী যে বাণিজ্যিক বিকাশ লক্ষিত হয়েছিল গুপ্ত প্রভাবিত শুশুনিয়া পোখন্নাতেও ছিল তার ছায়াপাত। উৎখননে প্রাপ্ত সিরামিক লাল কালো ধূসর চাকোলেট বর্ণের গলাবিশিষ্ট পাত্র, টিউলিপ পাত্র, অবতল পাত্র, বেসিন, ফুলদানি, মূল্যবান পাথরের দ্রব্য, রাবার-চিরুনী, লকেট, দুল ইত্যাদি শৌখিন দ্রব্যের প্রাচুর্য, উন্নত কারু, গৃহ ও গার্হস্থ্য দ্রব্যাদির উন্নততর গঠন বিচার করে বাকুঁড়ায় এটিকে প্রথম আধা-নগর সভ্যতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই নাগরিক ও বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম প্রমাণ নদীর অপরতীরের জনপদ ভরতপুরের সাথে তার সমকালীন ও প্রাক্-ঐতিহাসিক বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন।

গ্রামপত্তন ও সমাজগঠন ও গ্রাম কর্মি :

ফিওদর করোভকিনের বিজ্ঞান সমর্থিত তত্ত্ব অনুসারে বাঁকুড়ায় আদিম জনগোষ্ঠীর আগমন সংশয়াতীত ঘটনা এবং তার সময়কাল দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার আবিস্কৃত প্রাচীনতম মানব অস্তিত্বের সমকালীন। এই যাযাবর জাতির বসতি স্থাপন ও সামাজিক জীবন শুরুর সুনির্দিষ্ট সময়কাল এখনও নির্ধারিত হয়নি। তবে পুরাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বঙ্গের বিভিন্ন নদীতীরে আদিম জনজাতির বসতি স্থাপনকাল খ্রিঃপূঃ দুই হাজার বছর আগের বলে চিহ্নিত হয়েছে। [৩৫] তাদের আয়ুধ ছিল নব্যপ্রস্তরযুগের আর জীবিকা ছিল ফল, মূল, মাছ, অন্যান্য প্রাণী সংগ্রহ ও শিকার।[৩৬] তবে বাঁকুড়াখণ্ডে বাংলার বাকি অংশের চেয়ে আদিম জনজাতির আগমন, বসতিস্থাপন ও সমাজ-গঠন অনেক আগেই হয়েছিল যদিও পরবর্তী পর্যায়গুলিতে উত্তরণের ধারা ছিল তুলনায় শ্লথ ও স্বতন্ত্র।[৩৭] পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে মৌর্যযুগ পর্যন্ত বাঁকুড়া-ভূখণ্ডে সমাজবদ্ধ জীবন ও গ্রাম গঠনের পর্ব বজায় ছিল। গ্রামীণ শাসন গড়ে উঠেছিল গ্রামীণ মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে। এমনকি সিরাজ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে চতুর্দশ শতকে দামোদরের উত্তরাংশে ও কংসাবতীর দক্ষিণাংশে গভীর অরণ্যে ছোট ছোট উপজাতীয় বসতির কথা বলা হয়েছে। যাযাবর জীবনের শিকারভিত্তিক খাদ্য সংগ্রহের স্তর আংশিক অতিক্রম করে তারা স্বল্পকালীন শুষ্কজমিতে কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন এবং তারা ছিল রাষ্ট্র বিহীন সম্প্রদায়।[৩৮] তবে ডিহর ও পোখন্না পরিমণ্ডলে প্রাপ্ত প্রত্নদৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ থেকে সেখানে মৌর্য সময়কাল থেকে গুপ্ত সময়কাল পর্যন্ত বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রান্তিক প্রভাব এতদঞ্চলে প্রসারিত ছিল বলে মনে হয়। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী আঁকুড়ে ডোম কালুবীরের নেতৃত্বে দক্ষিণ বাঁকুড়ার জনজাতিরা প্রাক-মৌর্য সময়ে কলিঙ্গ অভিযান কালে মহাপদ্মনন্দ বিরোধী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল বলে মতপ্রকাশ করেন।

বৃহত্তর রাষ্ট্রপ্রভাবের অন্তর্গত বা প্রায় স্বাধীন বা স্বাধীন এই জনজাতিগুলোর প্রশাসন

বলতে তখন গ্রামীণ সর্দারতন্ত্রকেই বোঝাত। এই কৌম গ্রাম সর্দারদের রাষ্ট্রিক আকাঙ্খার পরিণতি হল ভৌমরাজ্য যার বিকাশের কাল মোটামুটি ৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। বাঁকুড়া ভূখণ্ডে ক্ষুদ্র গ্রাম শাসন থেকে বৃহত্তর ভৌমরাজ্য ব্যবস্থায় উত্তরণ অর্থনৈতিক কারণ ও আর্যীকরণের প্রত্যক্ষ ফল। এই বিবর্তন সম্পর্কে রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখেছিলেন, "ধীরে ধীরে যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর উপজাতীয় ও অর্ধ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহ জলাজমি কৃষিব্যবস্থা গ্রহণ করলে স্থায়ী বসতির পত্তন হতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে অনুভূমিক ও উল্লম্ব স্তরবিভাজন ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমগ্র সামাজিক উৎপাদনের অসম বন্টনের প্রক্রিয়া দেখা দেয়। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনের বন্টন সমস্যার মোকাবিলার জন্য বহুবিধ কর্তব্য ও রাষ্ট্রের মত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব পরিচালনার স্বার্থে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের জন্য নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বিশেষীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। একটি জনগোষ্ঠীর যে স্তরটির হিন্দুকরণ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল সে স্তরটি শাসনের অধিকারকে আইনসিদ্ধ করার জন্য নিজের সম্পর্কে একটি 'মিথ' তৈরী করে রাজপুত ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করে। এ দাবি সম্পদ-লোলুপ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগোষ্ঠী শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়। ভবিষ্যপুরাণে এতদঞ্চলের উপজাতীয় আদিবাসীদের 'রাজপুত' বলে অভিহিত করার ব্যাখ্যা এভাবেই পাওয়া যায়। পরিবর্তিত উৎপাদন পদ্ধতির অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে কৌম সর্দারতন্ত্র হিন্দুকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হয়।

...... বাঁকুড়া জেলায় উপজাতীদের বিশালায়তন অস্তিত্ব প্রমাণ করে, হিন্দুকরণ সত্ত্বেও উপজাতীয় সমাজ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। তাই শুধুমাত্র উপজাতীয় সর্দারদের ও তাঁদের ঘনিষ্ঠজনদের প্রভাবিত করেই সামাজিক রূপান্তর সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই উপজাতীয় কৌমের সাধারণ মানুষদেরও হিন্দুকৃত করার প্রয়োজন ছিল। তা সিদ্ধ হয়েছিল তাদের ব্রাহ্মণ্য কৃষিব্যবস্থার পরিবৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসার মাধ্যমে। আদিম উপজাতীয় জীবনে মানুষ ছিল ফলমূল আহরণকারী ও এমন এক কৃষিব্যবস্থার অভ্যস্ত যাকে বলা হয় ঝুম প্রথা অর্থাৎ ছোট ছোট খণ্ডে খুপরির সাহায্যে জমি চাষ করে বীজ বপন ও শস্য আহরণের পর জমিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। নূতন কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে আসার সময় বিভিন্ন কৌম সমাজের অন্তঃবিবাহ প্রথা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা হয়েছিল। এজন্যই বাঁকুড়া জেলায় বহু-বর্গীয় শূদ্র জাতি গোষ্ঠী দেখা যায়। এ মানুষগুলির সংখ্যাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।" এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও অনুপ্রবেশের বড় শরিক ছিল উৎকলী ব্রাহ্মণ ও পরবর্তীতে তাম্বুলী-চৌধুরীসহ উচ্চবর্ণের জাতি সমূহ।

গ্রামভিত্তিক কৌম সমাজজীবন বৃহত্তর রাষ্ট্রকাঠামোতে অঙ্গীভূত হওয়ায় সর্দারতন্ত্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ক্ষুন্ন হয় ও গ্রামীণ শাসন কাঠামো ক্রমশ আলগা হতে থাকে। ক্রমে ঘাটোয়ালতন্ত্র আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। ২০০০ বা তার অধিক খ্রিস্টপূর্ব সময়ে যে গোষ্ঠীজীবন ও গ্রামপত্তনের সূচনা ১০০০ খ্রিঃপূঃ সময়ে তা তাম্রাশ্মীয় যুগে উন্নত কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে।[৩৯] পরবর্তীতে আর্যায়ণের ধাক্কায় প্রোটোঅস্ট্রালয়েড ও প্রোটো-দ্রাভিডিয়ান জনগোষ্ঠী প্রোটোইন্দো-ইউরোপীয়ান জনগোষ্ঠীতে বিবর্তিত হয় [৩৯ক]। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে 'বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব' গ্রন্থে বঙ্গে বৌদ্ধমতের প্রসারকাল খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক, জৈন ধারার আগমন খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতকে এবং খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে আর্য আগমন ঘটে বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে রমেশচন্দ্র মজুমদার বাঙ্গালার ইতিহাসে (পৃঃ ৩৯৬, ষষ্ঠ খণ্ড) বলেছেন— " নিধানপুরে প্রাপ্ত তাম্রফলক থেকে জানা যায় শ্রীহট্টে ২০৫ জন ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করেন।এরও পরে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে 'বঙ্গে' অনেক সংখ্যক আর্য আগমন হয়।" বাঁকুড়া ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রসারের সাথেই আর্যীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। জৈন ভাবধারা প্রসারই ছিল মূল যদিও কোথায় কোথায় ক্ষীণ বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছায়াপাত আছে। অযোধ্যা, অম্বিকানগর, মণ্ডলকুলি, সাতপাটা, জয়পুর, কোতুলপুর, বহুলাড়া, সোনাতাপোল, ধরাপাট প্রভৃতি স্থানে জৈন ও কোচিয়াকোল, মরারগ্রাম, শুশুনিয়া, পূর্ব বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রত্ন নিদর্শন মিলেছে। 'বাঁকুড়া পুরাকৃতি রক্ষা'য় যোগেশচন্দ্র রায় বলেছিলেন- "বিষ্ণুপুরের পূর্বভাগে দ্বারকেশ্বর নদের কূলে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখনও লোকে সে গ্রামকে বিহার বলে"। তাঁর মতে এক্তেশ্বর মন্দিরের 'খাঁদারাণী' জৈন বা বুদ্ধ মূর্তি। ঘুটগড়িয়া-মোলবোনার খাঁদারাণী মূর্তি কে. এন. দীক্ষিত'র মতে নাগছত্র বিশিষ্ট দিগম্বর পার্শ্বনাথের যা কালের প্রভাবে জীর্ণদশাপ্রাপ্ত বা ভগ্ননাসিকা প্রাপ্ত হয়। মোলবোনা-এক্তেশ্বরেও জৈন- বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব আঁচ করা যায়। তবে বাঁকুড়া ভূখণ্ডে আর্য-জৈন সংস্কৃতির আগমন প্রয়াস প্রতিহত হয়েছিল এখানকার আদি-অস্ট্রিক, দ্রাবিড় সংস্কৃতি দ্বারা (আচারঙ্গ সূত্র)। জৈন তীর্থঙ্কররা রাঢ়ে দৈহিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এমনকি 'তু-তু ছুছু' শব্দে তাদের ওপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত। মহাবীরের রাঢ় পরিভ্রমণের কথা (খ্রিঃপূঃ ৩০০ বছর আগে, আচারঙ্গ সূত্র) জানা গেলেও গৌতম বুদ্ধের রাঢ়ে কোনো আগমন সংবাদ নেই, তবে তিনি পৌন্ড্রনগরীতে ৩ মাস কাল অবস্থান করেছিলেন।[৩৯খ]

খ্রিঃ পূঃ সপ্তম শতকে আত্রেয়ী আরণ্যকে এবং খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের বৈধায়ন ধর্মসূত্র থেকে জঙ্গলমহল - বাঁকুড়া ভূখণ্ডে 'অসুর' জনগোষ্ঠীর বসবাসের কথা জানা

যায়। তবে আর্য ধর্মগ্রন্থে এমনকি বৌদ্ধ-জৈন ধর্মগ্রন্থে অনার্য জনজাতিরা 'অসুর' বা বাগদি, বাউরী, জেলে, হাড়ি, ডোম, সাঁওতাল, মাল, পাহাড়ীরা নিষাদ-দাস-দুস্য নামে অভিহিত। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী অসুরদের প্রস্তর সভ্যতার উত্তরসূরী বলেছেন।

অসুর সমাজের যেমন 'লায়া' নাম্নী সমাজ ও ধর্মীয় কর্মির নাম জানা যায় তেমনি সাঁওতাল সমাজের মাঝি, জগমাঝি, পারাণিক, যোগ পারাণিক, নাইকে, কুড়াম নাইকে, গোড়েৎ, ভুদস, লাসেরসাল প্রভৃতি গ্রামকর্মি ও গ্রাম প্রশাসকের নাম জানা যায়।

কৌম সর্দারতন্ত্র থেকে ভৌম রাজতন্ত্রে উত্তরণ ও নব্য প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখেছিলেন (বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, পৃঃ ২৪),"হিন্দুকৃত উপজাতীয় সর্দাররাজ্যের অনুসঙ্গ হিসাবে আবির্ভূত হয় প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। সে সঙ্গে আসে স্তরবিন্যস্ত কর্মচারী শ্রেণি ও তাদের উপর আরোপিত হয় প্রশাসনিক বিচারবিভাগীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব। ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত পিরামিডাকৃতি রাজনৈতিক কাঠামোর শীর্ষে স্থাপিত হলেন হিন্দুকৃত উপজাতীয় প্রধান। তাঁর নীচে ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী। যেমন, পরগণা শাসক দিগর বা সদর ঘাটোয়াল বা তরফ সর্দার। রাজপরিবারের সদস্যদের মত তাঁরাও নিজেদের রাজপুত-ক্ষত্রিয় রাজপরিবারের বংশধর বলে দাবি করতেন। এজন্যই ভবিষ্যপুরাণে সামন্তভূম, তুঙ্গভূম ও বরাহভূমের অধিবাসীদের রাজপুত-ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দিগর বা সদর ঘাটোয়াল বা তরফ সর্দারের অধীনস্থ্ কর্মচারীগণ সদিয়াল বা মন্‌কি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল কয়েকটি গ্রামের দেখাশোনা করা। গাঁও সর্দার নামে পরিচিত তাঁদের অধীনস্থ্ কর্মচারী একটি গ্রামের শাসন পরিচালনা করত। গ্রামের একটি তলা বা মহল্লা দেখাশোনার জন্য গাঁও সর্দারের অধীনে তাবেদার নিযুক্ত হত।"

ঘাটোয়ালী এলাকার বাইরে 'মণ্ডলী' প্রথার বিকাশ ঘটেছিল। অরণ্যাবৃত জঙ্গলমহল বা বাঁকুড়া ভূখণ্ডে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ার সাথে মণ্ডলীপ্রথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাঁওতালদের মতো উপজাতি সমাজ যে জঙ্গল কেটে এবং তরঙ্গায়িত জমি সমান করে বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য করেছিল তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। রাজানুকূল্যেও এমন বসতি স্থাপন ও কৃষিজমি তৈরীর কাজ চলতে থাকে। যে গোষ্ঠীপতির অধীনে এই বসতি ও কৃষিজমি স্থাপিত হয় তিনিই মণ্ডল নামে অভিহিত হতেন। সাধারণত একলপ্তে ১২-১৬ রেখ জমি তৈরী করা হত (একদিনে লাঙ্গল যে জমি কর্ষণ করতে পারে তত পরিমাণ হল ১ রেখ)। ১-২ রেখ জমি মণ্ডল ও তার সহযোগী কর্মিরা নিষ্কর ভোগ করত। বাকী জমি গ্রামবাসীদের মধ্যে বণ্টিত হত ও সমানুপাতে কর নির্ধারিত হত। সংগৃহীত কর জমা হত মণ্ডলের কাছে। মণ্ডল অন্যান্য

রায়তের মতো জমি চাষ ও ভোগ করত। ফলে তাঁর অবস্থান জমিদার-জোতদারে পর্যবসিত হয়নি।[৩৯গ] তবে রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে (বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, পৃঃ ১২১) বর্ণসম্প্রদায়ভিত্তিক মণ্ডলীপ্রথায় (ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ গ্রাম বাদে গ্রাম প্রতি একজন বা বড় গ্রামে মহল্লা প্রতি) মণ্ডল ছিল আদিতে গ্রামবাসী নির্বাচিত বেশি জমির মালিক, গ্রামবিষয়ে জ্ঞানী ও গ্রামস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য ব্যক্তি যা জমিদার বা শাসক শ্রেণির অনুমোদন সাপেক্ষ। জমিদার রায়ত সুসম্পর্ক, সামাজিক বিষয়, আইনশৃঙ্খলা পুলিশ বিষয়ে তারা দায়িত্ব পালন করত। পুণ্যাহ তিথিতে মণ্ডল জমিদার শ্রেণি নিজেরা খাজনা দিয়ে খাজনা আদায় শুরু করতেন এবং সময়ে খাজনা আদায় করলে রাজা কর্তৃক পুরস্কৃত হতেন। তাছাড়া জমিদার আরোপিত বিবাহকর, পূজাকর, অনুষ্ঠান-কর ইত্যাদি আদায় করতেন মণ্ডল। সামাজিক অনুষ্ঠান ও আন্দোলনে তিনিই মুখ্য ব্যক্তি। সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে কাপড়-গামছা প্রণামী দেওয়া হত। ছোটোখাট বিবাদ মেটানো, পুলিশকে অপরাধের খবর দেওয়া, আদালতের কথায় সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি করতেন। অসদাচরণ ছাড়া তিনি অপসারিত হতেন না এবং ক্রমে পদটি বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। অবৈতনিক এই পদের জন্য তাঁর ভূমি-কর ছিল কম এবং খাজনা বৃদ্ধির সময় অব্যাহতিপ্রাপ্ত। সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য-উপহার পেতেন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। সর্বোপরি ছিল সামাজিক সম্মান। ঔপনিবেশিক সময়কালে মণ্ডলদের গুরুত্ব কমে। মাল গোমস্তা - ফৌজদারী গোমস্তা ও বিভিন্ন প্রকার আদায়কারী ও নিরাপত্তারক্ষীরাই গ্রামসমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠে। মণ্ডলীপ্রথার পতন নিয়ে রবার্টসন লিখেছেন (পৃ:-৫৯)

"The introduction of the dikku or foreighner into the jungle Mahal was the cause of the gradual decay of the Mandali system...... bengali from the east and Utkal Brahmin from Orrisa in the west, came in first as trader, and thus got a hold on the land. The ease with which money could be made at the expense of the simple people induced more and more foreighners to settle and the result has been the rapid decline in prosperity of the aboriginal tribes".রাজা যেমন মোকারারী লিজে এদেরকে গ্রামের কর আদায়ের ক্ষমতা দিচ্ছিল তেমনি বাঙালি-ওড়িয়ারা মহাজন মণ্ডলের খেম জমি কিনে বা উচ্ছেদ করে সরাসরি কর আদায়ের ভূমিকা নেয়।

রামপদ মণ্ডল-গৌরপদ সেন, 'মল্লভূমে রায়ত ঃ ১৭৬০ থেকে ১৮৬০' প্রবন্ধে (বিষ্ণুপর ঃ তথ্যগ্রন্থ) এদের সম্পর্কে লিখেছেন "গ্রামগুলিতে সম্পন্ন চাষীদের সংঘবদ্ধ সমাজ-যাদের সমসাময়িক নথিপত্রে Mandal বা মোড়ল বলা হয়েছে - তাদের কাছে পরের স্তরের চাষীদের নাড়া বাঁধা থাকতো। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ দেখিয়েছেন বিষ্ণুপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে এই মোড়লদের যূথবদ্ধ প্রভাবের কাছে জমিদারের

লোকজনও বিকিয়ে যেতেন, এরা কোন্ জমির কি খাজনা হবে তা নির্ধারণ একবার করে দিলে তার আর নড়চড় হবার উপায় থাকত না।' দশশালা বন্দোবস্তের সময় এদের বাধা সম্পর্কে N.K. Singha, Economic History of Bengal (পৃ. ১৩৯) বলেছেন, "Utility and collaboration among village heads Mandals were such that in most cases the fate of any revenue settlement depended largely on their dictates, design and cooperation. They resorted to resistance where necessary, to collaboration where suited to their terms"

দক্ষিণ বাঁকুড়া-খণ্ডে কৌম উপজাতীয় সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক কাঠামো দীর্ঘকাল অক্ষত থাকলেও (এমনকি ১৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দে রানিবাঁধ জঙ্গলে রাজস্ব-সমীক্ষক আমিন, মৌলালী এক্রামূল প্রায়নগ্ন খেড়িয়া উপজাতির সন্ধান পেয়েছিলেন) উত্তর বাঁকুড়া-খণ্ডে যেমন শুশুনিয়া-পোখন্না ও ডিহড় পরিমণ্ডলে মৌর্য-গুপ্ত শাসনের প্রান্তিক প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়।

পোখন্নায় প্রাপ্ত মৌর্যযুগীয় গার্হস্থ্য প্রত্নসামগ্রী, তাম্রমুদ্রা যক্ষিণীমূর্তি প্রভৃতি এখানে মৌর্য প্রভাবের আভাস দেয়।[৪০] ডিহরেও মৌর্যযুগীয় মুদ্রাসহ প্রত্নবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে।[৪১] সুতরাং এখানেও মৌর্য যুগ প্রভাব বর্তমান ছিল। মহাস্থানগড় লিপি ও অন্যান্য প্রমাণাদি থেকে ঐতিহাসিকরা মৌর্য সাম্রাজ্যের যে সীমানা চিহ্নিত করেছেন, রাঢ় তার অন্তর্গত।

মৌর্য শাসনব্যবস্থার গ্রামকর্মীরা ছিলেন গ্রামিক, গ্রামভোজক, গ্রামণি। গ্রামশাসনে গ্রাম পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিত গত্তি বা গতি নামক গ্রাম সমিতি। গ্রাম বৃদ্ধদের সভা গ্রাম্যবিচার ও মীমাংসায় অংশ নিত। পাঁচ-দশটি গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত গোপা নামক গ্রামকর্মি রাজাকে দেয় করের জমা বকেয়া হিসাব রাখত ও আদায় দিত। গ্রামীণ শিল্পের বিষয়ে গ্রামকর্মি ছিলেন জেঠিকা। গ্রামিক ছিলেন গ্রাম প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তি এবং গ্রামে বিজ্ঞাপিত কাজে গেলে সবাইকে গ্রামিকের সাথে উপস্থিত থাকতে হত নতুবা দেড় পানা জরিমানা দিতে হত। [৪২] এই গ্রাম সংগঠন ডিহর বা পোখন্না পরিমণ্ডলে উপস্থিত ছিল কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে তবে গ্রামের প্রশাসন পরিচালনার ব্যবস্থা নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল এবং তা মৌর্য প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

গুপ্তযুগে ডিহর পরিমণ্ডলের অবস্থান অস্পষ্ট থাকলেও শুশুনিয়া-পোখন্না ও সন্নিহিত এলাকা গুপ্ত নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট। পুষ্করণ বা পোখন্না অধিপতি সিংহবর্মা -চন্দ্রবর্মা ছিলেন গুপ্তযুগের মানুষ। শুশুনিয়া সন্নিকটস্থ 'হাউসি' গ্রামে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক চন্দ্রবর্মার পরাজয়ের কাহিনি সংশয়াতীত ও ইতিহাসসিদ্ধ না হলেও হরিষেনের এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে এখানে গুপ্ত আধিপত্য প্রমাণিত হয়।

রাঢ় ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল গুপ্ত বাণিজ্য ধারার প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে বাঁকুড়া-ভূখণ্ড গুপ্ত শাসনে ছিল বর্ধমান-পুণ্ডবর্ধন ভূক্তির মধ্যে (সূত্রঃ দামোদরপুর তাম্রপাত্র)। ভূক্তির মধ্যে জেলার ন্যায় প্রশাসনিক ভূখণ্ডগুলিকে বলা হত বিষয়। মহকুমার ন্যায় প্রশাসনিক খণ্ডগুলিকে বলা হত বিথী। 'গ্রাম' ছিল গুপ্ত শাসন ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন প্রশাসনিক এলাকা। বিষয় ও বিথীর মাঝামাঝি 'মণ্ডল' নাম্নী প্রশাসনিক অংশেরও নাম পাওয়া যায়। ভূক্তির শাসনকর্তা ছিলেন তৎপদপরিগ্রাহিতা। বিষয়ের বিষয়পতি, আয়ুক্তক, কুমারমত্য। বিথীর শাসনে নাম পাওয়া যায় মহাত্তারাসের। তাছাড়া খদাগির (সৈন্য) - ব্রাহ্মণ-কুটুম্বিন - অষ্টকূলাধিকরণের নাম পাওয়া যায়। গ্রাম প্রশাসন দেখত গ্রামিক। জমি জায়গা ইত্যাদির হিসাব রাখতেন পুস্তপলিস নামক গ্রামকর্মি। যান ও পরিবহণ বিষয়ে কর্মি ছিলেন 'বহনায়ক'। তাছাড়া বণিক স্বার্থে 'স্বার্থবাহ', গ্রামকার্য সম্পাদনে 'কায়স্থ', গ্রাম শিল্পীদের বিষয়ে 'গ্রামকুলিকা'র নাম পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে রাজানুকূল্যে ছিল সুবিদিত এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। দামোদর তীরবর্তী পোখন্নায় প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্য যেমন সিরামিক লাল, কালো, ধূসর, চকোলেট বর্ণের গলাবিশিষ্ট পাত্র, টিউলিপ পাত্র, অবতলাকৃতি পাত্র, বেসিন, ফুলদানি, মূল্যবান পাথরের জিনিস, রবার, চিরুণী, লকেট, দুল প্রভৃতি পোখন্নায় শিল্পের উৎকর্ষতা এবং বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে কর্মি নিয়োগ গুপ্তযুগের একটি বৈশিষ্ট্য। পোখন্না অঞ্চলে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার গ্রামকর্মি ও শিল্পকর্মি থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। 'ডিহর থেকে বিষ্ণুপুর : প্রসঙ্গ স্থানীয় শাসন' শীর্ষক প্রবন্ধে অজয়কুমার ঘোষ ও অধ্যাপক গৌরপদ সেন (সূত্রঃ বিষ্ণুপুর - তথ্যগ্রন্থ) এই গুপ্ত প্রভাবকে ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন, "এক সময়ে ডিহর দ্বারকেশ্বরের গতিপথ পরিবর্তন ঘটে, হয়তো সেই পরিবর্তন ডিহরে নাব্যতার সুবিধাকে কমিয়ে দেয়। বিষ্ণুপুরের কাছে দ্বারকেশ্বরের নাব্যতা প্রাধান্য পেতে শুরু করে, শুরু হয় বিষ্ণুপুরের শুভযাত্রা যা পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্য গাথায় বণিককুল প্রতিনিধিদের উল্লেখের মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়েছে।... সুতরাং প্রাচীনকালে ডিহর এবং আদি মধ্যযুগ থেকে বিষ্ণুপুর বর্ধিষ্ণু জনপদ হিসাবে বিকশিত হয়েছে ..... এবং এই বর্ধিষ্ণু জনপদগুলিকে বেষ্টন করে বড়ো হচ্ছিল অনেক ছোট ও মাঝারি গ্রাম, গঞ্জ, হাট, বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছিল, সেগুলিতে ভিড় বাড়ছিল বহুবৃত্তিজীবী ভাগ্যান্বেষী উৎসাহী মানুষের, যেগুলি পরবর্তীকালের গিল্ড, নিগম বা শ্রেণি-মুখ্যর (Caste headman) আবির্ভাবের পটভূমি প্রস্তুত করে দিচ্ছিল। আমরা গুপ্ত আমল থেকে দেখেছি বিভিন্ন বণিক সংঘ মুখ্য বা শিল্পসঙ্ঘ প্রধান কীভাবে নিজ নিজ সংগঠনের মধ্যে মনোনীত বা নির্বাচিত হয়ে শুধু শ্রেণিমুখ্য হিসাবেই নয় 'বীথি' বা মহকুমারস্তরে

এবং 'বিষয়' বা জেলাস্তরে স্থানীয় শাসনে অংশগ্রহণ করছেন এবং তা সম্ভব হচ্ছে তাঁদের শ্রেণিগত বা সামাজিক- অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির প্রভাবে। এটি তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি.....।"

কৌম ও হিন্দু রাজ শাসনে গ্রামকর্মিদের নিয়োগ ও কর্মধারায় মঙ্গলরাষ্ট্রের ভাবনা প্রতিফলিত হলেও ঔপনিবেশিক শাসন সময়ে মূলত কর আদায়কারী ও নিরাপত্তাকর্মিরাই ছিল মুখ্য। পাটওয়ারী, মুৎসুদ্দি, মণ্ডল সহ বিভিন্ন প্রকার কর আদায়কারী ও কর আদায়ের সাহায্য করার জন্য গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি কর্মির দেখা পাওয়া যেত গ্রামস্তরে। চৌকিদার, দফাদার নিয়োগ ছিল গ্রামস্তর থেকে সংবাদ সংগ্রহের মাধ্যম নির্মাণের প্রয়াস।

আদিকাল থেকে বাঁকুড়া ভূখণ্ডে জনপদ গঠন, সামাজিক জীবনধারার প্রবর্তন ছিল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্য জারিত। বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যা, গ্রাম সংখ্যা, পরিবার সংখ্যা, জনবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে সেই প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে। বাঁকুড়ায় প্রথম জনগণনা হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ২৬২৩ বর্গমাইল বাঁকুড়া জেলায় তৎকালীন জনসংখ্যা ছিল ৯৬৮৫৯৭, গ্রামের সংখ্যা ৪৪৩৬, বসতবাড়ীর সংখ্যা ১৯০৯৭৮ এবং বর্গমাইলে জনঘনত্ব ৩৬৯ ও পরিবারে গড় সদস্য ৬ জন। এই জনসংখ্যা ছিল তৎকালীন বঙ্গের জনসংখ্যার ৮ শতাংশ। জে.সি রাসেলের 'প্রাচীন ভারতের জনসংখ্যা' গ্রন্থে এবং ডাঃ শক্তিনাথ সাহা প্রণীত 'বঙ্গীয় অর্থনীতির ধারা' গ্রন্থে (পৃঃ২৫) খ্রিঃপূঃ ৫০০ বছর কালে ভারবর্ষের জনসংখ্যা নির্ণীত হয়েছে ৯০ লক্ষ, গুপ্ত যুগে ৪ কোটি, হিউয়েন সাঙের সময় ৩ কোটি (প্লেগ মহমারীজনিত লোক হ্রাসের কারণে)। খ্রিস্টপূর্ব সময়ে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে ৭-৮ শতাংশ হিসাবে লোকসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ এবং জল হাওয়া ভূপ্রকৃতি বিচার করে বঙ্গের জনসংখ্যা ২-৩ লক্ষ বা তার কম বলা হয়েছে। সেই হিসাবে খ্রিস্টপূর্ব সময়ে বাঁকুড়া ভূখণ্ডের জনসংখ্যা ২০-৩০ হাজার হওয়া সম্ভব অর্থাৎ বর্গমাইলে সাত-আট জন। অক্ষয়কুমার মৈত্র গৌড়ে পাল-সেন যুগে গ্রামগুলির পরিবার সংখ্যা 'গৌড়ের কথা' (পৃঃ ২৪) গ্রন্থে ৩০ থেকে ১০০০ বলেছেন। বাঁকুড়াখণ্ডে জনঘনত্ব কম হওয়ার কারণে সে সময় গ্রাম প্রতি ৩০ বা তার কম পরিবার হওয়া উচিত। খ্রিস্টপূর্বীয় অসুর সংস্কৃতির গ্রাম বিবরণে পরিবার সংখ্যা সম্পর্কে Tribal Community of Bihar, Part III (Anthropological Survey of India)প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

"An Asur settlement usually consists of not more than 30 families"
সেই ভিত্তিতে মৌর্য ও মৌর্যোত্তর সময়ে বাঁকুড়া-খণ্ডে দুই-তিনশো গ্রাম গড়ে উঠেছিল।

এই গ্রামগুলি মূলত নদী-নালার মতো জল উৎসের সন্নিকটে গড়ে উঠেছিল। প্রাক মৌর্য, মৌর্য ও মৌর্যোত্তর সময়ে মূলত অসুর সংস্কৃতির মানুষের বসতি গড়ে

উঠেছিল। যদিও তখন জৈন-বৌদ্ধ এবং তার হাত ধরে আর্য সংস্কৃতি জনজীবনকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মহানাদ ও বাঙালার গুপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ১৪) মহাভারতের বলি রাজপুত্রের পুণ্ড্রে রাজত্বের কথা বলেছেন যিনি ছিলেন মূলত 'অসুর' বা অনার্য। আর ভীমেদের গুপ্ত বসবাস ছিল বাঁকুড়া সন্নিহিত বীরভূমের জঙ্গল যেখানে বাস করত হিড়িম্বা-ঘটোৎকচদের মত 'অসুর'। 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে গৌড়-বঙ্গে অসুরদের বাস সম্পর্কে বলা হয়েছে 'অসুরানাথ ভবেৎবাচ গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা'। যে দুই-তিন শত গ্রামে অসুর সংস্কৃতি প্রভাবিত বসতি পত্তন হয়েছিল তার অনেকগুলিই আবিস্কৃত হয়েছে। যেমন— অসুরাল, কোড়াসুরগড়, আসরাবাইদ, হেত্যাসুর, হাট আসুড়িয়া, বন আসুড়িয়া, আসুরি মাধবপুর, অসুরগ্যোড়া, অসুরদা, মুড়ার গ্রাম, মৌলবনা, জিড়রা, চাঁদড়া, তিলুড়ি, ভৌরবস্থান, সাবরাকোন-পিয়ারডোবা, বাঁশডিহা, বাঁকাদহ, চাকদহ, পাথরমুড়া, কুড়মুড়া, পাঁচমুড়া, মাঞ্জমুড়া প্রভৃতি। The tribal community in Bihar, Part-III প্রতিবেদনে একটি অসুর গ্রামের সুন্দর বিবরণ আছে, "The Asurs have traditionally been iron-smelters and also slush and burn cultivators require charcoal of green sal wood which is a good quality timber. Similarly, slash-burn method of crop cultivation destroys well grown forests. Thus they have been nomadic. With the gradual extension of settlement and forest codes over the whole of their locality, they have become settled farmers and have founded their own villages. They prefer to locate their villages on sufficiently high table land for two main reasons that there may not be much eroded land during the rains and there may be enough 'Bari" land for maize cultivation. But village and the nearest natural source of water supply becomes inconveniently separated.An asur settlement usually consists of not more than 30 families and they prefer a settlement to be separate from others. There is no set pattern of settlement except that the youth dormitory and the dancing ground as situated in the easily accessible and central place. Generally they construct side walls of earth and different wooden frames are provided for supporting the tiled roof. Maplain barks are uesd for tying. Their residential house contains accomodation for their cattle too.Household goods are few, cooking utensils are mostly earthen vessels. Mat is weaved by them from the locally available date leaves. Their agricultural and hunting tools and implements are of wood, bamboo and iron. Now they buy iron from the market, which they fashion themselves.They purchase clothes from the neighbouring chik-baraiks, in local weekly markets. Similarly their earthen and metal

vessels are purchased from these markets and visiting traders. Though They make their own tiles for roofing their houses, they still make and use umbrella and waterproofs from corn container leaves and bamboo. They also do little paintings by hand on their side walls"

অসুর জনজাতি ছিল মূলত মুণ্ডা উপজাতি ও মুণ্ডা সম্পর্কিত ভূমিজ সম্প্রদায়। আঠারো শতকের শেষে ম্যাকালপিনের হিসাব মতো ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বাঁকুড়াতে ছিল ১৯,৩৩১। স্বাভাবিকভাবেই খ্রিস্টপূর্ব সময়ে স্থাপিত জনবসতির সিংহভাগ ভূমিজ হলেও অন্যান্য উপজাতি ও অর্ধ-উপজাতিদের বসতি স্থাপনও এসময় ঘটেছিল। ১৯২১ সালে ভূমিজদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬, ২৭০। এই সম্পর্কে রবার্টসন প্রতিবেদনে (পৃঃ১২) বলা হয়েছে "The bhumijes, an important tribe in the district before the coming of the santals,.... are rapidly decreasing in numbers and improtance. They supplied many of the sardars of the ghats in the days when the ghatwals played a part in the administration of the district. The bhumijes are now to be found principally in thanas Indpur, Khatra and Ranaibandh." ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইন্দপুর-খাতড়ায় ভূমিজ মানুষ ছিলেন ১১৪৪০, রাইপুরে ৫৪৮০, ছাতনা-বাঁকুড়ায় ১৭১৪ সেখানে সাঁওতাল জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ২০১৪৭, ৭১৭২, ২৪৬০৬। অর্থাৎ খ্রিস্টোত্তর সময়ে সাঁওতাল উপজাতির ও বাউরীসহ অর্ধ-উপজাতির বসতি স্থাপন হয় ব্যাপক হারে এবং সেই সঙ্গে অসুর সংস্কৃতির সায়াহ্ন ঘনিয়ে আসে। ডাল্টনের মতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে হাজারীবাগ, শিখরভূম থেকে সাঁওতালরা উত্তরে দামোদর থেকে দক্ষিণে রাইপুর-রানিবাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে - মূলত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ বাঁকুড়ায় রাজানুকূল্যে কৃষি শ্রমিকের অভাবপূরণ ও কৃষি জমি উদ্ধারের জন্য। ধীরেন্দ্রনাথ কর এই মতের আংশিক বিরোধিতা করে বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি পরিচয়ঃ রাইপুর-১ প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'সে সময় অনেক সাঁওতাল এলেও পূর্ব থেকেই সাঁওতালদের এখানে বাস ছিল। ছাতনা থানায় এমন প্রাচীন গ্রাম আছে যার নাম সাঁওতালী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'যদি সামন্তপাল থেকে সাঁওতাল হয় তবে ছাত্না সামন্তভূমতো বটে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাঁওতালগণ জেলার আদিবাসী।' (সূত্র ঃ আত্ম পরিচয়-বাঁকুড়া-১)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঁকুড়ার ৯০৫১৪ জন সাঁওতালের ২৫৯৩১ জন ছিলেন শালতোড়া-গঙ্গাজলঘাটিতে, ২৪৬০৬ জন ছাতনা-বাঁকুড়ায়, ২০১৪৭ জন ইন্দপুর-খাতড়া থানাঞ্চলে। অশোক মিত্র সম্পাদিত 'The Tradition and Institutions of the Sontals' সংকলনটিতে সাঁওতাল গ্রাম পত্তনের চমকপ্রদ বিবরণ আছে। "হড় (সাঁওতাল) লোকেরা একলা কোথাও বাড়ী তৈরী করে না। গ্রাম তৈরী করে। আর সেখানে একসঙ্গে থাকে। গ্রাম পত্তনের জন্য মুখিয়া (প্রধান) সহ তিন-চার

জন লোক জঙ্গল দেখে।.... তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে সেইরূপ জায়গা বাছিয়া লয় যেখানটা একটু উঁচু, সেখানে ভাল বাস্তুবাড়ী জায়গা যেখানে ক্ষেত তৈরী হতে পারে, যেখানে জল পাওয়া যেতে পারে। দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়। তারপর একদিন শুভ অশুভ ঠিক করতে গেল।.... তারপর একদিন ফিরিয়া গিয়া ঐ মুখিয়া লোকটির জন্য একটি কুঁড়ে তৈরী করে। ঐ গ্রামের যে মুখিয়া মাঝি হয়ে সে প্রথমে গাছ কাটবে, আজকাল জঙ্গল দেখে শুনে রাজাকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পূর্বে রাজাদের জন্ম হওয়ার আগে সে সব ছিল না। তারপর সেই মুখিয়াকে দিয়ে বাস্তু ভাগ করে। নিজের নিজের বাস্তুতে কুঁড়েঘর বাঁধে। আর এক একটি ছাড় তৈরী করে গরু রাখবার জন্য তারপর পুরাতন ঘরে ফিরিয়া গিয়া একমত হয় কবে উঠিয়া যাইব? তারপর ছেলে পুলে আর নিজেদের সমস্ত জিনিসসহ নূতন গ্রামে যায়। যাবার সময় হল ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। তারপর সকলে মিলিয়া বাস্তুর জন্য (জঙ্গল) সাফ করে, আর যে সব দিয়ে ঘরের সাজাও (কাঠামো) হয়। বাকী কাঠ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলে। ঘর তৈরী করে। মাঝামাঝি 'কুলি' (রাস্তা) রাখে আর গ্রামের শেষে জাহের (পূজার স্থান) রাখে।"

অন্যান্য উপজাতি খেড়িয়া, কোড়া, মাহাতো সংখ্যা জেলায় স্বল্প। খেড়িয়া- শবররা মূলত জঙ্গলবাসী ও অকৃষিজীবী। এরা মূলত রানিবাঁধ ও সন্নিহিত অঞ্চলে বাস করে।

বাঁকুড়ার সর্ববৃহৎ অর্ধ-উপজাতীয় জনজাতি হল বাউরী ও বাগদি। এদের সম্পর্কে রবার্টসন তার প্রতিবেদনে (পৃ: ১২) বলেছিলেন, "Of the semi-aboriginal tribes by far most important numerically are the bauris and bagdis. Both now class themselves as Hindus, but traces of totemism still survive. the heron is the emblem of the bauris and the dog is their sacred animal. The bauris are to be found mainly in the sadar and the bagdis in the Bishnupur subdivision. Both rank very low in the social scale and are for the most part landless men who work as agricultural labourers. The bauris often work as domestic servants, while the bagdis are the principal inhabitants of the Bishnupur jungles and have no distinctive language of their own, and from holding themselves aloof from the Bengalies they freely admit men of other caste into their community....." বর্ণেতর হাড়ি, ডোম, লোহার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "Of other tribes of non-Aryan descent the principal are the Haris, the Domes and the Lohars. These are to be found throughout the district and are mainly engaged in menial occupations. The lohars are the most numerous." এছাড়া ছিল মদ প্রস্তুতকারক শুঁড়ি সম্প্রদায়।

উচ্চবর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটে মধ্যযুগে। মূলত মহাজনীয় কারবারে সিদ্ধহস্ত উৎকলী ব্রাহ্মণ ও মল্লরাজানুগ্রহে বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটেছিল এসময়।

এ সম্পর্কে রবার্টসন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "Of the Hindus, properly so called, the most important as well as the most numerous are the Brahman. Two distinct classes of brahman are found in the district, the bengali brahmans proper, and the utkal brahmans.

According to tradition the Utkal Brahmans came over from Orissa with Nakur Tung and Sripati Mahapatra, his spiritual guide, when the south of the district was conquered. They are both numerous and influential in the south-west of the district, especially in the Simlipal thana, where the zamindars of Simlapal and Bhelaidiha belong to this caste.

The Utkal Brahmans are cunning and miserly and many of them have made considerable fortunes out of the original cultivators by lending money on mortgage and selling up the mortgagors. It is they who are largely responsible for the dispossession of the Santalss in this area. Their acquisition of wealth has little effect on their style of living , and they live so wretchedly and meanly that there is little, save the wearing of the sacred thread, to distinguish them from the aborginals among whom they live. Unlike the Bengali Brahmans they will perform all the work of agriculture except the actual handling of the plough. They will drive carts, graze cattle, carry bags of paddy, sell grain, thatch and even build their houses. They get their living by money-lending and by agriculture, and are more feared and hated than any other caste in the neighbourhood.

The Bengali Brahmans are especially numerous in the centre of the district where indeed they form the most numerous caste. They usually occupy the position of small intermediate land lords many of them being in possession of rent grants.

The preponderance of Brahmans over other castes in no doubt due to the generosity of the Bishnupur rajas, and especially of Gopal Singh and chaitanya singh, in the mather of gifts of lands which must have attracted brahmans from far and wide" ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য প্রভাবশালী জাতি ছিল গোয়ালা ও সদগোপ। রবার্টসনের মতে "They are to be found throughout the district, but are most numerous in the central and eastern thanas. In these thanas they form the buls of the genuine cultivating class." তাঁর মতে অন্য দুই জাতি শুঁড়ি ও তাম্বুলিদের আধিক্য ছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম থানাগুলে। ১৯১৭ সনে মুসলিমদের নিয়ে রবার্টসন লিখেছেন, "The number of Muhammandans in the district is small. Only 46401 were enumerated at the recent census. They are to be found mainly in Siroumanipur Indas and Patrasair thanas," বাঁকুড়া ভূখণ্ডে ঐতিহাসিক সময়ে

জনবৃদ্ধি ও জনপদ স্থাপনের ধারা বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন জনজাতির সংখ্যা বিচারে, এখানে গ্রাম পত্তন ও বিকাশ সম্পর্কে রেখাচিত্র আঁকা সম্ভব। জে.সি.রাসেলের 'প্রাচীন ভারতের জনসংখ্যা' গ্রন্থ মোতাবেক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সন, ৪০০-৫০০ খ্রিস্টাব্দে, ৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া ভূখণ্ডের জনসংখ্যা অনুমান করা যায়। জে. ই. গ্র্যাসটেলের 'বাঁকুড়া জেলার সংখ্যাতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক প্রতিবেদন - ৬ মার্চ ১৮৬৩' থেকে ১৮৩৯-৪৪ খ্রিস্টাব্দ ও ১৮৫৪-৫৬ খ্রিস্টাব্দের বাঁকুড়ার জনসংখ্যা জানা যায় যথাক্রমে ৩৩০৮৩৯ এবং ৪৩৮৪৯৫। এই জনসংখ্যা যেহেতু ১৩৪৬ বর্গমাইল (থানা বাঁকুড়া, ছাতনা, ওন্দা, গঙ্গাজলঘাটি, বিষ্ণুপুর) ধরে করা ছিল, ওই সময়কালে বর্তমান বাঁকুড়ার সমতুল স্থানের (ইন্দাস, সোনামুখী, কোতলপুর, রাইপুর, সুপুর ধরে) অর্থাৎ ২৬২৩ বর্গমাইলে জনসংখ্যা ধরা যেতে পারে যথাক্রমে ৬৫০০০০ ও ৮৫০০০০-এর কাছাকাছি।

নিম্নের সরণিতে জনসংখ্যা, জনঘনত্ব ও জনপদের সংখ্যা এই সংখ্যাতত্ত্ব ও গাণিতিক অবক্ষেপে অঙ্কিত হল—

ক্রমাঙ্ক	সময়কাল	জনসংখ্যা	বর্গমাইলে জনসংখ্যা	জনপদের সংখ্যা	গৃহসংখ্যা
১	খ্রিঃ পূঃ৫০০ অব্দ	২০০০০	৮	২০০-২৫০	৪০০০
২	১সন	৪০০০০	১৫	৩০০-৪০০	৮০০০
৩	৪০০-৫০০ খ্রিঃ	৮০০০০	৩০	৫০০-৬০০	১৬০০০
৪	৭০০ খ্রিস্টাব্দ	৬০০০০	২৩	৬০০-৭০০	১৭০০০
৫	১০০০খ্রিস্টাব্দ	১৩০০০০	৫০	৭০০-৮০০	২৬০০০
৬	১৫০০খ্রিঃ	৩০০০০০	১১৪	১৪০০-১৫০০	৬০০০০
৭	১৮৪২খ্রিঃ	৬৫০০০০	২৪৮	৩৫০০-৩৬০০	১৩০০০০
৮	১৮৫৫খ্রিঃ	৮৫০০০০	৩২৪	৪০০০-৪৩০০	১৭০০০০
৯	১৮৭২খ্রিঃ	৯৬৮৫৯৭	৩৬৯	৪৪৩৬	১৯০৯৭৮
১০	১৮৮১খ্রিঃ	১০৪১৭৫২	৩৯৭	৫৪৫৭	
১১	১৮৯১খ্রিঃ	১০৬৯৬৬৮	৪০৮	৫৪৯৪	
১২	১৯০১খ্রিঃ	১১১৬৪১১	৪২৬	৫৫৯৫	২৩১৬৪৬
১৩	১৯১১খ্রিঃ	১১৩৮৬৭০	৪৩৪	৪৬৩৪	
১৪	১৯২১খ্রিঃ	১০১৯৯৪১	৩৮৯	৩৯৯৯	

(১ থেকে ৮ ক্রমাঙ্কের সংখ্যাতত্ত্ব জে. সি. রাসেল ও জে.ই গ্যাসট্রেলের হিসাব,

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, তৎকালীন গ্রামপ্রতি পরিবার থেকে নিরূপিত এবং বাকিগুলি সেনসাস প্রতিবেদনে থেকে উল্লিখিত)।

৭০০ খ্রিস্টাব্দে জনহ্রাসের কারণ যেমন দেশব্যাপী মহামারী তেমনি ১৭৭০ খ্রিঃ মন্বন্তরে জনসংখ্যার বড় অংশ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এর পরবর্তী এক শতাব্দী ব্যাপী বন্ধ কৃষিকাজ শুরুর করার জন্য হাজারিবাগ ও সন্নিহিত এলাকা থেকে সাঁওতাল সমাজের ব্যাপক আগমন ঘটে। গ্যাসট্রেলের হিসাবে ১৮৩৯-৪৪ সালে যেখানে জনসংখ্যা ছিল ৩৩৯৮৩৯ (১৩৪৬ বর্গমাইল বাঁকুড়ার জন্য) ২৯.০৩ শতাংশ জনবৃদ্ধিতে ১৮৫৪-৫৬ সনে তা দাঁড়ায় ৪৩৮৪৯৫। ১৯.৯৭ শতাংশ জনবৃদ্ধিতে এই জনসংখ্যা ১৮৭২ সনে দাঁড়ায় ৫২৬০৪৬। সাঁওতাল জনজাতির আগমন ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ বাঁকুড়ার জঙ্গল কেটে কৃষিজমি ও বসতি স্থাপনের ফলে গ্যাসট্রেলের হিসাবে ১৮৫৪-৫৬ খ্রিঃ কৃষিযোগ্য ও কৃষিজমি দাঁড়ায় ৬১.০৩ শতাংশ। অন্য জমি এবং পতিত জমি মাত্র ৩৮.৬২ শতাংশ। ১৯১৭-২৪ খ্রিঃ অবস্থার উন্নতি ঘটে এই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৯ ও ৩১ শতাংশ। সিনহা - বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত West Bengal District Record (WB District letter issued 1802-1869) এর মতে “The growth was partly due to the steady emigration of the hard working santals from Hazaribagh area. The dry climate along with the availability of a vast tract of waste land in the sadar subdivision generally encouraged them to emigrate there.The ghatwals also played an important role in this field...... It was found that mahals like Ambikanagar, Phulkusuma, Simlipal, Supur and Shyamsundapur were almost covered with jungle. The land holders were anxious to secure cultivators. They offered easy cultivators..... after the settlement, the santals cleared the jungle and with great labour terraced the land to make it fit for cultivation of paddy.”

বিভিন্ন জনজাতির আগমনে অসুর সংস্কৃতি যেমন অস্তমিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সাঁওতাল সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি অধঃপতিত হয় উচ্চবর্ণের মানুষের শোষণ ও সামাজিক অনুপ্রবেশের ফলে। সিনহা - বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে — “Inspite of the pioneering role of the santals in the extension of agriculture they could not maintain their hold over these lands. The process of displacement of the santals continued in the second half of the century and it was largely an outcome of their widespread indebtness to the creditors. According to Gastrell (1854-56), their indebtness was due to factors like the cultivation of marginal holdings, frequent droughts, exorbitant rate of interest and a steady rise in rent rates..... in many cases 50 to 75 percent of their land were lost to money lenders. Mcalpin’s enquiry of the present century throws light on the nature of eviction of the

santals - ‘In the northern area, resettlement of the transferred lands is not very common, for the reason..... that most of the moneylendors are by class cultivators...... In the southern area resettlement of the land is common, mainly for the reason that the mahajans have acquired an unmanageably large amount of land, and owing to the jungles, do not live at the source of their gains. Such resettlement takes the form of a high produce rent. In the first case over one-half of the village has gone into the hands of mahajans, but one-third has been given back on high produce rents, in some cases increased to 20 times the previous rent. In the second case the whole hamlet has gone into the hands of the mahajan-propietor, who has let out the lands on different sajha leases, raising the combined from Rs.20-10 to 31 plus 58 maunds, valued at Rs.116 is the rent has been raised seven fold’..... the santal were resettled there on a higher rate of produce rent. Their new masters were generally money lender cum-grain dealers, exacting high rate of interest against their grain loans.The cultivators were often called upon to pay mangan. They were also asked to compensate for, having excavated a bund and turned wasteland into cultivation, a criminal case for having cut trees, a like suit for the uncultivated area and a rent suit on account of increased demand. “It a mahajan proprietor buys a horse, the santhals are made to contribute towards its purchase. They were practically reduced to a position of ‘serfdom under their new bengali masters” এই বিবরণ থেকে সাঁওতালদেরকে শোষণের বিভিন্ন রূপ ধরা পড়ে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনজাতির আগমনে বাঁকুড়ার জনতাত্ত্বিক ধরণের পরিবর্তন ঘটে। নিম্নে চারটি সেনসাস প্রতিবেদনের তুলনা থেকে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির সংখ্যাতাত্ত্বিক আধিক্য ও প্রভাব তুলনা করা যায়।

জাতি	১৮৯১সাল	১৯০১ সাল	১৯১১ সাল	১৯২১ সাল
সাঁওতাল	১০১৫৩৭	১০৫৬৮২	১১৫০২৬	১০৪৯১২
বাউরী	১২৩১৯৭	১১৩৩২৫	১১১৩১৩	৯৫৮৫১
বাগ্‌দি	৪৯৭২৯	৯০৮৬৮	৯৫৪৮১	৫৫০৭৭
কামার লোহার	৪১১৪১৯	৪৫৯৫০	২৫৩৫৯	৪১৪৮৬
সদ্‌গোপ	৪৫৭৪৭	৪৬৪৯১	৭৪৪৪	৪৩০১৬
তিলি	৯২১৯৭	৭৩৫৯৬	৭৫৩০২	৬৪৫৭৫
ব্রাহ্মণ	৮৫০৩২	৯৩৪৪৩	৯৯০৮১	৯৪৫৯২

জাতি	১৮৯১সাল	১৯০১ সাল	১৯১১ সাল	১৯২১ সাল
আহীর গোয়ালা	৬২০৬২	৬৫৭৮৪	৬৭২৩৩	৬৩৯২৫
ভূমিজ	২০৭৯৮	১৯৭৮৫	১৯৭৫৭	১৬২৭০
তাম্বুলি	১৬৭০৭	১৮৭৫৭	১৯৩৬৯	১৮৮৭১
শুঁড়ি	২২৬৫	২৪৩২৬	২৫৬৯৬	২৬১১৯
হাড়ি	৬৭২৫	৭৮৬২	৭৩৩৯	৬৩৯৫
ডোম	১৮০৪৮	১৭৫২০	১৭১৩২	১৩৬৭৬

১৯১৫-১৬ খ্রিঃ মহামারী (বিশেষত ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ম্যালেরিয়া) ও দুর্ভিক্ষজনিত লোকমৃত্যুর কারণে ১৯১১ সালের তুলনায় ১৯২১ সালে লোকসংখ্যা কমে যায়। বিভিন্ন জাতির বাঁকুড়ায় অবস্থান ও তাদের বর্ণগত বৃত্তি বিভাজনের ধরণ থেকে গ্রামগুলিতে বর্ণ ও বৃত্তির অনুমান পাওয়া যায়। ১৮৮১ ও ১৮৯১ খ্রিঃ সেনসাস প্রতিবেদনে বৃত্তি অনুসারে জনসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট জাতির তুলনা করলে দেখা যাবে বিশেষ বৃত্তি শুধুমাত্র বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে এই বৃত্তিস্বাধীনতা ব্যাপকতর ছিল না অর্থাৎ তখনও জাতিবৃত্তি মেনে চলার প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল।

জাতির নাম	জাতি সংখ্যা	বৃত্তি নাম	১৮৮১ খ্রিঃ	১৮৯১ খ্রিঃ
	(১৮৯১	জমির মালিক	বৃত্তিতে	বৃত্তিতে
	সেনসাস)	ভাগিদার (চাষী)	জনসংখ্যা	জনসংখ্যা
		ভূমি শ্রমিক	৮৭৮৬৭	১১৯৮০৮
তাঁতি	৩০২৯৮	তন্তুবায়	২১৯৪২	৩১২৪৯
জেলে, কৈবর্ত	২১২৮১	মৎস্যজীবী	—	২২৪৫৬
		জমিদখলকারী (চাষী)	১৯৮৩৮৫	২১০৪৮
		ধান/চাল উৎপাদনকারী	—	১৮০৬৬
		পাহারাদার	—	১৮৩৯২
		সেবা ক্ষেত্র (অচিহ্নিত)	—	৫২৮০
		অকৃষি মালিক	—	১৪০৪১
তেলি	৯২১৯৭	তৈল উৎপাদক ও বিক্রেতা	—	১২৪৪২
বেনিয়া	২৫০৬৬	দোকানদার (অচিহ্নিত)	—	১০২২৩
		পশুপালক	১৭৭৫	১৫৪৬০

১৮৯১ খ্রিঃ সেনসাস অনুসারে বাঁকুড়ায় যেখানে জেলের সংখ্যা ছিল ২১২৮১, মৎস্যজীবী ছিল ২২৪৫৬, তাঁতি জাতি ৩০২৯৮ জন হলেও তন্তবায় (বৃত্তিগতভাবে) ছিলেন ৩১২৪৯। অর্থাৎ এ সময় থেকে জাতিবৃদ্ধির বাঁধন অনেকটাই আলগা হতে শুরু করেছিল।

জেলাশাসক এফ. এইচ. ব্যারোর ৩৫৬ জি. স্মারক সংখ্যায় ২৬ এপ্রিল ১৮৯২ তারিখে প্রকাশিত জেলার জনগণনা ১৮৯৯ প্রতিবেদনে সরকার নির্দেশিত আটটি বৃত্তিগত বিভাজনের বিবরণ পাওয়া যায়-

ক) কৃষি ক্ষেত্র (১) জমিদার, ক্ষত্রিয় (মল্ল, ধল্ল, সামন্ত ইত্যাদি) (২) মোকরারিদার ও তালুকদার, কায়স্থ সদগোপ, (৩) লাখেরাজদার (ব্রাহ্মণ) (৪) চাষী রায়ত, তেলী, সদগোপ।

খ) পরিষেবা ক্ষেত্র (১) পূজারী ঃ ব্রাহ্মণ, মিশনারী, (২) উকিল মোক্তার ঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেনিয়া, সদগোপ, বৈষ্ণব, বৈদ্য, (৩) চিকিৎসক ঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, বেনিয়া।

গ) বাণিজ্যিক ক্ষেত্র (১) মহাজনঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, তাম্বুলি, সুবর্ণবণিক,

(২) পাইকারি বিক্রেতা ঃ তাম্বুলি, বেনিয়া।

ঘ) কারিগর (১) জরি-পোষাক ঃ তাঁতি (২) খাবার-পানীয় ঃ মোদক,

(৩) প্রাণীজ দ্রব্যাদি ঃ শঙ্খবণিক (শাঁখারি) (৪) উদ্ভিজ দ্রব্যাদি ঃ বাউরী, (৫) খনিজ দ্রব্যাদি ঃ কুমোর, পোদ্দার, কামার।

ঙ) পশুপালন ক্ষেত্র ঃ গোয়ালা, বাউরী (আংশিক)।

চ) পশু শিকার ও মৎস্য ঃ (১) পশুপালন ঃ সাঁওতাল, কুর্মি, ভূমিজ, কোল।

২) মৎস্য চাষ ঃ কেওট, জেলিয়া, মেটিয়া, খয়রা।

ছ) সেবা ক্ষেত্রঃ নাপিত, ধোপা, বাউরী, বাগদি, লোহার।

জ) অনুৎপাদক ক্ষেত্রঃ (১) জ্যোতিষঃ দাইবাজনা যারা গণক, গ্রহবিপ্র, দেবক নামে পরিচিত (২) নাচ-গান ঃ বৈষ্ণব, (৩) সাপ খেলা - পশুখেলা ঃ বেদিয়া, মাল, (৪) বাদক ও ব্যালে গায়ক ঃ ভাট/ভট্ট, বৈষ্ণব।

অন্যদিকে সি. এফ. ম্যাগ্রাথ নৃতাত্ত্বিক বর্গিকরণ করেছেন সাতটি জীবিকা কাঠামো ধরে। তা হল (১) সরকারি, পৌর ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অধীনে নিযুক্ত শ্রেণি যার মধ্যে এসেছে সরকারি পুলিশ, গ্রামীণ পুলিশ ও চৌকিদার, ইংরাজ ও অন্যান্য রাজপুরুষ ও কেরানী, (২) বৃত্তিমূলক কার্যে নিযুক্ত শ্রেণি যথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে নিযুক্ত পুরোহিত, গুরু, আচার্য, মহন্ত পূজারী, পাণ্ডা, মোল্লা, কথক, টোলের অধ্যাপক ও গুরুমশায়, মুন্সি, এ্যাটর্নি, উকিল, মোক্তার, স্ট্যাম্প ভেন্ডার, ডাক্তার, কবিরাজ,

ভ্যাক্সিনেটর গো-বৈদ্য, কম্পাউন্ডার, চিত্রকর, আমিন ইত্যাদি। (৩) স্বনিযুক্ত শ্রেণি - চাকর, রাঁধুনি, নাপিত, মেথর, মালি, দারোয়ান, মুর্দাফরাস প্রভৃতি। (৪) কৃষি ও পশুপালনে নিযুক্ত শ্রেণি- জমিদার, ইজারাদার, লাখেরাজদার, জায়গীরদার, ঘাটোয়াল, তালুকদার, পত্তনিদার, প্রজা চাষী, মহালদার, সাধারণ চাষী বা উপপ্রজা, গোমস্তা, পাটোয়ারী, পাইক, গো-শূকর-ছাগল-মেষপালক, মাহুত মালবাঁধ, শিকারী প্রভৃতি। (৫) ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত শ্রেণী-পরিবহণে নিযুক্ত যথা গোগাড়ী চালক, পাল্কি বেহারা, সর্দার, মাঝি, আড়তদার এবং বর্ধমান রেলকর্মচারী, টাকা পয়সার লেনদেন ইত্যাদিতে নিযুক্ত ব্যাঙ্কার ও মহাজন, পোদ্দার, সওদাগর, পাইকারি, ব্যাপারি, দালাল, সরকার, দোকানদার ইত্যাদি (৬) শিল্প ও কারিগরী সংক্রান্ত কাজে এবং ভোগ্যদ্রব্য নির্মাণ ও শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ে নিযুক্ত শ্রেণি - নীলকর,কন্ট্রাক্টর, রাজমিস্ত্রি, ইঁট প্রস্তুতকারক, ছুতার, ভূমিখনক, নৌকা ও গাড়ি নির্মাতা, কামার, কাঁসারি, স্বর্ণকার, কুমার, মাদুর, পাখা, ঝুড়ি ও খেলনা প্রভৃতি দ্রব্য নির্মাতা, দফতরি, বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য বিক্রেতা, পশুখাদ্য বিক্রেতা, মদ বিক্রেতা, গাঁজা,তামাক ও পান বিক্রেতা প্রভৃতি। (৭) অন্যান্য ব্যক্তি যাদের মধ্যে আছে পেনশন ভোগী, জুয়াড়ী, দুঃস্থ ও ভিখারী, শ্রমিক (বাঁকুড়ায় পুরুষ ৪১২১৫ ও মহিলা ২৬৯৯ জন), বেকার (বাঁকুড়ায় ১৫৭৬ জন), শিশু। অনুরূপভাবে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পূর্বোক্ত বৃত্তিগুলি ছাড়া ধাত্রী, নর্তকী প্রভৃতি এসেছে, দ্বিতীয় শ্রেণিতে বেশ্যা (বাঁকুড়ায় ২৭০ জন) এবং সপ্তম শ্রেণীতে স্ত্রী-শ্রমিক ও অনিযুক্ত বয়স্কা মহিলা এসেছে। সব মিলিয়ে সেকালের গ্রাম বাংলার যে চেহারা ম্যাগ্রাথের এই বর্গিকরণ থেকে ফুটে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে বর্তমান দিনের থেকে অনেকাংশে পৃথক।[৪৩] সাধারণ রায়ত শ্রেণি সম্পর্কে রথীন্দ্রমোহন (বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, পৃঃ-১২৮) লিখেছিলেন— '...... চৌধুরী জমি-মালিকদের নিজস্ব হাল থাকত ও গতানো মুনিষ-মাহিন্দার দিয়ে জমি চাষ করানো হত। এদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম জমির মালিক তিলি-গোয়ালা সদ্‌গোপ-মাহিষ্য-উগ্রক্ষত্রিয়-খয়রা বর্ণীয় কৃষকগণ হাতে নাতে জমি চাষ করত ও প্রয়োজনে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করত।' পৌষ সংক্রান্তি ও শ্রীপঞ্চমীর মাঝেই মুনিষ-মাহিন্দারদের বাৎসরিক, চুক্তি, মাসিক বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য স্থির হত নিয়োগ কর্তা-কৃষক আলোচনায়।

ম্যাগ্রাথের নৃতাত্ত্বিক বর্গিকরণ উচ্চবর্ণের মধ্যে ৮টি জাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, ঘাটোয়াল, বৈদ্য, ভাট, আগরওয়াল-মাড়োয়ারী) ১২টি জাতি জলচল, খাঁটি-শূদ্র শ্রেণি-নবশাখ সম্প্রদায়ের (নাপিত, তামলি, কুমোর, ইত্যাদি) ১৪ মাঝারি শূদ্র শ্রেণিভুক্ত জাতি (গোয়ালা, জাঠ, মোদক, কৈবর্ত ইত্যাদি) ২৭ টি জাতিকে নিচু শূদ্র শ্রেণিভুক্ত (শুঁড়ি, কামার, কলু, ধোপা, জেলে, কামার, ছুতার ইত্যাদি) এবং ২০টি জাতিকে

আধা-আদিবাসী শ্রেণিভূক্ত (চণ্ডাল, বাগদি, বাউরী, মাল, মুচি, বেদে, হাড়ি, মেথর ইত্যাদি, উপবর্গানুসারে জাতিগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। জেলাশাসক ব্যারো ১৬টি জাতি চিহ্নিত করেছেন যাদের মহিলারা পুরুষদের কৃষি ও শিল্পকাজে সাহায্য করে। এরা হল (১) তাঁতি, (২) চাষা, (৩) নাপিত, (৪) কুমার, (৫) কেওট-জেলিয়া (৬) মালাকার, (৭) গোয়ালা, (৮) যুগি, (৯) কলু, (১০) ধোবা, (১১) বাগদি-লোহার-খয়রা, (১২) ডোম, (১৩) মুচি, (১৪) হাড়ি, (১৫) বাউরী, (১৬) তেলি।

মূলত ১০০০ সালে বিভিন্ন জাতির বাসভূমি গড়ে ওঠে বাঁকুড়া জুড়ে। একই সঙ্গে ভূমিজ-সাঁওতালদের মত উপজাতি সমাজের একাধিপত্যের কালবেলা সূচিত হয়। উপজাতীয় ভাষা-সভ্যতা থেকে বাঙালি ভাষা-সভ্যতায় বাঁকুড়ার বদল ঘটে। ডঃ অতুল সুরের মতে বাংলা ভাষার ভিত নির্মাণে আদিম অধিবাসী, বিশেষত প্রাক দ্রাবিড় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অবদান ছিল আর মাগধীপ্রাকৃত, মাগধী অপভ্রংশ পেরিয়ে বাংলা ভাষার সৃষ্টিও প্রায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দে। আর ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, বাউরী, পশ্চিম ছত্রী, পশ্চিমবঙ্গীয়, মাহিষ্য সহ বিভিন্ন বর্ণ-সম্প্রদায়ের মানুষ (যাদের মূল বংশগত উৎপত্তি পৃথক) এই বাংলা ভাষা ও জাতিতে সামিল হয়ে গিয়েছিল।[৪৪] এই সময়কালে বিভিন্ন জাতির আগমন, বর্ণাশ্রম ও বসতি স্থাপন নিয়ে হান্টার দি এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গলে পৃঃ ৭৪-৭৫) সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন, “The population of lower Bengal consists, according to the pandits, of five elements, who came into the country in the following order 1st, the aboriginal non- Aryan tribes; 2nd, the Vaidic and Saraswat Brahmans, who formed the first Aryan settlement; 3rd, Kshatryan refugees, who escaped extermination of their caste by Parasurama, with isolated Viasya families, few or none of whom penetrated below Bahar, 4th, a later migration of Brahmans, circ. 900 A.D, represented by the story of the five Brahmans brought from Canouj by Adiswara; 5th recent emigrants and military adventure from the north, Rajputs, ie. Kshatryas, Afgahans, and Mussulmans of diverse races. In all this there is nothing of the rigid four fold classification described by Manu.... This took place about 900 A.D. and the rival claim of old and new settlers soon became a source of national disquiet. Two centuries afterwards Ballal Sen, the last Hindu sovereign of Bengal, found it necessary to settle questions of precedence by a comprehensive classification of his Aryan subjects. Many of the older families of the province were amalgamated with the new comers. Almost all of pure Aryan descent were admitted to equal rights, and of the ancient settlers very few recognised descendants now preserve their identity. Several mixed castes were derived from the

followers of the Cannj Brahmans (such as the Cayasths), but the other two twice born castes, as described by Manu, viz the Kshatryan and the Vaisya, scarcely single family exists in the southern valley which cannot trace its origin to the north within comparatively recent times, and the rigid fourfold classification of society laid down by Manu is practically unknown in Lower Bengal."

লক্ষণীয় ৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় আনুমানিক ৬০০০০ জন সংখ্যা, ১০০০ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় ১৩০০০০ যা ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় ৩০০০০০। একইভাবে জনপদের সংখ্যা ৭০০ সনে ৬০০-৭০০ থকেলেও তা ১০০০ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় ৭০০-৮০০ এবং ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ১৪০০-১৫০০। অর্থাৎ অসুর সংস্কৃতি, সাঁওতাল তথা উপজাতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালি যুগের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার গ্রামজীবনের রূপান্তর ঘটেছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গ্রামপত্তন সম্পর্কে, বলা হয়েছে, "Either by inducing foreigner or immigrant or by causing the thickly populated centre of his own kingdom to send forth the excessive population, the king may construct villages either on new sites or on old ruin. Village consisting each of not less than a hundred families and of not more than five hundred families of agriculture people of shudra caste, of agricultural people, with boundary extending as far as krosa (2250 yard, 25057m.) or two and capable of protecting each other shall be formed"[৪৫] অর্থাৎ গ্রামগুলি গড়ে উঠেছিল পূর্বতন জনপদের ধ্বংসাবশেষে বা জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন স্থানে। বাঁকুড়াখণ্ডে গ্রাম প্রতি পরিবার সংখ্যা ছিল তখন ১০ থেকে ৫০। বাঁকুড়ার গ্রামচিত্র নিয়ে বিভিন্ন পর্যটক ও গবেষক - প্রশাসকের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করলে গ্রামপত্তনের রেখাচিত্র অনুমান করা যাবে। হিউয়েন সাঙ যাকে 'কজঙ্গল' বলেছিলেন তা সম্ভবত রাঢ়ের এই অঞ্চলই। পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকে ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত 'রাঢীখণ্ড জাঙ্গল' ও এই ভূখণ্ড যা অবশ্যই জঙ্গলাকীর্ণ। এসময় বাঁকুড়া ভূখণ্ডে প্রায় ১৪০০-১৫০০ জনপদ গড়ে উঠেছে আর বর্গমাইল প্রতি জনসংখ্যা ১১৪। আইন-ই আকবরীতেও 'বনবিষ্ণুপুরে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭২০-৪০ খ্রিঃ সময়কালে জগমোহনের 'দেশাবলী বিবৃতিতে' বাঁকুড়া শহরের বাঙ্গাল গ্রাম 'বনের নিকটে' বলা হয়েছে। ১৭৮০ খ্রিঃ হান্টার বাঁকুড়া জেলার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে (ক) বাঁকুড়া-বীরভূম সড়কও জঙ্গল অধিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ১২০ কিমি. পথের ধারে গ্রাম দেখা যায় কদাচিৎ। দুই ব্যাটেলিয়ান সেনা শিবির স্থাপনের ফাঁকা জায়গাও পাওয়া যাচ্ছিল না। দেশ বাঘ ভাল্লুকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রিঃ গ্যাসট্রেলের বিবরণেও এর সমর্থন মেলে। হান্টারের বিবরণে দেখা যায় রানীগঞ্জ-মেদিনীপুর সড়কের

দুই পার্শ্ব ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। বিষ্ণুপুরের পরবর্তী ১০ মাইল ছিল জনবর্জিত। রানীগঞ্জ-বাঁকুড়া সড়কের ২০ তম ও ২৮ তম মাইল ফলক মধ্যবর্তী ৮ মাইলে মাত্র তিনটি গ্রাম দেখা গিয়েছিল। এ সময় বাঁকুড়া জেলায় ৪৪৩৬টি গ্রাম পত্তন হয়েছিল, জনঘনত্ব ছিল বর্গমাইলে ৩৬৯। ১৯০৮ খ্রিঃ ও'ম্যালী বাঁকুড়ার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাবৃত ও বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, হরিণের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র বলেছেন। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তেও বলা হয়েছে এদেশ এতই গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল যে পথচারীদের বন কেটে পথ তৈরী করে এগোতে হত এবং প্রায়শই হিংস্র শ্বাপদের সামনে পড়তে হত। ৬৭২-৬৯৩ খ্রিঃ চৈনিক পর্যটক ই. সিং বলেছিলেন, পৌন্ড্রে কোনো কোনো জায়গায় বিশেষত নগরাঞ্চলে চলাচলযোগ্য রাস্তা হয়। এর থেকে সমকালীন রাঢ়ের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এ সময় বাঁকুড়া-ভূখণ্ডে জনপদ ছিল ৬০০-৭০০ কাছাকাছি, আর জনঘনত্ব বর্গমাইলে মাত্র ২৩।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই জনপদগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও বাইরের জগতের সাথে সম্পর্কহীনতা ছিল লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রামগুলি সে কারণে স্বয়ম্ভরভাবে গড়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা গ্রাম ও গ্রাম সন্নিহিত এলাকাতেই জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে পারত। এমনকি পরিধেয় বস্ত্র তৈরীর প্রচেষ্টায় বাঁকুড়ায় বস্ত্রবয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটে আদিপর্বে। বিচ্ছিন্ন গ্রামে নান্দনিক তাৎপর্যে কুটির শিল্পের বিকাশের কারণও তাই। এমনকি রাষ্ট্রচেতনা বিকাশের সময়কালে ও কৃষি জীবন থেকে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যে উত্তরণকালেও এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির প্রয়াস দেখা যায় নি। ডাঃ শক্তিনাথ সাহা তাঁর 'বঙ্গীয় অর্থনীতির ধারা' গ্রন্থে (পৃঃ৭৩) যথার্থই লিখেছেন, 'কেন প্রাচীন যুগে নগরায়ণের প্রসার ঘটেনি সম্ভবতঃ তার অন্যতম কারণ হিসাবে আমরা এই সুদৃঢ় সামন্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা ও জীবিকার ধরণকে চিহ্নিত করতে পারি। এরা ছিল একান্তই কৃষি নির্ভর। যে কারণে নগরায়ণের প্রতি তাদের ঝোঁক প্রকাশ পায়নি, তাছাড়া সম্ভবতঃ আশঙ্কা ছিল যে, নগরায়ণ হলে রাস্তা ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রসার হবে; তাতে বর্হিশত্রুর আক্রমণ বৃদ্ধি পাবে। অতএব নগরায়ণে তেমন উৎসাহিত হওয়ার কারণ ছিল না। প্রকৃতির অতি সাধারণ এক গ্রাম্য পরিবেশে এ কারণে সামন্তশ্রেণী সুদীর্ঘকালে প্রসারলাভ করে; তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করাও কোন বর্হিশত্রুর পক্ষে তেমন সহজসাধ্য ছিল না। কৃষির আয়ও নদীমাতৃক অঞ্চলের সাহায্যে এক প্রাকৃতিক দুর্গে যেন গ্রামীণ সমাজের প্রচলন। ভূমিজ সম্পদকে নির্ভর করে একদিকে আপাত স্বাবলম্বী আঞ্চলিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।..... পথ ছিল দুর্গম...... ফলে গ্রামের বাইরের সাথে যোগাযোগও ছিল না—গ্রামগুলি স্বল্প উপযোগ ও দ্রব্যের যোগান বজায় রেখে গড়ে উঠতে থাকে।'

জঙ্গল কেটে বসতি ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপন পর্বে স্থাপক-মণ্ডলের ভূমিকা ঐতিহাসিক যুগের সূচনাকালে ছিল অবিসংবাদিত। এমনকি মৌর্য ও গুপ্ত যুগেও অনেকটা তা অব্যাহত ছিল।[৪৬] জমি হস্তান্তর হত মণ্ডলের অনুমত্যনুসারে। জমি সীমা,অবস্থান সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিচারকের মতো।[৪৭] ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। ভূমি ক্ষেত্রে বাজার ও রাষ্ট্রের অধিকার নিরঙ্কুশ হয়। দামোদরপুর লিপি, বৈগ্রামলিপি (৪৪৭-৪৫৮ খ্রিঃ) পাহাড়পুর লিপি, লক্ষণ সেনের লিপি থেকে এর প্রমাণ মেলে। ভূমি ও ভূমিকর ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নগ্ন প্রকাশ ঘটে ঔপনিবেশিক শাসনে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী শিল্প-অর্থনীতির অভিঘাতে স্বয়ম্ভর গ্রামব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সৃষ্টি হয় বিত্তশীল ও বিত্তহীন বিভাজন। ঈশ্বর ত্রিপাঠী ১৮৭১খ্রিঃ গ্রাম বাঁকুড়ার ছবি এঁকেছিলেন এই সমাজ-অর্থনীতির ক্যানভাসে, 'প্রচুর বিত্তশালী সামন্ত প্রভু ব্যবসায়ীদের মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল ব্যক্তির ঘরেও গৃহোপকরণ বলতে দেখা যেত সুতির গালিচা, তক্তাপোষ, দু-একটি টুল, জবরদস্ত সিন্দুক, ঢাকা বেতের ঝুড়ি, পেতলের প্রদীপ, আয়না, হুকা, লেপতোষক ও অন্যান্য শয্যা দ্রব্য, কাঁসার বাসনপত্র, রান্নার পত্রাদি, ছুরি এবং মূর্তি। অপর পক্ষে খেটে খাওয়া মানুষ অর্থাৎ সাধারণ একজন চাষীর ঘরে আসবাব বলতে থাকত মাদুর, কাঠের বাক্স, লেপ তোষক বা কম্বল, আয়না, খাওয়ার জন্য পাথরবাটি, কয়েকটি কাঁসা ও মাটি পাত্র, হুকা এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় লাঙ্গল ইত্যাদি। দোকানদার এবং চাষী সকল মানুষেরই খাওয়া পরার ছবিটি তখন ছিল এই রকম খাবার - ভাত, ডাল, মাছ, দুধ ও তরকারি। পোষাক - দোকরনদারের ক্ষেত্রে ধুতি ও ফতুয়া, চাদর অথবা সুতির শাল এবং একজোড়া জুতো বা চপ্পল; চাষীর ক্ষেত্রে মোটা ধুতি ও গামছা, কখনো কাঁধে ফেলা, কখনো বা মাঠের কাজ করার জন্য পাগড়ি হিসাবে মাথায় বাঁধা। চাষীদের বাড়ি ঘর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁশ, খড় ও মাটির তৈরী। দোকানদার বা ছোট ব্যবসায়ীর সাধারণত কাঠের তক্তা ও বিম দেওয়া। বড় গ্রাম বা গঞ্জ এলাকায় তাদের বাড়ীঘরের দেওয়াল ইঁটের। তবে সাধারণ চাষীর বাড়ীতে গড়পড়তা ২/৩টি ঘর এবং সম্পন্ন দোকানদার বাড়ীতে ৫/৬টি ছোট ঘর থাকত। প্রায় গ্রামেই একটি দুটি পাকা বাড়ী দেখা যেত।' তাছাড়া এ সময় এখানকার মানুষ সুপ্রাচীন বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে বৃহত্তর সমাজবৃত্তে প্রবেশ করেছিল, বেড়েছিল ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণ যা এক শ্রেণির মানুষের হস্তগতও হয়েছিল। জেলাশাসক রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (১৮৯৯-১৯০২) এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, "There has been, on the whole, an increase in the property of the people. They evince a growing desire to provide themselves with better food, better clothing and better appliance generally. Gold and silver ornaments are more common than ten years ago. Brass utensils have usurped the place of earthen pots

extensively used. Now brick built houses are springing up everywhere and articles of food which was formerly luxuries are now in common use"

ঘাটোয়ালী প্রথা :

ভৌমরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে ঔপনিবেশিক শাসনকালের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঁকুড়ার ঘাটোয়ালী প্রথা ছিল একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। পঞ্চদশ শতকে সবচেয়ে শক্তিশালী ভৌমরাজ্য ছিল মল্লভূম। মল্লভূমের অনুগত সাতটি সামন্তরাজ্য (তালুকদারি) ছিল ছাতনা, ফুলকুসমা, ভেলাইডিহা, সুপুর, অম্বিকানগর, রাইপুর ও শ্যামসুন্দরপুর (এ.পি. মল্লিক এছাড়া বগরী, সিমলাপাল, জামকুড়ি, ধরাপাট, ইন্দাস, মালিয়াড়া, শূরভূম, ধুমনি, বিহার, লেগো, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা প্রভৃতি সামন্তরাজ্যের কথা বলেছেন) যাঁরা পৌষ অভিষেকের দিন বিষ্ণুপুরে হাজির হতেন বা প্রতিনিধি মাধ্যমে বার্ষিক নজরানা পাঠাতেন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতেন। মল্লরাজকে প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য দিতেন সামন্ত রাজারা। মল্লভূমের নিজস্ব শাসনাধীন অংশ বিষ্ণুপুর, বড়হাজারী, সিংঘজারি, মালিয়াড়া, তোপমহল, করিশুণ্ডা, জঙ্গলমহল, কুচিয়াকোল, পাঁচাল, জামতারা, সাহারজোড়ার মতো পরগণাতে বিভক্ত ছিল যার শাসনকর্তা ছিলেন রাজা নিযুক্ত পরগণাইত। প্রতি পরগণা তরফদারের অধীনস্ত কয়েকটি তরফে বিভক্ত ছিল।[৪৮] এই তরফগুলিতে থাকত একাধিক ঘাটোয়াল। মল্ল সেনাবাহিনীতে যেমন ডোম, বাগদি, বাউরী, লায়েক, হাড়ি, কৈবর্ত, মাঝি, গোপ, তেলিদের সেনাপতি হিসাবে; কায়স্থ, গোপদের সীমান্ত পাহারাদার সীমান্দার ও সাধারণ সৈনিক পাইক হিসাবে এবং ঘাটোয়াল হিসাবে উল্লেখিত সব বর্ণের মানুষদের আধিপত্য ছিল। কিছু ভৌমরাজ্যে ঘাটোয়াল হিসাবে প্রথমে ভূমিজদের একাধিপত্য ছিল যা পরবর্তীকালে হ্রাস পায়। এ বিষয়ে সুরজিৎ সিনহার মত সমর্থন করে প্রভাতকুমার সাহা (বিষ্ণুপুর মল্লশাসনের বিভিন্ন দিক, পৃ-১৩) লিখেছিলেন— "...... The Bhumij king of Barabhum used to appoint none but those belonging to Bhumiji commmunity in all administrative positions. He (the raja) observed the customs and rituals of the Bhumij in religious matters also. But with growing Hindu settlements around their kingdom the Bhumij kings began to be more and more attracted to Hindu rites, customs and rituals. Gradually, the Brahmins and the high caste hindus replaced the bhumij people in a administrative posts and sorrounded then as courtiers." মল্লভূমের ঘাটোয়ালরা ছিল বিভিন্ন বর্ণের। নিম্নের তালিকা থেকে তা বোঝা যাবে (১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের হিসাব)।

ঘাট	সর্দারের নাম	কর্মী সংখ্যা	ঘাটোয়ালী জমি (বিঘা/কাঠা/ ছটাক)	পঞ্চকি (টাকা/ আনা)	হুজুর সেলমী (টাকা/আনা)	মোট (টাকা/ আনা)
বুলরামগড়	হারাদুর চৌধুরি	১০৩	১৫৮৮	১২৪/৮	—	৮৭
মুরুন্দপুর	গোবিন্দ সিং	২০০	৩০৫৬	৪০৬/১০	১৯১	৮৬
বাঁকাদহ	সামসুর বাহাদুর	২০৪	৩১০৫	১৫৪	২০	৮৫
বেলশুলিয়া	নিতাই দিগর	৪১	৫৯১	৫০/১২	—	১৮/৪
কোতল	মুকতাল বুনি	১৬৭	২১৪৬/১৩	১৯৭/৩	১১৩/৬	৫০/২
জয়বেলিয়া	রতন সিং	১৬০	৩২৮০/১১	৫৫৯/৪	২২৯	৪৮
মোণীপোর	গৌর হাজারী	৩০	১০৯৩/৫	১৩৫	৫৩	৩৯
দেগপরপল তেতুল	নন্দকিশোর দিগর	১৫৪	২৩১৬/১২	১৬০/১০	৪৬	৭০/১০
তৈল সঞ্চরা ও	লালু রায় ও					
জামকুড়ি	সৈরতুক হাজারী	৩৪	৩৮৭/১৬/৮	১৩০	৬৯	৪০/১৪
দেহে জামকুঁড়ি	বিনোদ সিং	১০	১০৪	১০	—	—
পৈতুমোরা	কোড়ারাম সর্দার	৩৫	৬০৯	৩৫	—	২৪
বীরসিং	”	৩৮	৬০২	২১	১৬/৬	৪৫/১০
চুয়ামসিনা	পাঞ্চু বাহাদুর	৫২	১০২৮/৩	১৩৩/১৩	৬৬	২০/২
বেলিয়ারা সবুক	বৈজু ফেটি	—	—	—	—	—
বেলড়ে বসন্তপুর	গোকুর বেরা	১১	১৯৬	১১/৬	—	১১/১২
নাকবাঁধমুচি	মোচারাম					
ভোঙ্গী	কার্তিক দিগর	২৮	৬১৫	৩১/৮	--	১৪
বালসী	রামকান্ত সিং					
	ও গোলাব রায়	১৩	১৭৩/১৮	২২	—	—
চাতরা	কালু সর্দার	২১	—	—	—	—
গোপালপুর	চৈতন সর্দার	১৪	৭১০	৬৫	--	---
ঘুটকুল	ভুরুটসর্দার	৩৯	—	—	১২	৭
	মোট	১৩১৯	২১৫৯৩/৪/৮	২৪৭/১২/৮০৭/১২৬৪৭/৯		
	মোট দেয় কর—৩৭০৩/৩					

অর্থাৎ ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দের হিসাবে মল্লভূমে ১৩১৯ ঘাটোয়াল ছিল ২০টি ঘাটে। মোট ঘাটোয়াল জমি ছিল ২১৫৯৩ বিঘা ৪ কাঠা ৮ ছটাক। আর মোট খাজনা ছিল ৩৭০৩ টাকা ৩ আনা।[৪৯] রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর হিসাবে (বাঁঃইঃসঃ পৃ-১২৬) মল্লরাজের ঘাটোয়াল ছিল ২২০০। গঙ্গাজলঘাটির বাইশ গ্রাম তরফে ২২, ছান্দার তরফে ২৭,

চুয়ামসিনার তরফে ৫০ জন ঘাটোয়ালে ছিল, যারা প্রত্যেক ৫০ বিঘা করে পঞ্চকি জমি ভোগ করত। অর্থাৎ মোট ঘাটোয়ালী জমি দাঁড়ায় ৩৩০০০ বিঘা। ১৮০২ খ্রিঃ বিষ্ণুপুর কমিশনার চার্লস ব্লান্টের হিসাবে মল্লরাজ্যে পঞ্চকি জুন্মার ঘাটের সংখ্যা ছিল ৪৩, ঘাটোয়াল ২২৯৯, ঘাটোয়ালী জমি ৩৫২৮২ বিঘা, আদায়যোগ্য পঞ্চকির পরিমাণ ৪৬৯০ টাকা ১২ আনা ৭ পাই। বেপঞ্চকি ঘাট ছিল ১টি। যে ঘাটগুলি সরাসরি জমিদারদের পঞ্চক দিত সেগুলিকে বলা হত জমিদারি পঞ্চকি ঘাট। প্রথম দুইটিকে বলা হত যথাক্রমে সরকারি পঞ্চকি ঘাট ও বেপঞ্চকি ঘাট। চার্লস ব্লান্টের তালিকায় মাতোয়ারী মোতাবেক ১৮১৬খ্রিঃ সরকারি পঞ্চকি ঘাট ছিল ৪১৬২০ বিঘা, জমিদারি পঞ্চকি ঘাট ১৪৭১০ বিঘা যেখানে ১৮৪৫ সালের হিসাবে সরকারি পঞ্চকি ঘাট ছিল ৫৮৫০৬ বিঘা, জমিদারি পঞ্চকি ঘাট ২৪৮৬৩ বিঘা, বেপঞ্চকি ঘাট ২২০০ বিঘা। এ সময় ক্ষেত্র সমীক্ষায় (রবার্টসন ও বাবু তারকনাথ ঘোষের নেতৃত্বে) বিষ্ণুপুর পরগণার ১৩৬৫৩৬ বিঘা পঞ্চকি, ১৩০৩৫৮ বিঘা জমিদারি পঞ্চকি জমি ও ২৯৭১ বিঘা বেপঞ্চকি জমি পাওয়া যায়। ১৮৮৭ খ্রিঃ ৩০ সেপ্টেম্বর ক্ষেত্রসমীক্ষা শেষে সরকারি পঞ্চকি জমি ১৬৯০০০ বিঘা, জমিদারি পঞ্চকি ৩৫০০০০ বিঘা, বেপঞ্চকি জমি ২৭০০ বিঘা পাওয়া যায় অর্থাৎ রাজকীয় সনদ বলে যে জমি ঘাটোয়ালদের থাকার কথা তার চেয়ে বহুগুণ। এর কারণ ঘাটোয়ালরা তাদের নির্ধারিত জমির চারপাশে উপজাতি বা অনুপজাতির মানুষদের সাহায্যে জঙ্গল কেটে জমির পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিল। ১৮১৬ সালের তুলনায় ১৮৮৭ সাল ঘাটোয়ালী জমির বৃদ্ধি একই কারণে। ঘাটোয়াল প্রথায় ঘাটের দায়িত্বে থাকতেন সর্দার। তাঁর অধীনে থাকত কয়েক জন সদিয়াল এবং সদিয়ালের অধীনে কয়েকজন তাঁবেদার। একজন সর্দার ২০-৪০ বিঘা জমি, সদিয়াল-তাঁবেদাররা ৫-১৪ বিঘা জমি দখলে রাখতেন।

ঘাটোয়ালদের তিন রকম ভূমিকায় দেখা যেত। সীমান্তের প্রবেশ পথ বা ঘাটগুলি বহির্শত্রুর থেকে সুরক্ষিত রাখা, রাস্তাগুলির সুরক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। চার্লস ব্লান্টের মতে, "The object proposed by the establishment of these people was to secure the inhabitants of Bissenpore from the incursions of the Chuars and plunderers by the several passes in the extensive jungle on the western frontier of the district"[৫০] জে. জেড. হলওয়েল ইন্টারেস্টিং হিস্টরিক্যাল ইভেন্ট গ্রন্থে (পৃঃ ১৯৬) লিখেছিলেন,.....' The traveller with or without merchandise, on his entering this district becomes the immediate care of the government, which allots him guards without any expense, to conduct him from stage to stage, and these are accountable for the safety and accomodation of his person and effects. At the end of the first stage, he delivered over with certain benevo-

lent formalities, to the guard of the next who after interrogating the traveller, as to the usage he had received in his journey dismiss the first guard with a written certificate of their behaviour, and a receipt for the traveller and his officer of the first stage who registers the same, and regularly reports it to Raja," বলা যায় সৃষ্টি লগ্নে মূলত সীমান্তঘাট পাহারা, পরবর্তীকালে রাস্তার নিরাপত্তা ও শেষের দিকে পুলিশি ভূমিকায় দেখা যায় ঘাটোয়ালদের। স্যার রিচার্ড টেম্পল ঘাটোয়াল সম্পর্কিত প্রস্তাবিত বিলে ঘাটোয়ালদের কর্তব্য নির্ধারণ করেছিলেন—১) আরোপিত পুলিশি দায়িত্ব ২) জন নিরাপত্তার জন্য খবর সংগ্রহ ও প্রেরণ, ৩) অপরাধ প্রতিরোধ, ৪) অপরাধীদের বিচারার্থে প্রেরণ, ৫) রাস্তায় টহল, ৬) পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান,৭) ডাক বিলি (সরকারি ডাক)। রবার্টসন প্রতিবেদনে দেখি (পৃঃ ৪৩),"They were employed originally by the rajas of Bishnupur and neighbouring chiefs as a kind of feudal militia to defend their territories from the inroads of the mahrattas, and from the depredations of the choars and generally to perform police duties. The term "ghatwal" is derived from the 'ghats" or passes over the hills which in former times it was their principal duty to defend....... in Bankura on the other hand the lands of each ghat were scattered over a number of villages and the duties of the ghatwals lay mainly in guarding communications and not in the police work of any definite area." তবে এই ঘাটোয়ালরা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

মল্লরাজত্বের শেষভাগে ও ইংরেজ শাসনের সময় এই ঘাটোয়ালদের ভূমিকা ছিল হতাশাজনক। যদিও ফরাসি পর্যটক রাইনল ও হলওয়েল কার্যকর ঘাটোয়াল ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, কমিশনার চার্লস ব্লান্টের মতে ঘাটোয়ালরা 'Refused to do any thing' এবং তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, 'engagement in cultivation of land, in trade and in suits arising there form' ব্লান্টের মতে, 'inefficiency of the ghatwals was largely due to their continued connection with and dependence on Zamindars.' এমতাবস্থায় চার্লস ব্লান্ট ঘাটোয়ালদের জমিদারদের ছত্রছায়া থেকে বের করে সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার সুপারিশ করেন। তাদের পঞ্চকি সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা করার প্রস্তাব দেন। তারা সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে পুলিশি ভূমিকায় থাকবে এমন প্রস্তাবও দেওয়া হয়। তবে ঘাটোয়ালী প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পথ-ডাকাতি সহ বিভিন্ন অপরাধ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় ও এগুলির পেছনে কোনো কোনো সময় ঘাটোয়ালদের যোগসাজশ প্রমাণিত হয়েছিল। ঘাটোয়ালী দায়িত্বের বংশানুক্রমিক হস্তান্তরের সুযোগে

মোট ঘাটোয়ালি সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ মহাজনদের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল সরকারের অবগতি ছাড়াই। উপরন্তু ম্যাজিস্ট্রেটরা দোষী ঘাটোয়ালকে বরখাস্ত করলে বা শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে পূর্বতন ঘাটোয়ালের পরিবারের বাইরে অন্য কাউকে নিয়োগ করলে, পূর্বতন ঘাটোয়ালরা সিভিল কোর্টে অনুকূল রায় পেয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে ম্যাজিস্ট্রেটরা নিজেদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সন্দিহান হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য রাজকীয় সনদানুসারে ঘাটোয়ালী কর্তব্য বিনিময়ে ঘাটোয়ালী জমি প্রদত্ত হয়েছিল এবং তা রাজা কর্তৃক প্রত্যাহারযোগ্য ছিল। যদিও বংশানুক্রমিক কর্তব্য ও জমি প্রদানের বিষয়টি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। আইনত জমির স্বত্বাধিকার বংশানুক্রমিক ছিল না। ১৭৯০ খ্রিঃ জেলাশাসক কিটিং বলেছিলেন। "All the existing ghatwals have succeeded linear descent."[৫০ক] যেমন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভক্ত্যাবাঁধের সদিয়াল ওমরাও সিংহকে বরখাস্ত করে ১৮৫৬ খ্রিঃ সেখানে মাণিক সিংহ বলে অন্য ব্যক্তিকে সদিয়াল নিয়োগ করা হয়েছিল। জর্জ ডসওয়েল, প্রাদেশিক সরকারের বিচার সচিব-কে লেখা কমিশনার ব্লান্টের ১৯/০৮/১৮০৬ পত্রাঙ্কে ও ২৫/০৪ ১৮০৭ তারিখের পত্রাঙ্কে এ বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে।

ব্লান্টের এই উদ্যোগে সত্ত্বেও ঘাটোয়ালী ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেনি। ইতিমধ্যে মেসার্স ওয়াটসন ও কোম্পানী (বিষ্ণুপুরের ইজারাদার) ও মেসার্স গিসবর্ণ ও কোম্পানী (রাইপুরের ইজারাদার) ঘাটোয়ালদের অধিকার অতিরিক্ত জমি দখলে রাখার বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন জানায় এবং বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার আর. সি. দত্ত সরকারের কাছে ঘাটোয়ালী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ও ঘাটোয়ালদের পুলিশি দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করেন। কারণ তার মতে ঘাটোয়ালদের 'SERVICE WAS NO LONGER REQUIRED'. তাঁর মতে জমিদারির সঙ্গে ঘাটোয়ালী জমি নির্দিষ্ট কর সমেত যোগ-বিয়োগ হলে তাদের যেমন আপত্তি হওয়ার কথা নয় তেমনি ঘাটোয়ালরা নব্য খাজনার বিনিময়ে জমির চিরকালীন দখলীস্বত্ব লাভ করতে আপত্তি করবে না।[৫১] ইতিমধ্যে ১০ চৈত্র ১২১৩ বঙ্গাব্দে বর্ধমানরাজ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে বলেন ২৫ দিনের মধ্যে তাঁর জমিদারি সীমানার মধ্যেকার ঘাটোয়ালদের রাজ সনদ পেশ করতে হবে, নতুবা ধার্য কর দিতে হবে।

এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আর. সি. দত্তের সুপারিশমতো সরকার ৭৬০ এ. আর তাং ১৪/১০/১৮৯৪ স্মারক সংখ্যায় ঘাটোয়ালী জমি অধিগ্রহণের আদেশনামা জারি করে। ১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ জেলার অপরাধ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটলে, সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল বেকারকে, এর পিছনে ঘাটোয়ালদের ভূমিকা খুঁজতে তদন্তে পাঠান হয়। তিনি তদন্ত শেষে ঘাটোয়ালী প্রথার ক্রমশ অবসান সুপারিশ করেন এবং অর্থসংস্থান করে শক্তিশালী পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাব

মতোই ২৪৯২ তাং ৩০/০৫/১৮৯৭ স্মারক সংখ্যায় সরকার ঘাটোয়ালী জমি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের এ্যাক্ট V অনুসারে সমীক্ষা করার নির্দেশনামা জারি করে।

নিম্নলিখিত নিয়মে ঘাটোয়ালী জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয় ১) ১৮৪০-৪৭ সালের ক্ষেত্রসমীক্ষা মোতাবেক ঘাটোয়ালী জমি নির্ধারিত হবে, ২) স্থানীয় হারে কর নির্ধারিত হবে এবং ঘাটোয়ালদের দীর্ঘ দখলদারিকে সম্মান জানিয়ে ২৫ শতাংশ কর ছাড় দেওয়া হবে, ৩) কর স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা হবে এবং ঘাটোয়ালদের নির্ধারিত জমির উপর বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব দেওয়া হবে। ৪) জমিদাররা কর আদায় করে অর্ধাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেবে, ৫) জমিদারকে দেয় মোট ঘাটোয়াল পঞ্চকি জমিদারের দেয় কর থেকে বিযুক্ত হবে।

এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ফলে বাঁকুড়া ভূমিখণ্ডের সুদীর্ঘকালের এক প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটে। ১৬ই জানুয়ারি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার, জেলাশাসক, ভূমি আধিকারিক ও সরকারি আইনজীবীর উপস্থিতিতে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয় তাতে দেখা যায় আর মাত্র ৩২টি ঘাটের ৩৩৪ জন ঘাটোয়ালের জমি অধিগ্রহণ বাকি আছে, যার অধিগ্রহণ চালু জেলা সেটলমেন্টে শেষ করে ফেলতে বলা হয়। ঘাটোয়ালী জমিগুলির নতুন করে কর নির্ধারণের ফলে পঞ্চকি থেকে সংগৃহীত অর্থের বহুগুণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়তে থাকে। রবার্টসন প্রতিবেদন (পৃঃ ৫৩) থেকে জানা যায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৫ ও ১০৬ ধারা মতে ঘাটোয়ালী জমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত প্রকাশের পর ভূমিকর নির্ণীত হয় ৪৪০১৩ টাকা ৮ আনা ৩ পাই, যেখানে পূর্বেকার পঞ্চকি ছিল ১২৪৪২ টাকা ৯ পাই। সুতরাং অতিরিক্ত কর হল ৩১৫৭১ টাকা ৭ আনা ৬ পাই। এরূপ ২৫২টি সরকারি পঞ্চকি, জমিদারি পঞ্চকি ও বেপঞ্চকি ঘাটের পঞ্চকি ও নয়া ভূমিকর নিম্নরূপ—

ঘাটের সংখ্যা	ঘাটের চরিত্র	এলাকা (একর)	নয়া কর ভূমি কর	পূর্বতন পঞ্চকি টাকা/আনা/পাই
৪৩	সরকারি পঞ্চকি ঘাট	৪৫৭৭৩.৯	১৭৫৪২/১০	৫০০৩/৭/০
১৭৪	বেপঞ্চকি ও জমিদার পঞ্চকি ঘাট	৭৭৭৪৬.৯	১৯৭৭৯/১১/২	৫৫৬৩/১০/১১
৩৫	বেপঞ্চকি ও জমিদারি পঞ্চকি ঘাট	২২৬২৯.০৪	৬৬৯১/৩/১	১৮৭৪/১৪/১০
মোট-২৫২		১৪৬১৪৯.৮৪	৪৪০১৩/৮৩	১২৪৪২/০/৯

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ভৌমরাষ্ট্র সূচনালগ্নে যে প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ, কয়েকশো বছর পরে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেছে।

চৌকিদারি প্রথা :

ঘাটোয়ালী প্রথার মতো আর এক পুরাতন প্রতিষ্ঠান ছিল চৌকিদারি প্রথা। চৌকিদার হ'ল গ্রামের নৈশপ্রহরী। গ্রামের নিরাপত্তার জন্য গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্য থেকে চৌকিদার নিয়োগ করত, রাজার অনুমোদন নিয়ে। সেবার বিনিময়ে রাজা এদের যে নিষ্কর জমি দিতেন সেটিকে বলা হত চৌকিদারি চাকরাণ জমি। সাধারণত এক একটি গ্রামে ২-৩ জন চৌকিদার থাকত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪-৬ জনও দেখা যেত। বাঁকুড়ায় মোটামুটি ৩৬৩৯ জন চৌকিদার ছিল (১৮০২-১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদন) এবং মোট চাকরাণ জমির পরিমাণ ছিল ২০১১৩ বিঘা। চৌকিদার প্রতি গড় জমির পরিমাণ ১১ বিঘা।[৫২] যাদের নিষ্কর জমি ছিল না তারা পরিবার প্রতি মাসিক ২ টাকা বা ১ টাকা ৮ আনা সংগ্রহ করত যা দুয়ার মাসোহারা নামে পরিচিত ছিল। জেলাব্যাপী ছড়িয়ে থাকা চৌকিদারেরা ঘাটোয়ালদের সাথে কাজ করত।[৫৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে থানাওয়ারী চৌকিদারের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ—

কোতুলপুর থানা	৬১৪
বিষ্ণুপুর থানা	২৭৬
ওন্দা থানা	১৭০
বাঁকুড়া থানা	১০৭
ছাতনা থানা	১৮২
সোনামুখী থানা	৩২৮
চুরুলকা থানা	৩৩৫
ওকরা থানা	৪৩৩
শিতলা থানা	১৮৮

রামানুজ করের হিসাবে (বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, পৃঃ - ১২৩) ১৯২১ সালে চৌকিদার-দফাদার সংখ্যা নিম্নরূপ—

থানার নাম	চৌকিদার সংখ্যা	দফাদার সংখ্যা	ইউনিয়ন বোর্ড সংখ্যা
বাঁকুড়া	১৩৪	১৫	১৫
ছাতনা	১১২	১২	১২

থানার নাম সংখ্যা	চৌকিদার সংখ্যা	দফাদার সংখ্যা	ইউনিয়ন বোর্ড
ওন্দা	১৫৯	১৭	১৭
তালডাঙ্গরা	৮১	৯	৯
গঙ্গাজলঘাটী	১১১	১২	১২
মেজিয়া	৬১	৬	৬
শালতোড়া	৮৫	৯	৭
বড়জোড়া	১৪৩	১৫	১৫
খাতড়া	১১৮	১২	১২
ইন্দপুর	৮৩	৮	০৮
রাইপুর	১৬৪	১৬	১৬
সিমলাপাল	৭৩	৭	০৭
রানিবাঁধ	৮১	৮	০৮
বিষ্ণুপুর	৫৭	৬	১০
রাধানগর	১০৮	১১	
জয়পুর	৮৩	৯	০৯
সোনামুখী	৯১	৯	১০
পাত্রসায়ের	১৪৮	১৫	১১
ইন্দাস	১৭২	১৬	০৯
কোতলপুর	১৪৩	১৫	০৯
শিরোমণিপুর	১২০	১২	
মোট (২২)	**২৩২৭**	**২৩৯**	**২১২**

উল্লেখ্য বিভিন্ন সময়ে চৌকিদারি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটেছে সময় ও চাহিদার নিরিখে। ১৮৬৯ খ্রিঃ থম্পসন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পল্লি চৌকিদারি আইন' ১৮৭০ চালু হলে তা হয় ইংরাজ শাসনে প্রথম গ্রামস্তরে প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়াস, যদিও তা ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত। উল্লেখ্য ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ আইন VI বলে সব চৌকিদারি চাকরাণ সম্পত্তি অধিগ্রহণ শুরু হয় এবং নয়া নির্ধারিত ভূমি কর দিয়ে চৌকিদারি ইউনিয়ন ফাণ্ড গঠিত হয়। এই ফাণ্ড থেকে চৌকিদারদের মাসিক বেতন দেওয়া শুরু হয়। আদায়ের সুবিধার জন্য এই চাকরাণ জমি স্বতন্ত্রভাবে খতিয়ানভুক্ত ও বন্দোবস্ত করা হত।[৫৪] তবে এই ভূমিকর যথেষ্ট না হওয়ায় পল্লি চৌকিদারি ১৮৭০

আইনে জনসাধারণের কাছে 'চৌকিদারি কর' আদায়ের বিধান রাখা হয়। চৌকিদারদের বেতন পরিশোধের সংকট নিয়ে তৎকালীন পশ্চিম বর্ধমানের সেসন জাজ এইচ. পি. রাসেলকে বাঁকুড়ার জেলাশাসক এইচ. সি. হ্যালকট ১৭ নভেম্বর ১৮৩৭ খ্রিঃ এক পত্রাঙ্কে লিখেছিলেন, "The village watch in this district call for great reform. On some villages, land (say about 9 or 10 beghas) assigned for the support of the Chowkedars, sometimes both land and an allowance in money is given, and in others again only an allowance in money, seldom exceeding and often falling short of eighteen rupees per annum, always, however insufficient for the purpose intended, even when regularly paid, which is by no mean always the case. The general people in this district are in extreme poverty, and can with great difficulty afford and as a natural consequence, avoid, even when they can do so, the payment of their assigned contribution, light though these be, to keep up the necessary number of Chowkedars required for the guarding of their villages, most of the villages also are very small of 10, 20, 25 houses and thus a heavier rate is necessary to be paid to keep up a Chowkedar for their security, than falls to the lot of those living in large villages or towns, where the number of contributions being greater the tax is less heavily felt. Hence frequently instances occur of Chowkedars running away from their villages, owing either to the insufficiency of the means assigned for their support, or not unfrequently from the nonpayment of even that pittance".

১৮৭৯ খ্রিঃ চৌকিদারি ব্যবস্থার পর্যালোচনার জন্য গঠিত মনরো কমিটির সুপারিশে চৌকিদারদের বিষয়টি জেলাশাসকের হাতে বর্তায়। পরবর্তীকালে বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমাশাসক, জেলা পুলিশকর্তাকেও এই দায়িত্ব দেওয়া যেত। মনরো কমিটি সম্পর্কে Report of the Chaukidari Enquiry Committee, 1983-40 পৃষ্ঠা ১১ তে বলা হয়েছে, " This committee found that the Panchayats had signally failed in their most important duty, the regular payment of Chawkidars. Act- I of 1886 in which the recommendations of the committee, as far as accepted by government, were implemented and Act-I of 1892, which transferred to the magistrate the power of fixing the number and salary of the chaukidars and also the power of appointing, dismissing and punishing them to a great extent broke away from the theory adopted in 1870." উল্লেখ্য ১৮৭০ খ্রিঃ চৌকিদারি আইনের বিল প্রসঙ্গে স্যার রিভার থম্পসনের (লিগাল রিমামব্রেন্স) মত ছিল, "either to introduce the principle advocated in some quarters that the Government should appropiate

the entire tax estimated to be about 60 lakhs of rupees paid for the maintenance of the village Choukidars throughout the country and utilise that sum in appointing through its own officers a rural police in subordination to the regular constabulary, or to leave to the village communities the control of their own choukidars and of selecting the men" কারণ চৌকিদাররা ছিল রাষ্ট্রস্বীকৃত ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রাম সমাজের ও গ্রামবাসীদের কর্মি, "The bill recognised the second course and empowered the panchayat to fix the number and the wages of the Chaukidars and dismiss Chaukidars, to assess and collect the necessary fund, and to appoint and dismiss chaukidars subject to the approval of the Magistrate. The intention of the framers was to give large freedom of action to the village Panchayats and to trust them, as being the persons most deeply intersted in the efficiency of the village police, to pay the chaukidars adequately and regularly. The power of interference on the part of Magistrates was curtailed, and the police were excluded from having any share wahtever in the administration of the system of village watch" [৫৫]

ভৌমরাষ্ট্রের ঘাটোয়ালী ব্যবস্থা উচ্ছেদে ব্রিটিশ প্রশাসকরা প্রথম থেকেই উদ্যোগী থাকলেও চৌকিদারি প্রথাকে তারা নতুন করে গড়ে তোলে। প্রাদেশিক সরকারের একটি নোটে এই প্রতিষ্ঠানের উৎস সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল, "The village watch man in Bengal, or " Chaukidar" as he is now known, has little connection with any ancient system of self-contained services including the important duties watch and ward. Under the rule of the Mughals the Zamindar was arranged not merely with collecting the revenue but also with maintaining the peace. In other words what would now be called police administration within his Zamindari was in the hands of the Zamindar. The village watch was part of the establishment which he mantained for this and other purposes. There were in fact several classes of establishment maintained among which may be mentioned 'Ghatwals" on the frontiers "Nagdee" troops in Burdwan, "Thanadari police" in Nadia, Burdwan, Birbhum and Murshidabad, an "Burkandazes" or personal guards generally. The village stuff was known by different names in different parts, e. g. "Kotal", " Nigaban" or "Pasban" They were not known as " Chaukidars" to guard their private " Chaukis"[৫৬] এইসব গ্রামরক্ষীদের ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে 'থানাদারি পুলিশ প্রতিষ্ঠান' তৈরী করে, তার 'দারোগা' নিয়োগ করে, থানার অধীন করা হয় এবং এদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, "to apprehend and send to the daroga any person caught in the act of commiting murder, robbery, house-

breaking or theft or against whom hue and cry raised, and to report immediately to him the presence of any robbery in the neighbourhood or of any vagrants who could not give a satisfactory account of themselves."

তবে এই থানাদারি পুলিশি ব্যবস্থায় চৌকিদারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যাশিত কাজ পাওয়া যায়নি। ১৮০৫ খ্রিঃ ও ১৮০৭ খ্রিঃ জমিদারদের পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা দিয়েও অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়নি। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ সুপারের মতে, —

"......village watchmen were the perpetrators of aiders or every kind of crime and main reason assigned was that utterly insufficient provision was made for their support." এই উপলব্ধি থেকেই ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চৌকিদারি দায়িত্ব-কর্তব্যসহ বিবিধ বিষয়ে রেগুলেশন XIIএবং XX প্রবর্তন করা হয়।

যদিও চৌকিদারি তদন্ত প্রতিবেদন ১৯৩৮-৪০ (পৃঃ-৯)-এ বলা হয়ছিল, 'on the introduction of 'Chaukidari' system, the shattered remnants of the Zamindari system where the Zamindar's village servants were made subordinate to the regular police, were swept away. Instead there was an establishment of local police officers charged with the performance of police duties only and remunerated by the people at large under the order of magistrate. The nomination was in some instances vested in the landholder, but as a rule it was left in the hands of the villagers. The duties laid down in 1793, for village watchmen, were re-enacted by regulation of 1817, which remained in force till 1866'.

আইনসিদ্ধ হলেও চৌকিদারি প্রথা ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়, কারণ চৌকিদারদের মাস মাহিনা সুনিশ্চিত করতে না পারা (গ্রামবাসীদের কাছে আদায় বাধ্যাতামূলক করা যায়নি) এবং চাকরাণ জমি থেকে গ্রাসাচ্ছাদন করার কারণে জমিদারের বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত থাকা ও আদপে জমিদারের নিয়ন্ত্রণে থাকা। যার ফলে জমিদারের অন্যায় কাজেও চৌকিদার ছিল নীরব দর্শক। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত চৌকিদাররা অনেকসময় দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ত। এ সম্পর্কে স্যার ফ্রেডরিক হলিডে লিখেছিলেন,[৫৭] '....... they are inadequately and uncertainly paid. They are kept in a permanent state of starvation, and though in former days, magistrate battled for them with unwilling Zamindars and villagers..... in later time...... contrary to the doctrine of earlier times, have been prohibited from interfering in favour of village watchmen,.... it being ruled altogether an affair of the people themselves, who may pay watchmen or not just as they think fit. village watchmen are now declared to have no legal right to remuneration for service, and (help of the Magistrate being withdrawn) they have no power to enforce their rights even if they had any rights

to enforce. Hence they are all thieves or robbers, or leagued with thieves and robbers in somuch that when anyone is robbed in a village, it is most probable that the first person suspected will be the village watchman.'

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে এই চৌকিদারি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে নিয়মিত পুলিশ নিয়োগের প্রস্তাব উঠলে তা সম্পর্কে ভিন্ন মতও উঠে আসে। ১৮৬০ খ্রিঃ পুলিশ কমিশনের মত ছিল,'The village watchman is man of the village, not enough offcial to be alien from or obnoxious to the villagers, and enough of an official to be amenable to system and reliable for duty. He possesses a sort of knowledge and a sort of influence which no police agent could ever possess and the people never regard him with distrust and dislike but, on the contrary, consider him a useful personage and a necessary adjunct to the constitution of the village.' একইভাবে ১৮৬৫ খ্রিঃ চৌকিদারি তদন্তকারী আধিকারি ডি. জে. ম্যাকনীল বলেছিলেন, "for local knowledge, for which it is admitted that the present watchmen have abundance, in the basis upon which all police management must proceed and the regular constabulary are not qualified either by their number or constitution to acquire such knowledge".

১৯০২-০৩ খ্রিঃ পুলিশ কমিশনের মত ছিল, 'The village police ought not to be separated from the village organisation and placed under the regular police,.... to place the village police officer under the thumb of the station - house officer could be to subvert the system in its essential principles, to get out of touch with the people in their custom, usages and interests, and often to place the dregs of the people over the respectable classes.' কমিশন চৌকিদারদের থানায় ঘন ঘন প্যারেডে যোগদানে বাধ্য করার বিষয়টি নিন্দা করে এবং প্রস্তাব দেয় ইউনিয়ন বোর্ডের 'প্রেসিডেন্ট' পদ সৃষ্টি করে তাকে চৌকিদারি কর আদায়ের দায়িত্ব প্রদান ও চৌকিদারদের ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টের সামনে নিয়মিত প্যারেড করা অনেক বেশি কার্যকরী।[৫৭ক] উল্লেখ্য ১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন মোতাবেক গঠিত ইউনিয়ন কমিটিগুলিও সঠিকভাবে কাজ করছিল না। এই অবস্থায় ১৮১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত 'জেলা প্রশাসনিক কমিটি 'র সুপারিশ ছিল, '...introduction of a system of Union Panchayats to excercise not only municipal but also police, executive and ultimately judicials functions, and to be the foundation of whole system of local self- Government. These Union Panchayats were to be grouped in circles under the guidance and supervision of "Circle Officers". স্পষ্টতই ইংরাজ শাসকরা তৃণমূল পুলিশি ব্যবস্থাকে সতেজ করার স্বার্থে

গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করার কথা ভাবেন।

জেলা প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯, চালু হলেও আদপে দ্বৈত শাসনাধীনে চৌকিদারি ব্যবস্থায় জটিলতা তৈরী হয়। চৌকিদারি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে (পৃঃ - ১৪) এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ' ....the appointment, punishment and dismissal of Choukidars and Dafudars and the determination of their number, salaries and equipment, remain in the hands of the District Magistrate, but real powers and control have vested in the Union Boards. The Chaukidars are paid by the boards and at their office instead of at the thanas; they can be punished and rewarded by the boards subject to the magistrate's control; they can be required to parade at the board's office and one Chaukidar has to attend there daily, their beats and patrol duties are to be prescribed by the boards, and they are not to be taken from their Unions by Police Officers except after consultation with the president unless in very urgent cases when the President has to be informed."

এই জটিলতা কাটাতে এবং দফাদার - চৌকিদারদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন পেশ করার জন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগের ২৯৫০ পি-১ তাং২৮/৭/১৯৩৮ নং আদেশনামা অনুসারে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এই তদন্ত কমিটিতে ছিলেন, (১) ই.এন. ব্ল্যান্ডি, আই.সি. এস. সভাপতি (২) এইচ. এস. এম. ঈসাক, আই. সি. এস. সম্পাদক (৩) বি. এন. সেন, আই. সি. এস, জেলাশাসক, মেদিনীপুর (৪) জাকির হোসেন, আই. পি. এস., ত্রিপুরা, (৫) খান বাহাদুর রেজাউল হায়দার চৌধুরি এম. এল. সি. (৬) আব্দুল করিম, এম. এল.সি. (৭) আব্দুল হাসিম, এম. এল. এ, (৮) ওউলাদ হোসেন খান, এম. এল. এ (৯) আনারুল আজিম, এম. এল. এ, (১০) হাফিজউদ্দিন চৌধুরি, এম. এল. এ (১১) সামসুদ্দিন আহমদ খন্দকর, এম.এল.এ (১২) পুষ্পজিৎ বর্মা, এম.এল.এ (১৩) কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল, এম. এল.এ (১৪) মুক্তগাছার মহারাজ শশীকান্ত আচার্য চৌধুরি, এম. এল.এ (১৫) শশাঙ্কশেখর সান্যাল, এম.এল.এ (১৬) নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম.এল.এ (১৭) অদ্বৈতকুমার মাজি, এম.এল.এ (১৮) জে. ডব্লু. আর. স্টিভেন, এম. এল. এ (১৯) সঈদ আব্দুল মজিদ, এম.এল.এ (২০) আব্দুল খান, এম. এল. এ। উল্লেখ্য কমিটির সেক্রেটারি ঈসাক, প্লট টু প্লট এন্যুমারেশন ইন বেঙ্গল নামে একটি ক্ষেত্রসমীক্ষাজাত কৃষি প্রতিবেদন প্রকাশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যে সমীক্ষায় বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন জেলার কৃষি ফসলভিত্তিক জমি ও উৎপাদনের বিস্তৃত বিবরণ ছিল, ইউনিয়ন বোর্ডভিত্তিক।

এই তদন্ত কমিটি বাঁকুড়ায় আসে ২১ জানুয়ারি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায়।

বাঁকুড়ায় তদন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ওউলাদ হোসেন খান, সামসুদ্দিন হোসেন খন্দকার, মহারাজ শশীকান্ত, জাকির হোসেন। তাঁরা ৩ জন ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট, জেলাশাসক, এস.পি., খাতড়ার পুলিশ ইন্সপেক্টর, বাঁকুড়া সদরের সার্কেল অফিসারদের মতামত নেন।

জেলাশাসক এস. কে. হালদার চৌকিদারদের নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার ইউনিয়ন বোর্ডকে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। বরঞ্চ তিনি চৌকিদারদের পরিবর্তে ইউনিয়ন প্রতি ২-৩ জন অধস্তন পুলিশ কনস্টেবল রাখার প্রস্তাব দেন। চৌকিদারের সচিৎকার টহলদারির পরিবর্তে কনস্টেবল দ্বারা অপরাধীদের গতিবিধির উপর নজর রাখার পরামর্শ দেন, যদিও এই সময়-পরীক্ষিত ব্যবস্থার সার্বিক অবসান না ঘটিয়ে কয়েকটি স্থানে তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার কথা বলেন। চৌকিদারদের বেতন ৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা এবং দফাদারদের বেতন ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৫ টাকা করার প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে যেহেতু জেলার একজন চাষীর বার্ষিক আয় ৫০ টাকার মতো, তাই এই মাসিক আয় যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং ভদ্রলোকেরা চৌকিদারির পরিশ্রমক্ষম হলে এ পেশায় আসতে উৎসাহী হবে। তিনি বলেন জেলায় ৯০০ টি চাকরাণ জোত আছে যা থেকে বার্ষিক ৪৩০০ টাকা আয় হয়। এর থেকে জেলার ১৮০টি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাপ্য বার্ষিক ২৫ টাকা মতো। এই জমির অসম বণ্টনজনিত কারণে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির প্রাপ্তিও অসম। বাঁকুড়া জেলার বার্ষিক পুরস্কার তহবিল ছিল মাত্র ৫০০ টাকা এবং প্রায়শই ৩-৪ মাসের বকেয়া থাকত।[৫৮]

জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ এস.সি. ব্যানার্জী বাহাদুর চৌকিদারদের উপর আগেকার মতো পূর্ণ অধিকার ফিরে চান। তিনি চৌকিদারদের বেতন থানা থেকে বন্টনের প্রস্তাব দেন, যেহেতু ইউনিয়ন বোর্ড থেকে বেতন প্রদান ছিল অনিয়মিত। তাছাড়া ইউনিয়ন বোর্ড চেক মাধ্যমে খেপে খেপে এবং কখনও কখনও দ্রব্যের মাধ্যমে তা পরিশোধের কারণে চৌকিদাররা ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর মতে থানাভিত্তিক বিভিন্ন দপ্তরের (পুলিশ, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) বার্ষিক সমন্বয় বৈঠকের ফলে ইউনিয়ন বোর্ড ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পুলিশ প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছেন, তা তিনি অন্য কোনো জেলায় পাননি। কংগ্রেস দল এগিয়ে আসায় এই সহযোগিতা আরো বেড়েছে। জেলার সবচেয়ে সক্রিয় ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেস দলেরই। তাঁর মতে সর্বাধিক শিক্ষিত বোর্ড প্রেসিডেন্ট ছিল একজন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং খাতড়া থানা সহ জেলার কিছু অংশে প্রেসিডেন্টদের গুণাগুণ আশানুরূপ নয়। চৌকিদারদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট প্রেসিডেন্টদের মতামত নিয়ে করার দাবি সম্পর্কে তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়ার অনুলিপি তাদের দেওয়া হোক মতামত প্রকাশের জন্য।

সদর থানার সার্কেল অফিসার, জেলাশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে চৌকিদারদের নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার কিছু সক্রিয় ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। দ্রব্যের বিনিময়ে চৌকিদারদের মাহিনা প্রদানের পদ্ধতির বিরোধিতা করেন এবং তার এলাকায় ৫০শতাংশ ইউনিয়ন বোর্ডেই এই পদ্ধতি বাতিল হয়েছে বলেন। চৌকিদারদের বেতন ১০ টাকা ও দফাদারদের ১৫ টাকা মাসিক বেতন সহ পোষাক ও পদনামের পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। জেলাশাসক গ্র্যাচুয়িটি পদ্ধতি সমর্থন করলেও[৫৮ক] তিনি ছুটি ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে যেহেতু এক বর্গমাইলে মাত্র একটির মতো মহল্লা আছে, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চৌকিদারি ট্যাক্স নেওয়ার পরিবর্তে সরকারের উচিত চৌকিদারদের ব্যয়ভার বহন করা।

খাতড়ার ইন্সপেক্টর চৌকিদারদের নিয়োগ-বরখাস্ত সার্কেল অফিসার ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃক সুপারিশের এবং জেলাশাসক কর্তৃক অনুমোদনের পক্ষে মত দেন। চৌকিদারের পোষাক ও পদনাম পরিবর্তনের পক্ষে মত দিয়ে বলেন, চৌকিদার-দফাদারের বেতন যথাক্রমে ১২ টাকা ও ১৫ টাকা করলে অনেক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ছেলে ও ভদ্রলোক এই পেশায় আসবে।

তিনজন ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টের দুইজন চৌকিদার নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার চান। তিলুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মিঃ সেন চৌকিদার বেতনের এক চতুর্থাংশের পরিবর্তে পুরো বেতন পর্যন্ত ফাইন করার অধিকার চান। তিন প্রেসিডেন্টই বোর্ডের সাথে আলোচনা না করে পুলিশ কর্তৃক চৌকিদারদের শাস্তি প্রদান ও বরখাস্তের বিরোধিতা করেন। মিঃ সেন এই অধিকার পুলিশ সুপার থেকে জেলাশাসকের হাতে আসা উচিত বলে মত দেন। চৌকিদারের বেতন ৫ থেকে ৮-১০ টাকা এবং দফাদারদের ৮ টাকা থেকে ১০-১৫ টাকা করার প্রস্তাব দেন, যাতে শিক্ষিত ও ভালো সামাজিক অংশ থেকে চৌকিদার নিযুক্ত হতে পারে। এক প্রেসিডেন্ট এস. কে. বোস মতামত দেন যেহেতু উচ্চবর্ণের লোকেরা চৌকিদারের মতো পরিশ্রম করতে অসমর্থ, নিম্নবর্ণ থেকেই চৌকিদার নিয়োগ হওয়া উচিত। চৌকিদারদের পদনাম 'শান্তিরক্ষী' বা 'শান্তি সেনা' এবং দফাদারদের সর্দার বা অধ্যক্ষ রাখার মত দেন। প্রশিক্ষণ, নিয়মিত সরকারি বেতন (যেহেতু নিরাপত্তা রক্ষা সরকারি কাজ এবং পুরসভার ক্ষেত্রে সরকার বেতনের অর্থ বরাদ্দ করেন), পোষাক, টাকা প্রতি বেতনের ৬ পাই যুক্ত সরকারি ৬ পাই নিয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রস্তাব করেন। বোর্ডকে না জানিয়ে পুলিশ চৌকিদারদের সঙ্গে নিয়ে তদন্তে বা অন্য কাজে যাওয়ার বিষয়টিরও তাঁরা প্রতিবাদ জানান।[৫৯]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ ছাড়া আর কেউ পুলিশের হাতে চৌকিদারির

নিয়ন্ত্রণের দাবি সমর্থন করেনি। সবাই চৌকিদারদের বেতন বৃদ্ধি ও বেতনের নিশ্চয়তা ও শিক্ষিত মানুষদের চৌকিদার পদে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সহমত ছিল। তবে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ১৯৪০ সালে প্রস্তুত হয়ে প্রাদেশিক সরকারের কাছে জমা হয় ঔপনিবেশিক শাসনের বিদায় লগ্নে। এই প্রতিবেদনটি আরো কিছু বিষয়ের বিশ্লেষণে চৌকিদারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছে। বঙ্গের চৌকিদারদের শ্রেণিগত বিভাজন ছিল নিম্নরূপ—

নিজস্ব কৃষি জমি আছে	—	৩০.১২শতাংশ
অন্যের জমিতে কাজ করে	—	৪৭.৩২ শতাংশ
অকৃষিজীবী	—	২২.৫৬ শতাংশ

(বাঁকুড়া ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত শ্রেণি মাত্র ২-৫ শতাংশ)

অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত	—	৬৬.৫৬ শতাংশ
অন্যান্য	—	৩৩.৪৪ শতাংশ

(বাঁকুড়াক্ষেত্রে অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত চৌকিদার ১০০শতাংশ)

বাঁকুড়াক্ষেত্রে চৌকিদার হতেন মূলত ডোম, মাহাতো, বাউরী, বাগদি, হাড়ি, সাঁওতাল ও লোহার বর্ণের মানুষেরা। বয়স হিসাবে বিভাজন—

৪০ বছরের নিচে	—	৩৭.২৪ শতাংশ
৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে	—	৪৪.৭৬ শতাংশ
৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে	—	১৪.২৪ শতাংশ

৬০ ও যাটোর্ধ — ৩.৭৬ শতাংশ

অর্থাৎ সর্বাধিক মানুষ (চৌকিদার) ছিলেন ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সসীমার মধ্যে।

বাঁকুড়ার চৌকিদারদের প্রদত্ত তিরস্কার ও পুরস্কারের তথ্য থেকে গ্রামীণ পুলিশি সক্রিয়তা উপলব্ধি করা যাবে। ১৯৩৫-৩৬ খ্রিঃ ফাইন আদায় ছিল ৫৬১ টাকা ১৫ আনা, ১৯৩৬-৩৭ খ্রিঃ ৫৫৫ টাকা ৫ আনা, ১৯৩৭-৩৮ খ্রিঃ ৯২৯ টাকা, ১৯৩৮-৩৯ খ্রিঃ ৫৪২ টাকা ১ আনা।

১৯৩৮ সালে মোট ২২৪৬ জন চৌকিদার দফাদারের মধ্যে ফাইন হয়েছিল ৮৩৫ জনের এবং পুরস্কৃত হয়েছিল ২৭৬ জন, যাদের প্রাপ্ত টাকা ছিল ৬৯৪ অর্থাৎ গড়ে ২.৫ টাকা প্রতিজনে। অর্থাৎ যেখানে সে বছর ৩৭.১৮ শতাংশ চৌকিদারই শাস্তিপ্রাপ্ত ছিলেন পুরস্কৃত হয়েছিলেন মাত্র ১২.২৯ শতাংশ চৌকিদার।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে জেলাশাসক আলেকজাণ্ডার টড কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ১৪টি মহল্লার চৌকিদারি প্রতিষ্ঠানের একটি ছবি পাওয়া যায়। পর পৃষ্ঠায় তা প্রদত্ত হল—

নং	মহল্লার নাম	গৃহ সংখ্যা	চৌকিদার সংখ্যা	চৌকিদার চাপরাশ	চৌকিদারের নাম	বেতন (মাসিক)	সনদ প্রাপ্তি তাং	মন্তব্য
১।	রাজগঞ্জ	৯০	৪	১-৪	অনুপ সিং বিশ্বনাথ রায় গুলাব রায় মদন হাড়ি	৬	১৭/৮/১৮১৫	দুজন ঘাটোয়াল ২ জন গ্রামবাসী কর্তৃক বেতনভুক্ত
২।	বাজান হোসনাবাদ	৪৮	২	৫-৬	সেখ নেহাল মহঃ সাকের	৩	১৭/৮/১৮১৫	একজন ঘাটোয়াল একজন বেতনভুক্ত
৩।	কোতোয়ালী মহল্লা	৬১	২	৭-৮	মোহন রায় রূপ ডোম	৩	”	ঘাটোয়াল-১ গ্রাম বেতন-১
৪।	কাজী মহল্লা	৪২	২	৯-১০	গোলাম রায় মগেন রনী	৩	”	ঐ
৫।	রকেট মহল্লা	৭০	২	১১-১২	ভূকারী মাল মোহন সিং	৩	”	ঐ
৬।	ভকত মহল্লা	৫৯	২	১৩-১৪	লালগি সিং বৃন্দাবন জানা	৩	”	ঐ
৭।	লোহার মহল্লা	৪২	২	১৫-১৬	জালিম সিং বিজয় রায়	—	—	ঘাটোয়াল-১ গ্রামবাসী-১ দারিদ্রের কারণে বেতন দেয় না।

নং	মহল্লার নাম	গৃহ সংখ্যা	চৌকিদার সংখ্যা	চৌকিদার চাপরাশ	চৌকিদারের নাম	বেতন (মাসিক)	সনদ প্রাপ্তি তাং	মন্তব্য
৮	ঘটক মহল্লা	৪৪	২	১৭-১৮	রস খান রঘুনাথ সিং	—	—	ঘাটোয়াল ২ গ্রামবাসী - ১
৯	তাঁতি মহল্লা	৮২	২	১৯-২০	মান সিং চৈতন বাউরী			ঐ
১০	পোদ্দার মহল্লা	৪৩	২	২১-২২	রামযাদব শর্মা	—	—	ঐ
১১	হাতোলা মহল্লা	৫৭	২	২৩-২৪	পুর্ণচাঁদ সুঁড়ি	—	—	ঐ
১২	ইদগা মহল্লা	৬৩	২	২৫-২৬	পুতুল বাগদি সোম বাগদি	৩	১৭/৮/১৮১৫	ঘাটোয়াল-১ গ্রাম বেতন - ১
১৩	অধুর্য্য মহল্লা	৪৩	২	২৭-২৮	লুকেন সিং জোড়ি লাল	৩	১৮/৮/১৮১৫	ঐ
১৪	গোপীনাথপুর মহল্লা	৪৮	২	২৯-৩০	গোকুল বাগদি নয়ন শর্মা	৩	ঐ	ঐ

যদিও ঔপনিবেশিক শাসনে চৌকিদারি প্রতিষ্ঠান নবরূপে বিকশিত হয়েছিল। এর প্রাচীনত্ব নিহিত ছিল হিন্দরাজশাসনে। ডব্লু. ডব্লু হান্টারের মতে '...... as in Berbhoorn and Bishenpore where the rajahs had maintained a quasi independence and where Hindu customs had successfully withstood moslem centralization, these village officials enjoyed small grants of rent free land. They infact stepped into the places of the hereditary village watch of ancient Hindu times, and in a purely Hindu principality like Bishenpore sometimes lineally represented the original families. But not even in Bishenpore was their office acknowledged to be hereditary and on each succession a new appointment issued from the thanadar, as on each succession of a thanadar a new appointment issued from the rajah......

.......policeman attached to a village, and immediately sets him down as the old Hindu watchman, and as such hesitates to interfere with his office. But the records prove that the village watchman whom the Mussulmans bequeathed to us, had at best but a faint connection with the primitive ante-type, and in some districts no connection at all. He was not hereditary, he held his office from, and was amenable to, the landholder, not to the village community'

অতএব হিন্দুশাসনে গ্রামীণ রক্ষী ইংরাজ শাসনে পরিমার্জিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে যা তিন শতাব্দীর বৈদেশিক শাসনেও অপ্রতিহত ছিল। এমনকি স্বাধীনতোত্তর কালেও এই প্রতিষ্ঠান অক্ষত ছিল। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে এদের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় পঞ্চায়েত কর্মি যা আজও বর্তমান।

পত্তনিপ্রথা ও অন্যান্য গ্রামকর্মি :

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের জমিদারি বর্ধমানরাজের হস্তগত হলে তিনি পুরাতন সব প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করে নিজের মনোমতো কর আদায়কারী নিয়োগ করেন। এ বিষয়ে 'Bankura District Letter Issued 1802-1869' এ বলা হয়েছিল, '... deputed persons of his choice for the collection of revenue from the ryots. He also divided the estate into local divisions, or, as he termed them lots, and sold each lot at a public sale to the highest bidder. The patni talukdars, who purchased these lots, again sold their right to darpatnidars, and they in turn to dardarpatnidars in each case to an increased jama 'until it is no longer divisible or will admit of no possible further assessment'. প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের বাইরে এই পত্তনিদার নাম্নী ভূমিব্যবসায়ীদের কর আদায়ের হিড়িকে সাধারণ রায়তদের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

'বাঁকুড়া জেলা থেকে চিঠি ১৮০২-১৮৬৯' এ বিষয়ে বিশ্লেষণ ছিল, "The patni system largely relieved the maharaja of Burdwan of all the 'labour and risk' attendant upon 'detailed mofussil management'. It however, encouraged the participation of numerous speculators on revenue matters. These immediate purchasers were generally men of very 'indifferent character', possessing no permanent interest in the welfare of the ryot or the improvement of the country. They were equally an 'inexhaustible source of trouble in Foujdary and Diwani courts'; it was also found that' 'very few of these persons' resided in the 'talook or employed any local agent or even known in the talook, a fixed resident of Burdwan of perhaps of Hooghly, Naddea, or some other adjacent zillah.' They were universally regarded 'as the chief source of all the evils which have attended the introduction of these tenures into this district".এমনকি একটি জমির রায়ত ও জমিদারের মধ্যে ২০ জন এমন মধ্যস্বত্বভোগী দেখা গেছে।[৬৩] এই নয়া ব্যবস্থা গ্রামজীবনে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল তা District Handbook (Cencus 1951) Bankura তে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে, ".....create a class of persons living on small fixed incomes and without interest in the tenancy. This has caused a disapperance of the old feudal spirit and a disintegration of the relations between landlords and tenants, who no longer have that common solidarity of interest which used to exist. The surplus grain in former days was spent in works of public utility, and a large village would have good tanks and bathing ghats, where its temple were carefully kept up and religious festivals were lavishly observed. Now, in many cases, the old zamindar's family residence is in ruins, and he himself often spends what income he can realise in fighting law suits of the landlord is not in debt, he is usually an absentee; having but lately purchased the estate; but it is reported that the large non-resident landlords all treat their tenants with justice and consideration. It must be remembered, moreover, that this state of affairs only marks a transition stage, the old feudal inter-dependence between zamindars and their tenants not yet having been replaced by the new inter-dependence between labour and capital". অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারিদের মধ্যে জমিদার সহযোগী নায়েব সমস্ত জমিদারির বা অংশবিশেষের ব্যবস্থাপনায় থাকতেন। তাঁর অধীনে থাকত মুহুরি, পিয়ন ও গোমস্তা। গোমস্তা বা তহশিলদার এক বা একাধিক গ্রামের কর আদায় করত। তিনি নিজ-জোত জমি চাষ ও সাজা-জমা বা ভাগ-জমা সংগ্রহ করতেন। কোনো রায়ত

জমি ছেড়ে গেলে নতুন রায়তের ব্যবস্থা তিনিই করতেন। শস্যাধারের হিসাব ও শস্য আদায় ছিল তাঁর কাজ। গোমস্তাকে সাহায্য করত পাইক বা অষ্টপ্রহরী। মামলা মোকদ্দমায় জমিদারকে সাহায্য করত ফৌজদারি গোমস্তা নামক শ্রেণি।

পূর্বে গ্রাম সমাজে 'মণ্ডলের' যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল তেমনিই পুরোহিত, নাপিত, ধোপা ও গণককে গ্রামকর্মি হিসাবেই ধরা হত এবং নিষ্কর সেবা জমিও প্রদত্ত হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালী, ডোম ও কামাররাও একই সুবিধা প্রাপ্ত হতেন।

২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৪৬ খ্রিঃ জেলাশাসক জর্জ লচ বাখরগঞ্জের আরক্ষাধ্যক্ষকে যে পত্রাচার করেছিলেন তাতে গ্রামীণ নিরাপত্তা কর্মি হিসাবে ১) ঘাটোয়াল ২) চৌকিদার ৩) পিয়ন-পেয়াদা ৪) সীমান্দার ৫) অষ্টপ্রহরী ৬) ডাক রানারদের নাম উল্লেখ আছে। এরা সবাই ছিল বিদেশি শাসক শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত।

এরূপ বিবিধ গ্রামকর্মি ও গ্রাম প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রাক্-স্বাধীনতাকালের সর্বশেষ শক্তিশালী প্রথা হল পত্তনী প্রথা যা ঘাটোয়ালী ও চৌকিদারি প্রতিষ্ঠানের পর বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক জীবনের বড় অংশ দখল করেছিল। সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রাক স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত কালসীমায় বাঁকুড়া খণ্ডের ভূ-বিবর্তন থেকে সামাজিক ও গ্রামীণ প্রশাসনিক বিবর্তন সত্যিই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও ঘটনাবহুল। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে পরিবর্তনের সরণি চিত্র পূর্ণাঙ্গ অঙ্কিত না হলেও এর বিশিষ্টতার আভাস সুস্পষ্ট। এখানে প্রথম মানুষের পদার্পণ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম মানবসাক্ষ্যের সমকালীন। বাঁকুড়ার বিবিধ নদ-নদীর প্রান্তিক সাংস্কৃতিক অবক্ষেপ সেই প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য সম্পৃক্ত। মানবসভ্যতার বিকাশের সমস্ত পর্যায়ই এখানে উপস্থিত। যদিও সভ্যতার অগ্রগমন ছিল পাললিক বঙ্গের তুলনায় স্থবির, তবুও তার বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা এককথায় অনন্য। পুরাতন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ, নতুন প্রস্তর যুগ ও তাম্রাশ্মীয় যুগের সরণি বেয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল অসুর সংস্কৃতি ও কৌম জনজীবন। ঊষর প্রস্তর প্রান্তরেও ডিহর ও পোখন্নার মতো বহুমাত্রিক আধানাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল বাঁকুড়ার বুকে। বহু শতাব্দীব্যাপী অরণ্য অন্তরালের বিচ্ছিন্নতাও এমনতর উন্নত পরিমণ্ডল নির্মাণের অন্তরায় হয়নি।

নন্দ-মৌর্য -গুপ্ত যুগে রাষ্ট্রসীমার প্রান্তিক অবস্থানের এই ভূমিখণ্ডে রাজশাসনের কঠোর রৌদ্রতাপ পৌঁছাতে পারেনি, তবে সেই রাষ্ট্রপ্রভাবের চিহ্নও রয়ে গেছে অনেক স্থানে। খ্রিস্ট জন্মোত্তর পাঁচ শতাব্দীর মধ্যেই এই আদিম জনপদে রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ক্রমশ তৈরী হয়েছিল বিভিন্ন ভৌমরাষ্ট্র এবং সেই সাথেই আর্যায়ণের স্রোত গ্রস্ত করে তোলে এখানকার সমাজ জীবনকে। ক্রমশ ছিন্ন জাতিসত্তা বৃহত্তর সংস্কৃতির স্রোতের মধ্যে অনেকটাই বিসর্জিত হয়।

অসুর সংস্কৃতি যেমন বৃহত্তর উপজাতীয় প্রভাবে অস্তমিত হয়েছিল, তেমনই তথাকথিত 'বাঙালি আগ্রাসনে' উপজাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। বিবিধ সংস্কৃতির মহামিলনে তৈরী হয় বাঁকুড়া জনের সংস্কৃতি।

এই ভূমিখণ্ডের গ্রামগঠন ও গ্রামকর্মিদের বিবর্তন কয়েক শতাব্দীর কালসীমায় ব্যাপ্ত। আদিম মানুষদের সামাজিক জীবন উপজাতীয় সংস্কৃতি ও সংগঠনে বাঁধা পড়ে। এই উপজাতীয় ও অর্ধ উপজাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি অপ্রতিহত ছিল কয়েক শতাব্দী। বৌদ্ধ, জৈন প্রভাব ও আর্যায়ণের ধাক্কায় এই সমাজ-সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। শাসকের চাহিদার সাথে বিভিন্ন গ্রাম-প্রতিষ্ঠান ও গ্রামকর্মিদের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। আদিকালের 'মণ্ডলী প্রথা' ভৌমরাষ্ট্রের 'ঘাটোয়ালী প্রতিষ্ঠান' ঔপনিবেশিক আনুকূল্যে 'চৌকিদারি প্রতিষ্ঠান' এবং জমিদার লালিত 'পত্তনিদার প্রথা' বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় বড় জায়গা নিয়েছিল। গ্রামের প্রতিদিনের জীবন প্রবাহ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হত এই তৃণমূল গ্রামকর্মিদের দ্বারা।

বিবিধ অভিঘাত ও বিবর্তনের পথে এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাধীনোত্তর কালে কেবলমাত্র পরিমার্জিত চৌকিদারি ব্যবস্থাই টিকে ছিল। এই সুবিস্তৃত সমাজ বিবর্তনের দিনান্তের ছায়ার মতো।

সূত্র নির্দেশিকা :

১। বাঁকুড়ায় প্রাগৈতিহাসিক মানব সভ্যতার সন্ধান— অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (অনুষ্টুপ, শীত ২০১৪, পৃ. ২৮০-২৯০)।

১ক। Fundamental of Geolegy - Rogers and Adams, New York, 1966

২। বাঁকুড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রত্নবস্তুবিদ্যা ভিত্তিক গবেষণা - চন্দন মিশ্র (পঃরাঃগঃ সাঃ ২ সংখ্যা) - সম্পাদক - গৌতম দে।

৩। Current Science. vol - 71 no-9; Pothuri Divakar Naidu.

৪। Taffonomical Studies on Extinct Animals from Archeological Sites - Biswanath Samanta, 2005.

৫। শুকুল চন্দন— প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের আলোকে বাঁকুড়া-১ (আত্মপরিচয়ঃ বাঁকুড়া -১-দামোদরপুর মৌজায় ১ ফুট চওড়া ৮ হাতের জীবাশ্ম তৃণভোজী প্রাণীর মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত হাড় প্রাণী মেরুদণ্ডের কশেরুকা বলে অনুমিত), বাঁকুড়া, ২০০৭।

৫ক)। মুখোপাধ্যায় ব্রতীন্দ্রনাথ — ভারত ইতিহাস, বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত (কলিকাতা, ২০০০)।

৬। মানচিত্র, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ — ফিওদর করোভকিন, মস্কো, ১৯৮৩।

৭। The changing face of Bengal - a study in Riverine Economy, Radha Kamal Mukharjee, p-31.
৮। রায় নীহাররঞ্জন— বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব (কলিকাতা ১৯৪৯) পৃঃ ৪০-৪৯।
৯। মাহাত সুশীল — রাঢ় বাঁকুড়ার অসুর সংস্কৃতির গ্রামনাম (বাঁকুড়ার খেয়ালী, ২০০৮, জুন - সম্পাদক -গিরীশন্দ্রশেখর চক্রবর্তী।
১০। দুয়ারী সুধীরচন্দ্র — কুশদ্বীপ কাল্চার (পঃ রাঢ় গবেষণা সাময়িকী), বাঁকুড়া, ২০০৩ (১ম)।
১১। মাহাত সুশীল— পৃঃ -১।
১২। G. A Grierson - A linguistic Survey of India Vol - iv, Delhi, 1876, p-21.
১৩। ফিওদর করোভকিন — পৃঃ ২০।
১৪। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়কুমার— বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার্স, কলকাতা, ১৯৬৮।
১৫। এ. দত্ত— চ্যালকোলিথিক কালচার ইন বেঙ্গল, দিল্লী, ১৯৯০।
১৬। বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি-রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া, ২০০২, পৃঃ-১৩৩।
১৭। Prehistoric Culture in Bengal - Neolithic Culture Vol XI P-208
১৭ক। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন— পৃঃ -২০।
১৮। পশ্চিম রাঢ় গবেষণা সাময়িকী, চতুর্থ সংখ্যা, বাঁকুড়া, ২০০৩, পৃঃ-৪৭।
১৯। ত. দে. ব. - পৃঃ - ৪৬।
২০। The Tribal Communities of Bihar, Part-III-Anthropological Survey of india.
২১। Annals of Rural Bengal - W. W. Hunter, Calcutta, 1868, p-369.
২২। ibid -- p-367.
২৩। ibid - p- 109.
২৪। Bankura - Sonthal Village - MC Alpin, Calcutta, 1909, p-9.
২৫। ibid --p-9.
২৬। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, পৃ. ৪১।
২৬ক। Beglar, Report of Archaeological Survey of India, Vol-VII, Calcutta, 1878, P-72-73.
২৭। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁ. জ. ই. স. পৃ. - ৪১।
২৮। Typology of Legal Institution - K. S. Newman, Cambridge 1983, p-80.
২৯। সভ্যতার সন্ধানে ডিহর - রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও জপশ্রী করচৌধুরী (বিষ্ণুপুর তথ্যগ্রন্থ, ২০০৮)।
৩০। চ্যালকোলিথিক কালচার ইন বেঙ্গল - এ স্টাডি অন স্টেলমেন্ট এ্যাণ্ড ট্রানজিসন - এ দত্ত।
৩১। সিংহ মাণিকলাল— পশ্চিমরাঢ় ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ (অনুলিখন : নীহার হাজরা, বিষ্ণুপুর '৭৮)।
৩১ক। অহল্যাভূমি পুরুলিয়া - সম্পাদনা - দেবপ্রসাদ জানা, কলিকাতা, ২০০৩, পৃঃ-৬।

৩২। History of Agriculture in India Vol - I - M. S. Randhawa, Delhi, 1982, p-354
৩৩। চ্যালকোলিথিক কালচার ইন বেঙ্গল এ. দত্ত।
৩৪। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন পৃঃ -৫ এবং বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি - অঃ কুঃ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪ক। হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি।
৩৪খ। মহাস্থানগড় শিলালিপি।
৩৫। Exploring Bengal's Past - P.C. Dasgupta, Calcutta, 1966, p-2.
৩৬। ibid - p-2.
৩৭। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন - পৃঃ -২০।
৩৮। তদেব - পৃঃ -২০।
৩৯। An Approach to Indian Archeology - Sudhiranjan Das, Calcutta, 2003, p-40-109.
. ৩৯ক। গ্রিয়ার্সনের ভাষাতাত্ত্বিক বিভাজন, দিল্লী, ১৮৭৬।
৩৯খ। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতিকা এবং হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ।
৩৯গ। Final Report on Survey and Settlement operations in the district of Bankura - F. W. Robertson, Calcutta, 1926, p-58.
৪০। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়কুমার— বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ-৬৬ বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি - রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পৃঃ - ৫।
৪১। সিংহ মাণিকলাল— পশ্চিম রাঢ় ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ (অনুলিখন নীহার হাজরা পৃঃ ১-৩)।
৪২। A History of Agriculture in India - M.S. Randhawa, Delhi, 1982, p-355-56.
৪৩। গ্রামবাংলার জীবনযাত্রা ঃ সেকাল ও একাল - ঈশ্বর ত্রিপাঠী, বাঁকুড়া, ১৯৯৬, পৃ-৬।
৪৪। বঙ্গদর্পণ - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রবন্ধ), পবিত্র সরকার, সম্পা.-২০০১।
৪৫। A History of Agriculture in India, vol - I, M. S. Randhawa, Delhi, 1982, p-352
৪৬। রামচরিত - পৃ-৮৬ (রাধাগোবিন্দ বসাক অনুদিত, কলিকাতা, ১৯৭০)
৪৭। Epigraphic India Vol. XX page-59 - H. Sasthri.
৪৮। Some Aspects of Malla Rule in Bishnupur - Pravat Kr. Saha, Calcutta, 1970, p-47-48
৪৯। ibid - page -70.
৫০। Letter from C. R. Blunt to G. Thomas, Magistrate of Zilla Bankura. on 18\02\1802.
৫০ক। Annals of Rural Bengal - W. W. Hunter, Calcutta, 1868, p-224.
৫১। Robertson Report - page 50.
৫২। এস. পি. ডব্লু ড্যাম্পিয়ারকে লেখা জেলাশাসক লচের - ১৪/০২/১৮৪৬ তাং পত্রাঙ্ক
৫৩। Some Aspects of Malla Rule In Bishnupur- Pravat Kr. Saha, p-55

৫৪। Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Bankura 1917-24-F. W. Robertson, Calcutta, 1926, p-56.

৫৫। Report of the Chaukidari Enquiry Committee 1938-40, p-11.

৫৬। ibid - page - 8.

৫৭। ibid - pag-9.

৫৭ক। Rule 3E, Union Board Manual Vol-I Earlier Chaukidars had to attend weekly parade, later they had to attend fortnighly\ monthly parade at Union Board - Chaukidari Enquiry Report 1938-40, Calcutta, page-44.

৫৮। ibid - page-217.

৫৮ক। Under Rule 48, Union Board Manual Vol-II page 30-31 Men with reasonably good records who have rendered more than 20 years of service might be given the gratuity.

৫৯। Under rule 18, Union Board Manual Vol-II the Union Board allots the Chaukidar's beats and chaukidar is not supposed to leave his beat at night except wih the permission of the president or in urgent cases under the direct order of a Police Offecer, Ordinarily Police officers not take a chaukidar away from his Union without consulting the President if the police officer is to inform the President what he has done as soon as possible - Chaukidari Enquiry Report 1938-40, page-42.

৬০। মল্লভূমে রায়ত : ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ - রামপদ মণ্ডল, গৌরপদ সেন, (বিষ্ণুপুর ঃ তথ্যগ্রন্থ, ২০০৮) পৃঃ-৬৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন

বাঁকুড়া সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা স্বকীয়তাপূর্ণ ও বিচিত্র ধারার। আদি অস্ট্রাল মানুষ, সমাজ গঠনের যুগে অসুর জাতিতে পর্যবসিত হয়। অসুর ভাষা হয়ত মুন্ডাজাতির আদি ভাষা। ভূমিজরা মুন্ডাদের হিন্দুকৃত রূপ, সাঁওতাল আগমন ঘটে পরে। পালযুগে বিবিধ জনজাতির আগমনে উপজাতি প্রধান সমাজব্যবস্থা মিশ্র সমাজে পরিণত হয়। পাল যুগের বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব সেন আমলে ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে বৃহত্তর হিন্দু ভাবধারায় বিলীন হয়ে যায়। বাংলায় খিলজি আগমনের সাথে সাথে বাঁকুড়ায় মূলত সুফি ভাবধারার অনুষঙ্গে মুসলিম ধারার সূত্রপাত ঘটে। ভৌম শাসন কালে বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আগমন ঘটে। তবে বাঁকুড়ায় এই স্রোত ছিল ক্ষীণতর। পাশাপাশি মাড়োয়ারী সমাজ ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের আগমন ঘটে ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে। তুর্ক-আফগান পর্বে বাঁকুড়াভূমি ছিল ওড়িয়া প্রভাবিত। ফলে বাঁকুড়ায় বিশেষত দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ওড়িয়া সমাজ ও সংস্কৃতির ছাপ অতি স্পষ্ট। মোঘল সময়ে ভৌম শাসকরা ছিল প্রায় স্বাধীন। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হস্তক্ষেপ না থাকায় ভৌম সমাজ আপন স্বকীয় ভঙ্গিতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অভিঘাতে অবশ্য এই সুখী বাঁধন ছিন্ন হয়ে পড়ে। পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষের আঘাতে ও ক্রমবর্ধমান করভারে, নতুন ভূমি ব্যবস্থা ও ভূম্যাধিকারীদের আবহে পুরাতন সামাজিক স্থিতি ভেঙে পড়ে। আদিকাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক স্তরে রাঢ়ের এই অংশের উত্তীর্ণ হওয়ার ইতিহাস নিম্নে আলোচিত হল।

আদি অস্ট্রাল এবং অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি : মুন্ডা ও ভূমিজ

বাঁকুড়ার আদি বাসিন্দা হিসাবে মুন্ডাদের চিহ্নিত করা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সেনসাস প্রতিবেদনে দেখা যায় ইন্দপুর থেকে খাতড়া হয়ে রাইপুর পর্যন্ত ভূমিজদের আধিক্য ছিল। পরবর্তীকালে ছোটোনাগপুর মালভূমি থেকে আগত সাঁওতালদের আধিক্য দেখা যায় ছাতনা, শালতোড়া, গঙ্গাজলঘাটিতে। উল্লেখ্য তুঙ্গভূমের সামন্তসার রাজ্য আদিতে মুন্ডা পরিচালিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সাতপাটা, মণ্ডলকুলি, অম্বিকানগর মোলবোনা, ছাতনা, থুমকোড়ো, তিলুড়ি ইত্যাদি গ্রামের মেগালিথ মুন্ডা-সাঁওতালদের আদি সভ্যতার নিদর্শন। ফুলকুসুমা সংলগ্ন শিলদা যেহেতু সাঁওতালদের দ্বিতীয় আদিভূমি (ছোটোনাগপুরের পর) ছিল, তাই এই সামন্তসার বা রাজগ্রামের শাসন ক্ষমতা পরবর্তীকালে মুন্ডাদের হাত থেকে সংহত সাঁওতদের হাতে চলে যায় বলে অনুমিত। দ্বাদশ শতকে উৎকল ব্রাহ্মণদের আগমনে মুন্ডাজাতি হিন্দুকৃত হয়ে ভূমিজ নামে পরিচিত হয় এবং পুনরায় সাঁওতাল- ভূমিজ বিরোধের সূত্রপাত হয়। এসময় রাইপুরের শাসন ক্ষমতা ছিল সম্ভবত কোনো ভূমিজ রাজার হাতে। স্বভাবতই স্থানীয় এক ভূমিজ সর্দার (নকুড় তুঙ্গ) ওড়িয়া শ্রীপতি মহাপাত্র ও ভূমিজ রাইপুর রাজের সহায়তায় তুঙ্গভূমের শাসন ক্ষমতা পান (১৩৫৮ সালে)। ১৮৭২ সালের জনগণনা থেকে সাঁওতাল, মুন্ডা জনবিন্যাসের অতীত রূপরেখা অনুমান করা যায়।[১]

থানা	মোট জনসংখ্যা	ভূমিজ	সাঁওতাল
শালতোড়া সহ গঙ্গাজলঘাটি	১২২৩৯৯	—	২৫৯৩১
ছাতনা সহ বাঁকুড়া	১৪৮৬৭০	১৭১৪	২৪৬০৬
ইন্দপুর সহ খাতড়া	১১৫৩১৩	১১৪৪০	১২১৪৭
রাইপুর	১০১৩৪৫	৫৪৮০	৭১৭২
সিমলাপাল	৩৮১০৯	৫৫০	৩০৭৮
তালডাংরা সহ ওন্দা	১২২৯১৭	১৪৭	৯৫৮০

অসুর সংস্কৃতি থেকে বৈষ্ণব ধারা : বিবর্তনের রেখাচিত্র

আদিম জনস্রোতের প্রামাণ্য স্তর পেরিয়ে জনগোষ্ঠী প্রথম যে ভাষা পেল তা 'অসুর' বুলি হিসাবেই স্বীকৃত। বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামনামের মধ্যেও অস্ট্রিক উৎসের ছোঁয়া ছিল। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে, 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক গ্রন্থে পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের লোকেরা 'অসুর' ভাষাভাষী রূপে কথিত। এখনো মুন্ডাগোষ্ঠীর প্রধান বুলি 'অসুর বুলি'। তাই অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, বাঁকুড়া জেলার

প্রাচীনতম বুলি ছিল অসুর বুলি। অর্থাৎ এ দেশ আদিতে ছিল অসুর ভাষাভাষী অধ্যুষিত। লোকায়ত নিম্নবর্গীয় স্তরে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের মধ্যে, এখনো প্রচলিত এক কুড়ি, দু কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়ি এবং চার কুড়িতে এক পণ ও চারটিতে এক গণ্ডা, এ অস্ট্রিক গণনা-পদ্ধতিতে বোধ হয় এ সত্য আভাসিত।' সুতরাং আদিম জনগোষ্ঠী অসুর জাতিতে উত্তরণ এবং অসুর ভাষীদের মুণ্ডা অভিধা ও হিন্দুকৃত হয়ে ভূমিজ অভিধায় ভূষিত হয়ে যাওয়া একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের রূপটান। এ বিষয়ে অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়ের অভিমত[২], 'There was once a big Munda tribe which inhabited a wide spread are Bhumij - originaly a Mundari speaking people' ট্রাইবাল কম্যুনিটি ইন বিহার (পার্ট-৩) গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে[৩], 'The modern Asur tribe consists of three subtribal divisions, namely Bir, (Kol) Birjia Agaria' অসুরবুলি সম্পর্কে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'There are sufficient ethnic evidence to show that region in which the town Bankura stands now was once inhabited by tribal speaking one or the other of the Munda or Kol language' পরবর্তীকালে সাঁওতাল উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ছোটনাগপুর থেকে এখানে হাজির হলে অনেক স্থানেই ভূমিজরা সংখ্যাধিক্য হারায়। এমনকি এর ফলে তুঙ্গভূমে ভূমিজ-সাঁওতাল বিরোধ ও পালা বদলের তত্ত্বেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে আদি-অস্ট্রাল থেকে ভূমিজ উপজাতিতে উত্তরণের পথে আদিবাসী সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় বিবিধ আত্তীকরণ ও পরিমার্জনের মাধ্যমে। পাল আমল থেকেই বাঁকুড়া সমাজজীবনে উচ্চবর্ণীয় অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাদের প্রভাবে যেমন আদিবাসী সমাজ পরিবর্তিত হল, তেমনি পূজা পদ্ধতিতে বর্ণেতর ভাবনার সংক্রমণ ঘটেছিল। এমন একটি উদাহরণ হল পূজা পার্বণে মদ, মাংসের ব্যবহার। রথীন্দ্রমোহন চৌধরীর মতে,[৪] 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি মূলতঃ উপজাতীয় উৎস থেকে উদ্ভুত। উপজাতীয় জীবনে উত্তেজক পানীয় গ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ও পালা পার্বণে আদিবাসীদের মধ্যে নরনারী নির্বিশেষে মদিরা পানের প্রথা ছিল। এ জেলার উপজাতীয় ও অর্ধ-উপজাতীয়দের মধ্যে মদ্যপানের সাধারণ অভ্যাস সম্পর্কে ভবিষ্যপুরাণ থেকে জানা যায়।' তাই রাইপুরের রাজদেবী কোকামুখার পূজাতে ভোগ যেমন মদ-মাংস। বাসুলী দেবীরও তাই। উল্লেখ্য ছাতনায় ব্রাহ্মণ রাজা ভবানী ঝাড়াৎ-এর রাজত্ব উচ্ছেদ করে সাঁওতাল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পেছনে বড় কারণ ছিল রাজা ভবানী কর্তৃক এই দেবীর স্বীকৃতি না পাওয়া। সাঁওতাল প্রজাগণও এই বিদ্রোহের শরিক হয় একই কারণে। বাসুলী পূজারী অন্যান্য গ্রামগুলি হল আটবাইচণ্ডী, রিপুর, কুমিদ্যা, গুমুট-মুনিনগর, নবাসন, বিক্রমপুর, সলদা প্রভৃতি। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ুচণ্ডীদাসের উপাস্য দেবতা ছিল এই বাসুলী। ১৩০০-১৫০০ সালে

শূন্যপুরাণের স্রষ্টা রামাই পন্ডিতের উপাস্য ধর্মপূজা আদতে অস্ট্রিক ও কৌমসংস্কৃতি সঞ্জাত।[৫] অনেকে এর মাধ্যমে বৌদ্ধ মহাযানী যোগসাধনার অন্তিম রূপান্তর ও আত্তীকরণ দেখতে পান। এ জেলায় ময়নাপুর-সলদা কেন্দ্রিক ধর্মপূজার সাক্ষ্য পাওয়া যায় ময়নাপুর, সলদা, রাজাশোল, শ্রীধরপুর, কুলনগর, কুচিয়াকোল, কুড়র‍্যাগ্রাম, বাঁশীচন্ডীপুর, বৈতল, কোতলপুর, জয়পুর, কুশমেটিয়া, বিষ্ণুপুর, ইন্দাস, মঙ্গলপুর, গাবপুর বালসী, পংখাই, সিয়াম, পার্শা, গোপালপুর, হদলনারায়ণপুর, মেজিয়া, জোতবিহার, বেতাসন, ডিহর, মটগোদা প্রভৃতি স্থানে। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধবিশ্বাসের সাথে ধর্মপূজার সম্পর্ক বিতর্ক-বিঘ্নিত হলেও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ধর্মঠাকুরকে বিষ্ণু অবতারে রূপান্তরিত করেন। মনসামঙ্গল কাব্যের মনসা মূলত রাঢ়েরই দেবতা। কাব্যের মুখ্য চরিত্র চাঁদের নাম পাত্রসায়ের থানার বেলুট গ্রামের চন্দ্রদ্বীপ নামক ঢিবির সাথে জড়িয়ে গেছে। মনসার স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম, নামগুলি হল ছান্দার, অযোধ্যা, হন্যাবাদ, অর্জুনপুর, রাউতখণ্ড, ফুটকরা, সলদা, কুম্ভস্তল প্রভৃতি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে মনসা সরস্বতীর অবতার, বৌদ্ধসূত্র মতে এ হল জঙ্গলবাসিনী শবরকন্যা বৌদ্ধ জাঙ্গুলি। অর্থাৎ এখানেও সব ধর্মের দেব-দেবী লোকায়ত স্তরে এক অভিন্নরূপ পাচ্ছে। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখেছিলেন,[৬] 'প্রাচীনকালে সর্পসঙ্কুল গহন অরণ্যাবৃত বাঁকুড়া অঞ্চলে পরববর্তীকালে পৌরাণিক মনসাপূজার ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। পরে বৌদ্ধরাও পর্বত ও অরণ্যবাসী বিশাল কৌম সমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করার জন্য ভূত-প্রেত-যক্ষ-ডাকিনী-যোগিনী-পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবীকে মহাযানতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্বভাবতঃ জাঙ্গুলীর আকারে মনসাপূজার ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হয়েছিল।' একই ভাবে চন্ডীমঙ্গলের চন্ডী অস্ট্রিক অনুষঙ্গে অনার্য দেবী যা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে পার্বতী, মহামায়া জৈনদের কাছে অম্বিকা। এখানেও লোকায়ত স্তরে বিভিন্ন ধর্মের দেবতা একাসনে অঙ্গীভূত হয়েছে। শ্রী চৌধুরীর মতে,[৭] 'কোন কোন পণ্ডিত চণ্ডীর বৌদ্ধ উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। আবার অনেকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতি সম্ভূত বলে মনে করে,— চন্ডীর উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিমত মনে রেখেও বলা যায়, চণ্ডীর চরিত্র ও আচরণের রুক্ষতা, নির্মমতা, স্বার্থপরতা, দম্ভ আর্যেতর প্রাণশক্তির অমার্জিত প্রভাবের পরিচায়ক। তাই মঙ্গলকাব্যে চণ্ডী ডোমিনীবেশিনী।' এই দেবীর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় মল্লরাজের মৃন্ময়ী আদপে চণ্ডী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় মধ্যে।[৮] সমন্তরাজারাও যুদ্ধ যাত্রার আগে চণ্ডীর আরাধনা করত। মেজিয়ার কবি জগদ্রাম রামায়ণের অনুবাদে রামকে দিয়ে চণ্ডীর পূজা করিয়েছেন। শীতলা দেবীর উৎসও একই ভাবে প্রান্তিক ধর্মীয় অভিন্নতার মধ্যে নিহিত। মাণিকলাল সিংহের মতে ওড়িয়ারাজ চোড়গঙ্গের উপাস্য অম্বিকার মতোই রাঢ় বঙ্গের শীতলা জৈন শাসন যক্ষিনী বৌদ্ধ-জৈন তান্ত্রিক পর্যায়ে উদ্ভুত।[৯]

শিব রাঢ়ের জনপ্রিয় দেবতা। অনেকে শিবলিঙ্গ পূজাকে আদিম জাতির মেনহির বা মোনোলিথের রূপান্তরিত রূপ মনে করেন। বাঁকুড়ায় ১৯৫১ সালের হিসাবে ২০১টি গ্রামীণ মেলার ১১৬টিই ছিল গাজন বা শিবের মেলা! জেলার বিখ্যাত শৈবতীর্থগুলি হল এক্তেশ্বর, বহুলাড়া, পাঁচাল, জগন্নাথপুর, ডিহর, দেউলেশ্বর, বামিরা, পাত্রসায়ের, পীড়রাবনী, বিহারীনাথ, শিহড়, মৌলবনা, মনতুমড়া। শিব জায়া পার্বতীর উপাসনা হত মল্লভূম ও খাতড়া রাজবাড়িতে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় সিঞ্চিত মল্লভূমে দোলযাত্রা ও রাসলীলার প্রবর্তন ঘটে। বৈষ্ণব ধর্মের স্মৃতি বিজরিত স্থানগুলি হল অবন্তিকা, কাদাসোল, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া শহর, জয়পুর-রাজগ্রাম, হৃদলনারায়ণপুর, রামপুর, হাড়মাসড়া, ইন্দাস, জয়পুর-সুপুর, দলদলি, খামারবেড়িয়া, ছাগুলিয়া, গৌরাসোল, জগদল্লা, মানকানালী, ইন্দপুর-কুমিদ্যা, ব্রজরাজপুর, নড়রা প্রভৃতি।

নিম্নবর্গীয় ও উপজাতিদের মধ্যেও এই রাজবন্দিত বৈষ্ণব ধারার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ই.টি. ডাল্টন বলেছিলেন[১০], "It is singular this national amusement of the santals we have handed down to us a most vivid living representation of one prominent scene in the sports of Krishna in Vraja and Vrindabana. There is nothing in Modern Hindu life that all ilustrate the animated scenes so geographically delineated in the Purans but the description of Rasa dance in Chapter XIII Book V of Bishaupuran, might be taken literally as an account of the Santal "Jumhir" অর্থাৎ সাঁওতাল নৃত্য জুমহিরের মধ্যে তিনি স্পষ্টতই রাসনৃত্যের ছায়াপাত দেখেছিলেন।

কালুবীর কাহিনি : প্রাক-মৌর্য লোকগাথা ও লোকরীতির জন্ম

কথিত আছে ৪২৪ খ্রিস্টপূর্বের পরে মহাপদ্ম নন্দের ওড়িষা অভিযান হয়েছিল সম্ভবত রাঢ়ের উপর দিয়ে। এসময় এই যুদ্ধ উদ্যোগের বিরোধিতা করেছিলেন দক্ষিণ বাঁকুড়ার গোষ্ঠীপতি কালুবীর। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে এই কালুবীর ছিলেন আকুড়ে ডোমদের দলপতি এবং এই সংঘর্ষে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।[১১] এর কোনো ঐতিহাসিক দলিল নেই। যা আছে তা হল কালুবীরের স্মৃতিবিজড়িত লোকগাথা, লোকগান ও লোক উৎসব। বাঁকুড়াখণ্ড এসময় ওড়িয়া প্রভাবিত ছিল কিনা তা গবেষণার বিষয়। মহাভারতেও রাঢ়ের অনুষঙ্গ এসেছে বারে বারে। ভীম সহ পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস ছিল রাঢ়ে এবং হিড়িম্বা ছিল সম্ভবত রাঢ়ের চরিত্র।

যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক কালে ভরণী নক্ষত্রের আদিতে মহাবিষুব হত। তদনুসারে ১৩ বৈশাখ বর্ষারম্ভের প্রথম

দিনরূপে নিরীক্ষণ গণনা শুরু হয়। মাণিকলাল সিংহের মতে বাঁকুড়ার আঁকুড়ে ডোমগণ এদিন তাদের স্বজাতি কালুবীরের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকেন। কালুবীরের মহাপদ্ম নন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হওয়ার ঘটনাকে পুণ্য স্মৃতি হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার উত্তরপুরুষ আঁকুড়ে ডোমেরা স্মরণ করে থাকে।[১২]

মৌর্য অশোকের সশস্ত্র যাত্রা ও ই-সিং-এর উপর আক্রমণ : ঘাটোয়াল পথদস্যুতা, রণপা, ফাঁসুড়ে ডাকাত

অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে বৌদ্ধ মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে দূত পাঠান। শ্রীলঙ্কায় নিজ পুত্র মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে পাঠান এই উদ্দেশ্যে। তিনি নিজে রাঢ়ের উপর দিয়ে পুত্র-কন্যাকে তাম্রলিপ্ত বন্দরে পৌঁছে দেন। তাঁর এই যাত্রা পথ ছিল সসৈন্য। অবশ্যই তৎকালীন জঙ্গলাকীর্ণ পথ, বিচ্ছিন্ন উপজাতি ও বন্যপশুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে অন্যবিধ উপায়ও ছিল না।

শশাঙ্কের রাজ্য শাসনের তিন দশক পরে চিন দেশীয় পর্যটক ইসিং ইন্দোনেশিয়া হয়ে বার্মা বাংলাদেশের পথে রাঢ় অঞ্চলের উপর দিয়ে নালন্দা যাত্রা করেন। এই যাত্রাপথে তাঁর বর্ণনা মতো, দূরত্ব হিসাবে খুব সম্ভব রাঢ় দেশে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এই পূর্ণ শ্বেত বর্ণের মানুষটিকে এরা দেব-বলিতে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। নিজের ত্বকের বর্ণকে এই দুর্দশার জন্য দায়ী বুঝতে পেরে তিনি কোনোরকমে সেখান থেকে পালিয়ে কাছে পাঁকের মধ্যে ডুব দেন ও এই পরিবর্তিত রূপ নিয়েই রাঢ় দেশ পেরিয়ে যান। উল্লেখ্য রাঢ়দেশের ডোমেরা সূর্য উপাসনার জন্য সাদা রঙের পশু-পাখি বলি দিত। কারণ নীহাররঞ্জনের মতে ডোমেরা সৌর উপাসক ছিল এবং তাকে সাদা জ্ঞান করে সাদা বর্ণের পশু বলি দেওয়া হত।[১৩] ই-সিং-এর বিড়ম্বনার সাথে এর সম্পর্ক অমূলক নয়।

এই ঘটনা তৎকালীন রাঢ়ের সমাজ জীবনের একটি খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত করে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পাল শাসনের সূচনা ইস্তক বাংলায় যে অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল, রাঢ়দেশ যে তার ব্যত্যয় ছিল না, এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

সেন শাসনের অবসানে এবং সুলতানী শাসন সময়ে যখন ভৌমশাসনের সূচনা হয় তখন মূলত মল্লভূমে ও অন্য ভূম রাজ্যে পথদস্যুতা ঠেকাতে পথনিরাপত্তামূলক ঘাটের পত্তন করা হয়। রণপা ডাকাত, ফাঁসুরে ডাকাতে তখন দেশ উপদ্রুত ছিল। এমনকি ঘাটোয়ালদের কেউ কেউ এই দস্যুতায় জড়িয়ে পড়েছিল। শৈলজানন্দের গল্প-উপন্যাসে এই ফাঁসুড়ে ডাকাতদের কাহিনি ও ডাকাতির ধরণ বিবৃত আছে।

(দ্রষ্টব্য : পুলিশ ও লোকরক্ষা, রামক্ষয় গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৮১ এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২০১৪, পৃ. ১১-১২)

গুপ্তযুগ ও সৌর-শৈব প্রভাব : শূর আধিপত্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদ

বাঁকুড়ায় সূর্যদেবের আরাধনার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত প্রমাণিত হয় শুশুনিয়া শিলালিপি থেকে। এ শিলালিপি গুপ্তসমকালীন। সুতরাং গুপ্তযুগে রাঢ়ের এই অংশে আর্যায়ণের অন্যতর মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় সৌর উপাসনা। চতুর্থ শতকে বাঁকুড়ায় চক্রস্বামী বিষ্ণুর আরাধনা প্রচলিত হয়েছিল গুপ্তসমকালীন ধারার প্রভাবে। (সূত্র : শুশুনিয়া শিলালিপি)

অষ্টম-নবম শতকে শূর শাসনে বিষ্ণু-বাসুদেব মন্দির ও একাদশ-দ্বাদশ শতকে সেন আনুকূল্যে বৈষ্ণব ও শৈব ধারার বিস্তার ঘটে। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ছান্দার পরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত সাহারজোড়া অঞ্চলে (বড়জোড়া) শূর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এবিষয়ে ডঃ গৌরপদ সেনের বিশ্লেষণ বহুলাংশে বিশ্বাসযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'আদিশূর আনুমানিক ৬৫৪ অব্দে রাঢ়ের অংশ বিশেষে শাসন ক্ষমতা অর্জন করেন। পরে পাল রাজাদের সামন্ত হিসাবে এই বংশের শাসকগণ দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করেন। শূর রাজাদের অধিকার ক্রমশ পূর্বদিকে সরে আসে ও এই বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যে শূরনগর, প্রদ্যুম্নপুর ও গড় মন্দারণ এই তিনটি নগরীর পত্তন হয়। শূরনগর বর্ধমান জেলায়, প্রদ্যুম্নপুর বাঁকুড়া জেলায় জয়পুর থানায় এবং গড়মন্দারণ হুগলী জেলায় অবস্থিত একথা পূর্বউল্লিখিত। অষ্টম শতকের শেষপাদ থেকে নবম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শূররাজাগণ যে উত্তর বাঁকুড়ার সাহারজোড়া তথা ছান্দার পরিমন্ডলের সামন্ত ছিলেন এরূপ একটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। এরূপ অভিমতও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির প্রতিষ্ঠা ও বিষ্ণু- বাসুদেব মূর্তির পূজা-অর্চনা বৃদ্ধি পায়।.... পাল শাসন পর্বে বৌদ্ধধর্মে যেরূপ তন্ত্রের প্রভাব পরিবর্তন সূচিত করে, সেন পর্বে সেরূপ বৈষ্ণব ও শৈবতন্ত্রের বিস্তার ঘটে। সেন আমলেই জয়দেব বিখ্যাত সৃষ্টির কারণে আজও বন্দিত। রাঢ় অঞ্চলে প্রাকৃত জনগণের জন্য যে কৃষ্ণলীলা কেন্দ্রিক সহজিয়া ধর্ম প্রচলিত ছিল তার সাহিত্যিক নিদর্শন হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।'[১৪]

কালাপাহাড়ের আক্রমণ ও সামাজিক প্রভাব

একাদশ শতকের প্রারম্ভে স্থানীয় শূররাজ ও বীরগুণের রাজ্যপাট প্রসারিত সেন সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্তর্হিত হবার পর বাঁকুড়াভূমির রাজনৈতিক সমাচার তমসাচ্ছন্ন হয়ে পরে। বস্তুত ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রিক মল্লভূমে বীর হাম্বিরের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপ্ত বাঁকুড়াভূমির রাষ্ট্রসমাচার মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে আছে। বস্তুত এই অন্ধকার সময়েই বাঁকুড়ায় সামাজিক রূপবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটছিল। উপজাতি আধ্যুষিত এই রাঢ়খণ্ডে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের পাশাপাশি মিশ্রজনজীবনের আঙ্গিকে অর্ধউপজাতীয়দের আধিক্য ঘটে। তাই শাসন ক্ষমতা

উপজাতীয় কৌম সর্দারদের হাতে থেকে গেলেও ক্রমবর্ধমান উচ্চবর্ণের প্রভাব রুখতে তাদেরও আর্যীকরণ ঘটে। সাধারণ জনজীবনে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। দীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের অবসান ঘটে কালাপাহাড়ের নিষ্ঠুরতম ও বীভৎস অভিযানের অভিঘাতে।

পাঠান শাসনের শেষ ও মোঘল সূচনা পর্বে মোঘল-পাঠান টানাপোড়েনে আর একবার আলোড়িত হয় বাঁকুড়াভূমি। এই কালসীমায় প্রথম আঘাত ছিল পাঠানরাজ সুলেমান করনানীর সেনাপতি কালাপাহাড়ের আক্রমণ। কালাপাহাড় ধর্মান্তরিত হওয়ার পর হিন্দু জীবনের সব স্মৃতি বিনষ্টের শপথ নেন। তার অঙ্গ হিসাবে সোনামুখী আক্রমণ ও স্বর্ণমুখী মন্দিরের দেবমূর্তির অনিষ্ট ঘটে। এই ঘটনা প্রাসঙ্গিকভাবেই স্থানীয় জনজীবনকে আতঙ্কিত ও আলোড়িত করে। তাছাড়া তাঁর এ অভিযান ছিল ওড়িয়াপতি মুকুন্দদেবের বিরুদ্ধে। এসময় দক্ষিণ বাঁকুড়া ছিল মুকুন্দদেবের অধীন। ওড়িয়া রাজত্ব দখল, পুরীর দেবালয় ও দেবতা বিনষ্টের বৃহত্তর অভিযানের অঙ্গ হিসাবে বাঁকুড়াখণ্ড কালাপাহাড়ের পদলুণ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া সন্নিকটে মোলবোনা গ্রামে বিচূর্ণ খাঁন্দারাণীর প্রস্তর মূর্তি ও মাথায় ক্ষতচিহ্ন বিশিষ্ট নীলাম্বরের মূর্তি কালাপাহাড়ের আঘাতে হয়েছিল বলে অভিমত।[১৫] জয়পুরের সালদা গ্রামের ডোমদিঘির দক্ষিণে (৩০০মি: x ১০০মি:) বিস্তীর্ণ প্রত্নস্থল ছিল আদতে ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গের দেউল। এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিষ্ণু শঙ্খপুরুষ মূর্তি, ৩৬ ফুটের অষ্টভূজ ভৈরব মূর্তি, উৎকীর্ণ শিলাচালচিত্র, বারহী ও চণ্ডিকা মূর্তি। এই মন্দিরটি কালাপাহাড় কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে কথিত।[১৬]

উল্লেখ্য এসময় মল্লশাসক ছিলেন বীর হাম্বির পূর্ববর্তী কোনো মল্লরাজ। বাঁকুড়া বা মল্লভূমে এসময় খুব বেশি মন্দির দেবালয় গড়ে ওঠেনি। দক্ষিণ বাঁকুড়ায়, দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী কিছু জৈন দেব ও দেবালয় যা হিন্দুকৃত হয়ে পরেছিল, সেগুলি কালাপাহাড় কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়া অসম্ভব কিছু না। এসময় করনানীর রাজধানী ছিল তৎকালীন উত্তরবঙ্গের তান্ডায়। কথিত আছে কালাপাহাড় কাশীবিশ্বনাথ মন্দির, আসামের কামাখ্যা মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বংসে ব্রতী হয়ে এই তিন স্থান আক্রমণ করেন এবং যাত্রাপথের সমস্ত মন্দির ও দেবমূর্তি লাঞ্ছিত করেন। সেনাপতির ওড়িযা বিজয়ের যাত্রাপথ ছিল সম্ভবত বাদশাহী সড়ক ধরে বর্ধমান-সোনামুখী-মল্লভূম- মেদিনীপুর-দাঁতন হয়ে উৎকল এবং ১৫৬৬-১৫৭২ কালসীমায়। এর উল্লেখ পাওয়া যায় যদুনাথের ঐতিহাসিক আখ্যানে। ৯৫৭ বঙ্গাব্দের ১৭ ফাল্গুন বারেন্দ্রভূমির জনৈক জাইগীরদার এবাদৎ খানের সন্ধি প্রস্তাবের উত্তরে সেনাপতি কালাপাহাড় যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে উল্লেখ ছিল, 'বিষ্ণুপুর ও পাটনার জাইগীরদার সোলেমানের বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত সোলেমানের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে তাঁহারা বন্দী হইয়াছিলেন। মহাত্মা সদাশয় সোলেমান কেবল যে জাইগীরদারদিগকে মুক্তি দিয়াছেন এমত নহে, তাঁহারা

সোলেমানের বাধ্য অনুগত থাকার অঙ্গীকার করায় তিনি তাঁহাদিগের জাইগীর প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।'[১৭]

বিষ্ণুপুর রাজের বিরুদ্ধে সোলেমনের প্রথম যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে যদুনাথ লিখেছিলেন, 'সম্প্রতি নবাব সরকার হতে এক দল সেনা বিষ্ণুপুর যাচ্ছে। বিষ্ণুপুরের ও পাটনার জাইগীরদার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলে দেশ শান্তিময় হয়।'[১৮]

হিন্দুবীর কালাপাহাড়ের সোলেমানের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির পর তাঁর প্রথম অভিযান ছিল মল্লভূমের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে যদুনাথ লিখেছিলেন, "অনন্তর বিষ্ণুপুর ও পাটনার পরাজিত জাইগীরদারদ্বয়কে দরবারে আনয়ন করা হইল। পরাজিত বিদ্রোহী জাইগীরদার ও ভূস্বামীর প্রতি পাঠান বঙ্গেশ্বরগণ কঠোর দন্ডেরই বিধান করতেন। অদ্য সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল ..... জাইগীরদ্বয়ের অপরাধ ক্ষমা করা হইল। উভয়েই বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় স্ব স্ব জাইগীর লাভ করলেন।' মল্লরাজরা বারবারই বিদ্রোহী হয়েছেন এবং শত্রুপক্ষের সাথে পরাজিত হলে সন্ধি করেছেন। সুতরাং এই ঘটনা সেই ঐতিহাসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সম্ভবত তখন মল্লভূম ধাড়ী হাম্বিরের পূর্ববর্তী রাজার অধীনে ছিল এবং মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুর ছিল একপ্রকার দুর্ভেদ্য। এ সম্পর্কে যদুনাথ লিখেছিলেন, 'যখন আমাদের বুড়ো সেনাপতি সাহেব বাঁকুড়া ছেড়ে আসবেন ঠিক করলেন, তখন পাহাড় সাহেব বল্লেন,একটা রাত অপেক্ষা করুন। পাহাড় সাহেব, হনুমান পাঁড়ে আর ছাবেদ খাঁ রাত্রের অন্ধকার মধ্যে সাঁতরিয়ে গড় পার হলেন। গড়ের তিনটা শাস্ত্রীকে বেঁধে রেখে গোপনে গড়ে প্রবেশ করলেন, গড়ের দরজা খুলে দিলেন, তখন সকল সৈন্য গড়ে ঢুকলে সেই রাত্রেই গড় ফতে হলো। পর দিন বিষ্ণুপুর ফতে হলো'[১৯]

উল্লেখ্য এরপরই কালাপাহাড় সহ সেনানায়ক পদে উন্নীত হন ও বারেন্দ্র অভিযানে সাফল্য পান। সেই সাফল্যের পরে তিনি সেনাপতির মর্যাদায় ভূষিত হন এবং পুরীর উদ্দেশ্যে উৎকল অভিযানে অগ্রসর হন, রাঢ়ের উপর দিয়ে। কালাপাহাড়ের এই দুটি অভিযান রাঢ়ের সাধারণ মানুষের মনে প্রভূত ভীতির সঞ্চার করে এবং রাঢ়ের সামাজিক সংহতি বিপন্ন করে তোলে।

শূর শাসনের অবসানে এবং ধীবর বংশের উচ্ছেদের পর ষোড়শ শতকের অন্তঃ ভাগে হুগলী, হাওড়া, নদিয়া-মেদিনীপুর-বর্ধমান-বাঁকুড়ার একাংশে শক্তিশালী ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজশাসন প্রতিষ্ঠা (পেঁড়ো ও দোগাছিয়া কেন্দ্রিক, যার রাজধানী ছিল গড়ভবানীপুর) করেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র। এই সময় সুলেমন করনানীর পাঠান শাসনের সাথে সম্পর্ক অবনতি হলে, তিনি ওড়িয়ারাজ মুকুন্দদেবের সাথে এক শক্তি জোট গড়ে তোলেন এবং ত্রিবেণী প্রাঙ্গণে পাঠান শক্তিকে পরাজিত করেন। ত্রিবেণীতে শক্তিজোটের বিজয়ের স্মরণে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তগ্রাম বন্দরেও নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত

হয়। ইতিমধ্যে জোট সেনাপতি রাজীবলোচন রায় সুলতানের কন্যার বশবর্তী হয়ে পাঠান শিবিরে যোগ দিলে পাঠানশক্তি জোরালো হয়। ইতিমধ্যে পাঠান দাউদ খাঁ মোঘলমারির যুদ্ধে আকবর সেনাপতি মুনিম খাঁর হাতে পরাজিত হয়েছেন। এরপর তিনি মান্দারণ আক্রমণ করে শক্তি সংহত করতে চাইলে মল্লরাজ, ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ মোঘলদের সহায়তায় প্রবল সেনাশক্তি গড়ে তোলেন। ১৬৬৫ সালে ওড়িয়ারাজ মুকুন্দদেবও মোঘলের মিত্রশক্তিতে পরিণত হয়েছেন। এ সময় পাঠানসেনাধ্যক্ষরা হলেন কোতল খাঁ, ওসমান খাঁ। বিরোধী শক্তি পরিচালিত হয় মল্লরাজ হাম্বির, ভূরিশ্রেষ্ঠ প্রতাপরুদ্র, মান সিংহ পুত্র জগৎ সিং, খান জাহান (এর নামেই বর্তমান আরামবাগ যা আগে ছিল জাহানাবাদ) দ্বারা। এই যুদ্ধে কোতল খাঁর মৃত্যু হয় (বর্তমান কোতলপুরে তাঁর সেনাশিবির ছিল বলে কথিত), জগৎ সিং আহত হলে হাম্বিরের আতিথ্যে সুস্থ হন। ওসমান খাঁ ওড়িষায় পালিয়ে যান। কথিত আছে রুদ্রনারায়ণ—উত্তর ভূরিশ্রেষ্ঠ দেশের রানী ভবশঙ্করী এই ওসমান খানকে বাসুড়ির যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। মল্লরাজ যেমন বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে পরাজিত করেছিলেন, তেমনি নরনারায়ণের (ভবশঙ্করীর পুত্র প্রতাপনারায়ণের উত্তরাধিকারী) হাতেও তার পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদের হাতে মল্লরাজ যেমন ফতেপুর মহল হারিয়েছিলেন, তেমনই প্রতাপপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ভূরিশ্রেষ্ঠ হারান মুর্শিদকুলির সহযোগী কীর্তির হাতে। অথচ মোঘল সেনাপতি মানসিংহ পাঠান বিজয়ের পর বহু কেল্লা ও পরগণার শাসনভার দিয়েছিলেন হাম্বিরকে। রানী ভবশঙ্করীকে বাৎসরিক একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি ছাগল ও একটি কম্বল নজরানার বিনিময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠ শাসনের অধিকার দিয়েছিলেন! এই কীর্তিচাঁদই আবার কবি ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্ররায়কে কারাগারে বন্দি রেখেছিলেন। কবি ও কালাপাহাড় আবার একই বংশের। কালাপাহাড় বা রাজীবলোচন রায় আদতে ছিলেন পেঁড়োর রাজা শ্রীমন্তরায়ের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ। গোপীনাথ ও রাজীবলোচন রায় ছিলেন দুই ভাই। রাজীব হলেন পরবর্তীকালে পাঠানরাজ সুলেমানের সেনাপতি এবং সুলেমান কন্যাকে বিবাহ করেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণান্তে। ইনিই হিন্দুমন্দির ধ্বংসকারী কালাপাহাড়। গোপীনাথের অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ নরেন্দ্র রায়। তাঁর রাজ্য সৈন্যবলে দখল করেন বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্র। নরেন্দ্ররায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কবি রায় গুনাকর ভারতচন্দ্র। এমনকি ভারতচন্দ্রের আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও কবিকে প্রদত্ত মুলাজোড় গ্রাম বর্ধমানরাজের হাতে তুলে দেন (এ সময় বর্ধমানরাজ বর্গী আক্রমণ এড়াতে নদীয়ায় আশ্রয় নেন)। কবি দুঃখে লিখলেন,

> "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
> ক্ষনেকে হাতে দড়ি ক্ষনেকে চাঁদ।"

দুঃখে দুর্ভাবনায় কবি মারা গেলেন পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পর, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে, বহুমুত্র রোগে।[১৯ক]

হাম্বির সমকালীন সমাজ জীবনের খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনায়। রাঢ়ের পূর্বসীমায় দামুন্যা গ্রামে জন্মেছিলেন মুকুন্দরাম। এসময় মল্লরাজ ছিলেন হাম্বির এবং মল্লভূমের পূর্বাংশে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দুজনেই ছিলেন মোঘল বাদশা আকবরের অনুগত। কবির লেখনীতে যেমন রাজাদের মহানুভবতার কথা ধরা পড়ে, তেমনি স্থানীয় ভূস্বামীদের অত্যাচারের। তিনি মানসিংহের জয়গান গেয়ে লিখলেন,

"ধন্যরাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধীপ"

আর জমিদারের স্থানিক পীড়ন (এ সময় স্থানীয় ভূস্বামী ছিলেন ডিহিদার মামুদ শরিফ) ও সমকালীন সামাজিক অবক্ষয়, শোষণের কথা জানিয়ে লিখলেন (১৫৮৪-৯৪),

"উজীর হৈলা রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হৈলা অরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।
সরকার হৈলা কাল খিলভূমি লিখে লাল
বিনি উবকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হৈলা যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য যায় তঙ্কাপ্রতি।।"

ঔরঙ্গজেবের শাসনে সপ্তদশ শতকের আরেক কবি রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল কাব্যে (১৬৬২ সাল) সামাজিক চালচিত্র, মুকুন্দরামের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। তিনি লিখলেন,

"ভুরশুটে রাজার নাম প্রতাপ নারায়ণ
দানে দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান।।
চৈতন্য সামন্ত ছিল গ্রামের মণ্ডল
মুখে মাত্র কম কথা অন্তরে বড় খল।।
পৌষ মাসের খাজনা মুজবিলের দিনে
পিতা নাই ঘরে হেথা রামের কপালে।।

তিনদিন রাম দাসে দিলা বন্দীখানা
শিশুমতি বড় দুঃখ পাইল যন্ত্রনা।"

একশ বছরের ব্যবধানে রচিত এই দুই আখ্যান থেকে (একটি মোঘল শাসনের সূচনাপর্বে ও অন্যটি গোধূলি লগ্নে) তৎকালীন সমাজজীবনে স্থানীয় শাসকদের নিপীড়নের কাহিনি ও তার সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে একই উপসংহার টানা যায়।[১৯খ] সে শাসক ডিহিদার মামুদ শরিফ বা হিয়াৎপুরের চৈতন্য সামন্ত, যেই হোক।

পালযুগে সামাজিক অবস্থা ও কৈবর্ত বিদ্রোহ : সেনযুগ

পালযুগে একটি বড় ঘটনা ছিল কৈবর্ত বিদ্রোহ। কৈবর্ত বিদ্রোহ ও তার দমনের কার্যকারণ গভীর পর্যালোচনা করলে এই রাষ্ট্রসংকটে রাঢ় অঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা উপলব্ধি করা যায়। বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্যদের আগমন ঘটে আদিশূরের আমলে। পাল বংশের মধ্য-অন্তভাগে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এসময় কৈবর্তের সংখ্যাও বেশ ভালো ছিল। কৈবর্তরা দুই শ্রেণির— চাষা কৈবর্ত (যাদের জীবিকা মূলত কৃষিকাজ) ও জেলে কৈবর্ত (মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে)। পালরাজ মহীপাল-২ ছিলেন একজন অত্যাচারী শাসক। প্রজারা বিশেষত কৃষকরা ছিল করভারে জর্জরিত। এমনকি মাছধরা, নৌকা ব্যবহারের উপরও তিনি কর আরোপ করেন। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে কৈবর্ত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মহীপালকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এই বিদ্রোহে বাঁকুড়া, আরম্যনগরের বিপুল কৈবর্তজনগণের ভূমিকা জানা না গেলেও, কৈবর্ত বিরোধী জোটে মন্দারণ-আরম্যনগরের সক্রিয় দলপতি বিজয় সেন কৈবর্ত প্রজানুরাগবশত ও ভবিষ্যত পাল বিরোধী অভিযানের কথা মাথায় রেখেই কৈবর্ত বিরোধী পাল-মহাজোটে যোগ দেননি (উল্লেখ্য এসময় এই অংশে কৈবর্ত জনঘনত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য এবং ১৮৭২ সালের প্রথম জনগণনায় তার ছায়াপাত আছে)।[১৯গ] ফলে তিনি পাল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করে সেন শাসনের সূচনা করতে এই শ্রেণির প্রজাদের সহায়তা পেয়েছিলেন।

এই প্রজা ও শূর বংশের সাহায্যে বীরগুণকে পরাজিত করে তিনি পালবিরোধী অভিযানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। রামপালের কৈবর্ত বিরোধী মহাজোটে বাঁকুড়া থেকে যোগ দিয়েছিল শূররাজ লক্ষ্মীশূর ও কোটাটবীর বীরগুণ। এই সামন্তজোট বিজয়ী হলেও অনতিকাল পরেই বীরগুণ বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত হন ও শূর শাসকরা বৈবাহিক মিত্রতার মাধ্যমে সেন প্রভাবের মধ্যে অর্ন্তলীন হয়ে পড়ে। রামপালের পুত্র কুমারপালের রাজত্ব উচ্ছেদ করে সেন রাজত্ব প্রবর্তন করেন বিজয় সেন। অতএব এক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় শাসনধারা পরিবর্তনে এই এলাকা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল।

চর্যাপদের বিশ্লেষণ :

পালযুগের অন্তভাগ ছিল চর্যাপদের যুগ। এ যুগে বুদ্ধ প্রভাব রাজবৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাতন্ত্র্য আকার বেশি দিন বজায় রাখতে পারেনি (তাছাড়া মন্ত্রী-সামন্তরাও এই ধর্মাচারী ছিলেন না)। বাঁকুড়া খণ্ডেও যেটুকু প্রভাব ছিল তা হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে আত্তীকৃত হয়। চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য, কবি শবরীপাদ সম্ভবত রাঢ় অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। তাঁর পদগুলির মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় চিত্র ধরা পড়ে। পাল বংশের শেষ দিকে এবং সেন রাজত্বের প্রথম দিকে উচ্চবর্ণের মানুষদের বাঁকুড়ায় আগমন ঘটে। এদের নতুন নতুন বাসস্থান গড়ে ওঠে এবং নগরের প্রান্তসীমায় নিম্নবর্ণীয়দের বাসভূমি রয়ে যায়। তাই চর্যাপদের কবি লিখছেন, 'নগর বাহিরে ডোম্বী তোহরি কুড়িয়া, ছোই ছোই যাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।' এই সব পদে ডোম সহ নিম্নবর্ণীয়দের পর্ণকুটির, 'দিন আনা দিন খাওয়া প্রাত্যহিক' জীবনচিত্র ধরা পড়েছে। চর্যাযুগের উপজাতীয় সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ধর্মের অবশিষ্ট মহাযানী তান্ত্রিকতা, ক্ষীণস্রোতা জৈন প্রবাহ সেন ও ভৌমযুগে (একাদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক) এক সংমিশ্রিত হিন্দু লোকধর্মের রূপ পায়। মূলত এ যুগ ছিল প্রারম্ভিক শূন্য পুরাণের যুগ ও পরবর্তীতে মঙ্গলকাব্যের যুগ।

রাজেন্দ্রচোলের একজন সেনানায়ক, তাঁর বঙ্গ অভিযানের সময় (১০২২-২৩) ছান্দার পরিমন্ডলে শালিবাহন শাসক বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কথিত। এসময় বঙ্গেশ্বর ছিলেন প্রথম মহীপাল ও প্রতিবেশী গোপভূমির (বর্ধমানের অজয় তীরবর্তী) শক্তিশালী গোপরাজা ছিলেন ইছাই ঘোষ। ইছাই এই প্রথম নৃসিংহবাহনকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। অবশ্য তাঁর শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সুতরাং পাল শাসনের অন্তভাগে সেন রাজাদের উত্থানের কালে শূর আধিপত্য বিনষ্ট হয়ে যেমন ছান্দার পরিমন্ডলে শালিবাহন-নৃসিংহবাহনদের (বড়জোড়ার ইছারিয়া গ্রামে শালিবাহনের রাজধানী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে মনে করা হয়) রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্তে আসা যায়, তেমনি বিজয় সেন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে (তাঁর স্ত্রী বিলাসদেবী ছিলেন শূর রাজকন্যা) অবশিষ্ট শূর শক্তি অন্তর্গত করে কোটাটবী (পাত্রসায়ের) রাজ বীরগুণকে পরাজিত করেন। কারণ এর অব্যবহৃত পূর্বে শূররাজ লক্ষ্মী রামপালের কৈবর্ত বিরোধী জোটে যোগ দিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং এরপর শূরদের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। সুতরাং এই পর্বে একটি বড় রাষ্ট্রপরিবর্তন বাঁকুড়াভূমিকে আলোড়িত করেছিল।[২০]

পাল আমলের মধ্য ও অন্তভাগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অস্তমিত হতে থাকে সমগ্র বাংলা জুড়ে, কারণ এর প্রাবল্য ছিল রাজ আনুকূল্যের সমানুপাতিক। শালতোরা

বিহারীনাথ পাহাড়ে, ছাতনার শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে ও বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে বৌদ্ধ মঠ বা মন্দিরের চিহ্ন মিলেছে বলে অনেকে দাবি করেন। দক্ষিণ বাঁকুড়ার অজস্র জৈন পুরাবস্তুকে অনেকে বৌদ্ধ ধর্মাবশেষ বলে দবি করেন। দেউলভিড়ার প্রত্ননিদর্শনগুলি অনেকেই বৌদ্ধপ্রভাবের প্রমাণ বলে মনে করেন। বুদ্ধপুরের নামকরণের কারণ অনুসন্ধান করলে বৌদ্ধমতের প্রবাহের ধারা বোঝা যাবে।

এদিকে বৃহত্তর জনসমাজ মূলস্রোতে ফেরার তাগিদে লোকধর্মকে আকঁড়ে ধরে। বৌদ্ধধর্মও হীনযান ও সহজিয়া মতের মধ্য দিয়ে সরলীকৃত হয়ে বৃহত্তম হিন্দু ভাবধারায় অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই সময়কালেই বিভিন্ন লোকদেবতা, লোকাচারের জন্ম হয়।

চর্যাসংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় পদকর্তার হাতে। বাঁকুড়া তথা রাঢ় অঞ্চলের কবি ছিলেন শবরপাদ/ভুসুকুপাদ। এদের পদগুলি থেকে পাল সমকালীন সমাজ জীবনের খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়। শবরপাদের বর্ণনায় উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে ময়ূরপুচ্ছ মাথায় শবরী নারীর চিত্র রাঢ়ভূমির সাথে মিলে যায়।[২০ক]

ডঃ সুবীর মণ্ডল তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষাতে চর্যাপদে ব্যবহৃত শব্দ ও শব্দবন্ধনী এখনও দক্ষিণ বাঁকুড়ার লোকভাষাতে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। এমন কিছু দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল:[২১]

চর্যায় ব্যবহৃত রূপ	**দক্ষিণ বাঁকুড়ার লোকভাষা**	**শিষ্টভাষা রূপ**
বহুড়ি	বৌড়ি	বধূ
ফঁটা	ফাঁটা	ফোঁটা
মোকে	মোকে	আমাকে
কল্লে	কইরলো	করলে
জাইন	যায়	যায়
নাইলড়ে	নড়েনা	নড়েনা
ভতার	ভাতার	স্বামী
চ্ছিনালী	ছেনালী	ছলনাময়ী

এর থেকে চর্যাপদে বাঁকুড়া তথা রাঢ়ের অবদান অনুমান করা যায় এবং চর্যা পদকর্তাদের সাথে এই অঞ্চলের যোগ প্রমাণিত হয়।

মঙ্গলকাব্যের যুগ :

তুর্ক-আফগান শাসনের অন্তভাগে অর্থাৎ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাঁকুড়ায় মঙ্গলকাব্যের ধারা প্রবর্তিত হয়। এসময় ছিল ভূমরাজ্যগুলির বিকাশের কাল। পাল

শাসনের অন্তভাগে এবং সেন শাসনের সময় বাঁকুড়ায় সামাজিক গড়নের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। সমাজে উচ্চবর্ণীয়দের অবস্থান ও প্রভাব বেড়েছিল। উপজাতীয় ভৌম রাজাদের ক্ষত্রিয়করণ ঘটেছিল সামাজিক কৌলিন্য আনতে। বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের গোধুলিবেলায় বৃহত্তর হিন্দু প্রভাবে অন্তর্লীন হওয়ার সামাজিক শৈথিল্যের প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকাব্যের যুগ শুরু হয়। এসময় লৌকিক দেব-দেবীদের আরাধনার চল শুরু হয় মূলত বিবিধ ধারার সংমিশ্রণে এবং মূলভূমি থেকে প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগে। মনসা দেবীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রচারে মনসা মঙ্গল, ধর্মরাজের বিষয়ে ধর্মমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, খেলারাম চক্রবর্তী, রাম আদক প্রমুখ রচিত, অনেকে ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ ধারার হিন্দুকৃত রূপ মনে করেন, লাউসেন, কালু, ইছাই ঘোষের মত কাব্যিক চরিত্রগুলি রাঢ় ও দামোদর সন্নিহিত অঞ্চলের সংস্কৃতি জাত), দেবী চণ্ডীর লোকগাথা চণ্ডীমঙ্গল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ মূলত ধর্ম ঠাকুরের বন্দনা। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে সামাজিক নৈতিক শিথিলতার অনেক চিত্র আছে। সামন্তভূমে এই অবক্ষয়ের কালে নারীর রূপ-যৌবনই তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, যেমন হরিণী নিজ দেহের মাংসের ভারে বিকল হয়।[২২] বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেবের মনসা মঙ্গলকাব্যে রাঢ়বঙ্গের পুরুষ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অধঃপতনের চিত্র আছে।[২৩] অনেকের মতে দামোদর উপত্যকা সংলগ্ন রাঢ়দেশ (বড়জোড়া, সোনামুখী, পত্রসায়ের, ইন্দাস থানা) এই কাব্যের উৎসস্থল। কাব্যের মুখ্য চরিত্র চাঁদের স্মৃতি বিজড়িত পাত্রসায়েরের বেলুট গ্রামের পশ্চিমের চন্দ্রদীপ ও ঠাকুরাণী নামক ঢিপি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকরা ছিলেন চম্পকনগরের চাঁদ-লক্ষ্মীসদাগর, মল্লভূমের রাম দত্ত, বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবন্ত খাঁ।[২৪] মঙ্গলকাব্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত হল সমকালীন বণিক জীবনও ছিল যৌনতার স্পর্শ কলুষিত। অষ্টাদশ শতকে রচিত জগদ্রামের রামায়ণের প্রস্তাবনা ও রামারস অংশে রাঢ়ের সামাজিক স্থিতির আঁচ পাওয়া যায়।[২৫] এমনকি গোপাল সিংহের আমলে মারাঠা আক্রমণের প্রেক্ষিতে রচিত গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণেও একই ছবি ধরা আছে। এই অধঃপতন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'রাধা কৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইয়া। রাত্রদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইএগ্রা।।'[২৬] নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন মূলত নিম্নবর্গীয় জীবনে এই শিথিলতার মাত্রা ছিল বেশি।[২৭] চর্যাপদে নগর বাহিরে ডোম্বীর উদাহরণ সেই ধারার ইঙ্গিত দেয়। এমনকি এদের সংস্কারমুক্ত বৌদ্ধ সহজিয়ামার্গী ও কাপালিকদের সাধনসঙ্গী হতেও দেখা যেত। এজন্য সে যুগে সামন্তভূম-মল্লভূমে বৌদ্ধ সহজিয়াতন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল। বজ্রযানের মতো সহজযানেও নর-নারীর মিথুন যোগ স্বীকৃত ছিল। ক্রমশ এই সাধন পদ্ধতি আদর্শ-নৈতিকতা বর্জন করে কায়া সাধন ও দেহাশ্রয়ী হঠযোগে

পরিণত হয়। ডেকে আনে সামাজিক অবক্ষয়। সপ্তদশ শতকের শুরুতে বৈষ্ণব নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণব ধারায় বৌদ্ধ সহজিয়া আদর্শ আত্তীকৃত হয়ে একটি গোপনচারী উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সহজিয়া ধর্ম এভাবে বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করে নৈতিক বিকৃতি ডেকে এনেছিল। উল্লেখ্য বীরভদ্রের শিষ্য মনোহরদাস সোনামুখীতে তাঁর আখড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে মল্লরাজ্যে ৬৫টি গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাদর তৎকালীন সমাজের একাংশের কামরসের প্রতি আকর্ষণকেই প্রমাণিত করে।[২৮]

আদিশূরের ব্রাহ্মণ তত্ত্ব-রাজেন্দ্রচোল, লক্ষ্মীশূর, রণশূর : বাঁকুড়াভূমিতে সামাজিক পরিবর্তন

বাঁকুড়া তথা রাঢ়ে শূর বংশের পত্তন ও তার অনুষঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের মত উচ্চবর্ণের আগমন ও বসতির বিস্তার ঘটে পালযুগে।

বিভিন্ন সূত্র বিচারে বলা যায় বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন ঘটে সপ্তম শতক ও একাদশ শতকের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে। খুব সম্ভব পাল আমলে। শূর বংশের বংশলতিকা, কালসীমা ও ভৌগোলিক ব্যাপ্তি আজও সংশয়াতীতভাবে নির্ণীত হয়নি। অবশ্য রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে বাংলায় ব্রাহ্মণ আগমনের সময় চিহ্নিত করেছেন ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ।[২৯]

কথিত আছে এই বংশের উত্তরপুরুষ আদিশূরের কন্যাকুব্জ দেশাগত মহিষী পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞের নিমিত্ত বঙ্গদেশে কোনো উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাননি। তাঁর সমস্যা নিরসনে কন্যাকুব্জ বা কোলাঞ্চদেশ থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন আদিশূর।[২৯ক] এদের নিবাসের নিমিত্ত যে পাঁচটি গ্রাম দান করা হয় তা ছিল বাঁকুড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে। এই ব্রাহ্মণদের সাথে এসেছিল পাঁচজন কায়স্থ। এদের মধ্যে চারজন হল বসু, মিত্র, ঘোষ, বসু। এদের বসবাসের জন্য তৎকালে ২৭টি গ্রাম বরাদ্দ হয়েছিল। যদিও পাঁচটি ব্রাহ্মণ গ্রামের অবস্থান নিয়ে একাধিক দাবি আছে, তবুও এ ঘটনা রাঢ় অঞ্চলের সামাজিক সমীকরণে সমূহ পরিবর্তন এনেছিল। 'সম্বন্ধ নির্ণয়করে'র মতে বঙ্গে আগত পাঁচ ব্রাহ্মণকে শূর বংশ যে পাঁচটি গ্রাম দান করেছিল তা হল ১) বর্তমান বাঁকুড়া জেলার কঙ্কায় শ্রীহর্ষ ২) বীরভূম জেলার কামকোটিতে দক্ষ ৩) বেদগর্ভ বর্ধমানের বাটাগ্রাম ৪) ভট্টনারায়ণ পুরুলিয়ার পঞ্চকোটিত ৫) মেদিনীপুরের হরিকোটিতে চন্দর। যদিও এই ব্রাহ্মণগ্রাম সম্পর্কে একাধিক দাবি আছে, আরম্যনগর-মন্দারণ কেন্দ্রিক শূরবংশীয় রাজাদের মন্দারণের পরিধির মধ্যে এই গ্রামদান অনেকবেশি বিশ্বাসযোগ্য ও ইতিহাসের বিচারে সঙ্গতিপূর্ণ।

বাংলায় শূর বংশ বিজড়িত এই ক্রমিক সামাজিক পালাবদলে বাঁকুড়া ও রাঢ়ভূমির ভূমিকা অনস্বীকার্য, কারণ ইতিহাসে যে দুজন শূরনৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় তার একজন দেওপাড়া শিলালিপি উল্লেখিত রণশূর, যিনি রাজেন্দ্র চোলের বাংলা অভিযানের সময় আরম্যনগরের (বর্তমান বাঁকুড়া সন্নিহিত আরামবাগ) মন্দারণ বা ছান্দার পরিমণ্ডল থেকে থেকে উৎখাত হন। রাজেন্দ্রচোল যেহেতু রণশূরকে পরাজিত করেন এবং রাজেন্দ্রর সেনানায়ক নৃসিংহবান যেহেতু ছান্দার পরিমন্ডলে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, এই ঘটনা ছান্দারে ঘটেছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। ইছারিয়া গ্রামে নৃসিংহের উত্তরপুরুষ শালিবাহনের ঢিপি (স্থানীয় নাম) এই সম্ভবনার সাক্ষ্য দেয়।

উল্লেখ্য মন্দারণ বাঁকুড়া সন্নিহিত ঐতিহাসিক অঞ্চল। মনে হয় রাজেন্দ্র দেশে ফিরে গেলে, এতদাঞ্চলে শূর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ এর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রামপালের কৈবর্তবিরোধী সমর প্রয়াসে সামিল হয়েছিলেন মন্দারণের লক্ষ্মীশূর। এই দুই ঘটনার বিন্যাস থেকে সিদ্ধান্ত করা অসংগত নয় যে গৌড়াধিপতি শূররাজাদের প্রধান বা অপ্রধান শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গড়মন্দারণ বা অপারমন্দারণকেন্দ্রিক স্থানিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়।

দ্বিতীয়ত পাল বংশের এই অন্তরাগের আবহে সেন বংশীয় বিজয় সেনের উত্থান হয়েছিল এই একই অঞ্চলে। তাঁর কৌশলের অঙ্গ হিসাবে, শূর বংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করে বিজয় সেন শূর আনুগত্য নিশ্চিত করেন। মন্দারণে প্রভাব বৃদ্ধির পর উত্তর বাঁকুড়ার (সোনামুখী -পাত্রসায়ের কেন্দ্রিক কোটাটবী) বীরগুণকে পরাজিত করে সুসংহত শক্তি নিয়ে গৌরাধিপতি পালরাজকে উচ্ছেদ করেন। বস্তুত ওড়িয়াপতি অনন্তবর্মা দক্ষিণ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের প্রভাবিত অংশ থেকে এই পালাবদলে বিজয়সেনের সহযোগী হন। মনে হয় বৈবাহিক সম্পর্কের জেরে শূর বংশ গৌরব, সেন প্রভাবের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছিল বলেই বল্লাল সেনকে আদিশূরের দৌহিত্রবংশ বলে অভিহিত করা হয়। বল্লাল সেনই কৌলিন্য প্রথা (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থদের) প্রচলন করেছিলেন কিনা তা বিতর্কিত হলেও স্পষ্টতই শূর-সেন বংশের সংহতির পর বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন, কৌলিন্যের বাঁধন, সবের সঙ্গেই সেনরাজাদের নাম জুড়ে যায়।

এই সেন বংশের সাথে শূরবংশের আত্মীকরণের ফলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মতো উচ্চবর্ণের সমর্থন সেনদের দিকে সংহত হয়েছিল। শুধু তাই নয় তৎকালীন আরম্যনগর, বাঁকুড়ার পূর্বাংশে কৈবর্তদের আধিক্য থাকায় ও এই অঞ্চল থেকে বিজয় সেনের উত্থানের রসদ সংগ্রহের প্রয়াস জারি থাকায়, কৈবর্ত বিরোধী আঞ্চলিক মহাজোট থেকে কৌশলী বিজয় সেন নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। এর ফলে পরবর্তীকালে

পাল বিরোধী মহাসংগ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-কৈবর্ত সংখ্যাগুরু জনগণের সমর্থন পেয়েছিলেন।

সুতরাং অষ্টম থেকে একাদশ শতকে বাঁকুড়ার উপজাতি প্রভাবিত জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য জাতির আগমন ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় জৈন ধর্মাশ্রয়ী আর্যায়ণের পথ ধরে বাঁকুড়ার উপজাতি প্রধান সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন বর্ণের মানুষের আগমন ঘটতে থাকে গুপ্তযুগ থেকেই। প্রাক মৌর্যযুগে জৈন তীর্থঙ্করের রাঢ় আগমন ও মৌর্যযুগে রাজা ও রাজপুরুষ-বণিকদের রাঢ়ের উপর দিয়ে নিয়মিত বাণিজ্যযাত্রা এলাকার জনবিন্যাসে ব্যাপকতর পরিবর্তন এনেছিল বলে মনে হয় না। বরং সেটা ছিল স্বল্পমাত্রার সূচনা। উপরন্তু গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ও সামাজিক বর্ণবিভাজন তীব্রতর হতে থাকে। সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন (৩৫৫-৩৭০ খৃ:) রাঢ় অধিপতি সিংহবর্মা, চন্দ্রবর্মার রাজত্বে এই প্রয়াসের প্রমাণ শুশুনিয়া শিলালিপি। এই শিলালিপিতে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ধোসোগ্রাম উৎসর্গের কথা আছে। এইযুগে উপজাতি প্রধান স্থানে, সূর্য বা বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, তার নামে উৎসর্গীকৃত জমিতে উপজাতিদের দিয়ে চাষাবাদ করিয়ে তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করার চল ছিল। এসময় থেকেই আর্যীকরণ ও হিন্দুকরণের অনুষঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষদের আগমন শুরু হয়। গুপ্তোত্তর তৈলকম্প শিখররাজ, বীরগুণ, নৃসিংহবাহন বংশ, শূররাজ, ঘোষ গোপ ভূম্যধিকারিদের প্রভাব উত্তর বাঁকুড়ায় অনুভূত হলেও বর্ণেতর সম্প্রদায় ও উপজাতি সংখ্যাধিক্য, প্রভাব তখনও অস্তমিত হয়নি। বরং ভবিষ্যপুরাণের যুগে (আফগান শাসনের অন্ত ও মোঘল শাসনের সূচনা লগ্নে রচিত) এদের ক্ষমতায়ন ইতিহাস স্বীকৃত হয়। এসময় মল্লভূমে (বিষ্ণুপুর) বাগদি সম্প্রদায় সম্ভূত রাজা, ছত্রিবনায় (ছাতনায়) সাঁওতাল বংশীয় রাজা, বরাহভূমে রজক সম্প্রদায়ের দলপতি, তুঙ্গভূমে (শ্যামসুন্দপুর-ফুলকুসমাকেন্দ্রিক) ভূমিজ রাজা (অন্তর্গত রাইপুরে ভূমিজ ও পরবর্তীতে বাগদি রক্তসম্পর্কিত), সিমলাপাল-ভেলাইডিহায় ভূমিজ অনুগত উৎকল ব্রাহ্মণ বংশ এই তত্ত্বের প্রমাণ দেয়। স্পষ্টতই ষোড়শ শতকেও বাঁকুড়ার বৃহদাংশ মুণ্ডা বা সাঁওতাল জ্ঞাতিত্বে আবদ্ধ রাজপরিবার বা উপজাতি রক্তসম্ভূত জাতিসমূহের শাসনাধীন ছিল। এই ঐতিহাসিক সময়েই রাজাদের আত্ম-ক্ষত্রিয়করণের প্রবণতা দেখা যায় এবং রাজানুকূল্যে উচ্চবংশীয়দের আগমন শুরু হয়। এর ফলে বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক মানচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে।

মল্লভূমে উচ্চবংশীয়দের আগমনের ধারা আলোচনা করলে এর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে। ভবিষ্যপুরাণের আগে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের (অর্থাৎ সেনযুগের ও যুগোত্তর কালে) ভাষ্য অনুসারে

এসময় বাংলায় সামাজিক সচলতা বর্ণীকরণকে তীব্রতর করেছিল। যার ঢেউ বাঁকুড়াতে আছড়ে পড়েছিল। ডঃ গৌরপদ সেনের মতে সমাজের শীর্ষে রাজা ও রাজপাদোপজীবীরা থাকতেন। এমন রাজপাদোপজীবীরা হলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, ছত্রী। কৃষক, পশুপালক, অন্যান্য জাতির মধ্যে আছেন গোপ, সদগোপ, তিলি, তাম্বুলী, মাহিষ্য, বারুজীবী, কেয়ট। কারিগর-শিল্পী উৎপাদক শ্রেণির মধ্যে লোহার, কর্মকার, তন্তুবায়, শঙ্খশিল্পী, মোদক, কুম্ভকার, রজক, ক্ষৌরকার, শুঁড়ি, করঙ্গা, বণিক হিসাবে শঙ্খবণিক, স্বর্ণবণিক শ্রমজীবী হিসাবে ডোম, হাড়ি, বাগদি, যুগী,বাউরি, মাল, সাঁওতাল বর্গের মানুষরা এই সামাজিক বিভাজনের বিভিন্ন ধাপে অবস্থান করতে থাকেন।

রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী যোড়শ শতকে ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার সময় মন্তব্য করেছিলেন, 'যোড়শ শতাব্দীর শেষদিক থেকে বাঁকুড়া জেলার ভূমি ব্যবস্থায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ লক্ষণীয়। এ জেলায় কনৌজ ও ওড়িশা থেকে বহু ব্রাহ্মণ এবং বিহার থেকে বহু ছত্রী এবং হুগলী, বর্ধমান, উত্তর চব্বিশপরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও রাজমহল এবং এমনকি ঢাকা থেকে বহু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-গন্ধবণিক ও অন্যন্য বর্ণের মানুষ প্রবেশ করে উচ্চবর্ণীয় জনসংখ্যা স্ফীত করে তোলে।'[৩০]

এভাবে বিভিন্ন কালপর্যায়ে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের আগমনে বাঁকুড়ার সামাজিক মানচিত্রের আদল পরিবর্তিত হয়। এটাই ছিল সপ্তম থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাঁকুড়ার সামাজিক পরিবর্তনের চলচ্ছবি।

জৈন আগমন ও সামাজিক বিবর্তন : মন্দির সৌকর্য ও বিপণন

রাঢ়ে মহাবীর ধর্মপ্রচারে আসেন প্রাক-নন্দ যুগে। সম্ভবত পরেশনাথ পাহাড়ের দিক থেকে পুরুলিয়ার অভিমুখে ছিল এই ধর্মযাত্রা। হয়ত তিনি দক্ষিণ বাঁকুড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। কারণ মহাবীর স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। তবে এই ঘটনা ধর্ম প্রচারের স্রোতকে আটকে রাখতে পারেনি। এর পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্মপ্রচারকের দল রাঢ়ে জৈন সংস্কৃতির বীজ পুঁততে সক্ষম হয়। সিমলাপালের জড়িষ্যা গ্রামের দক্ষিণপূর্বের একটি দেবস্থান 'মহাদন তড়া'য় (জৈন তীর্থঙ্কর মহাজনের অপভ্রংশ) জনশ্রুতি মতে তীর্থঙ্করের প্রধান শিষ্যের আগমন ঘটেছিল ধর্মপ্রচারের জন্যে। তবে এই পর্বে জৈন ধর্ম প্রবাহে বাণিজ্যিক অনুষঙ্গ ও রাজানুকূল্য ছিল না।

কিন্তু প্রথম পর্বে জৈন প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়ে অশোকের রাজত্বকালে, বৌদ্ধমতের প্রসারের সাথে সাথে। তবে বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই, বিশেষত আদিবাসী সমাজ, এই ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল। তবে মূলত আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাধর গোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ার শরিক ছিল বলে মনে হয় (মতান্তরে দীর্ঘকাল রাঢ়ে টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভূম কৃষ্টি বৃহত্তর লোকজীবন ও লোকাচারের মধ্যে আত্তীকৃত

হওয়াকে দায়ী করেছেন)। সব পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ নতুন মতে পরিবর্তিত হত। জৈন মত থেকে বৌদ্ধ মতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে জৈন প্রভাবিত জনগোষ্ঠী এবং তাদের জৈন উপসনাগৃহও বুদ্ধায়িত হয়। অশোকের কলিঙ্গযুদ্ধোত্তর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে অধিকৃত রাঢ় বাংলাও বাদ ছিল না। সিংহলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত ধর্মযাত্রা করে পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে নৌপথে প্রেরণ করে, নিজে পাটলিপুত্রে ফিরে আসেন। তাঁর যাত্রাপথ ছিল রাজগির-রাজমহল-ঝড়িয়া-রঘুনাথপুর-ছাতনা-ঘাটাল-তমলুক সড়ক বরাবর। সুতরাং রাঢ়ে বৌদ্ধপ্রভাবের অনুসিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এ ঘটনা একটি অন্যতম উপাদান। যোগেশচন্দ্র এবং মাণিকলাল সিংহের মতে বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে ও শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। ইন্দপুরের দেউলভিড়া ছিল অন্যতম বৌদ্ধকেন্দ্র। হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্ত রাজ্যে অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তুপের উল্লেখ করেছেন। শশাঙ্কোত্তর সময়ে হিউয়েন সাঙ যত সংখ্যক সংঘারাম দেখেছিলেন তা ছিল ফা হিয়েনের দেখা সংঘারামের চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ বৌদ্ধ প্রভাব কমতে শুরু করেছিল। হিউয়েন সাঙ লিখেছিলেন, 'At first the people of this country did not believe in Buddha.'

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি ছিল রাজানুকূল্য ও বাণিজ্যিক অনুষঙ্গ (অবশ্য অমাত্য-সামন্তরা ছিল হিন্দু মনোভাবাপন্ন)। গুপ্তরা ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহনশীল ও পাল শাসকরা ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। পাল শাসনের শেষ দিক থেকে ও সেন-শাসন কালে এই রাজানুগ্রহ অর্ন্তহিত হয় এবং পাশাপাশি পশ্চিমা বণিকদের স্থল ও নৌবাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রন শিথিল হতে থাকে। শেষ আঘাতটি আসে রাজেন্দ্রচোলের বাংলা অভিযানে। বৌদ্ধ প্রভাবিত অঞ্চলে তাঁর অভিযানের সাথে সাথে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপকতা লোপ পায়। শশাঙ্কের বৌদ্ধবিরোধী অবস্থান বাংলায় বৌদ্ধর্ধমের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেন আমলে রাজকবি, রাজপুরুষেরা শঙ্করাচার্যের শৈববাদ কেন্দ্রিক হিন্দু জাগরণ অভিযানের ছিলেন সক্রিয় শরিক, যা হিন্দু আধিপত্যবাদের সহায়ক ভূমিকা নেয়।

বারাণসী বা তাম্রলিপ্ত-রাজগীর থেকে তাম্রলিপ্ত (বা ওড়িয়া) পর্যন্ত সড়ক ছিল রাঢ়ের অভ্যন্তর দিয়ে। বেগলারের মতে,[৩১] "Direct route would be through Bishanpur, Bahulara, Sonatopal, Ekteswar, Chhatna, Ragunathpur, Telkuppi, Jharia, Rajauli and Rajgir" এই সড়কগুলির ত্রিবিধ গুরুত্ব ছিল ১) সমরাভিযান ২) বাণিজ্য ৩) ধর্মপ্রচার। এই পথেই জৈনধর্ম রাঢ়ে প্রবেশ করেছিল এমন অনুমান অমূলক নয়। বিশেষত জৈন বণিকদের (শ্রাবক বা শরাক) হাত ধরে

(মেজিয়ার সরাকড়িহা, বিষ্ণুপুরের সরাকডাঙ্গা তার স্মৃতি বহন করে)। অতীত বাঁকুড়ার বণিকতন্ত্র ও জৈনধর্মের যোগাযোগ প্রমাণিত হয় বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণগঞ্জ ও বকুলতলার শরাকপল্লিতে যে কজন শরাক বাস করেন, তাঁদের অনেকের জৈন ধর্মাচারণ পালন থেকে।[৩২]

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, 'রাজগীর, চম্পা বা ভাগলপুর, পাবাপুরী, সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পর্বত, মথুরা, কওসাম বা কোশাম্বী ইত্যাদি স্থান জৈনদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল, মগধ ছিল খ্রিস্ট পরবর্তীকালে অন্যতম প্রধান জৈন কেন্দ্র। মগধ থেকেই বঙ্গে ও ওড্রে জৈনধর্ম প্রবেশ করেছিল।'[৩৩] এই প্রভাব অব্যাহত ছিল ১২০০ সাল পর্যন্ত। ১১ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ বাঁকুড়ায় চোড়গঙ্গ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে জৈন ধর্মাবলম্বী ওড়িয়া নৃপতিদের আনুকূল্যে বাঁকুড়ায় জৈন ধর্মের বিস্তার ও স্থাপত্য গড়ে উঠতে থাকে । আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার নির্দেশক কানিংহামের সহকারী জে ডি বেগলার ১৮৭২-৭৩ সালে পাটনা থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত যে প্রত্নানুসন্ধান চালান তাতে অসংখ্য প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়। অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন এগুলি সবই জৈন নিদর্শন সম্পৃক্ত। তাঁর মতে, 'খ্রিস্টোত্তর বাঁকুড়ার পুষ্করণ অধিপতি (সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন) ছিলেন জৈন মতে বিশ্বাসী, কারণ, জৈনরাও চক্রস্বামী বিষ্ণুর পূজা করতেন। এবং শুশুনিয়া পরিমণ্ডল জুড়ে অসংখ্য জৈনমূর্তি মন্দির বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। অতএব, চতুর্থ শতক থেকে মানভূম অঞ্চলে (ছাতনা মানভূম জেলার অন্তর্গত ছিল) হিন্দু-জৈন ধর্মের প্রত্নপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এটাও জানা যাচ্ছে যে, কুতুব মিনার থেকে ছাতনা পর্যন্ত রাজা চন্দ্রবর্মার বিষ্ণুভক্তির স্মারক ছড়িয়ে আছে। এই পথেই জৈন ধর্ম এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।' অর্থাৎ অশোকের সময়ে বাংলায় বৌদ্ধ মতের প্রসার ঘটলেও খ্রিস্টোত্তর সময়ে জৈনধর্মের প্রাবল্যে এর প্রভাব অস্তমিত হতে থাকে। বঙ্গে মহাবীরের আগমনোত্তর সময়ে প্রচারকদের প্রয়াসে এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে ওড়িয়ারাজ জৈনমতাবলম্বী চোড়গঙ্গ ও খারবেলের আনুকূল্যে বিজিত রাঢ় অঞ্চলে জৈন ভাবধারা প্রোথিত হয়। জৈন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে এমন স্থান হল খাতড়ার বড়ি পাহাড় সংলগ্ন পরকুল, গোপালপুরে জৈন মূর্তি, মণ্ডলকুলি গ্রামে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি, সাতপাট্টা গ্রামে অম্বিকা ও তীর্থঙ্করের মূর্তি, ইন্দপুরের ব্রাহ্মণডিহা গ্রামে জৈন ভগ্নমূর্তি, জোড়দা গ্রামে পার্শ্বনাথের মূর্তি, জুনবেদিয়া গ্রামের ঢিবি থেকে ধ্যানমগ্ন তীর্থঙ্করের মূর্তি, কেন্দায় অম্বিকা মূর্তি, পরেশনাথে ৬ ফুট পার্শ্বনাথের মূর্তি, অম্বিকানগরে ঋষভনাথ ও অম্বিকা মূর্তি, তালডাংড়া-দেউলভিড়ার পার্শ্বনাথের, ইন্দপুর-দেউলিভিড়ায় গাছতলায় জৈনমূর্তি, হাড়মাসড়ার পার্শ্বনাথের মূর্তি, বহুলাড়া

মন্দিরের পার্শ্বনাথ প্রভৃতি।[৩৪]

দ্বাদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাঁকুড়ার বৃহদাংশ হিন্দুভাবাপন্ন ওড়িয়া রাজাদের প্রভাবিত হওয়ায় এবং তাদের ধর্মসহিষ্ণুতার কারণে জৈনধর্মের শিকড় বাঁকুড়া মননের গভীরে প্রবেশ করে। এই ধর্মাচরণ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী সবলতর ছিল। তবে জৈন ধারা হিন্দু লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে ক্রমাগত আত্তীকৃত হয়ে যায়। বাঁকুড়া সংস্কৃতিতে দুর্গা, শিব, চামুণ্ডা, সরস্বতী, চণ্ডী, বৃক্ষ, সর্পপূজার প্রবেশ ঘটে। জৈনরা যেমন এর পূজা শুরু করে তেমন জৈন দেবীরা পরিবর্তিত হন পার্বতী, বাসুলী, ভৈরবীতে। লোকায়ত স্তরে এর ফলে জৈন-হিন্দুর সূক্ষ্ম তফাৎটিও লুপ্ত হয়।

বৈষ্ণব ধারা : ওড়িয়া প্রভাব

গুপ্তযুগে শুশুনিয়া শিলালিপিতে যেমন প্রথম বিষ্ণুসাধনার ইঙ্গিত আছে, তেমনি মল্লযুগে হাম্বির প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মাচারের সংবাদ মেলে। বহু প্রত্নপ্রমাণও বৈষ্ণব ধারার সাক্ষ্য দেয়। বিষ্ণু মূর্তির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে শালতোড়ার বিহারীনাথে, বাঁকুড়া থানার এক্তেশ্বরে, বিষ্ণুপুরের রাধানগরে, জয়কৃষ্ণপুরে, ধরাপাটে, বাসদেবপুরে, ইন্দাস থানার ইন্দাসে, আটবাইচণ্ডীতে, সোমসারে, রানিবাঁধ থানার অম্বিকানগরে, জয়পুর থানার গোকুলনগরে, সলদায় ও পাত্রসায়রে। এগুলি সব গড়ে উঠেছিল দশম-একাদশ শতকে। সেন যুগের সূচনা পর্ব থেকেই শৈব ধর্মের জাগরণ শুরু হয়। তাছাড়া শূরবংশীয়রা ছিল শৈব ধর্মাবলম্বী। মল্ল সময়ে নির্মিত শিব দেউলগুলি হল বিষ্ণুপুর, এক্তেশ্বর, বহুলাড়া, সিহড়, জগন্নাথপুর, মুনিনগর, ডিহর,আটবাইচণ্ডী, এ্যালাটি পত্রসায়ের, ভড়া। এই ধারা অব্যাহত ছিল অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত।

শৈব মূর্তি উদ্ধার হয়েছে জয়পুরে মোলকারি গ্রামে, পাঁচমুড়া গ্রামে, পাত্রসায়ের কান্তোরে, শলদা, রাধানগর থেকে। বিভিন্ন শৈব মেলার স্থান তালিকা থেকে শৈব প্রভাবের প্রাবল্য অনুভব করা যাবে। বৃহৎ গাজন মেলা হয় এক্তেশ্বর , বহুলাড়া, ডিহড়, বড়জোড়া, জগন্নাথপুর, পাঁচাল, বেলিয়াতোড়, বিষ্ণুপুর, সিহড়, বিহারীনাথ, শালতোড়া, পরেশনাথ প্রমুখ জায়গায়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে মল্লভূমির বিভিন্ন শাক্ত মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যায় (অম্বিকা, কালী, চন্ডী, চামুন্ডা, ছিন্নমস্তা, সর্বমঙ্গলা, বিন্ধবাসিনী, চক্রবাহিনী, ভগবতী,ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মণী, আটবাইচণ্ডী, মহিষাসুরমর্দিনী, বারাহী, মৃন্ময়ী পূজার মাধ্যমে)। শক্তি মূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে খাতড়া, রাইপুর, ইন্দপুর, রানিবাঁধ, সিমলাপাল, সাহারজোড়া, পাত্রসায়ের, নাড়িচা, জয়কৃষ্ণপুর, সলদা, হদলনারায়ণপুর, আগড়দা,

সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, গোকুলনগরে।

একই সময়ে সৌর ও গাণপত্যের আরাধনা শুরু হয়। সূর্য মূর্তি আবিষ্কার হয়েছে পাত্রসায়রের শ্যামদাসপুরে, বিষ্ণুপুরের জয়কৃষ্ণপুরে, জয়পুরের রাজগ্রামে, সোনাতাপলে, আঁতড়ায়, ময়নাপুরে।

গণপতি মূর্তি পাওয়া গেছে রাণীবাঁধের সারংগড়ে, বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর দেউলে, ওন্দার হরিহরপুরে, এক্তেশ্বরে, নাড়িচার সর্বমঙ্গলা মন্দিরে, বিষ্ণুপুরের রাধানগরে, ইন্দপুর ব্রাহ্মণডিহায়, অযোধ্যায়।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি বা তার আগেই তুঙ্গভূমে ও সারংগড়ে জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। ওড়িয়া রাজাদের সাথে সখ্যতার কারণে মল্লভূমেও জগন্নাথের আরাধনা বিস্তার লাভ করেছিল। ১৬৫০-৬০ সালে রূপরামের লেখা ধর্মমঙ্গলের ভাষ্য অনুসারে, 'পশ্চিমদিকের রাজা সিংহ গজপতি/ধলরাজা মল্লরাজা যাহার সঙ্গতি।'

বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করা যায় জগন্নাথপুরেই (সাতপাট্টা-গড়খ্যল্লা) প্রথম জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। এখান থেকে শ্যামসুন্দরপুরে রাজধানী স্থানান্তর হলে জগন্নাথ মন্দিরের ঠাঁই হয় মণ্ডলকুলিতে। শ্যামসুন্দরপুরের রাজপুরোহিত মার্কণ্ড পাণ্ডা দেবোত্তর মৌজা নীলজোড়ে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেটি মটগোদায় স্থানান্তরিত হয়। শ্যামসুন্দরপুর থেকে বিভাজিত রাজ্য ফুলকুসুমার রাজধানী রসপালেও জগন্নাথ মন্দির গড়ে উঠেছিল। মালিয়াড়ার অধূর্য্য রাজপরিবারের জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল অনুমানিক সপ্তদশ শতকে।

১১৩৫ সালে চোড়গঙ্গরাজ অনন্তবর্মা দক্ষিণ রাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং কথিত আছে এই গঙ্গবংশীয়রা জৈন ধর্মমতের অনুগত ছিল এবং জৈনদেবী অম্বিকার উপাসক ছিল। অনন্তবর্মার আগমনের সময় রাঢ়ের ইতিহাসে কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল। যেমন ১) এসময় ছিল পাল শাসনের ক্রান্তিকাল ও সেনদের উত্থানের লগ্ন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'উৎকলরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গা যখন গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন তখন বিজয়সেন বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বোধ হয় সমগ্র উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় তাঁহার করতলগত হয়েছিল।'[৩৫]

২) ঐতিহাসিক তথ্য পরম্পরা মোতাবেক বিজয় সেন কুমার পালকে পরাজিত করে গৌড়ের শাসন ক্ষমতার দখল নিতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ দেবপাড়া শিলালিপি থেকে জানা যায় যে গৌড়েশ্বর বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন।[৩৬]

৩) স্পষ্টতই এই যুগান্তের ক্ষণে হিন্দুধর্মীয় শূর আধিপত্য বিনষ্ট হয়েছিল। আগেই

বলা হয়েছে শূর শাসকরা প্রধান বা অপ্রধান তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে ছান্দার কেন্দ্রিক শূর শাসক রণশূর সম্ভবত রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত হন ও সেনানায়ক নৃসিংহ বাহনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। রাজেন্দ্রর আগমনে বৌদ্ধধারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে ও হিন্দু পুনর্জাগরণ তরান্বিত হয়। যদিও লক্ষ্মীশূর কৈবর্ত বিরোধী মহাজোটের শরিক হয়ে জয়লাভ করেছিলেন, পালেদের দুর্বলতার সুযোগে ও শূরেদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে (শূর রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিজয় সেন বিবাহ করেন) শূর আধিপত্যের স্থলে সেন শাসকদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। ইতিমধ্যে বাঁকুড়ার অন্যতম সামন্তশাসক বীরগুণও বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত হয়েছেন। মন্দারণে অনন্তবর্মার বিজয় ছিল শূর শাসকদের অন্তরাগ।

৪) রাঢ়ে ওড়িয়া প্রভাব নূতন সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে। অনন্তবর্মার আগে দ্বিতীয় মহীপালের (৯৮৮-১০৩৬) সময়ে ওড়িয়াপতি শিবকর-৩ রাঢ়ে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি রাঢ়ের একটি গ্রাম 'জারা' দান করেন। তবে তার প্রভাবের বিস্তৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই। বস্তুত অনন্তবর্মার রাঢ় বিজয়ের পর বহুকাল রাঢ়ে ওড়িয়া প্রভাব বর্তমান ছিল। অনঙ্গভীম-২ (১১৯০-১১৯৩) গঙ্গার পশ্চিমতীর পর্যন্ত অধিকৃত ভূমিতে জরিপ কাজ করেন বলে ঐতিহাসিক তথ্য আছে। এর পরেই বাংলায় বখতিয়ার খিলজির আগমন ঘটে। অনঙ্গভীম-৩ ১২১১ সালের পর গিয়াসুদ্দিন খিলজিকে বীরভূম-দামোদরের অন্তর্বর্তী স্থানে প্রতিরোধ করে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ দেন। অনঙ্গভীম-৩ বাংলার সুলতানকে পরাজিত করলেও তাঁর পুত্র নরসিংহদেব মালিক তুঘানের সাথে ১২৪৪-৪৫ সালে বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে কাটাসঙ্গের যুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে নামেন। এই লড়াইয়ে তিনি জয়ী হলেও পাঁচ বছর পরে সুলতান মুঘিসুদ্দিন উজবেক নরসিংহের জামাতা প্রদ্যুম্নকে পরাজিত করলে রাঢ়ে দীর্ঘ ওড়িয়া প্রভাব অবসন্ন হয়ে পড়ে। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর অনুমান এই প্রদ্যুম্ন জয়পুরে প্রদ্যুম্ননগরকেন্দ্রিক শাসনের সূচনা করেন, যার উচ্ছেদ সাধন করে মল্লশাসনের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই দীর্ঘ ওড়িয়া শাসনে অম্বিকানগর-সারংগড়ে একটি প্রান্তিক দুর্গ ও জৈন সাধনা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রসমীক্ষাতে সাতপাট্টা-মণ্ডলকুলি- মঠগোদা-জগন্নাথপুরে নকুড়তুঙ্গ পূর্ববর্তী সময়ে একটি জৈন নগরী গড়ে উঠেছিল বলে ইঙ্গিত মিলেছে।[৩৬ক]

মাদলা পাঁজী, বিভিন্ন পুঁথি ও লেখ থেকে একাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত মন্দারণ-আরম্যনগরে (বর্তমান আরামবাগ) ও সন্নিহিত দক্ষিণ বাঁকুড়ায় (সারংগড় কেন্দ্রিক) ওড়িয়া আধিপত্য প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রশাসন থেকে থেকে জানা যায়,[৩৭]

'আরম্যানগরাৎ কলিঙ্গজবলপ্রত্যুগ্রভগ্নাবৃতি
প্রাকারায়াততোরণ প্রভৃতিতো গঙ্গাতক্ষস্থাত্ততঃ।
পার্থাস্ত্রৈযুধি জর্জরীকৃতনমদ্রাধেয়গাত্রাকৃতি
মন্দারাধিপতিগর্গতো রণভুবো গঙ্গেশ্বরানুদ্রুতঃ।'

৪) ১৩৫৮ সালে ওড়িয়াবাসী শ্রীপতি মহাপাত্র ও নকুড়তুঙ্গ তুঙ্গভূমে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে বৈষ্ণব ধারা এই অংশে পুষ্ট হতে থাকে। ২৫২ জন ওড়িয়া সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করেন। এদের প্রভাবে উপজাতীয় খুপড়ি চাষের পরিবর্তে জলাজমি চাষ প্রবর্তিত হয়। চাষে পুঁজির আগমন ঘটে। ঊর্ধ্বমুখী সামাজিক সচলতার সাক্ষ্য মেলে।

৫) প্রদ্যুম্নের পরাজয়ে ওড়িয়া শাসনের অবসান ঘটার দুই শতাব্দী পরে কপিলেন্দ্রদেব সুলতান নাসিরুদ্দিনকে পরাজিত করে ওড়িয়া হৃত রাজত্ব গৌরব ফিরিয়ে আনেন। ১৫৬৪-৬৫ সালে মুকুন্দদেবের সময়কাল পর্যন্ত এই প্রভাব অক্ষত ছিল, সপ্তগ্রাম পর্যন্ত।[৩৮] সুলেমান কররানী ওড়িষা অভিযানে এই আধিপত্য অন্তর্হিত হয়। ১৪৮৬ সালে প্রতাপরুদ্রের আমারা সুরথানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় ও সারংগড়ে জগন্নাথের মূর্তিসহ আশ্রয়ের কাহিনি কোনো কোনো সূত্রে উল্লেখিত হয়।[৩৮ক] এই দীর্ঘ ওড়িয়া প্রভাব রাঢ় বাঁকুড়ার সমাজ জীবনকে প্রভাবিত ও চালিত করেছিল।

৬) ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে তুঙ্গভূমের পালাবদলের কারিগর শ্রীপতি মহাপাত্র ছিলেন যাজনগরের চোড়গঙ্গদের শাস্ত্রজ্ঞ রাজপুরোহিত। এ বিষয়ে জন বিমস তাঁর "Tribes and Caste of Orissa",[৩৮খ] উল্লেখ করেছেন, "The twelve century Chourgangia Raja brought Brahmins of highly cultured Vedic knowledge from Jajpur area with a view to making ritual rites and offering devotional hymns to Lord Jagannath and allowed them to live permanently within a radius of sixteen crossa" রাঢ়ে শাস্ত্র-সাহিত্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষায় এমন বহু পুঁথি উদ্ধার করেছেন। তাঁর মতে তুঙ্গভূমের রাজপরিবারে (এমনকি মহিলারাও) ও রাজানুকূল্যে রাজ্যে এমন শাস্ত্র ও সাহিত্যের বিপুল চর্চা প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণুপুরকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধারা : শৈব সহাবস্থান-মহাবীর-চৈতন্য-শ্রীনিবাস

বাঁকুড়ায় তিনটি জগন্নাথ পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল। প্রথমটি রাইপুরের সাটপাট্টা-মণ্ডলকুলি-জগন্নাথপুর পরিমণ্ডল, দ্বিতীয়টি পরেশনাথ-সারংগড়- অম্বিকানগর

পরিমণ্ডল, তৃতীয়টি বিষ্ণুপুর পরিমণ্ডল। মানিকলাল সিংহের মতে ৮৫৬ বঙ্গাব্দে পতিত মল্ল প্রথম বিষ্ণুপুরে জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য হাম্বীরের আমলে শ্রীনিবাস প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারায় মল্লভূম প্লবিত হয়েছিল।

লোকশ্রুতি অনুসারে নকুড় তুঙ্গ ওড়িয়াবাসী শ্রীপতি মহাপাত্রের সাহায্যে তুঙ্গরাজবংশের সূচনা করেন কালাপাহাড়ের আক্রমণের সময় অর্থাৎ ১৫৬৭-৬৮ সালে। জগন্নাথের অনুগামী নকুড় সাতপট্টা-মণ্ডলকুলি-জগন্নাথপুর পরিমণ্ডল বৈষ্ণব ভাবাধারায় সিঞ্চিত করেন।

মাদলাপঞ্জী অনুসারে ১৪৭৮-৮৬ সালে গৌড় শাসকের আক্রমণের কারণে ওড়িয়ারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদেবকে সারংগড়ে পার্বত্যগুহায় লুকিয়ে রাখেন। এই সারংগড়ের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক হলেও গঙ্গরাজরা পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগেই সারংগড়ে জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন (বর্তমানে মুকুটমণিপুরের জলাধারে এই সারংগড়ের প্রত্ননিদর্শন নিমজ্জিত আছে বলে অনেকের ধারণা ও এখানে একটি জগন্নাথ মন্দিরও ছিল বলে জানা যায়)।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে[৩৮গ] জেলার সমস্ত জৈনমূর্তি দশম শতকের বা কিছু পরবর্তীকালের। ওড়িয়া রীতির রেখদেউলগুলি গড়ে উঠেছিল দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে।

জয়পুরের শলদা-গোকুলনগরের প্রাপ্ত শৈবচিহ্ন কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে পালযুগের প্রথম দিকের। পাত্রসায়ের থানার কান্তোর গ্রামের ষটচক্রবাহিনী শিব মূর্তিটি খ্রিস্টীয় নবম শতকের বলে অনুমিত। চন্দ্রবর্মার বিষ্ণুর প্রশস্তিসূচক শুশুনিয়া শিলালিপি চতুর্থ শতকের বলে প্রমাণিত ।শলদা-গোকুলনগরে বরাহ অবতারের মূর্তিটি পালযুগের বলে মনে করা হয়।

শলদার নাগছত্রযুক্ত শঙ্খপুরুষ ও লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি বৈষ্ণব-মহাযানী ভাবধারার মিলনের ফল মনে করা হয়। এ সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত হল,[৩৯]
“The particular class of specimen therefore indicates a blending of the older Bhagavata class of Vaisnava images and Lokesavara of the later Mahayana school of Budhism.”

এবিষয়ে ডঃ গৌরপদ সেনের অভিমত হল, ‘যেমন চোরগঙ্গের সময় দক্ষিণ বাঁকুড়ায় সারংগড় ও নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে জৈন মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। চোড়গঙ্গের অনন্তবর্মণের আরাধ্য তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্বপাথ। বাঁকুড়া জেলার যে কয়টি প্রাচীন রেখদেউল এখনও দেখা যায় যেমন সোনাতাপল-এর দেউল (এখানে সূর্য পূজারও নির্শন আছে),বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর দেউল, অম্বিকানগরের ও হাড়মাশড়ার

রেখদেউল-এদের প্রায় সবগুলিই অনন্তবর্মণের সমসাময়িক বলে অভিমত প্রচলিত রয়েছে। মল্লভূম তথা বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির ইঙ্গিত এই যে খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্গ্রন্থদের ধর্মকে ঘিরে এক আন্দোলন বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।'[৪০]

বাঁকুড়ার মুসলমান জনসমাজ ও সুফীবাদ

কালাপাহাড়ের দর্শন ছিল বাঙালি সংহতি ও জাগরণ যা সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক ধর্ম বিশ্বাসে রূপান্তরিত করেই করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে হিন্দু ধর্মের বিনাশ ও মুসলিম একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্রতী হন। এই লক্ষ্য বলা বাহুল্য সফল হয়নি। বাঁকুড়া ভূমিতে এই আতঙ্ক ও অত্যাচারের আবহেও ধর্মান্তর সম্ভব হয়নি। কারণ ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে এখানে ধর্মান্তরিত মুসলিম নগণ্য, বহিরাগতই বেশি। মনে করা হয় কৌম লোকধর্মের প্রাবল্যে সাধারণ জনমানসে ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সমতার আবেদন রাঢ়ের জনমানসে বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাঢ়ে হিন্দু ওড়িয়া শাসনের প্রভাবকেও এর পেছনে বড় কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

তিনি বলেছেন,[৪১] "রাঢ়দেশ মুসলমানের অধীন না হওয়ার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। উড়িষ্যার রাজারা খুব প্রবল ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে সমস্ত রাঢ়দেশ দখল করিয়া লইতেন।" অর্থাৎ সমগ্র বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনার সামাজিক প্রভাব থাকলেও বাঁকুড়ায় তার অন্যথা হয়েছিল। জেলার এক সময়ের কালেকটর রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, "The Musalman conquest of Bengal, however made no difference to the Bishnupur province."

যদিও ও' ম্যালীর ধারণা ছিল বাঁকুড়ার মুসলমানরা মূলত ধর্মান্তরিত, অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী ক্ষেত্রসমীক্ষা ও অন্য তথ্যপ্রমাণ সহযোগে প্রমাণ করেছেন যে এই ধর্মাবলম্বীরা মূলত বহিরাগত। তাঁর মতে, 'একটি সমীক্ষাতে জেলার উত্তরদিকের বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দাস ও বিষ্ণুপুর থানায় বসবাসকারী মুসলমানদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষদের আগমন ঘটেছে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে, বাঁকুড়া শহর তালডাংড়া ও মূল খাতড়া জনবসতির মুসলমানদের পূর্বপুরুষদের আগমন বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বাণিজ্যিক কারণে, এবং কোতলপুর, জয়পুর, তালডাংড়া, ওন্দা, রাইপুর থানা ও খাতড়া ব্লক ২ এলাকা, এমনকি বিষ্ণুপুর থানার অংশ বিশেষে বসবাসকারী মুসলমানদের আগমন প্রধানত বর্ধমান ও হাওড়া জেলা থেকে। প্রসঙ্গত তালডাংড়া থানার সীতাপুরের 'মীর' সম্প্রদায়ের মুসলমানরা নিজেদের আসরাফী কওমের লোক বলে ও তাদের পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদ থেকে আগত বলে দাবি করে।

খাতড়া থানার হিড়বাঁধ ব্লকের গোপালপুরের বাসিন্দা সত্তর-আশি ঘর মুসলমানের পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছিল হুগলি জেলার রামজীবনপুরের পার্শ্ববর্তী হাজীপুর গ্রাম থেকে খেজুর মহল করতে। অতএব বাঁকুড়া জেলার মুসলমানদের সম্পর্কে ও' ম্যালির এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বাস্তবতঃ বৃহত্তর অংশের পূর্বপুরুষগণ ছিল আরবীয়, বাগদাদী, ইরানীয় ও আফগান; উত্তরপ্রদেশ ও বিহার এলাকা থেকে আগত, এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, মালদহ জেলার বহিরাগত। তুলনামূলকভাবে স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বংশধরদের সংখ্যা জেলার মুসলমান জনসংখ্যায় উল্লেখযোগ্য নয়।'[৪২]

রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে বাঁকুড়ার মুসলমানরা মূলত অন্য দেশাগত। কারণ, 'বাঁকুড়া জেলায় ইসলামের পদচারণার পিছনে তরবারি বা রাজনৈতিক আধিপত্যের কোনো কারণ ছিল না। প্রধানত নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এ জেলায় বর্ণজাতিভিত্তিক ভেদবুদ্ধি ও অস্পৃশ্যতার প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও উচ্চবর্ণীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় বাউরী- বাগদি-খয়রা-ডোম ইত্যাদি নিম্নজাতীয়দের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মনসা-মাদনা-ধর্ম ইত্যাদি লৌকিক দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান ও জাতি-গোত্র-সামাজিক মর্যাদা অনপেক্ষ শিবগাজনে ভক্ত্যাকৃত্য গ্রহণের রীতি ইত্যাদি অবলম্বন করে এক তৃণমূলস্তরীয় সর্বজনীনতাবোধ বিরাজিত থাকায় ইসলামের সামাজিক সাম্যের আদর্শ নিম্নজাতীয়দের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবেদন বিশেষ কাজ করেনি। বস্তুত এ জেলায় মুসলমান জনগোষ্ঠী গড়ে উঠার জন্য নানাবিধ কারণ কাজ করেছিল, ধর্মান্তকরণের সাফল্য ছিল গৌণ।'

ইসলামীকরণের মুখ্য কারণগুলি ছিল ১) তুর্ক-আফগান-মুঘল শাসকদের আক্রমণ ও অভিযানের অভিঘাত ২) সুফি মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে এ জেলায় পীরেদের আগমন ৩) ভূমরাজ্যে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কারণে বহু মুসলিম পরিবারের আগমন ৪) ভূমরাজ্যের সামরিক আরক্ষার কারণে ছড়িদারের মতো ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আগমন ৫) মুঘল শাসনের ভাঙন ও কর্মচ্যুত সেনাদের একাংশ ফকির সহ বিভিন্ন দলপতির অধীনে বর্গী আক্রমণের পটভূমিতে বাঁকুড়ায় উপস্থিতি ৬) রেশমগুটি উৎপাদনে পটু একদল ধর্মাবলম্বী বাঁকুড়ার রেশম চাষের শরিক হওয়া।

স্পষ্টতই বাঁকুড়ায় এই সব কারণে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল কম। রবার্টসন তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন, "The number of Muhammadans in the district is small.... They are to be found mainly in Siromonipur, Indas and Patrasair thanas..."[৪৩] বরং লোকায়ত স্তরে সুফিবাদ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

বর্গী হাঙ্গামা ও সামাজিক বিপন্নতা :

মোঘল শাসনের ক্রান্তিকালে মারাঠা জাগরণ ঘটে। ভারতবর্ষের বৃহদাংশ মারাঠা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বাংলার চৌথ-কর আদায়ের দাবি করে মারাঠারা। নাগপুরের পেশোয়ার সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিতের অধীনে একদল বর্গীসেনা ছোটোনাগপুর মালভূমি হয়ে ১৭৪২ সালে রাঢ়ভূমিতে প্রবেশ করে স্থানীয় জনতার উপর অপরিসীম নির্যাতন শুরু করে। এই নির্যাতনের কাহিনি বিবৃত হয়েছে বর্ধমানরাজের সভাকবি বাণেশ্বরের চিত্রাচম্পু, গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে। এই আক্রমণকালে মল্লরাজ ছিল গোপাল সিংহ। বর্গী আগমন সম্পর্কে মদনমোহন বন্দনায় রতন কবিরাজ লিখেছিলেন,[৪৪]

> 'আইলেন ভাস্কর খবর কহে শুভঙ্কর,
> তিন লক্ষ ঘোড়া সঙ্গে কর‍্যা,
> শুনিয়া চিন্তিত রাজা নানস্তানি হৈল প্রজা
> ভাবনা করয়ে মনে মনে।'

মল্লরাজ দেশকে রক্ষা করার জন্য সাধন ভজনের আশ্রয় নিলেন। মন্ত্রী শুভঙ্কর রাজধানী রক্ষার তাগিদে প্রত্যুষে দলমাদল কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করে শত্রু শিবির বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু গ্রামীণ বিষ্ণুপুরে এদের অত্যাচার ছিল অবাধ ও অকথ্য।[৪৪ক] শুভঙ্কর তাঁর আর্যায় লিখেছেন,[৪৫]

> 'সাগর ঘোষ নামে এক গোওআলা আছিল।
> দৈবের কারণে বর্গী আসিয়া পড়িল।।
> সর্ব্বস্ব হইল গোপের না লইল গাই।
> সাত ভাই মধ্যে তার রহিল তিন ভাই।।
> কনিষ্ঠ চারি ভাইকে বর্গী বাঁধি লয়া গেল।
> যকথোদিনে তিন ভেয়ে পৃথক হইল।।'

১৭৫২ সালে রচিত গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে এই বর্গী আক্রমণ নিয়ে ভ্যষ্য ছিল,

> "গোয়ালভূমঞিঃ সেনভূমঞিঃ সব পোড়াইল।
> চতুর্দিকে সব পোড়াইয়া বিষ্ণুপুরে আইল।।"

অর্থাৎ সেনভূমি, গোপভূমি ছারখার করে মল্লভূমে বর্গী আগমন ঘটেছিল। রাজধানী শহরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে পার্শ্ববর্তী ধরাপাট, রামসাগর, পাইকপাড়া, যাদবনগর, ব্রজরাজপুর[৪৫ক] প্রভৃতি গ্রাম বর্গীদল ছাড়খার করে দেয় (অগ্নিসংযোগ, অঙ্গচ্ছেদ, হত্যা,

নারীদের সম্ভ্রমহানি, সোনা-রূপাসহ দ্রব্যাদি লুঠ)। গুলাম হোসেন রচিত রিয়াজ-উস-সালাতিন নামক গ্রন্থে এই বর্গী অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। সালাতিনের ভাষ্য, "Sacking the villages and towns of the surrounding tracts, and engaging in slaughter and captures, they set fire to granaries, and spread no vestiges of fertility. And when the stores and granaries of Burdwan were exhausted, and the supply of imported grains were also completely cut off, to avert death by starvation, human being ate plant's roots – murderous freebooters drowned in the rivers a large number of the people, after cutting their ears, noses and hand – burnt them with indescribable tortures."[৪৬]

কৃষি ও কৃষকের বিনাশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রেও নেমে এসেছিল সংকটের কালো মেঘ। মল্লভূমির মুখ্য শিল্প সুতি-বস্ত্রের যোগানদার মালবেরী গাছকে এরা ঘোড়ার খাদ্য করে তোলে। হলওয়েল এ সম্পর্কে লিখেছিলেন,[৪৭] "They committed the most horrid devastation and cruelties, fed their horses– with Mulbery Plantations– a general face of ruin succeeded– and husbandmen fled"

কৃষি ও শিল্পের সার্বিক ধ্বংস এলাকার মানুষকে নিঃস্ব করে তোলে। লোকে দেশান্তরী হয়।[৪৭ক] অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গঙ্গার ওপারে আশ্রয় নেয় (ঘোড়া সওয়ারী বর্গীদের পক্ষে চিরস্রোতা গঙ্গা নদী পার কঠিন ছিল)। হান্টার এবং ও' ম্যালীর বিবরণে এর সত্যতা মেলে। তবে দেশীয় রাজন্যবর্গ দ্বারা কিছু প্রতিরোধ ও সংঘর্ষ যে হয়নি তা নয়। বর্গী শিবিরে মল্লরাজধানী থেকে গোলা বর্ষণ, সামন্তপতি স্বরূপনারায়ণের সফল বর্গী বিরোধী অভিযান ছাড়াও রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে রাইপুরে যে সংঘর্ষে মিরণ শাহর মৃত্যু হয়েছিল তা আদপে রাইপুর রাজের অধীনস্ত সশস্ত্র ফকির সর্দার মিরণ শাহের সাথে বর্গীদের সংঘর্ষের ফল। এতে মিরণ শাহের মৃত্যু হয় ও রাজ পরিবারের বিনাশ ঘটে।[৪৮]

বাঁকুড়ায় বর্গী আক্রমণের প্রমাণ সংকলন করতে গিয়ে যে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ্য তা হল ১) ভাস্কর সোনামুখীতে কালীপূজা করেছিলেন বলে কথিত, ২) হৃদলনারায়নপুরের 'চল্লিশ কুঠরি ঘর' আক্রান্ত হয়, ৩) জয়পুরের শালদা গ্রামের ভুবনেশ্বর শিবের রত্নালঙ্কার লুণ্ঠিত হয়, ৪) মেজিয়ার রামচন্দ্রপুরের পূর্বদিকের সড়ককে 'বর্গীয় সড়ান' বলে উল্লেখ গ্রামের দেবোত্তর সম্পত্তির দলিলে (১৭৭১ সালে কালেকটর হিগিনস কর্তৃক স্বীকৃত), ৫) ছাতনার রাজা স্বরূপনারায়ণের সাথে যুদ্ধে বর্গীদের ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং সাতশো বর্গীসেনার ছিন্ন মাথা মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হয়[৪৮ক] ৬) সম্ভবত রাইপুরের রাজা ও সেনাপতি মারাঠাদের সাথে সংঘর্ষে উৎসাদিত হন।[৪৯] ৭) ইন্দাসের

মঙ্গলপুর-বেতানল গ্রামে বর্গী আক্রমণকালে চক্রবর্তী পরিবার কৌশলে বর্গীদের বিতাড়িত করেন। এরপর থেকে পরিবারটি 'বর্গী ভুলানো বামুন' নামে পরিচিত হয়।

বর্গী আক্রমণের বীভৎসতা ও ব্যাপকতায় বাঁকুড়ায় যে ক্ষতি হয় তা হল ১) ব্যাপক লুন্ঠন ও অত্যাচার, ঘোড়াদের দাপাদাপিতে ফসল নষ্টের কারণে কৃষি ও কৃষক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। বেশিরভাগ কৃষক দেশান্তরী, এমনকি গঙ্গার পূর্বপারে অনেকে পালিয়ে যান। ২) বস্ত্রশিল্পেও নেমে আসে অনিশ্চয়তার ঘনঘটা। বর্গীরা তুঁত গাছের পাতা নির্বিচারে ঘোড়ার খাদ্য করে তোলায় এবং তাঁতিদের উপর অত্যাচার করায়, রেশম তথা বস্ত্র শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। ৩) নারী পুরুষের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও সম্ভ্রমহানির কারণে দেশান্তরের ঘটনা ঘটে।[৪৯ক] গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। ৪) গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ায় ভূমরাজারা রাজস্ব আদায় ও নবাবকে পরিশোধ দিতে ব্যর্থ হয়। ৫) এই অর্থনীতির পটভূমিতে ১৭৭০ সালে কালান্তক মন্বন্তরের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি রথীন্দ্রমোহন চৌধুরি ক্ষেত্রসমীক্ষায় বর্গী আক্রমণের ফলে বিনষ্ট পূর্ব-দলিলের উল্লেখ সমন্বিত একটি ভূমি দলিলের সন্ধান পেয়েছেন।

এই পৌনঃপুনিক হাঙ্গামার ফলে বাঁকুড়া ভূমির জনবিন্যাস ও সামাজিক বাঁধন বড় নাড়া খায়।

সাঁওতাল সমাজের ভাঙন

বাঁকুড়ায় মুন্ডা উপজাতি ছিল প্রাচীনতম জাতি যাদের অসুরভাষীদের উত্তরপুরুষ মনে করা যায়। প্রাচীনকালে কোন সময়ে সাঁওতাল জাতি বর্তমান ঝাড়খণ্ড (চো-চম্পা) থেকে দামোদরের পথে ছাতনা-শিলদাকেন্দ্রিক বসতি স্থাপন করেছিল তা বলা কঠিন। শিলদার সন্নিকটে তুঙ্গভূমে একসময় শাসন অধিকার সাঁওতালদের হাতে চলে যায় যা পরবর্তীকালে মুন্ডা জ্ঞাতিত্বে আবদ্ধ দলপতির হাতে পুনরুদ্ধার হয় বলে অনুমান। ছাতনার শাসন ক্ষমতা মাঝে স্বল্প সময়ের জন্য শিখররাজ সমর্থিত ব্রাহ্মণ রাজার হাতে গেলেও তা শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বংশীয় রাজাদের হাতেই ছিল। পরবর্তীকালে ম্যাকালপিন প্রতিবেদনে দেখা যায় ঔপনিবেশিক শাসনে এই উপজাতিরা শোষণ ও সামাজিক ভাঙন কবলিত হয়ে পড়েছে।[৪৯খ] একই ভাবে নিম্নবর্ণীয়দের জীবনের সংকট স্ক্রাইনের প্রতিবেদনে বিধৃত আছে।[৪৯গ]

জালপ্রতাপ : বর্ধমান রাজ ও মল্লরাজের বিরোধে ঔপনিবেশিক ভূমিকা

বর্ধমান রাজ ও মল্লরাজের বিরোধের ইতিহাস অনেক পুরানো। ঔরঙ্গজেবের আমলে মহারাজ কৃষ্ণরাম চেতুয়া-বরদা ও মল্লরাজের যৌথবাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। পরবর্তীকালে কীর্তিচাঁদ যেমন চেতুয়া-বরদা দখল করেন, মল্লভূমের

একাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন (ফতেপুর মহল)। বিষ্ণুপুর জমিদারির পতনে চৈতন্য সিংহের আমলে বর্ধমান জমিদারের আগ্রাসী ভূমিকা দেখা দেয়। জমিদারির অধিকাংশই তাঁরা কিনে নেন। পত্তনি প্রথা চালু করে এই অংশে তাঁরা প্রজাদের উপর করভার বহুগুণিত করেন ও প্রজারঞ্জক জমিদারদের পরিবর্তে ব্যবসায়ী মানসিকতার পত্তনিদারদের আগমন ঘটে। চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বর্ধমান রাজপরিবারের সদস্য হিসাবে প্রতাপচাঁদ বর্ধমান রাজ সিংহাসনের উপর তাঁর দাবি আদায়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাঁকুড়া এলে, মল্লরাজার বংশধরেরা তাঁর সমর্থনে দাঁড়ায়। যদিও এজন্য তাঁদের রাজরোষ, লাঞ্ছনা এমনকি গ্রেপ্তারিও সহ্য করতে হয়। জালপ্রতাপ গ্রন্থে যদুনাথ প্রতাপের বাঁকুড়া আগমন নিয়ে লিখেছিলেন, 'এই সময় সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল, কোথায় বাস না করিয়া সরকারী সারকিট হাউসের নিকট তেঁতুল তলায় গিয়া থাকিল, মেজিষ্টার সাহেবের বাটীতে দেখা করা, বোধ হয়, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; সন্ন্যাসীবেশে তথায় দেখা হওয়া বড় সম্ভব ছিল না। যে কারণেই হউক, সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মনে করিয়া থাকিবেন, মেজেষ্টার সাহেব এই পথে হাওয়া খাইতে আসিলেই সাক্ষাৎ হইবে। প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ বার্ত্তা বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। রাজা ক্ষেত্র সিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন এ কথাও লোকে শুনিয়াছিল সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল।

মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব দেখিলেন, এই এক সময়। এবার আর ঠকা হইবে না। অতএব তৎক্ষণাৎ দারগা, জমাদ্দার, বরকন্দাজ সমবিভ্যাহারে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা অনেকেই পালাইল, তথাপি প্রায় এক শত জন ধরা পড়িল। সকলেই জেল-থানায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য গবর্ণমেন্ট রিপোর্ট গেল যে, এক জন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে, সে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত জন ধরা পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী জেলখানায় থাকিলেন। যাঁহারা প্রতাপচাঁদের প্রত্যাগমন বার্ত্তা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কলিকাতা হইতে ইংরেজ উকীল বাঁকুড়ায় পাঠাইলেন।'

মানভূমের হাঙ্গামার পর বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চল ও মানভূমের জন্য পলিটিক্যাল এজেন্ট উইকিলসান ও হ্যারিংটন নিযুক্ত হন। মানভূম-বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটরা সাবধানী ও কোনো গোলোযোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে কৃত সংকল্প হন। ফলে প্রতাপ ও তার অনুচরদের কালবিলম্ব না করে গ্রেফতার করা হয়।

এই মামলা আদালতে উঠলে চৈতন্য সিংহের উত্তরপুরুষরা রাজা প্রতাপের পক্ষে

সাক্ষ্য দেন। যেমন রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ আদালতে বলেন 'আমার পিতার নাম মহারাজ চৈতন্য সিংহ, নিবাস বিষ্ণুপুর। তেজচাঁদ বাহাদুরের সাথে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমি বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা যাইতাম এবং এক একবার গিয়া দুই মাস করিয়া থাকিতাম। আসামী নিশ্চয় তেজচাঁদ বাহাদুরের পুত্র প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি প্রতাপের পলায়নবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। তাহার পর সাত আট বছর হইল লাহোর নিবাসী আমার একজন পাঠান দ্বারবান স্বদেশ হতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি রঞ্জিত সিংহের পুত্র খড়ক সিংহের সহিত প্রতাপচাঁদকে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' আসামী প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়েছিল। আমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে তথায় তিন মাস রাখি। সেই জন্য বাঁকুড়ার মেজেষ্টার আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন, আর বিস্তর অপমান করেন।'

জামকুড়ির জয় সিংহ প্রতাপচাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি বিষ্ণুপুরের রাজগোষ্ঠীসম্ভূত। আমি আসামীকে চিনি, প্রতাপচাঁদ।'[৫০]

রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী জানিয়েছেন কয়েকশত পশ্চিমা অস্ত্রধারীদের নিয়ে মিছিল সহযোগে প্রতাপ শহর পরিক্রমা করেন, তাঁর শক্তি প্রদর্শনের জন্য। তিনি জানান, '১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে.. জাল প্রতাপ নামে পরিচিত জনৈক মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর নিজেকে বর্ধমান রাজ এস্টেটের প্রকৃত মালিক বলে দাবি করে নিজের পক্ষে সরকারী সমর্থন আদায়ের জন্য বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। তখন জেলাশাসক ছিলেন ডব্লু. এইচ. এলিয়ট। 'জাল প্রতাপ' উন্মুক্ত তরবারী হাতে ৪০০ থেকে ৫০০ সশস্ত্র অনুচরসহ বাঁকুড়া বাজারের উপর দিয়ে আগমন করেছিলেন। তাঁর অনুচরগণ ছিল কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের মানুষ। তারা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী ছিল। ভবিষ্যতে সুযোগ সুবিধা লাভের প্রত্যাশা নিয়ে তারা তথাকথিত মহারাজা প্রতাপচন্দ্রের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে খুব বলিষ্ঠ ও সশস্ত্র কুড়ি থেকে ত্রিশজন বরকন্দাজ ছিল উত্তর ভারতীয়। অবশিষ্ট লোকজন ছিল মানভূম জেলার; তীর ধনুক ঢাল তলোয়াল লাঠি ও কিছু কিছু ছোট ছোট কামান ছিল তাদের অস্ত্র। বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের লোকেরা, বিশেষ করে ক্ষেত্রমোহন সিংহ, যেভাবে প্রতাপচন্দ্রের সমর্থনের দাঁড়িয়েছিলেন তা জেলাশাসকের চোখে ছিল খুবই লজ্জাজনক ও দাসসুলভ। জাল প্রতাপের সমর্থনের কারণ ছিল, নিজের অধিকার ফিরে পেলে বিষ্ণুপুর পরগণার অধিকার রাজ পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।'[৫১]

এই ঘটনা প্রবাহ থেকে বোঝা যায়, চৈতন্য উত্তরকালে প্রতাপচাঁদকেন্দ্রিক ঘটনা প্রবাহে বাঁকুড়া বেশ আলোড়িত হয়েছিল এবং মল্লরাজাদের পূর্ব গরিমা ফিরে পেতে এ ছিল শেষ প্রচেষ্টা।

মিশনারী প্রভাব ও মাড়োয়ারী আগমন :

বাঁকুড়ায় ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের কিছু আগে ইংরেজ বণিক ও ধর্মযাজকরা এখানে হাজির হয়। এরা মূলত নীলচাষের জন্যে এলেও পরবর্তীকালে বস্ত্র, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, ওষধি প্রভৃতি চাষেও জড়িয়ে পড়ে।

ঊনিশ শতকের তিরিশের দশকের গোড়া থেকেই জেলায় মূলত ধর্ম প্রচারের জন্য চার্চ মিশনারী সোসাইটি, ওয়েশলিয়ান মেথডিস্ট মিশন সোসাইটি ও আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন এ জেলায় সক্রিয় ছিল। অবশ্য ধর্মীয় প্রচারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো বিষয়গুলিতে এরা জনহিতকর ভূমিকা নিয়েছিল। সারেঙ্গার মতো কিছু এলাকায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এই ধর্মে দীক্ষিত হন। তবে বৃহত্তর বাঁকুড়ায় এই ধর্মান্তকরণের ব্যাপকতা তেমন ছিল না। বরং বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর শহরে মাড়োয়ারিদের উপস্থিতি বাণিজ্যিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৭২ সালের জনসমীক্ষা অনুসারে এ সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল ৭০। প্রথম মাড়োয়ারি হিসাবে রাণিগঞ্জ হয়ে এ জেলায় আসেন রাজস্থানের বিকানীর জেলার দেশনোক গ্রাম থেকে মহেশ্বরী সম্প্রদায়ভুক্ত রাঠী পরিবার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজস্থানের রতনগড় থেকে আসেন বাজোরিয়া। তাছাড়া এসেছিল সেলামপুরিয়া, সুহাসসরিয়া ইত্যাদি পরিবার। ১৯১৫ সালে বিকানীর জেলার চুরু থেকে ব্যবসা উপলক্ষ্যে হাজির হন জয়দয়াল গোয়েঙ্কা ও মোহনলাল গোয়েঙ্কা। মাড়োয়ারি সম্প্রদায় ব্যবসা ছাড়াও ত্রাণ কাজ, স্বাধীনতা আন্দোলনে, শিক্ষাবিস্তারের কাজে কোথাও কোথাও বিশিষ্ট অবদান রেখেছিল।

মেলাপার্বণ :

বাঁকুড়া তথা রাঢ়ের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের বড় অংশ জুড়ে আছে মেলা ও পার্বণ। বিভিন্ন সময়ে যে ভাবধারা এই অঞ্চলের মাটিকে সিক্ত করেছে সেই ভাবধারা মেলা পার্বণ আকারে লোকায়ত স্তরে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। যেমন সেন আমলে শৈব ধারার প্রভাবে গাজন মেলা জেলাব্যাপী জনচিত্তে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। মল্লরাজ বীরহাম্বীরের সমকালীন বৈষ্ণব ধারার প্রভাবে দোল ও রাস মেলার মতো লোকমেলার বহুল প্রচলন ঘটে। বাঁকুড়ায় এমন অনেক মেলা যেমন ১) এঁখ্যান উৎসব ২) তুসু পূজা ৩) মকর মেলা ৪) গাজন মেলা ৫) ধর্মরাজের মেলা ৬) মনসা পরব ও ঝাপান ৭) ভাদু উৎসব ৮) বারুণী মেলা ও উৎসব ৯) ইন্দ্র পরব ১০) নবান্ন উৎসব প্রভৃতি বহুল প্রচলিত। কিছু এমন মেলার স্থান নির্দেশ করা হল।

বাঁকুড়া থানায় এক্তেশ্বর, কেঞ্জাকুড়া, ঊড়িমা, কানকাটা, দশের বাঁধ, ভগবানপুর, জামবেদিয়া, মানকানালী, শুনুকাপাহাড়ী, আঁচুড়িতে শিবের গাজন; জগদল্লা, বাঁশি,

কোষ্টিয়া পুরন্দরপুর, নড়রা, জুনবেদিয়ায় গাজন; কালপাথরে শ্রীপঞ্চমী মেলা, বাঁকুড়া শহরে রথমেলা; পুরন্দরপুর, জগদল্লায় কালিয়াদমন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছাতনা থানার কামারকুলি, ঝাটিপাহাড়ী, ছাতনা, কুলঘেরা, মনতিমানো, কামাতেলিতে গাজন; জিড়রাতে দুর্গামেলা, আড়রাতে শ্রীপঞ্চমী মেলা, শুশুনিয়ায় বারুণীধারা মেলা পুরাতন মেলা। আর বিখ্যাত শালতোড়া থানার বিহারীনাথ, ঢেকিয়া, পাবড়া, তিলুড়িতে শিবগাজন মেলা। মেজিয়া থানার নামোমেজিয়া, অর্ধগ্রাম, বহড়া, তেঘড়িয়া, জেমুয়ায় গাজন মেলা পুরাতন মেলা। বড়জোড়া থানার বড়জোড়া, জগন্নাথপুরে গাজন মেলা, প্রতাপপুরে শ্রীপঞ্চমী মেলা, গৌড়বেড়ায় মকরমেলা, পোখন্নায় মাকড়ী সপ্তমী মেলা, কৃষ্টনগরে বারুণী মেলা প্রাচীন মেলার মধ্যে পরে। গঙ্গাজলঘাটী থানায় বড়শাল, ফুলজাম, কেশিয়াড়া, পিড়রাবণী, ভক্তাবাঁধে শিবগাজন মেলা; ভুঁইফোড়ে রামনবমী মেলা, তল ঝিটকা রাস মেলা অনেক কালের। ওন্দা থানার মৈয়া, এ্যলাথি, খামারবেড়া, সানতোড়, হরিহরপুর, লোদনা, ভোলা নূতনগ্রাম, ধন্না, রাইডি, ছোটকুরপা, বহড়ামুড়ি, বহুলাড়া, ওন্দা, তেলিবেড়া, রামসাগর, আগরদা, ঝটিবনী, ঝাটাবাড়ি, যাদবনগর, জামডহড়া, পিড়রায় শিবগাজন মেলা; তপোবনের রাবণকাটা মেলা, আসনাসোলে দুর্গাপূজা মেলা, হাটবাড়ি লক্ষ্মীমেলা, চন্দ্রকোণা, মন্দারবনীতে দোলমেলা, ভুলানপুর। কিয়াবতীতে সরস্বতীমেলা, চাগুলিয়ায় রাসমেলা, গোপালপুর, পুরুষোত্তমপুর, বহড়ামুড়িতে শ্রীপঞ্চমী মেলা, কৃষ্ণনগরে রথমেলা, গোড়াসোল, নাকাইজুড়িতে পৌষমেলা প্রাচীন মেলা হিসাবে চিহ্নিত। বিষ্ণুপুর থানায় চুয়ামসিনা, অযোধ্যা, ডিহড়, রাধানগরে গাজনমেলা, ভড়া, বিষ্ণুপুর শহরে রথযাত্রা, জনতায় বারুণীমেলা, দারিকায় দোলযাত্রা, তুড়কী সিতারামপুরে চব্বিশপ্রহর মেলা, পানসুলির পঞ্চমীমেলা, জিয়াবাঁধি, পিয়ারডোবা, বাসুদেবপুরে কালীপূজা মেলা, চাঁচড়ে দুর্গা মেলা, কেল্লায় রাস মেলা বহু পুরাতন মেলা। জয়পুর থানার পুরাতন মেলাগুলির মধ্যে আছে ব্রজসোল, হেতিয়া, বৈতল, কুচিয়াকোলের গাজনমেলা; দক্ষিণবাড়ে রথযাত্রা, গোকুলনগরের রক্ষাকালী মেলা। কোতলপুর থানার মির্জাপুরের শিবগাজন, শিহড়, সাপুর, নপুকুর, বালিঠায় পৌষ ও চৈত্রসংক্রান্তির মেলা; ছাতড়ার রাবণকাটা মেলা ও মদনমোহনপুরের রাসযাত্রা প্রাচীন মেলা হিসাবে পরিচিত। ইন্দাস থানার বেহার, কলাগ্রাম, গোপালনগর, সাসপুরের গাজন মেলা; কেনেটির সন্তোষরাম মেলা, শানপুরার পৌষমেলা, আব্দুলপুরের রথমেলা প্রাচীন মেলা। পাত্রসায়ের থানার দেউলপাড়া, নারায়ণপুর, ধান্না, বালমী, কুশদ্বীপ, সালকারী, পাত্রসায়েরের গাজন মেলা, কৃষ্ণনগরের কেন্দুলি মেলা, মহেশপুরের মকর মেলা, বীরসিংহের মহাস্থান মেলা, জামুকড়ির বাসন্তীমেলা, সিয়াপুরের মকরচন্ডী মেলা বহু পুরাতন মেলা। সোনামুখী থানার পাঁচাল, নফরডাঙ্গা,

পালসরা, রামপুর, খয়েরবনী গ্রামের গাজনমেলা; সোনামুখীর মনোহরদাস মেলা, রাধামোহনপুরের নাইরেবাঁধ মেলা, নারায়ণসুন্দরী ও ধনসিমলা গ্রামের দশহরা মেলা পুরাতন মেলার মধ্যে পরে। খাতড়া থানার পুরাতন মেলাগুলি হল নন্দা, ধারাগ্রী ভোগরা, সিমলা, মেটালা গ্রামের গাজন; বামনী, দেউলীর চব্বিশপ্রহর মেলা, খাতড়ার ইন্দপরব মেলা, পড়কুলের মকর মেলা। রাইপুর থানায় ভাঙ্গরার গাজনমেলা ও মটগোদার ধর্মরাজ মেলা প্রচীন মেলা। ইন্দপুরের প্রাচীন মেলাগুলি হল হাটগ্রাম, বড়বাঁধ, পুয়াড়া, ডাঙ্গারামপুর, ইন্দপুর, আটবাইচন্ডী গ্রামের গাজন মেলা; ব্রজরাজপুরের দোলপুর্ণিমা, নেলাবনীর চৈত্রসংক্রান্তি মেলা। রানিবাঁধ থানার বড্ডি, নারকোলি, গোলকুড়ি, সিমলা, মাহুতপুর, রুন্দড়া, রানিবাঁধ, বাঁশডিহা গ্রামে গাজন; পরেশনাথ নবরাত্রি মেলা, বুদখিল্যার তুযুমকর মেলা, রুদ্রার দোলযাত্রা, রাউতাড়ার দোলযাত্রা প্রাচীন উৎসব। তালডাংড়া থানার সাবড়াকোনের রাসমেলা ও পাঁচমুড়ার গাজন মেলা বিখ্যাত। সিমলাপাল থানার সিমলাপালের দোলযাত্রা, সিমলাপাল ও ভেলাইডিহার দুর্গামেলা, দুবরাজপুরের গাজনমেলা, ভেলাইডিহার দোলযাত্রা, ভূতশহরের কালীমেলা, নেকড়াতাপলের পৌষমেলা প্রাচীনমেলা হিসাবে পরিরিচত।[৫২]

সামাজিক শ্রেণি : কৌম সমাজ :

বাঁকুড়ায় সাঁওতাল উপজাতি ছাড়াও কালের প্রবাহে জ্ঞাতিত্বের বন্ধনে বিবিধ উপ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত সম্প্রদায় গোষ্ঠীর নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস, বাসরীতি, উৎসব ও অনুষ্ঠানের প্রকরণ, সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বাঁকুড়ার এই বিবিধ সংস্কৃতির ধারা বিশ্লেষণ করলে এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, সংগঠন ও সমাজ জীবনের সন্ধান পাওয়া যাবে। মুন্ডা-সাঁওতাল সহ এমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (শবর, কাড়া, মাহালী, খেড়িয়া, হাঁড়ি, ডোম, বাউড়ি, বাগদি) সমাজ জীবন আলোচনা করা হল।[৫৩]

কাড়া : লোকালয় থেকে দূরে মাটির ও খড়ের ছাউনির ঘরে জঙ্গল সান্নিধ্যে বসবাস করতে পছন্দ করে। এদের ১১টি গোত্র আছে। যেমন কাছুয়া, সমর, তামগেঁড়িয়া, ছাগের, কিসাড়, সুয়ের, হুরদুয়ার, চিড্ডু, কাড়ি, সামা, সানদোয়ার। ধর্মীয় প্রতীকগুলি হল কচ্ছপ, ছাগল, শোল মাছ, তামা, ষাঁড়, কাশিবক, শুয়োর, হলুদ, কাঠবিড়ালি, ঢেঁকির রিং প্রভৃতি।

এদের ধারণা প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে দেবতার ভূমিকা থাকে। এমন 'সোয়া লাখকা পূজা' হত বৈশাখ মাসে। জঙ্গলের দেবতা ছিল 'বাগেশ্বর'। প্রতি বছর বনদেবতার উদ্দেশ্যে মুরগি ছাগল উৎসর্গ করা হয়। গ্রাম দেবতা হল 'গরাম ঠাকুর'। গ্রামে নির্বিঘ্নে বাস করার জন্যে 'গরাম থানে' এই ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। এরা ভূত, প্রেত, তুকতাক,

যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করে। কুনজর কাটানোর জন্যে গুণিনের সাহায্য নেয়। কালে শিব, মনসা, শীতলা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীগণ স্বীকৃতি পায়।

অন্তঃসত্ত্বা নারীর দুপুর-সন্ধ্যায় একা বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। এদের নিজস্ব ধাইমা 'কুসারেন' আছে। নদিনে অশৌচ পালন করা হয়। স্বগোত্রে বা তিনপুরুষ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কন্যাপণ আছে। স্বামী -স্ত্রী দুজনেই বিচ্ছেদ চাইতে পারে। কন্যা বিচ্ছেদ চাইলে কন্যাপণ ফেরত দিতে হয়। বহুবিবাহ স্বীকৃত ছিল। এমনকি দাদার বিধবা স্ত্রীকে ভাই বিবাহ করতে পারত। মৃতদেহ কবর বা দাহ করা হত। দাহকালে ব্যবহার্য জিনিস মৃতের সাথে রাখা হত। দশদিনে অশৌচ পালন করা হয়।

পঞ্চায়েত প্রধানকে 'মাহাত' বলা হয়। পরামাণিক হল মাহাতর সহকারী। 'গোড়াইত' হল বার্তাবাহক। 'নাইকি' নামক পঞ্চায়েত সহায়ক নিয়োগ করা হত। এর উপরের পঞ্চায়েতকে বলে 'টোঠা' যার প্রধান হল 'পাঁড়ে'। পাঁড়ের মন্ত্রণাদাতা ও দেওয়ান হল 'ছেঁড়িদার'। 'টোঠা'র তত্ত্বাবধায়ক হলেন 'এইন মোড়ল'।

ভূমিজ সম্প্রদায় : কৃষিজীবী এই শ্রেণি প্রায় পুরোটাই হিন্দুকৃত। মূলদেবতা সিংবোঙ্গা বা সূর্যদেব। গ্রামের থানে মাটির হাতি, ঘোড়া রাখা থাকে। বছরের প্রথম দিনে গ্রামের কল্যাণে সেখানে 'ধূলা' পূজা হয়। গ্রাম পুরোহিত 'লায়া' পূজা পরিচালনা করেন। উৎসর্গ করা হয় মুরগি, ছাগল, মিষ্টি, দুধ, গাঁজা দিয়ে। গোসম্পদের দেবতা হল গড়াই ঠাকুর (গোয়াল ঘরে পোঁতা একফুট শাল কাঠ), যার পূজা হয় কার্তিক মাসে। উৎসর্গ করা হয় তিনটি মুরগি। জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কার্তিকের অমাবস্যায় 'বায়ুত' পূজা হয় ছাগল ও মুরগি বলিদানের মাধ্যমে। আগে মহিষ বলি দেওয়া হত, যা 'কাড়াকাটা' নামে পরিচিত। বর্তমানে তা পাঁঠাবলিতে পর্যবসিত হয়েছে। সমাজের অন্যান্য দেবতা হল গরাম ঠাকুর, বাঘুত, জাহির, বুরু, কুদ্রা, বারডোলা, জাহিরবুরু, ধরম, কুদরা, বিষয়াচন্ডী, পাঁচবাহিনী প্রভৃতি।

ভূমিজ জনজাতির উপবিভাগগুলি হল দরশি, তামারিয়া, মানিমুড়া, শিরিয়া, পাতুবিয়া, শেলো, বারভূমিয়া। গোত্রগুলি হল ক) বড্ডা কুরকুটিয়া, খ) বারডা গ) ভুইয়া ঘ) চাঁদিল ঙ) গুলগু চ) হাঁসদা ছ) হেম্রঙ জ) জারু ঝ) কাশ্যপ ঞ) লেঙ ট) নাগ ঠ) অবারসারি ড) পিলা ঢ) সাগমা ণ) সাসররিসি ত) শান্ডিল্য থ) সাওলা দ) তেসা ধ) টুমারুঙ ন) তুতি প্রভৃতি। ভূমিজ পঞ্চায়েতের মাথায় থাকত বংশানুক্রমিক 'প্রধান'।

অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় মেয়েদের নানা বিধিনিষেধের মধ্যে জীব হত্য না করা, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে না যাওয়া ছিল। শিশু জন্মের নদিনের মাথায় 'নাড়াত' অনুষ্ঠান হয়। তবে মা-শিশুর শুদ্ধিকরণ হত ২১দিন পর। স্বগোত্রে বা ৩-৫ পুরুষের রক্তের

সম্পর্কে বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। বৈশাখ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন মাসে বিবাহ অনুষ্ঠিত হত। বিবাহ পর্বে আম গাছের সাথের বরের ও মহুল গাছের সাথে কনের বিবাহের রীতি আছে। স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকারী ছিল। পঞ্চায়েতে সহমত হলে বধূর নোওয়া খুলে ও শালপাতা জলে ভিজিয়ে ছিঁড়ে ফেলে তা অনুমোদন দেওয়া হত। বিচ্ছেদের পর দুজনের পুনর্বিবাহ হতে পারে। মৃতদেহ বড়ছেলের দ্বারা মুখাগ্নির পর দাহ করা হত। চিতাভস্ম ও অস্থি হাঁড়িতে সংগ্রহ করে ৩-৪ দিন পর লায়ার পৌরহিত্যে তা গোষ্ঠীর নিজস্ব শ্মশানে সমাধিস্থ করা হয়। অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মা ও পেট কেটে সন্তানকে বার করে পাশাপাশি কবর দেওয়া হত।

মাহালী : এরা স্বতন্ত্র গ্রাম পত্তন না করে গ্রামসংলগ্ন হয়ে মাটির বাড়ি ও খড়ের বাড়ি তৈরী করে। বাঁশের জিনিসপত্র তৈরী প্রধান জীবিকা। মাহালীরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ও সাতটি উপবিভাগে বিভক্ত। যেমন— ক) বাঁশফুল খ) পাতর গ) সুহুঞ্ঝী ঘ) তাঁতি ঙ) মুন্ডা চ) ওঁরাও ছ) কোল। মাহালিদের গোষ্ঠী সংখ্যা চৌত্রিশ।

প্রধান উপাস্য দেবতা সূর্য বা সিংবোঙ্গা। বৈশাখ মাসে এই দেবতার পীঠস্থান 'জাহের থানে' পূজার নিমিত্ত পাঁঠা, মুরগি, পায়রা উৎসর্গ করা হয়। পূজা করেন সম্প্রদায় নিযুক্ত পুরোহিত। বারো বছর অন্তর সূর্যিদেবীর পুজো হয়। পারিবারিক দেবতা 'অড়াবোঙ্গা'র পূজা পদ্ধতি ও উপকরণ বংশ পরম্পরায় কেবল বাড়ির লোকেরাই অবগত থাকেন। তাঁদের মহান দেবতা 'ধরম' দেবতার আরাধনা হত মাঘ মাসে ফসল তোলার উৎসব হিসাবে। নিজেদের সুখ শান্তির জন্য মাঘে গরাম ঠাকুর ও বুগিনীদেবীর পূজো হয়। তাছাড়া এসময় মনসা পুজোরও চল আছে। এ পূজায় নৈবেদ্য হিসাবে মুরগি, পায়রা, চাল, সিন্দুর প্রদানের চল আছে। দুর্গা পূজার সময় পাঁঠা বলি ও কালী পূজার সময় গৃহপালিত জন্তুদের পূজা 'মাহালী' অনুষ্ঠিত হয়।

মুণ্ডা : দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় এদের আধিক্য। মুন্ডাগ্রামে রাস্তার দুই পাশে সুপরিকল্পিত সারিবদ্ধ পরিচ্ছন্ন মাটির দেওয়াল-খড়ের চালের বাড়ির এদের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। গ্রামের মাঝে থাকে নৃত্য-গীতের মঞ্চ 'আখড়া' ও গ্রামের প্রান্তে গাছ-গাছালি বেষ্টিত পবিত্র স্থান 'সারনা'। মুন্ডাদের প্রধান দেবতা 'সিংবোঙ্গা'। প্রতি অনুষ্ঠানে সাদা মোরগ নিবেদন করা হয় এই দেবতাকে। এর পাশেই স্থান পায় কৃষি দেবতা 'জাহের বুড়ি' ও শিকারস্থলের বিপত্তারিণী 'চণ্ডীবোঙ্গা'। এদের পূজা করে পুরোহিত 'পাহান'। এছাড়া ছিল পাহাড়-পর্বতের দেবতা 'বুরুবোঙ্গা', নদী-জলাশয়ের দেবতা 'ইকিরবোঙ্গা', জোড়-নালার দেবতা 'নাগেএরা', পারিবারিক দেবতা 'আড়াবোঙ্গা', বিপত্তারিণী 'আতোবোঙ্গা'।

খড়িয়া : বাঁকুড়ায় কেবলমাত্র পাহাড়ী খড়িয়া সম্প্রদায়ের দেখা মেলে। অন্য দুই

সম্প্রদায় হল দুধ এবং ঢেলকি খড়িয়া। জানালাহীন ছোট দরজার কুঁড়েতে এদের বসবাস। শিকার ও চৌর্যবৃত্তি ছিল এদের জীবিকা। এদের শ্রেষ্ঠ দেবতা হল 'গিরিং' বা 'ঠাকুর'। জঙ্গলে যাবার আগে তারা গিরিংকে স্মরণ করে। সমস্ত অনুষ্ঠানে পূজা পায় 'দিন্দুরি'। জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবতার উদ্দেশ্যে মুরগি বলি হয়, যার হকদার হত অবিবাহিত জেলে। পূজার উপাচার হল চাল, সিঁদুর, ধূপ-ধূনা, দুধ, তুলসি পাতা প্রভৃতি। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ঝড়-বৃষ্টির নিয়ন্ত্রক হল পর্বত। দলমা পাহাড়ের নামে দেবতা হল 'দলমাপাত'। গ্রামের ও গৃহের শান্তির দেবতা হল 'গড়াম'। ভূত-প্রেত-মন্ত্রে ছিল এদের অগাধ বিশ্বাস।

শবর : খাতড়া-রানিবাঁধ অঞ্চলে এদের আধিক্য। বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও শিকারই প্রধান জীবিকা। এখন দিন মজুরি। মাটির বা বাঁশের ওপর মাটির প্রলেপের দেওয়াল দেওয়া বাড়িতে এদের বাস। কথিত একসময় এদের গৃহ দেবতা ছিল জগন্নাথ, কিন্তু কোনোসময় এই দেবতা চুরি হলে তাঁরা জগন্নাথ আরাধনা বন্ধ করে। এখন এরা কালি, মনসা, শীতলার পূজা করে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় এদের বনদুর্গার পূজা হয়। এটি 'গ্রামা পূর্ণিমা' নামেও পরিচিত।

সাঁওতাল : সাঁওতাল গ্রামের রাস্তার দুইপাশে চিত্রিত মাটির দেওয়াল-খড়ের ছাওনির ছোট ছোট ঘরের সারি ও পরিচ্ছন্নতা তার আবহমান কালের বৈশিষ্ট্য। শালকুঞ্জের 'জাহের থানে' অবস্থান করে দেব-দেবী 'মারাংবুরু' ও 'জাহেরএরা'। গ্রাম মুখিয়ার বাড়ি সংলগ্ন চারদিক খোলা খড়ের ছাওনির বেদিকে বলা হত 'মাঝিথান', যা মূলত বিচারের কাজে ব্যবহার করা হত। প্রতি উৎসবেই দেবতা পূজা পান। এই মারাংবুরু বা লিটাগোঁসাই প্রথম মানব-মানবী 'পিলচু হারাম' ও 'পিলচু বড়হিকে' হাঁড়িয়া তৈরী করা শেখায় ও খাবার পূর্বে উৎসর্গের রীতি প্রবর্তিত হয়। বিপদ থেকে উদ্ধারের দেবতা হল সিংবোঙ্গা। 'জমসিম' উৎসবে এর পূজা হয়। ভালো বৃষ্টি, ফসল, রোগমুক্তির জন্য 'মঁড়েকো-তুরুইকো'র আরাধনা করা হয়। গ্রামের মঙ্গলের জন্য জাহের এরাকে মুরগি উৎসর্গ করত 'নায়কে' ও রোগ-ব্যাধির দেবতা সীমাবোঙ্গার পূজা করত 'কুড়ানায়কে'। অন্যান্য দেবতা হল মাঝিহাড়ামবোঙ্গা, ডাডিবোঙ্গা, কেসাঁড়বোঙ্গা, বাখুতবোঙ্গা ইত্যাদি। এদের মূল উৎসব বাহা (ফুল), সহরায়, করম।

বাগদি : এরা বারোটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত, যেমন দুলিয়া, ওঝা, তেঁতুলিয়া, কাঁসাই-কুলিয়া, মাছুয়া, গুলিমাঝি, দন্ডমাঝি, কুসমতিয়া, মেটা। এদের ১২ টি গোত্র হল, শোল মাছ, শাঁখ, কচ্ছপ, বাঘ, পুকুড়ি, কালসাপ, পলাশ গাছ, কাশিবক, কাঠ ফড়িং, সূর্য, চাঁদ, চড়ুইপাখি। এদের পদবি মূলত বাগদি। তাছাড়া অন্য পদবি রাউৎ, দিগর, সর্দার, প্রতিহার, মাঝি প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। এদের আন্তঃউপবিভাগ ও স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বাল্য ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও এখন তা প্রায় অবলুপ্ত। বিবাহ পূর্ব

যৌন সম্পর্ক নিন্দনীয় নয়, তবে প্রসবের পূর্বে বিবাহ করতে হবে। বয়োজ্যেষ্ঠ বাগদি পৌরহিত্য করেন। বর বিবাহের আগে মহুল গাছ বিবাহ করেন। বিধবা বিবাহের চল আছে। কারণ দর্শিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি মিলত এবং পরবর্তীতে পছন্দের বিবাহের অনুমতিও দেওয়া হত। মৃতদেহ দাহ করা হত। একমাস অশৌচ পালন করে শ্রাদ্ধ করা হত। এরা আদিতে জন্তু ও প্রকৃতির পূজারী ছিল। পুরোহিত ছিল 'গোঁসাই' ও 'বড় পাহাড়ী'। প্রধান দেবী মনসা। বর্তমানে হিন্দু দেবদেবীর পূজারী।

বাউরি : মুন্ডা-দ্রাবিড়-আলপাইন গোষ্ঠীর বাউরীদের ১২টি উপবিভাগ হল মল্লভূমিয়া, শখরিয়া, পঞ্চকোটিয়া, মলা, ধুলিয়া, মলুয়া, ঝাটিয়া, কাঠুরিয়া, পাথুরিয়া। টোটেম হিসাবে চিহ্নিত বক, ঘোড়া, কুকুর। এদের আন্তর্গোত্র বিবাহ প্রথাসিদ্ধ। বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পাদিত হত নির্দিষ্ট সূত্র মেনে। পুরুষদের কুলে সাতপুরুষ এবং মেয়েদের কুলে তিনপুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। সমাজে বহুবিধবা অনুমোদিত হত। বিবাহিত নারীদের লোহার আঙটি পরতে হয়। বিধবাবিবাহের চল আছে। গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের অনুমোদন পেলে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ছিল। অতীতে মৃতদেহ কবর দেওয়া হলেও, বর্তমানে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে দাহ চালু হয়েছে।

এদের দেবতা হল মনসা, ভাদু, মানসিং, বড়পাহাড়ী (ইনি সাঁওতালদের মারাংবুরু), ধর্মরাজ, কুদ্রাসিনী। কুদ্রাসিনীর পূজা হয় শনি ও রবিবার। পূজায় আবশ্যক উপকরণ হল ছাগল বা শূকর বা পাখি, চাল, চিনি ও ঘি। এদের পূজারি 'দেঘরিয়া' বা লায়া।

ডোম : এদের ১৮টি উপবিভাগ হল আঁকুরিয়া, বাজরিয়া, মানুকিয়া, বিসদেলিয়া, ধাই ডোম, ধেসিয়াধাকাল, ধোলা, ঘসেরা, কালিন্দি, কাউরা, মগহিয়া, মন্দারন, মুর্দাফরাস, সাঁচি, তালাইবনা, আটুরা, মোলা, শিখরিয়া। এদের ১৩টি গোত্র হল অজঘলা, ধুসিয়া, হড়বনাস, কছুয়া, করওয়া, ক্যারকেটা, মহুয়া , মুশ, নাগ, রোত, সন্ধ, শোল, তিরকি। সমাজে বাল্যবিবাহ বহুল প্রচলিত। দশ বছরের উর্ধ্বে অবিবাহিত কন্যা থাকলে পরিবার নিন্দিত হয়। বিবাহ পূর্ব যৌন সম্পর্ক নিন্দার্হ নয়। কন্যাপণ, স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলে অনুমতি, বিচ্ছেদের পর বিবাহ সমাজে চালু ছিল।

এদের অনেকে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। ধর্মরাজ হল উপাস্য দেবতা। শ্রাবণ মাসে 'শ্রাবণিয়া' পূজা হয়। আগে এ পূজায় শুয়োর বলি হত। সেই শুয়োরের রক্ত এক কাপ দুধে মিশিয়ে নারায়ণকে উৎসর্গ করা হত। বর্তমানে এ প্রথা লুপ্ত। দুর্গাপূজার সময় এরা ঢোল-ধামসার পূজা করে। আরেক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হল কাসুধার।

হাঁড়ি : মুচি-চামার একই শাখাভুক্ত হলেও মুচি চামারদের মতো বাসি মাংস খায় না। এরা ধাত্রীবিদ্যা ঘৃণা করে। চামাররা কাঁচা-চামড়া সংস্কার করে পাকা করে, আর মুচিরা তা থেকে চামড়াজাত দ্রব্য তৈরী করে। মুচিদের উপবিভাগ হল— ১) বড়ভাগিয়া

২) ছোটভাগিয়া। দুটি গোত্র হল— ১) কশ্যপ ২) শাণ্ডিল্য । শিশুর জন্ম মহূর্তে ঘরের চালায় পাথর ছুঁড়ে শব্দ করা হয় শিশুকে সাহসী করার প্রথা মেনে। পাঁচদিনে নামকরণ করা হয়। পঞ্চমরাত্রিতে শিশুর বিছানায় কাগজ-কলম রেখে ঘর কিছুক্ষণ অন্ধকার করে দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে ভগবান ভাগ্য লিখে যাবেন। নদিনে 'নরাত' হয় ও মা স্নান করে শুদ্ধ হয়। বাল্যবিবাহের চল নেই। ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে সম্বন্ধ নিয়ে যায়। বিবাহের দিন পাত্র-পাত্রীকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ান হয়। বিয়ের দিন পাত্রের পায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া জল শিশিতে ভরে কনের কাছে পাঠানো হয় তার স্নানের জন্য। এই প্রথাকে 'তেলচড়ান' বলে। কনের বাড়িতে ছাদনাতলায় সিঁদুর দান, মালা বদলের প্রথা আছে। মৃতদেহ দাহ করা হয়। বারোদিন অশৌচ পালন করা হয়। তেরোতম দিনে শ্রাদ্ধ করা হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শ্রাদ্ধের পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।

বলাই বাহুল্য বর্ণেতর সম্প্রদায়ের এই বিচিত্র ও সমৃদ্ধ লোকাচার ভূভারতেও বিরল।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

বাঁকুড়ার সামাজিক ও লৌকিক পরিমণ্ডল বিবিধ পালা-পার্বণের জন্ম হয়েছে। এগুলি একান্তই রাঢ়ভূমির নিজস্ব। অন্ত্যজ, অনভিজাত মানুষ তাদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ব্যথা, বেদনা, প্রাত্যহিক দিনলিপির নির্যাস নিয়ে বাঁধেন গান যা লোকমুখে কালের প্রবাহে লোকসংগীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাঁকুড়ায় এমন লোকগান হল মনসার গান, ভাদু গান, জাওয়া গান, অহিরাগান, টুসু গান, বিহা গান, ঝুমুর গান প্রভৃতি। এমন কিছু লোকগান ও সংস্কৃতির বিবরণ দেওয়া হল।

মনসার গান : প্রতি বছর ১৩ জ্যৈষ্ঠ রোহিনী পরবের দিন মনসাপূজা উপলক্ষে মনসা গান শুরু হয়। দশহরার দিন সারারাত মনসা গান চলে। আষাঢ়-শ্রাবণে বর্ষার ঘনঘটায় সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে এমন এক মনসা বন্দনা, 'দেবী আমার আসরে একবার এস মা মনসা। তোমার রাঙা চরণ দুটি আমারই ভরসা।।'

বাউল গান : বীরভূমে এ গানের প্রাবল্য থাকলেও রাঢ় বাঁকুড়ার মাটিতে এর প্রভাব কম নয়। এক্তেশ্বরের মেলায় বাউলের মেলা বসে।

ভাদু গান : কিংবদন্তি কাশীপুর রাজের মেয়ে ছিল ভদ্রাবতী বা ভাদু। তাকে বিয়ে করতে আসার সময় পথে ডাকাতের হাতে প্রাণ হারায় তার ভাবী স্বামী। এ সংবাদে শোকাতুর ভাদু বিতার সাগরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করে। রাজ্যবাসী তাদের প্রিয় নিজ কন্যাসম ভাদুর শোকে ও স্মৃতিতে গান বাঁধে। তাই এটি ভাদু গান নামে পরিচিত।

'বটতলাতে দাঁড়াও ভাদু/বট পাতে কি দুধ পড়ে/ পরের মাকে মা বলিলে/মায়ের পরাণ যায় ফাট্যে।।' ভাদ্র সংক্রান্তির রাত্রিতে ভাদু পূজার সমারোহের পালা শেষ করে ভাদু ঘট বিসর্জন দিয়ে ভাদু পর্ব সমাপ্ত হয়।

জাওয়া গান : এটি মূলত কৃষি বিষয়ক, চাষবাসের গান। করম, ছাতা, জিতা পূজায় এই গানে উৎসব হয়, গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে গ্রামসমাজের উদ্যোগে। আইবুড়ো কুমারী গানের উৎসব হয়, গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে গ্রামসমাজের উদ্যোগে। আইবুড়ো কুমারী মেয়েরাই এর পূজায় ব্রতী হয়। নানা রকমের ফসলের বীজ সংগ্রহ করে পার্শ্ব একাদশীর দিন রাত্রিতে নূতন শাড়ি পরিধান করে উপবাসী থেকে নূতন বরণডালা মহিলারা সাজিয়ে রাখে। রাখা হয় আলপনা আঁকা পিঁড়ির উপর। চারপাশে আলপনা দিয়ে ঘটটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঘটের পাশে থাকে মাঠ থেকে আনা নতুন ধানের গাছ। যখন বরণডালার মাটিতে বিভিন্ন বীজ পোঁতা হয়। আইবুড়ো কুমারী মেয়েরা সুরে গেয়ে ওঠে, 'জাওয়া দিলাম জাওয়া দিলাম নদীর বালিয়ে লো/এমনি জাওয়া হুদকে ওঠে বাঁশগাছের পারা লো।।' রাত্রির পূজায় গ্রামের মোড়ল, আইবুড়ো কুমারীদের চরমু-করমু দেবতার কাহিনি শোনায়। কাহিনিই মন্ত্র। এটির পর তারা পুষ্পাঞ্জলি দেয় আমলা, কচি ধানের পাতা, একটি নতুন শসা গাছের ফল দিয়ে। কুমারী যখন মা হবে, এই শসা ফলটি আসবে সন্তান রূপে। পূজার শেষে মোড়ল বাড়ির পাশে বা গ্রামের মাঝে রাস্তার উপর একটি করম ডাল পুঁতে দেয়, আর মেয়েরা হাত ধরাধরি করে গেয়ে ওঠে, 'ঝিঙা ফুল ফুটল্য দাদা বহুকে আনরে/ গড়া ধান পাকলা দাদা বহুকে খেদ রে।।' গান চলে সারা রাত ধরে। সকালে করম পূজার জাওয়া ভাসান দেওয়া হয়। কুর্মী-ভূমিজদের মতো আদিবাসীরা এই জাওয়া গানে অংশ নেয়।

টুসু গান : অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে ইতু পূজা শেষ করে ১ পৌষ নিয়ম করে তুলসী পাতায় পাতা হয় টুসু। বসে টুসু আবাহনী গানের আসর। আবালবৃদ্ধবণিতা আবাহন করে টুসুকে, 'এস টুসু হৃদয় মন্দিরে/ তোমার পূজব্য গো যতন কর্যে।। চলে ভাজা-কড়কড়্যা ভাজা দিব টুসুর অঁচালে/তিরিশটি দিন পূজব্য মাকে রাখব সোনার মন্দিরে।।' পূজার উপকরণ হল চাল ভাজা, কলাই ভাজা, বাতাসা, চিঁড়ে, মুড়কি, গুড়। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গানের মহড়া চলে এ পাড়া ও পাড়ায় সারা পৌষমাস জুড়ে। বিষয় মূলত প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা, শিক্ষা, দীক্ষা,ব্যথা, বেদনা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ। টুসুকে পরিবারের অতি আপন মনে করে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন বিসর্জন ঘিরে বেদনার গান হল, 'ওমা টুসু আসবো গো ফিরে/টুসু মাকে বিদায় দিয়ে রিব মা কেমন করে।।'

অহিরা গান : কার্তিকের অমাবস্যায় কালীপূজার রাতে গরু-মহিষের উদ্দ্যেশে এই গান বাঁধা হয়। গরুকে ভগবতী জ্ঞান করে দুদিন ধরে গরু-মহিষের শিঙে তেল দিয়ে, পা ধুইয়ে অমাবস্যার রাত্রে তাদের উদ্দ্যেশে অহিরা গান বাঁধা হয়, 'রিমি ঝিমি,

রিমি ঝিমি পানি বরষে রে অহিরে/আঙ্গনায় তো পড়ি গেল কাঁইরে/ধীরে চল ধীরে চল শিরমনি গেইয়া রে/ তোর গুনিন দিবেক দুব ধান রে'। ভাই দ্বিতীয়ায় গাওয়া হয়, 'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যমের দুয়েরে পড়ল কাঁটা।' উত্থান থালা সাজিয়ে হলুদ জলে গো- মহিষের পা ধুইয়ে, নতুন ধানের মোড় বানিয়ে তাদের শিঙে বেঁধে দেওয়া হয়। রাস্তার মাঝে গ্রামে খুঁটি পুঁতে দড়ি বেঁধে খুটোন হয়। গান বাঁধা হয়, 'অহিরে এতদিন যে খাওয়ালি বরদা, বওঝা বোঝা ঘাসরে অহিরে/আইজ তোর দেখি মর্দানী রে।।'

বিয়া গান : মাঘ, ফাল্গুন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বিয়ের লগ্ন উপলক্ষ্যে সমাজে বিয়ের গান প্রচলিত আছে। এই গান বিয়ের ২দিন আগে হলুদ উৎসবে, পণ আদানপ্রদানের জল ছাওয়ার ক্ষণে, বিয়ের দিন সিঁদুর দান উপলক্ষে আইবুড়ো-এয়োতি মেয়েদের দ্বারা গীত হয়, 'আজ আমাদের সাধের (বালার) ধনীর বিহা লো/ আজ আমাদের সাধের (বালার) ধনীর বিহা। মনের মতো (বর) কন্যা পাঁয়েছি মনের মতন/নাচন টিয়া টিয়া লো/ আজ আমাদের সাধের বালার (ধনীর) বিহা লো।।'

গোষ্ঠ-লীলার গান : আশ্বিনের প্রথম থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবাৎসল্য ও গোচারণকে উপজীব্য করে গ্রামেগঞ্জে অন্ত্যজ-মেহনতী মানুষ সন্ধ্যায় করতাল বাদ্য সহযোগে আখড়া বসায়। যুবকরা মেয়েদের সাজ করে মেয়েলি ঢঙে নাচ করে। এটি পাতা নাচ বা কাঠি নাচ নামে পরিচিত। এমন একটি গত, 'বাঁশ লয় বাঁশরী লয় মা তরল গাছের ধজা গো/বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশী বলে রাধা রাধা গো।"

ঝুমুর গান : রাঢ় বাঁকুড়ায় ঝুমুর গানের সূচনা চৈতন্য-পরিকর শ্রীনিবাসের আগমন, অবস্থান ও হাম্বির অনুসারী মল্ল রাজবংশের বৈষ্ণব অনুরাগের কারণে। আদিতে লৌকিক প্রেম-প্রণয় মুখ্য বিষয় থাকলেও তা পরবর্তীতে রাধা-কৃষ্ণকেন্দ্রিক হয়ে পরে। বিষয়, ঋতু, উৎসবভেদে ঝুমুরের ভাগগুলি হল ১) লৌকিক ২) দরবারি ৩) দাঁড়শালিয়া ৪) ভাদরিয়া ৫) ছৌ-নাচ ৬) টাঁড় ৭) রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঝুমুর। চৈতন্য পূর্ববর্তী ঝুমুর ছিল স্থানীয় জীবন আলেখ্য নির্ভর। রাঢ়ী নায়ক-নায়িকার হৃদয়াবেগের প্রকাশ পেয়েছে, 'আরে, সরল দেখে প্রেম করিলে/ আর এতদিনে নিঠুর হইলে। দেখা পাইলে মুখেও ত শুধাও না।/ ওহে তুমার তরে মরি আমি/ তুমি ফিরে আইলে না।' দরবারি ঝুমুরের বাহক হল ভূমিজ, সর্দার, কুর্মী, ভুঁইয়াদের পালিত 'নাচনী'দের দ্বারা দরবার, দালান, মন্দির, বারোয়ারীতে নাচ চর্চা। দাঁড়শালিয়া নাচ যা কৃষক-শ্রমিক পুরুষ দ্বারা কর্মক্লান্ত দিনের শেষে ধামসা-মাদলের তালে বৃত্তাকারে সামনে পেছনে পদক্ষেপে গীত হয়, 'ভাদর মাসের গাদর জুনার। আইড়ে বিসে খাব হে/ যে আইসবেক ছাতা ফুটাইঁ/তার সেঁ যাব হে।'

বাঁকুড়া তথা রাঢ়ের লোকায়ত বৃত্তে এমন গীত ও নৃত্যকলার বিকাশ ও পরিণতি উর্বর রাঢ় সংস্কৃতিকে বলিষ্ঠ বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জগৎ কবিরাজের লোকশ্রুতি নির্ভর ঝুমুর গান প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। (দ্রষ্টব্য : লোকশ্রুতি, প. ব. সরকার, ২০১১, পৃ. ১২৪)

নগর জীবনের উন্মেষ :

বাঁকুড়ার সামাজিক জীবন মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। বিস্তৃত সামাজিক পরিসরে কোথায় কোথায় নগর ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দের উন্মেষ ঘটেছিল। বিভিন্ন কারণে। গুপ্তযুগে ও গুপ্তোত্তর যুগে বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে দ্বারকেশ্বর তীরে ডিহড় নাম্নী জনপদ বাণিজ্য শহর হিসাবে গড়ে ওঠে। পোখন্না-ডিহড়ে এই নগর জীবনের বিকাশ ঘটেছিল গুপ্তযুগে, গুপ্তযুগীয় রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে ও বাণিজ্যিক উৎকর্ষতার অনুষঙ্গে। সেন শাসনের অন্তভাগে ও বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনাপর্বে ভৌমশাসকদের আনুকূল্যে বীরসিংহপুর-রাজহাটী এবং পরবর্তীকালে রাজগ্রাম বাণিজ্য নগরের পত্তন ঘটে।

চোড়গঙ্গরাজ অনন্তবর্মণ ও পরবর্তী ওড়িয়া রাজাদের আনুকূল্যে বাঁকুড়ায় জৈন ভাবধারার বিস্তার ঘটে। সারংগড়ে (বর্তমান অম্বিকানগর-মুকুটমণিপুর) একটি সমরঘাটি গড়ে উঠেছিল এবং ধবলভূম ও তুঙ্গভূমে জৈন ধর্মকেন্দ্রিক নগর সভ্যতার বিকাশের বহু প্রত্নপ্রমাণ উদ্ধার হয়েছে বা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। মটগোদা-মণ্ডলকুলি-সাতপাট্টা-দেমুশ্যানা এলাকায় জৈনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ও নগরী গড়ে উঠেছিল এসময়। অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও প্রাপ্ত প্রত্নপ্রমাণের ভিত্তিতে অনুমান যে, এখানে প্রাচীন গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মস্থান সবই ছিল।

সুধীরচন্দ্র দুয়ারী কুশদ্বীপের প্রত্ননিদর্শন বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এখানে হরপ্পা পরবর্তী উন্নত নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।[৫৪] অবশ্য অনেকে এই নিদর্শনগুলি নদী বাহিত বলে থাকেন।

ইংরেজ আমলে বাণিজ্য নগরী হিসাবে সোনামুখীর পত্তন ঘটে। এটি দীর্ঘদিন ইংরেজ কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের কেন্দ্র হিসাবে বাঁকুড়ার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করেছে। মল্লযুগে বিষ্ণুপুর শহরের পত্তন ও বিকাশের ধরা ছিল মূলত পাঠান-আফগান যুগে। ইংরেজ শাসনের সূচনা পর্বে বাঁকুড়া প্রথমে সমর শহর, পরে প্রশাসনিক শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যুদ্ধভূমিতে সামাজিক আলোড়ন :

বাঁকুড়া ভূমিতে বিভিন্ন যুদ্ধপ্রয়াস ও যুদ্ধ সামাজিক সংস্থিতিকে প্রভাবিত করেছিল। অনেক যুদ্ধ কৃষি শিল্পের বিপর্যয় এনেছিল। অনেক যুদ্ধ নতুন শাসকের অনুষঙ্গে নতুন

নতুন উন্নয়নের ধারণা ও তৎপরতায় এই ভূমিকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেক অভিযান ধর্ম-সংস্কৃতির বাঁধনে আমূল পরিবর্তন এনেছে। অনেক যুদ্ধ সে দেশের সংস্কৃতিকে এনে এদেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। অনেক যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিকে বিদ্ধ করে মানুষের অবিমিশ্র দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদেশে ও দেশের উপর দিয়ে পরিচালিত সমরপ্রবাহের তালিকা নিম্নরূপ ১) ৪২৪ খ্রিঃ পূর্বাব্দে মহাপদ্মনন্দের ওড়িষা অভিযান, রাঢ়ের উপর দিয়ে, কালুবীরের সাথে সংঘাত। ২) অশোকের তাম্রলিপ্ত যাত্রা, বাঁকুড়ার উপর দিয়ে ৩) সমুদ্রগুপ্তের পুষ্করণ আক্রমণ, হাউসি গ্রামে চন্দ্রবর্মার সাথে সংঘাত ৪) শশাঙ্কের ওড়িষা অভিযান, রাঢ়ের উপর দিয়ে ৫) দেবপালের উৎকল অভিযান, রাঢ়ের উপর দিয়ে ৬) মহীপাল-১ এর সময়ে শিবকর-৩ (৯৮৮-১০৩৬) এর বাংলা অভিযান, রাঢ়ের জারাগ্রাম দান ৭) ১০২১-২৩ সালে রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণ ও স্থানীয় শূর নৃপতি রণশূরের পরাজয়। ১০২২-২৩ সালের কয়েক বছর পর ছান্দার পরিমন্ডলের রাজা (রাজেন্দ্রচোলের সেনাবংশ) ১ম নৃসিংহবাহনকে পরাজিত করেছিলেন ইছাই ঘোষ। ৮) রামপালের পক্ষে শূরপতি লক্ষ্মীশূর ও কোটাটবীর বীরগুণের কৈবর্তরাজ বিরোধী অভিযান ও বিজয় ৯) ১০৬৮ সালে কর্ণাটের চালুক্যরাজ চতুর্থ বিক্রমাদিত্য, পরে ওড়িয়া সোমবংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত, ওড়িয়ারাজ উদ্যতকেশরী রাঢ় অঞ্চলে বিজয় অভিযান করেছিলেন বলে কথিত। ১০) ১১৩৫ সালে ওড়িয়ারাজ অনন্তবর্মণের বঙ্গ অভিযান, মন্দারপতির পরাজয়, দক্ষিণ বাঁকুড়ায় আধিপত্য, ১১) অনঙ্গভীম-২ (১১৯০-১১৯৩) গঙ্গার পশ্চিমতীর পর্যন্ত অধিকৃত ভূমিতে জরিপ কাজ করেন বলে ঐতিহাসিক তথ্য আছে। এর পরেই বাংলায় বখতিয়ার খিলজির আগমন ঘটে। ১২) অনঙ্গভীম-৩ ১২১১ সালের পর গিয়াসুদ্দন খিলজিকে বীরভূম-দামোদরের অর্ন্তবর্তী স্থানে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ দেন। ১৩) অনঙ্গভীম-৪ বাংলার সুলতানকে পরাজিত করলেও তাঁর পুত্র নরসিংহদেব মালিক তুঘানের সাথে ১২৪৪-৪৫ সালে মল্লভূমের অন্তর্গত কাটাসঙ্গের যুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে নামেন। ১৪) পাঁচ বছর পরে সুলতান মুঘিসুদ্দিন উজবেক নরসিংহের জামাতা প্রদ্যুম্নকে পরাজিত করে। ১৫) ১৩৫৮ সালে ওড়িযাবাসী শ্রীপতি মহাপাত্র ও নকুড়তুঙ্গ শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন স্থানীয় সামন্তসার বা রাজগ্রামের রাজাকে পরাজিত করে। ১৬) প্রদ্যুম্নের পরাজয়ে ওড়িয়া শাসনের অবসান ঘটার দুই শতাব্দী পরে কপিলেন্দ্রদেব সুলতান নাসিরুদ্দিনকে পরাজিত করে হৃত ওড়িয়া রাজত্ব গৌরব ফিরিয়ে আনেন। ১৭) ১৫৬৪-৬৫ সালে মুকুন্দদেবের সময়কাল পর্যন্ত এই প্রভাব অক্ষত ছিল, সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল (রাখালদাসের বাঙলার ইতিহাস, ১৪১৪, পৃ: ২০২)। ১৮) ১৬৫০-৬০ সালে

রূপরামের লেখা ধর্মমঙ্গলের ভাষ্য অনুসারে, 'পশ্চিমদিকের রাজা সিংহ গজপতি/ধলরাজা মল্লরাজা যাহার সঙ্গতি।' ১৯) ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শা তুঘলক শিখরভূম ও সামন্তভূম আক্রমণ করে। ১৯) ১৫৬৪-৬৫ সালে মোঘলের সহায়তার মুকুন্দদেব বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৬৬-৬৭ সালে সোলেমান কারনানী সরাসরি মল্লভূম আক্রমণ করেন। পরে মল্লভূমের উপর দিয়ে ওড়িষা অভিযান পরিচালিত হয়। ২০) টোডরমলের রাজস্ব অভিযানে মল্লভূম মোঘল শাসনাধীন হয়। ২১) ১৫৯০ ও ১৫৯৪ সালে আকবরের আফগান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হয় মল্লরাজের সাহায্য নিয়ে। ২২) জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী হাম্বীরের বিরুদ্ধে সুবেদার ইসলাম খাঁকে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। ২৩) ১৬১৪ সালে হাম্বির আবার বিদ্রোহী হলে সুবেদার কাশেম খান মল্লবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। ২৪) ১৬৫০-৬০ সালে ওড়িয়ারাজ গজপতির সাথে মল্লভূমির মিত্রতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ২৫) শাহজাহানের আমলে সুবেদার শাহ সুজা রাজস্ব কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৫ গুণ বৃদ্ধি করেন। ১৬৮৫ সালে রঘুনাথ-১ রাজস্ব আদায় দিতে ব্যর্থ হলে বাংলার রাজধানী রাজমহলে তাঁকে অন্তরীণ করা হয়। ২৬) ১৬৯৫-৯৭ সালে মোঘল মিত্র বর্ধমানরাজকে পরাজিত করে মল্লরাজ ও চেতুয়া-বরদারাজ বর্ধমান সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। ২৭) রঘুনাথ সিংহ ১৭০১ সালে ঔরঙ্গজেবের অনুকূলে এককালের মিত্র চেতুয়া-বরদা আক্রমণ করে চেতুয়ারাজ ও আফগান সর্দার রহিম খানকে পরাজিত করেন। ২৮) মোঘল মিত্র বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ চন্দ্রকোণা, মল্লভূমির একাংশ বিজয় করতে সক্ষম হয়। ২৯) বীরসিংহ-২ এর আমলে ১৭২৭-২৯ সালের মধ্যে সুজাউদ্দিন ও জমিদার জাফর খাঁর নেতৃত্বে সেনাদল বীরসিংহ-২ কাছে পরাজিত হয়, পরে সুজা ২০০০০ সেনা সহ নিজে আক্রমণ পরিচালনা করেন। ৩০) ১৭৪১ সালে ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গীদল বিষ্ণুপুরে হাজির হয় ও গোপাল সিংহ দলমাদল কামানের সাহায্যে তাদের হটিয়ে দেন। ৩১) ১৭৫৬ সালে সিরাজের প্রশ্রয়ে চৈতন্যের জ্ঞাতিভাতা দামোদর মল্লভূম আক্রমণ করেও সিংহগোলার যুদ্ধে পরিজিত হন। ৩২) ১৭৬০ সালে সিউ ভট্টের অধীনে মারাঠাদল ও শাহ আলম-২ মল্লভূম তথা বাংলা আক্রমণ করে। ৩৩) ১৭৬১ সালে মিরজাফরের সহায়তায় দামোদর সিংহ মল্লভূম দখল করেন। ৩৪) ১৮০৮ সালে যখন মাধো সিং বাঁকুড়া শহর আক্রমণের সুযোগ খুঁজছেন, তখন এই আক্রমণ ইংরেজ সরকার প্রতিহত করে। ৩৫) ১৮৩৬ সালে বর্ধমান জমিদারির দাবিদার জাল প্রতাপের বাঁকুড়া শহরে শক্তি প্রদর্শন শেষতম প্রত্যাঘাতের চেষ্টা। এছাড়াও কৈবর্ত বিদ্রোহে স্থানীয় রাজাদের যোগদান, বিজয়সেন কর্তৃক বীরগুণের পরাজয়, কালাপাহাড় ও ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণ, রাঢ়ভূমি দিয়ে ধর্মপাল-দেবপাল,

শশাঙ্ক, হোসেন সাহের[৫৪ক] যুদ্ধযাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বাঁকুড়া ভূমিতে আদিকাল থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত সমর উদ্যোগগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে এখানে রাষ্ট্র প্রভাবিত সামাজিক পরিবর্তনের চালচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। শশাঙ্কের সমকালীন ও তার পূর্ববর্তী অভিযানগুলি এই বিচ্ছিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলটির আর্যীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ধর্মপাল, দেবপাল, নয়পাল, প্রথম ও দ্বিতীয় মহীপাল, রামপাল ও কুমারপালেদের প্রভাব রাঢ়ের সমকালীন সামাজিক বিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সময়েই আর্যাবর্তের শূরবংশ, দক্ষিণী চোল অনুগত শালীবাহন বংশ ও কর্ণাট দেশীয় সেন বংশ রাঢ়ভূমিতে তাদের প্রভাব বিস্তারের দ্বারা এই সামাজিক বিবর্তন তরান্বিত করে। বস্তুত এসময় বাঁকুড়া ভূমিকে বৃহত্তর রাষ্ট্রপ্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। একাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাকুঁড়া ভূমির বৃহদাংশ ওড়িয়া প্রভাব ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল যা এই অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির বাঁধন স্পষ্ট করে তোলে। ওড়িয়া শাসকরা তুর্ক-আফগানদের প্রভাব থেকে এই অঞ্চলকে মুক্ত রাখতে সফল হয়েছিলেন। মোঘল আমলে ভৌম শাসকরা এদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেও নিজেদের মত ও মনন অনুসারে দেশ শাসন করেছিলেন। ফলে এই অঞ্চলের সামাজিক কাঠামো স্বাতন্ত্র্য হতে পেরেছিল। অবশ্য ১৭৬০ সাল থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের রাহুগ্রাসে সমস্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অন্তর্হিত হতে থাকে।

বাঁকুড়ার সমাজ জীবনের বিবর্তনের সুদীর্ঘ চালচিত্র বিচিত্র এবং অনন্যতায় পরিপূর্ণ। উপজাতি সংস্কৃতির বিকাশ, বিবিধ সম্প্রদায়, উপ-সম্প্রদায়ের আগমন, এর সংস্কৃতির ক্যানভাসে দক্ষিণী ও ওড়িয়া কৃষ্টির ছায়াপাত বাঁকুড়া ভূমির কৃষ্টি-সংস্কৃতির মোজাইক নির্মাণ করেছিল। বাকি বাংলা মূলস্রোতের সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বাঁকুড়া তথা দক্ষিণ রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল নিজস্ব আঙ্গিকে, নিজস্ব স্বতন্ত্রতায়। এই অন্তর্গত শক্তিই বাইরের স্রোত ও তরঙ্গকে স্তিমিত, অগাঢ় করে দিতে পেরেছিল।[৫৪খ] সৃষ্টি হয়েছিল 'বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি'।

সূত্র নির্দেশিকা :

১। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁ জ ই স, বাঁকুড়া, ২০০২, পৃঃ ২৮ এবং সেন গৌরপদ, ম জী প্রও স পৃঃ ১৩-২০।

২। ব্যানার্জী অমিয় কুমার, পঃবঃ জেলা গেজেটিয়ার্স-বাঁকুড়া, কলিকাতা ১৯৬৮।

৩। Tribal Community in Bihar (part-iii) ASI, Delhi.

৪। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, বাঁকুড়া ২০০২, পৃঃ ১৩৬।
৫। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, বাঁকুড়া ২০০২, পৃ : ১৩৯।
৬। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, বাঁকুড়া ২০০২, পৃ : ১৪৯।
৭। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, বাঁকুড়া ২০০২, পৃ : ১৫০।
৮। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়কুমার, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, কলকাতা, ১৯৭১।
৯। সিংহ মাণিকলাল, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ: ১২৫-১২৬।
১০। DaltonET, Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta 1872, page-213-14.
১১। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, বাঁকুড়া ২০০২, পৃ: ৩৮।
১২। ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ: ৫৩।
১৩। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮০ (পু.সু.), পৃ: ৪৮৬।
১৪। সেন গৌরপদ, মল্লভূমি জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা, বর্ধমান-২০১১, পৃ:৬৬।
১৫। ভুঁই মেঘদূত, রাঢ়ের আলোকে মোলবোনা, বাঁকুড়া-২০০৫,পৃ-৯০।
১৬। সেন গৌরপদ, মল্লভূমি : জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা, পৃ—৫২, বর্ধমান-২০১১।
১৭। যদুনাথ ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস কালাপাহাড়, কলিকাতা-১৯০৭।
১৮। যদুনাথ ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কালাপাহাড়', পৃ: ১১১, কলিকাতা-১৯০৭।
১৯। যদুনাথ ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস কালাপাহাড়, কলিকাতা-১৯০৭, বিংশ পরিচ্ছদ।
১৯ক।রায় কানাইপদ, উত্তর ২৪ পরগণার সেকাল একাল, পৃ. ৯, ২০, কলি-২০০৭।
১৯খ। আদক অমরেন্দ্র, জাহানাবাদ থেকে আরামবাগ, প্রকাশিতব্য।
১৯গ।১৮৯১ সালের জনগণনাতে বাঁকুড়ায় কৈবর্ত ছিল ২২৪৯১। ১৮৭২ সালে আরামবাগ মহকুমায় কৈবর্তরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঁকুড়া সন্নিহিত হুগলি জেলায় ৪০% ছিল কৈবর্ত, সংখ্যায় ২৮৮৬২১।
২০। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, বাঁকুড়া ২০০২, পৃ: ৩৮।
২০ক।সবরপাদের যে রচনায় (পদ-২৮) রাঢ়ের সামাজিক ও ভৌগোলিক মানচিত্র (পর্বত-টিলায় ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা সবর রমণী) ধরা পড়েছে তা হল, "উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী/মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালি।"
২১। কাঁসাই-কুমারী, প্রকাশক-খাতড়া মহকুমা শাসক,২০১৪, পৃ: ৩৫৫।
২২। বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য, কলকাতা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ:২৪৩।
২৩। বন্দোপাধ্যায় অসিত, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ১০০-১০১, ১২১-২২।
২৪। দত্ত বিজিত কুমার, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডিমঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৯৫।
২৫। মুখোপাধ্যায় নির্মলেন্দু সম্পাদিত অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ, কলিকাতা, ২০০১, পৃ:১।

২৬। ডিমক-গুপ্ত, গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ, হনলুলু, ১৯৬৫, পৃ: ৪২।
২৭। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কলকাতা, ১৯৮০ (পু.মমু.), পৃ: ৪৫১।
২৮। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, পৃ:১০৯।
২৯। চক্রবর্তী রজনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস, মালদা, ১৯০৯, পৃ: ৫৮।
২৯ক। প্রাচীন কুলপঞ্জী মতে, "অসীৎপুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান। আনীতবান দ্বিজান পঞ্চগোত্র সমুদ্ভবান।।" নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (১ম ভাগ, ব্রাহ্মণ কাণ্ড) এবং (১৩২৩ ব.) ধ্রুবানন্দ মিশ্রের সম্পাদিত মহাবংশ দ্রষ্টব্য। মল্লরাজের দেওয়ান সত্ত্বরাম-মুকুন্দ-আত্মারাম (যামিনী রায়ের পূর্বপুরুষ) আদিশূর আনীত বিরাট গুহের বংশধর।
৩০। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃ: ১২৮।
৩১। Beglar JD, Report of a Tour through the Bengal Provinces, Calcutta, 1878, P-50.
৩২। সিংহ মাণিকলাল, রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ: ৬-৮,১৮।
৩৩। পুরুলিয়ায় হিন্দু-জৈনযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান : বাঁকুড়ার খেয়ালী পত্রিকা-২০১৪, পৃ:৪১২।
৩৪। বন্দোপাধ্যায় অমিয়কুমার, বাঁকুড়ার মন্দির, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ: ১৩৫।
৩৫। বন্দোপাধ্যায় রাখালদাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯, কলিকাতা-১৯৯৩।
৩৬। Epigraphia Indica, Vol-I, page-309, verse 20, ASI, 1892.
৩৬ক। মাদলাপঞ্জীতে 'আমুরা সুরথান' আসলে 'আমির সুলতানের' অপভ্রংশ। অর্থাৎ তৎকালীন বঙ্গেশ্বরের পরাজয়ই এখানে বোঝানো হয়েছে।
৩৭। দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসন— Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, Pt-I, p-239.
৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস, বাংলার ইতিহাস, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ২০২।
৩৮ক। চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দ, তুঙ্গভূমে জগন্নাথ মূর্তি ও বাঁকুড়ায় জগন্নাথ কাল্ট (খেয়ালী-২০১৩, পৃ. ৮)। কৃষ্ণচন্দ্র ভুঁইয়া অনুদিত মাদলা পাঁজী (সাহিত্য একাডেমি, কলকাতা, ২০০৩) দ্রষ্টব্য।
৩৮খ। Beans John, Tribes and Caste in Orrissa, Calcutta, 2004, Page-106.
৩৮গ। বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাল, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পকথা, প্রবাসী।
৩৯। Eastern Indian School of Mediaval Sculpture-Rakhaldas Bandopadhaya, Delhi, 1936, page-125.
৪০। সেন গৌরপদ, মল্লভূমি, বর্ধমান-২০১১, পৃ:৬৬।
৪১। হরপ্রসাদ রচনা সমগ্র চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ২৮৯ (কলিকাতা, ১৯৯২)।
৪২। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়ার মুসলমান, বাঁকুড়া, ২০১৪, পৃ: ১১।
৪৩। Robertson FW, Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Bankura-1917-24,Calcutta-1926.

৪৪। কবিরাজ রতন, মদনমোহন বন্দনা, প্রবাসী-১৩৪১।

৪৪ক। আদিশূরের সময়ে কন্যাকুব্জ আগত দক্ষের বংশধর গুপ্তিপাড়া নিবাসী ও চিত্রসেনের সভাকবি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার (১৭০০-১৭৮৮) চিত্র-চম্পুতে বর্গী আতঙ্ক বিবৃত করে লিখেছেন, "গর্ভবত্যর্ভকদৈবতদ্বজসূনুদীনদারণদারুণপন" ও সর্ব্বসর্ব্বস্বাপহরণ স্বেচ্ছাবিহরণ প্রতিষিদ্ধাচরণমাত্রনিপুণঃ" যদুনাথ সরকার যার অনুবাদের লিখেছেন, "Shahu Rajah's troops are niggard of pity, slayers of pregnant women and infants, of brahmins and the poor, fierce in spirit, expert in robbing the property of everyone and committing every kind of sinful act..." উৎস : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৫) প্রকাশিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ'; বামাচরণ চক্রবর্তী অনুদিত (বেনারস-১৯৪০) এবং সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্টস-১৯৮৩; যদুনাথ সরকারের 'ফল অব মুঘল এম্পায়ার ১৭৩৯-১৭৫৩' (দিল্লি-১৯৩২)।

৪৫। শুভঙ্করী আর্যা, সংকলনে শুভঙ্কর, পৃ. ২০, রামপুর-বাঁকুড়া-২০০৫।

৪৫ক। দাসগোবিন্দ বিরচিত শ্যামলীলামৃত কাব্যের ধলভূমকাণ্ডে ইন্দপুরের এই গ্রামে বর্গী আক্রমণ নিয়ে লেখা হয়েছে, "এগারোশ ছেষট্টি সনে বৈশাখের অপরাহ্নে/শুক্ল পক্ষের তৃতীয়ার দিনে একদল বর্গী এসে অত্যাচার কৈল যবে/এই ব্রজরাজপুরের গ্রামে।"

৪৬। Gulam Hossain Selim (1788)–Rius-Us-Salatin. Moulavi Abdus Salam (Tr) page 340-361, Dhaka, 1893 (Rep).

৪৭। Holwell J.Z, Interesting Historical Events, London - 1772 page-121-122

৪৭ক। জে আর ম্যাকলেনের "ল্যান্ড এ্যান্ড লোকাল কিনশিপ অব এইটটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল" (কেমব্রিজ-১৯৯৩, পৃ. ১৮৩) গ্রন্থ সূত্রে জানা যাচ্ছে বর্গী হাঙ্গামার অভিঘাতে ১৭৩৮-৪২ সময়কালের তুলনায় ১৭৫২-৫৬ সালের পরিসরে বাঙলা থেকে রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে প্রায় ২৩ শতাংশ। এই সময়কালে রপ্তানী ছিল যথাক্রমে ৪৬২৮৫৪ এবং ৩৫৫৬৩৩। এসময়কালে চালের দাম বেড়েছিল দ্বিগুণ।

৪৮। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়ায় মুসলমান, পৃ: ৬।

৪৮ক। ১৭৬০ সালে শিউ ভট্টের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার মারাঠা হাঙ্গামার সময় মল্লরাজ, রামগড় ও বীরভূম রাজের মারাঠা-মোঘল জোটের প্রতি আনুগত্য নিয়ে Vansitart, Narrative, "President Holwell's memorials to Select Committee, Page-69"-এ বলা হয়েছে, "(Bishnupur, Ramgar) and the other countries bordering upon the mountains were ready to shake off their dependence, and had offered considerable supplies (to Birbhum)".

অর্থাৎ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত করার তাগিদে রামগড়, মল্লভূমের মতো আঞ্চলিক শক্তিসমূহ মারাঠা পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। শাহ আলম-২ (দিল্লী), শিউভট্ট (ওড়িয়ার মারাঠা গভর্নর) ও কাঙ্কার খানের (বীরভূমের জমিদার) জোটকে এরা সাহায্য করে।

৪৯। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি, পৃ: ৯২-৯৩।

৪৯ক। প্রাগুক্ত। ১৭৫৫ সালের এক ডাচ ফ্যাকটরির নথিতে দেখা যায় বাংলা-বিহারে বর্গী হানায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় চার লাখ। বাংলায় ৩.৫ লাখ মৃত্যু ধরে ১০০০ জনসংখ্যাপ্রতি এই হার দাঁড়ায় ১৬ জন! আক্রমণের প্রথম বছরেই বর্ধমানের রাজস্ব অনাদায় দাঁড়িয়েছিল ২২ লাখ। সুবাতে ৫০ শতাংশ কম আদায় ধরে রাজস্ব সংগ্রহ দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৬৪.৫২ লাখ।

৪৯খ। Mclpin M.C, Report on the Condition of the Santals in the Districts of Birbhum, Bankura, Midnapore and North Balasore, Calcutta -1909.

৪৯গ। Scrine, Memorandum on the Material Condition of the Lower Orders in Bengal, Calcutta, 1892.

৫০। চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্র, জাল প্রতাপচাঁদ, কলিকাতা-১১৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৮-২৯।

৫১। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, পৃ-১০৫, বাঁকুড়া-২০০২।

৫২। বাঁকুড়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলিকাতা-২০০২ প্রকাশিত, পৃ: ৭৩-৭৯।

৫৩। অহল্যভূমি পুরুলিয়া, সম্পাদনা - ডি. পি. জানা, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ৮১-১০০।

৫৪। দুয়ারী সুধীরচন্দ্র, কুশদ্বীপ কালচার, পশ্চিমরাঢ় গবেষণা সাময়িকী, বাঁকুড়া, ২০০৩।

৫৪ক। জানা যায় রূপ-সনাতনের অজ্ঞাতেই উৎকল অভিযান করেন হোসেন শাহ। মদলাপঞ্জী অনুসারে রাজা প্রতাপরুদ্র সারংগড়ে জগন্নাথকে লুকিয়ে রাখেন, এই আক্রমণ থেকে বাঁচাতে। তার সাথে বাংলার আমির-সুলতানের সংঘর্ষ বাঁধে। বৃন্দাবনদাস বিরচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, পৃ. ৩৮১এ সময় ওড়িয়াপতি প্রতাপরুদ্র ও বঙ্গ সুলতান হোসেন শাহের বিরোধের ইঙ্গিত দিয়ে লেখা হয়েছে,

> “দুই রাজার হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
> মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ।”

রাখালদাসের বাঙ্গালার ইতিহাসে (রাজ্য পর্ষদ কর্তৃক ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত) পৃ. ৫৫২ ও ৪৭৯-তে এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাষ্য আছে। মাদলা পাঁজী অনুসারে ১৫০৯ সালে সেনাপতি ইসমাইল গাজীর ওড়িয়া অভিযানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে প্রতাপরুদ্র তাঁকে মন্দারণ দুর্গে অবরোধ করেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর নাম্নী ওড়িয়া সেনা, অবরুদ্ধ গাজীর সাথে যোগ দিলে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

৫৪খ। অন্যতম বহিরাক্রমণ বর্গী হাঙ্গামার তীব্রতা নিয়ে গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরাণে লিখেছিলেন,

> “বাঙলা চৌ অরি যত বিষ্ণু মোণ্ডব।
> ছোটবড় ঘর আছি গোড়াইলা সব।।
> এমতে যত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
> চতুর্দিকে বর্‌গি বেড়াএ লুটিয়া।”

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি জীবন

সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি বাঁকুড়ার জীবন ও জীবিকা কৃষিনির্ভর। প্রান্তিক শিল্পোদ্যোগের প্রচেষ্টা হলেও তা মোট জনজীবনকে প্রভাবিত করার মতো যথেষ্ট নয়। আচারঙ্গ সূত্র বর্ণিত রাঢ়ে জৈন তীর্থঙ্করদের আগমন ছিল আর্যায়ণের প্রথম প্রচেষ্টা।[১] এক হাজার সনের আগে ও পরে কাঁসাইকূলে জৈন বসতির সূচনা বাঁকুড়ার কৃষি মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় জৈনদের প্রভাব বিস্তারে অনুকূল ভূমিকা ছিল বাঁকুড়ার জৈন ধর্মাবলম্বী চোড়গঙ্গারাজদের আধিপত্য। জৈনদের বিস্তৃতি ঘটে অম্বিকানগর-সারংগড়-দক্ষিণ বাঁকুড়া থেকে দ্বারকেশ্বর নদীতীর বরাবর বিষ্ণুপুর পর্যন্ত। এদের যোগদান ছিল বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র-বাজারকে সমৃদ্ধ করাতে, বাণিজ্যের উপযোগী কৃষি ফসলের বিস্তারে ও উদ্বৃত্ত অর্থনীতির স্মারক হিসাবে অম্বিকানগর বহুলাড়া, ধারাপাত, সোনাতপল সহ বিভিন্ন জনপদে জৈন উপাসনাগৃহ গড়ে তোলায়। গুপ্তযুগের পোখন্না-ডিহর কেন্দ্রিক সমৃদ্ধ কৃষি ও কৃষি বাণিজ্যের গৌরবময় অধ্যায়ের পর বাঁকুড়ায় জৈন কৃষিপুঁজির আগমন ও ওড়িয়া জলাজমি চাষের প্রবর্তন ছিল একটি যুগান্তরকারী ঘটনা। এরপর ভৌমরাজ্যগুলির বিকাশের কালে বাঁকুড়া ভূমিতে ভূমি-রাজস্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। ঘাটোয়ালী ব্যবস্থা ছিল রাঢ় বাঁকুড়ার নিজস্ব আঙ্গিক। বনরাজ্যে আপন শাসনের ধারা আরোপে সবচেয়ে বিরোধ ও ব্যথার শরিক হতে হয়েছিল ইংরেজ শাসকদের। ঔপনিবেশিক শাসনের ও শোষণের অভিঘাতে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট বাংলার কৃষকদের প্রথম বিদ্রোহ হয়েছিল বাঁকুড়াতেই, কৃষকনেতা রুদ্র

বাউরীর নেতৃত্বে। বিভিন্ন সেবা জমি থেকে কর্মি-রায়তদের উচ্ছেদ, জমিদারি রাজস্ব অনাদায়জনিত জমিদারি-উচ্ছেদের প্রয়াস জন্ম দেয় চুয়াড়-বিদ্রোহ, পাহাড়িয়া-ফকির আক্রমণ, গঙ্গনারায়ণী হাঙ্গামা। অষ্টাদশ শতাব্দীর ছয়ের ও সাতের দশকে বর্গী হাঙ্গামায় বহু কৃষকের মৃত্যু ও আতঙ্ক রায়তদের একাংশকে গঙ্গার পূর্বপাড়ে পলায়নে বাধ্য করে। কৃষিক্ষেত পড়ে থাকে অকর্ষিত। ১৭৭০ সালে মন্বন্তর দরিদ্র রায়তদের অধিকাংশের বিনাশ ও মৃত্যু আনে, যা আবারও কৃষিজমি অকর্ষিত ও জঙ্গলাকীর্ণ করে তোলে। নয়ের দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আরোপিত রাজস্ব সংগ্রহার্থে এবং জঙ্গল-পতিত জমি কৃষি জমিতে পরিণত করতে জেলায় আগমন ঘটে অন্য জেলার রায়ত (পাইকাস্ত) ও সাঁওতালদের। কিন্তু এই সাঁওতালদের একাংশকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জমি-জীবিকা উচ্ছন্ন হয়ে নিজভূমিতে (দামিন-ই-কোহ্) ফিরে যেতে হয়েছিল। সুতরাং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তভাগে দুইবার জেলার কৃষকদের দেশত্যাগ, রায়তদের দরিদ্রতর ও করুণ অবয়বকেই প্রতিফলিত করে। ব্রিটিশ রাজত্ব ব্যবস্থায় ইজারাডাক, ১৭৭২ সালের পাঁচসালা, ১৭৯০ সালের দশসালা, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঁকুড়ার কৃষি মানচিত্রে অন্ত্যজ শ্রেণির পরিবর্তে উচ্চবর্ণের ক্ষমতায়নের সহায়ক হয়েছিল। মল্লরাজত্বের অন্তিমকালে জমিদানে রাজস্ব এড়ানোর প্রক্রিয়াতেও দেখি শূদ্র-অন্ত্যজ শ্রেণির পরিবর্তে উচ্চবর্ণের মানুষরাই জমির প্রাপক। ইজারাডাক ও পত্তনি গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চ আয়ের ও উচ্চবর্ণের মানুষদেরই একাধিপত্য দেখা দিল। সুতরাং মল্লশাসনে ও অন্যান্য ভৌমরাজত্বের কর্মিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিম্নবর্ণের ছিল, ইংরেজ শাসনে যার বৃহদাংশই ভূমিহীন মুনিষ মাহিন্দারে পরিণত হয়। জমির মালিক হয়ে যায় মূলত উচ্চবর্ণের মানুষেরা।

বাঁকুড়ায় কৃষির প্রাচীনত্ব :

প্রাগৈতিহাসিক যুগ :

বাংলায় প্রস্তরযুগীয় মানব অবস্থিতির অবিতর্কিত নিদর্শন মিলেছে মাত্র দুটি, হিমালয় পাদদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার উচ্চভূমিতে। আর দ্বারকেশ্বর নদীতীর বরাবর কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবনের সূচনা ঘটেছিল হলোসীন যুগের প্রারম্ভে (প্রায় দশ হাজার বছর আগে)। এর বড় কারণ ছিল এ সময়ের জলবায়ুর হঠাৎ পরিবর্তন। অপ্রতুল বৃষ্টিপাতের ফলে নদীখাতের সংকোচন ও নদী উপত্যকার সম্প্রসারণ ঘটে। শিকারজীবী উচ্চভূমির অরণ্যাচারী মানুষ শুশুনিয়ার মতো উচ্চভূমি থেকে নেমে এসে ক্ষীণস্রোতা নদীতীর বরাবর মৎস্য শিকার, কৃষিপত্তন, পশুপালন ও বসতির সূচনা করে। দ্বারকেশ্বরের পূর্বতীরবর্তী মাঞ্জুরিয়া, আড়ালবাসী সহ বিভিন্ন এলাকা

থেকে এই যুগের ১১ সেমি. ব্যাসের ও ২ সেমি. বেধের রিংস্টোন অবিষ্কার এই কৃষি সভ্যতার বিকাশের নিদর্শন।[২] একাধিক রিংস্টোনকে ২ সেমি. ব্যাসের সূক্ষ্মাগ্র কাঠদণ্ডের মধ্যে পরিয়ে ভারযুক্ত করে ভূমিকর্ষণে ব্যবহার করা হত। কৃশ আকৃতির পালিশ করা ছোট রিংস্টোন সুতা কাটার তকলি হিসাবে ব্যবহৃত বলে অনুমিত যা পরবর্তীকালে দানাশস্যের পাশাপাশি তুলা চাষ ও বস্ত্রবয়ন শিল্পবিকাশের ইঙ্গিত দেয়। যাঁতা ব্যবহৃত হত শস্যদানার খোসা ছাড়াতে। প্লিস্টোসীন-প্রস্তরযুগীয় কোয়ার্জ-ব্যাসাল্ট ডিসকাস, কুঠার ছেদকের পরিবর্তে সূক্ষ্মদানা চার্ট-কোয়ার্জ-ব্যাসাল্ট-ক্রিস্টাল পাথরের রিংস্টোন, কুঠার, বাটালী, শিলনোড়া ও কৌলাল এই যুগান্তরের সাক্ষ্যবহ। পোখন্না পরিমণ্ডলে তাম্রযুগীয় ভৈরবডাঙ্গা ছিল প্রাচীন কৃষি অধিবসতি (বাঁকুড়া পরিচয়-১, ২০১২, পৃঃ -১৩৫ঃ উৎখনন ১৯৯৬-২০০২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

তাম্রাশ্মীয় যুগের উন্নত কৃষির নিদর্শন পাওয়া গেছে ডিহড় পরিমণ্ডলে।[৩] উৎখননে পঞ্চম থেকে সপ্তম স্তরে মিলেছে উন্নত কৃষিগোলা ও শস্যদানার অবশেষ। পোড়ামাটির শক্তপিণ্ড ও চুনাপাথর-কাঁকর উপকরণের মেঝে ও মাটির পুরু প্রলেপযুক্ত দেওয়ালের গোলাকার অবশেষ শস্যগোলার ভগ্নাংশ হিসাবে অনুমিত। প্রাপ্ত কুঁড়ের বিশ্লেষণে সে যুগে 'ওরাইজা স্যাটিভা' প্রকৃতির ধান চাষ হত বলে প্রমাণিত। পশুহাড়ের তৈরী ফলা, যাঁতা, বৃহৎ মৃৎপাত্র, মূলোৎপাদনের যন্ত্র, পাষাণচক্র প্রভৃতি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হত। প্রাপ্ত পশুহাড়ের কার্বন ডেটিং বিশ্লেষণে এলাকার পশুদের ৭১.৯৩ শতাংশ গৃহপালিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ জঙ্গলকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া এ সময় শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। গোলার উপস্থিতি, গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য, উন্নত মানের চাষ, তাম্রমুদ্রার উপস্থিতি ডিহড়ের সার্বিক সমৃদ্ধি ও উন্নত কৃষি ব্যবস্থার প্রমাণ।[৪] (Puratattva No.XXXVIII 2006-07, P-54) গবেষণা লব্ধ তথ্যে উল্লেখ আছে ডিহড়ে চাল, কলাই, সরিষার ব্যাপক ফলন হত।[৫] ডঃ অনিল চন্দ্র পাল এই যুগের সূচনা ৩০০০ বছর আগে বলে মনে করেন। তবে এই ধারা মৌর্য যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে বাংলার এই অংশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মৌর্যরাজ অশোক সিংহলরাজের প্রতিনিধিদের তাম্রলিপ্ত বন্দরে বিদায় জানাতে আসেন পাটলিপুত্র-রাজগির- রাজমহল-ঝড়িয়া-রঘুনাথপুর-ছাতনা-ঘাটাল-তমলুক সড়ক ধরে। ইণ্ডিকা ও অর্থশাস্ত্র মতে মৌর্য যুগে গুরুত্বের বিষয় ছিল শূদ্রদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নিরাপত্তায় মোড়া রাষ্ট্রের আনুকূল্যে কৃষিগ্রামের পত্তন। ইণ্ডিকায় এ সম্পর্কে ভাষ্য,[৬] "As they were exempted from fighting and other public service, they devoted the whole of their time to tillage. Nor would an enemy, coming upon a husbandman at work on his land, do him any harm, for farmers were regarded as public benefactors and were protected. The land

thus remaining unravaged, and producing heavy crops, supplies the inhabitants with all that is requisite for making life enjoyable. ....The secluded villages belong to the Sudras was a Mauryan innovation." স্পষ্টতই তাম্রযুগে শিকার জীবন থেকে কৃষি জীবনে জেলার সামাজিক উত্তরণ ঘটেছিল। তবে তখনও পর্যন্ত কৃষির ব্যাপ্তি ছিল নিজের প্রয়োজন মতো ফসল ফলানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ (বন্ধ অর্থনীতি)।

মৌর্য ও গুপ্তযুগ : বদ্ধ কৃষি অর্থনীতি থেকে মুক্ত অর্থনীতিতে উত্তরণ

মৌর্য যুগে দুই ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উপজাতি নিয়ন্ত্রিত স্বাধীন ব্যবস্থা ('রাষ্ট্র' ভূমি) ও জঙ্গল থেকে পরিবর্তিত 'সীতা' জমি যা সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে (১) আধা ফসল প্রদানের শর্তে (২) জমি অকর্ষিত না রাখার ও (৩) গ্রাম ত্যাগ না করার শর্তে প্রদত্ত। এই জমির হস্তান্তরও ছিল বিশেষ অনুমতি ছাড়া নিষিদ্ধ।[৭]

ডিহরের কৃষি গ্রামের সূচনা ছিল অনেকটাই 'রাষ্ট্র' ভূমি ব্যবস্থার অনুরূপ। পাশাপাশি জঙ্গলকে বা অনাবাদী পতিতকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করা 'সীতা' জমির অনুরূপ ভূমিও ছিল। বাঁকুড়ার ছাতনা-পোখন্না অঞ্চলে আরেক ভূমি ব্যবস্থার সমাচার পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন পুষ্করণ (পোখন্না) অধিপতি সিংহবর্মা-চন্দ্রবর্মার সমকালে। শুশুনিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মণীলিপিতে উৎকীর্ণ 'চক্রস্বামিনঃ ধোসো গ্রামাতি সৃষ্টঃ........' অর্থাৎ চক্রস্বামীকে বা বিষ্ণুকে ধোসো গ্রামটি উৎসর্গ করা হল, এই লিপিটি তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে।[৮] উল্লেখ্য গুপ্তযুগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আর্যায়ণ। রাজানুকূল্যে পরিচালিত হিন্দুকরণের অন্যতম উপায় ছিল উপজাতি প্রধান গ্রামে দেবস্থান নির্ণয় করে দেবতার সেবার নামে গ্রামের জমি উৎসর্গ করা ও অধিবাসীদের দ্বারা জমি চাষ করে মন্দিরের কোষে রাজস্ব জমা। এর ফলে যেমন দুর্ধর্ষ উপজাতিদের সহজে অনুগত করা যেত তেমনি অনাবাদী ও জঙ্গল জমি আবাদী করে তোলা সম্ভব হত। তাছাড়া এই ধরনের গ্রামদান দেশের উদ্বৃত্ত অর্থনীতির পরিচয় দেয়। এক কথায় চন্দ্রবর্মার সময়ে কৃষি ও কৃষকদের অবস্থা ভালো ছিল বলেই মনে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন লোকগানের মাধ্যমে দীর্ঘকাল পোখন্নার কৃষি সমৃদ্ধি প্রচারিত ছিল।

বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি' প্রথম খণ্ডে, এমন একটি লোকগান উল্লেখ করেছেন,[৯] 'চার মাস বর্ষা পোখরনা যায় / পোখরনা গিয়ে দেখি দুয়ারে মড়াই / ছোট মড়াইয়ে পা দিয়ে / রাই এসো গো ঝলমলিয়ে।' অর্থাৎ অন্যত্র খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হলেও পোখন্না ছিল খাদ্যে উদ্বৃত্ত ও সমৃদ্ধ। ডিহড় ও পোখন্নাতে উৎখননে প্রাপ্ত মুদ্রা সমকালীন কৃষি, শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তৃতিকেই নির্দেশ করে।

পাল - সেনযুগ : কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

শশাঙ্কের ও দেবপালের রাজত্ব দক্ষিণবঙ্গে প্রসারিত হলেও বাঁকুড়ার ভূমি ব্যবস্থায় তার ছায়পাতের কোনো রেখাচিত্র পাওয়া যায় না। তবে পাল রাজত্ব এই জঙ্গলভূমিতে তেমন রেখাপাত করেনি কারণ পালেদের অনুসৃত বৌদ্ধ সংস্কৃতির খুব একটা নজির এ জেলায় নেই। যদিও যোগেশচন্দ্র, মাণিকলাল সিংহ বিষ্ণুপুরে ও সুখময় চট্টোপাধ্যায় শুশুনিয়ায় বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহীদের কাছ থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারে মন্দারণের (কোতলপুরের একাংশ এর অন্তর্ভুক্ত) লক্ষ্মীশূর ও ইন্দাস-পাত্রসায়ের-সোনামুখীকেন্দ্রিক কোটাটবী রাজ্যের বীরগুণের সহায়তা ও আনুগত্য লাভ করেছিলেন (সন্ধাকর নন্দীর রামচরিত)।[১০] তবে এই ঘটনার পূর্বে ও পরে পাল ভূমি ব্যবস্থার অভিঘাত এই অঞ্চলে অনুভূত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কারণ দেবপালের সময়ে ওড়িষা-বঙ্গে পালেদের আধিপত্যের সুবাদে বাঁকুড়া ভূমিও পাল নিয়ন্ত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। সেন রাজ্যের প্রবর্তক বিজয় সেনের উত্থান ঘটে পূর্ব বাঁকুড়ার শূরবংশের সাথে বৈবাহিকানুগত্য ও মধ্য বাঁকুড়ার কোটাটবীর সামরিক জয়ের মধ্য দিয়ে। সুতরাং সেনেদের ভূমি ব্যবস্থার প্রভাব এই জেলায় ছিল বলে মনে করা যায়। ডিহড়ে উৎখননে প্রাপ্ত সেন-পাল যুগের অনেক কৌলাল ও মুদ্রা নিদর্শন এই ধারণাকে সুদৃঢ় করে। পাল-সেন রাজত্বে রাজস্বের মূল উৎসই ছিল কৃষি রাজস্ব, কারণ এইযুগে মৌর্য-গুপ্ত সমকালীন শিল্প সমৃদ্ধি ও তাম্রলিপ্তকেন্দ্রিক বাণিজ্য-গৌরব অস্তমিত হয়েছিল। কৃষি সেচের বিকাশে পালযুগে সারা বঙ্গব্যাপী অসংখ্য জলাশয় খনন করা হয়। রামপালের সময়েও বাঁকুড়ার সামন্তপতিদের সাথে পাল রাজ্যের মিত্রতামূলক সম্পর্ক বজায় ছিল। সেন আমলের জনজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছিল সমকালীন কবি ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধর, শরণের লেখাতে। এ যুগেও বৃষ্টি নির্ভর কৃষি, ইক্ষুচাষ, গোসম্পদের প্রাচুর্য, কৃষক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তাদের লেখায় ফুটে উঠেছে। অবশ্য কিছু দারিদ্র্য ও মলিনতার চিত্রও আছে।

দক্ষিণ বাঁকুড়ায় জৈন-ওড়িয়া প্রভাব : কৃষির আধুনিকীকরণ ও পুঁজির প্রবেশ

রামপালের পুত্র কুমার পালকে পরাজিত করে ওড়িষাধিপতি অনন্তদেব চোড়গঙ্গ মূলত দক্ষিণ বাঁকুড়া পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় মন্দারণ কেন্দ্রিক শূর আধিপত্যও অস্তমিত হয়েছিল। ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে আফগান-উজবেক-তুর্ক বংশীয় মুঘিসউদ্দিন ওড়িয়া আধিপত্যের অবসান ঘটালেও দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ওড়িয়া সংস্কৃতির রেশ অব্যাহত থাকে। বরং পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি কপিলেন্দ্র দেব সুলতান নাসিরুদ্দিনকে পরাজিত করলে এই অংশে ওড়িয়া আধিপত্য প্রাতিষ্ঠানিক

রূপ পায়। চোড়গঙ্গ নৃপতির আধিপত্যের সুযোগ বাঁকুড়ায় জৈন প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[১১] এতে কৃষিক্ষেত্রে ও বাণিজ্যে জৈন বণিকদের পুঁজির আগমন ঘটে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু কৃষিপণ্যেরই আধিক্য ছিল, তাই বাণিজ্যের স্বার্থে, কৃষিতে তাদের বিনিয়োগ ছিল। পুঁজির যোগান ও অনুকূল কৃষিবাণিজ্যের কারণে এসময় কৃষক ও কৃষির অবস্থা ভালো ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়। এর ঠিক দুইশত বর্ষ পরে ওড়িষা নিবাসী শ্রীপতি মহাপাত্র দক্ষিণ বাঁকুড়ার সিমলাপালে জমিদারি পত্তন করলে বহু ওড়িযাবাসী তাঁর অনুগামী হয়ে বাঁকুড়ায় বসতি স্থাপন করে। এ সময় ওড়িষার সমুদ্র বাণিজ্য ও শিল্পের অবনতির কারণে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল। তাদের অভিবাসনের পেছনে এটি একটি কারণ ছিল। এদের আগমনে বাঁকুড়ার কৃষি পদ্ধতির গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এদের প্রভাবে উপজাতীয় ঝুম চাষের পরিবর্তে আধুনিক জলাজমি চাষ প্রবর্তিত হয়। কৃষির স্থিরতা আসে। তাছাড়া এই আগন্তুকদের একশ্রেণি মহাজনী কারবারে সিদ্ধহস্ত হওয়ায়, কৃষিতে পুঁজির সম্ভাবনা বাড়ে। তবে এই মহাজনী শোষণে উপজাতীয় রায়তদের অনেককেই জমি হারাতে হয়। দক্ষিণ বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাকেন্দ্র অনেকটা এদেরই কারায়ত্ত হয়। আদি রায়ত ও জমিদাররা ক্ষমতা ও বিত্ত হারিয়ে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে।

তুলনায় অনন্তদেব ও অনঙ্গভীম-২ (১১৯০-১১৯৩ খ্রিঃ) সময়ে কৃষক ও কৃষির উন্নতিকল্পে রাজশক্তি ছিল সক্রিয়। অনঙ্গভীম-২ তাঁর অধীনস্ত গোদাবরী থেকে হুগলি নদী এবং সমুদ্র থেকে সোনপুরের সমুদয় এলাকা জরিপ করান। মোট এলাকা ছিল ৬২২৮০০০ ভাটি (২০ একরে এক ভাটি)। এর মধ্যে কৃষিজমি ছিল ৪৭৪৮০০০ ভাটি। অর্থাৎ শতাংশে ৭৬ ভাগ। সুতরাং অনঙ্গভূম -২ প্রভাবিত দক্ষিণ বাঁকুড়াতেও কৃষিজমি নিশ্চয় ৫০ শতাংশ ছাড়িয়েছিল। এই রাজাদের আরেকটি নীতি ছিল জলের উৎস বা জলাশয়ের আশেপাশেই যথাসম্ভব কৃষিক্ষেত্র গড়ে তোলা। চোড়গঙ্গদের রাজত্বকালে দক্ষিণ বাঁকুড়ার কৃষি সেচের জন্য জলাশয় খনন অসম্ভব কিছু নয়।[১২]

ভৌম রাজত্বে বাঁকুড়া ঃ বিবিধ স্বত্বের সৃষ্টি

সেন রাজ্যের প্রবর্তক বিজয় সেনের উত্থান পশ্চিম বাঁকুড়া ও মন্দারণের শূর বংশের সাথে বৈবাহিকানুগত্য ও কোটাটবী রাজ্য জয়ের মধ্য দিয়ে।[১৩] অর্থাৎ বাঁকুড়ার বৃহদংশই তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল। ডিহড়ে উৎখননে প্রাপ্ত সেন-পাল যুগের অনেক কৌলাল ও নিদর্শন এই ধারণাকে সুদৃঢ় করে। বস্তুত পাল আমলের শেষদিকে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক শক্তির যে উত্থান ঘটেছিল (শূর, কোটাটবী), বিজয় সেনের সামরিক অভিযানে তা বিনষ্ট হয়। বিজয় সেন পরবর্তী সেন রাজাদের ক্ষমতা কেন্দ্র গৌড় কেন্দ্রিক

হওয়ায়, ফের বাঁকুড়ায় একাধিক আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটে, যেগুলি ভৌমরাজ্য হিসাবে পরিচিত হয়। বাঁকুড়ার মুখ্য দশটি ভৌমরাজ্যের উদ্ভবকাল নিম্নরূপ ঃ[১৪]

রাজবংশ	প্রতিষ্ঠাসাল	প্রতিষ্ঠাতা
(১) বিষ্ণুপুর মল্ল	১৫৬০ বা ৬৯৪ খ্রিঃ	ধাড়ী হাম্বির বা আদিমল্ল
(২) ছাতনা	১৪০৩ খ্রিঃ	শঙ্খ রায়
(৩) মালিয়াড়া	১৫৯১ খ্রিঃ	দেব অধূর্য
(৪) সুপুর / ধবলভুম	১৭২৫ খ্রিঃ	টেকচাঁদ ধবল / চিন্তামনি ধবল
(৫) অম্বিকানগর	১৭২৫ খ্রিঃ	খড়্গেশ্বর
(৬) সিমলাপাল	১৩৫০ খ্রিঃ	শ্রীপতি মহাপাত্র
(৭) ভেলাইডিহা	১৬১৭ খ্রিঃ	লস্কর সিংহ চৌধুরী
(৮) রাইপুর	১৩৫০-৫৮ খ্রিঃ	শিখর রাজ, ফতে সিংহ
(৯) শ্যামসুন্দরপুর	১৩৫৮ খ্রিঃ	নকুড়তুঙ্গ
(১০) ফুলকুসমা	১৫৯১-১৬১৬ খ্রিঃ	মুকুটনারায়ণ দেব

এই তালিকা থেকেই স্পষ্ট যে সেন শক্তির অবসানের পর (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) বারংবার মুসলিম শাসনের আবর্তে বাংলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকলেও বাঁকুড়া ভূমিতে এসে বরাবরই তার অগ্রগতি অবসন্ন হয়ে পড়ত। এর কারণ সম্ভবত অরণ্য-অন্তরালে শক্তিশালী ভৌমরাজ্যের বিকাশ ও তাদের প্রতিরোধ। যেহেতু সেন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় চোড়গঙ্গরাজ মুকুন্দদেবের সহযোগ ছিল, মিত্ররাজ্য হিসাবে দক্ষিণ বাঁকুড়ায় চোড়গঙ্গরাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত জৈনধর্মাবলম্বী চোড়গঙ্গদের সমকালীন জৈন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পরবর্তী একশত বছর তাদের এই প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। ১২৫০-১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ প্রায় দুইশত বর্ষ ওড়িয়া প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়লেও দেশের এই অংশে আফগান প্রভাব সেভাবে অনুভূত হয়নি। এর বড় কারণ দুর্গম বনমধ্যে ভৌমরাজ্যগুলির শক্তিধর হয়ে ওঠা। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে বাঁকুড়ার একাংশে কপিলেন্দ্রদেবের নেতৃত্বে ওড়িয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নবাবী শাসনেও এই ভৌমশাসকরা ছিলেন কার্যত স্বাধীন। তুর্ক-আফগান শাসনের মধ্যেই ভৌমরাজ্যগুলির সৃষ্টি সমাচার মিলতে থাকে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে ভৌমরাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠাকাল হল সিমলাপাল ১৩৫০ খ্রিঃ, শ্যামসুন্দরপুর ১৩৫৮ খ্রিঃ, সুপুর ১৪০০-১৫৫০ খ্রিঃ, ছাতনা ১৪০৩ খ্রিঃ, মল্লভূম ১৫৬০ খ্রিঃ (মতান্তরে ৬৯৪ খ্রিঃ), মহিষাড়া ১৫৯১ খ্রিঃ, ফুলকুসমা ১৫৯১-১৬১৬ খ্রিঃ, ভেলাইডিহা ১৬১৭ খ্রিঃ, রাইপুর

১৬৩৬-৫৬ খ্রিঃ, অম্বিকানগর ১৭২৫ খ্রিঃ। এই ভৌম রাজদের নিজস্ব ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আঙ্গিকে জন্ম নেয় মণ্ডলী প্রথা, ঘাটোয়ালী প্রথা, বিভিন্ন ধরনের চাকরাণ সেবা জমি ও নিষ্কর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দানকৃত জমি। নিম্নে এদের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখিত হল ঃ

১) মণ্ডলী প্রথা :

বাঁকুড়া জনের ইতিহাস - সংস্কৃতি (রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পৃঃ - ৩১৫) গ্রন্থের তথ্যানুসারে[১৪] 'বাঁকুড়া জেলায় জঙ্গল পরিস্কার করে চাষের জমি বৃদ্ধি করেছিল উপজাতীয় সাঁওতাল ও অর্ধ উপজাতীয় ভূমিজ ও মাহাতো গোষ্ঠীর অভিবাসিত শ্রমিকের দল। ফলে মণ্ডলী প্রথার সৃষ্টি হয়। এ মণ্ডলী প্রথা ছিল পশ্চিম বাঁকুড়ার নূতন কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি। অভিবাসিত সাঁওতাল, ভূমিজ ও মাহাতো শ্রমিক সর্দারগণ মণ্ডল নামে পরিচিত ছিলেন।' ইংরেজ আমলে ১৮৩৯ সালে জমিতে মণ্ডলদের অবস্থান ও অধিকার স্থির করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে করে চাষীদের উপর অধিকারের প্রশ্নে মণ্ডল ও জমিদারদের কোনো মতান্তর না ঘটে।[১৫] মণ্ডলী প্রথার প্রাবল্য ছিল ভূমিজ-মাহাতো অধ্যুষিত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঁকুড়ায়। সাঁওতালদের বসতি পত্তনের কাহিনির সঙ্গে মণ্ডলী প্রথার সূচনা সম্পর্কিত করা যায়। ডালটনের ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব্ বেঙ্গল অনুসারে সাঁওতালদের আগমন ছিল ছোটনাগপুরের হাজারীবাগ জেলার হিহিড়ি-পিপিড়ি থেকে। চৈ-চম্পা, ধানবাদ, গয়া, পাঞ্চেৎ হয়ে একটি শাখা সাঁওতাল পরগণায় এবং অন্যটি ছাতনা হয়ে মেদিনীপুরের শিলদায় ঘাঁটি গাড়ে। অশোক মিত্র সম্পাদিত 'The Tradition and Institution of the Santals" গ্রন্থে লেখা হয়েছে[১৬] 'হড় (সাঁওতাল) লোকেরা একলা কোথাও বাড়ি তৈরী করে না। গ্রাম তৈরী করে। আর সেখানে একসঙ্গে থাকে। গ্রাম পত্তনের জন্য মুখিয়াসহ তিন-চারজন লোক জঙ্গল দেখে। .... তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে সেইরূপ জায়গা বাছিয়া লয় যেখানটা একটু উঁচু, যেখানে ভাল বাস্তুবাড়ী, যেখানে ক্ষেত তৈরী হতে পারে, যেখানে জল পাওয়া যেতে পারে। দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়। তারপর একদিন শুভ অশুভ ঠিক করতে গেল। তারপর একদিন ফিরিয়া গিয়া ঐ মুখিয়া লোকটির জন্য একটি কুঁড়ে তৈরী করে। ঐ গ্রামের যে মুখিয়া মাঝি হয়ে সে প্রথমে গাছ কাটবে, আজকাল জঙ্গল দেখে শুনে রাজাকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পূর্বে রাজাদের জন্ম হওয়ার আগে সে সব ছিল না। তারপর সেই মুখিয়াকে দিয়ে বাস্তু ভাগ করে।' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরোপিত রাজস্ব নিশ্চিত করতে ও লাভের পরিমাণ বাড়াতে ভূস্বামীদের কাছে জঙ্গল ও পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই হাজারিবাগ-ঝাড়খণ্ড থেকে এই

কাজে নিপুণ সাঁওতালদের আনা হয় ও তাদের হাতে নয়া বসতি ও কৃষি ক্ষেত স্থাপিত হতে থাকে। গোষ্ঠীপতি বা মণ্ডলই ছিল যৌথ জমির রাজস্ব সংগ্রহ ও জমার দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে একশত বছরের মধ্যেই দেশীয় মহাজন জমিদারদের শোষণ ও চক্রান্তে অধিকাংশ মণ্ডলী জমি আর সাঁওতাল-মণ্ডলদের অধিকারে ছিল না (সূত্র : ম্যাকালপিন প্রতিবেদন)। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে অনেক বাস্তুচ্যুত-ভূমিচ্যুত সাঁওতাল রায়ত তাদের আদিদেশ দামিন-ই-কোহ্-তে ফিরে গিয়েছিল। দামিনের শাসক পেটি-ওয়ার্ড সাহেব ভাগলপুরের রাজস্ব কমিশনারকে ১৮৩৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর জানান বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত সাঁওতালরা আসার ফলে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছ।[১৭] এই অভিবাসনের ফলে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে দামিনের ১৫০০ গ্রামের জনসংখ্যা ১১৭০৪৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৯১৪৬২। এ সময় বাঁকুড়ার সাঁওতাল জনসংখ্যা কমে ছিল ২৫৩৭৮। এই শোষণের অভিঘাত এবং জমি-বৃত্তি-বসতি থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করার ফলে বাঁকুড়ার জঙ্গল ও পতিত জমি উদ্ধারের কাজেও ভাঁটা আসে। আর সাঁওতালরা বস্তুত নিঃস্ব হয়ে নিজ ভূমে ফিরে গিয়েছিল। শুচিব্রত সেনের ভাষায়[১৮], 'they first came from the erstwhile jungle mahals to Domin-i-kho, they had practically nothing to bring from their deserted homes." অন্যদিকে দেশীয় মণ্ডলেরা অনেকেই নিজস্ব জমি ও ক্ষমতার কিয়দংশ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে কোম্পানী জমিদারের গোমস্তা ও পাটোয়ারীকে প্রভাবিত করে। মণ্ডলরা এইসব কর্মচারিদের দ্বারা নিজেদের জমিতে, ভালো মানের হলেও, কম রাজস্ব নির্ধারণ ও দরিদ্র রায়তদের তড়া-টাঁড় বা বাজে জমিতে বেশি রাজস্ব নির্ধারণ করান।

মল্লরাজ ও অন্যান্য ভৌমরাজদের সাথে রায়তদের যোগসূত্র ছিল এই মণ্ডলরা। এরা বেতনভূক কর্মচারি ছিলেন না। রাজস্ব আদায়ের শর্তে গ্রামের কিছু জমির নিষ্কর বা নামমাত্র রাজস্বের মালিকানা দেওয়া হয়েছিল এদের হাতে (খেম জমি)। অনেক মণ্ডলই অবশ্য নিজস্ব প্রভাব প্রতিপত্তির কল্যাণে খেম জমির বাইরে বহু জমির মালিকানা পেয়েছিলেন। মণ্ডলরা ছিলেন গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত। গ্রামবাসীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁরা অবশ্যই আমন্ত্রিত থাকতেন। গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসাও করতে হয় তাঁকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুরু হলে এই ক্ষমতার কেন্দ্র ইজারাদার গোমস্তার হাতে চলে যায়। মণ্ডলদের ক্ষমতা গ্রামে আগত রাজপুরুষদের আতিথ্য প্রদর্শনের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। মূলত দেশীয় (উচ্চবর্ণের) মণ্ডলরা কম রাজস্বে ভালো জমি হাসিল করলেও, সরল সাদাসিধে সাঁওতাল মণ্ডলরা ক্ষমতা ও জমি হারিয়ে ভূমিচ্যুত-বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। তাছাড়া উপজাতীয় মণ্ডলরা গোষ্ঠীগতভাবে জমির মালিকানা ভোগে বিশ্বাসী

ছিল, সেই কারণে মণ্ডলের ভূমিচ্যুতির সাথে সমগ্র গোষ্ঠীরই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ম্যাকালপিনের সমীক্ষায় (পৃঃ-১৭) দেখা যায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দেও যেখানে শ্যামসুন্দরপুর তালুকে ১৪টি গ্রামে সাঁওতাল মণ্ডলী (তালুকের প্রায় ৭০ শতাংশই সাঁওতাল গ্রাম) প্রথা অব্যাহত ছিল, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তা দাঁড়ায় ১০টি। অম্বিকানগরে (জমিদারির প্রায় ৩০শতাংশ সাঁওতালি গ্রাম) ১৮৮৪ সালে সাঁওতাল মণ্ডল ৪ থেকে কমে ১৯০৯ খ্রিঃ দাঁড়ায় ১টিতে।[১৯] রাইপুরে (সাঁওতাল গ্রাম মোট গ্রামের ৭০শতাংশ) ১৮৮৪ সালে ১৯টি গ্রামে সাঁওতাল মণ্ডলী প্রথা অক্ষত থাকলেও ১৯০৯ খ্রিঃ দাঁড়ায় ২টিতে। ছাতনাতে একটিও এ ধরনের মণ্ডলী গ্রাম অবশিষ্ট ছিল না। ম্যাকালপিন সাঁওতালি মণ্ডলী গ্রামে আরো কিছু রাজস্ব প্রথার অনুপ্রবেশ দেখেছিলেন, যেমন—(১) মোকাবরী স্বত্ব ঃ সেলামী ও চিরকালীন নির্দিষ্ট রাজস্বের শর্তে জমি বন্দোবস্ত, (২) জঙ্গলবুরী স্বত্ব ঃ জঙ্গল লীজ দেওয়া হয়, ক্রমাগত আনুপাতিক হারে জঙ্গল সাফ করে জমি হাসিল করার জন্য। রাজস্বের হার কম বা শূন্য রাখা হয় প্রথম অবস্থায়। (৩) জামাই বা জোত স্বত্ব ঃ বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব যা একক বা যৌথ মালিককে দেওয়া হত। (৪) ঘাটোয়ালী স্বত্ব ঃ দু-একটি ঘাটোয়ালী স্বত্ব ছিল। অধিকাংশ মণ্ডলীগ্রাম কৌশলে দখল করেছিল মহাজনরা। খুব অল্পসংখ্যক মণ্ডলী গ্রাম রাজস্ব অনাদায়ে বা কোর্টের নির্দেশে ভেঙেছিল। কিছু গ্রাম মণ্ডলীদের অধীন 'দিকু' আদায়কারীরা কৌশলে দখল করে। এই ভাঙা গ্রামগুলিতে চালু ছিল (১) জামাই জোত, (২) মোকাবরী স্বত্ব, (৩) সাজা প্রথা ঃ দখলীকৃত জমিতে পুরানো রায়তকে উচ্চহারের বার্ষিক নির্দিষ্ট রাজস্বে চাষের স্বত্ব, (৪) ভাগতি স্বত্ব ঃ উৎপাদিত শস্য মালিক-চাষীর মধ্যে আধাআধি (কৃষক বীজ-সার- বলদ-শ্রম দিলে ২/৩ অংশ কৃষকের) ভাগের সত্ব। (৫) কোর্ফা প্রজাস্বত্ব ঃ মূলত শ্রমিক-কৃষকদের চাষের উপস্বত্ব। এইভাবে মণ্ডলীপ্রথা বিভিন্ন স্বত্বে অবনমিত হয়।

(২) ঘাটোয়াল ও ঘাটোয়ালী জমি

রাঢ়ভূমিতে ঘাটোয়ালী প্রথা ছিল ভৌমরাজতন্ত্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এর সঠিক সৃষ্টিকাল ও উদ্ভবের কারণ নির্ধারিত হয়নি। তবে ভৌমরাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ী ও জঙ্গল সড়কের প্রবেশ পথ ও ঘাটের নিরাপত্তার দায়িত্বের কথা (এমনকি মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ) ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু ঐতিহ্যে যেমন রাজারা জমিকে কৃষিযোগ্য ও বসতযোগ্য করে যে প্রথম আবাস ও চাষের পত্তন করত তাদেরই সেই অংশের স্বত্বাধিকারী মানত, বাঁকুড়াতেও তেমন ঘাটোয়ালরা ঘাট সন্নিহিত মৌজার পত্তন, কৃষিক্ষেত-পুষ্করিণী-বাঁধ ও বসতি সৃষ্টি করে মালিকানা স্বত্বের অধিকারী হয়।

ঘাটোয়ালরা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হলেও ক্রমে এটি বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। পঞ্চকি পরিশোধ ও ঘাটোয়ালী কর্তব্যে গাফিলতি না পেলে এদের অপসারণ করা হত না। গোপাল সিংহের সময়কালে, ফরাসি পর্যটক এ্যাবেরাইনল এদের কর্তব্য পরায়ণতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।[২০] ঘাট এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথে বণিক ও পর্যটকরা ঘাটোয়ালী অনুমতি পত্র, সংগ্রহ করত যা দেখিয়ে বিভিন্ন ঘাট এলাকা তারা নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে অতিক্রম করতে পারত। পথিকের হারানো দ্রব্যাদি বিজ্ঞাপিত করে সন্নিকটস্থ গাছে টাঙিয়ে রাখা হত। পরবর্তীকালে গ্যাসট্রেল প্রতি ঘাটে আর্থ-আদায় সমেত অনুমতি দান ও পথে ঘাটোয়াল ও অন্য ধনাঢ্য প্রজাদের দ্বারা জুলুম-লুণ্ঠনের উল্লেখ করে এই প্রথার দোষ তুলে ধরেছেন। ১৭৯৮ সালের হিসাবে মল্লভূমে ২০টি ঘাটে ১৩১৯ জন ঘাটোয়াল ছিলেন যাঁদের দখলীয় জমির পরিমাণ ২১৫১৩ বিঘা ৪ কাঠা ৮ ছটাক। মোট খাজনা ৩৭০৩ টাকা ৩ আনা। অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর হিসাবে মল্লরাজাধীন ঘাটোয়ালের সংখ্যা ২২০০। গঙ্গাজলঘাটির বাইশগ্রাম তরফে ২২, ছান্দার তরফে ২৭, চুয়ামসিনা তরফে ৫০ জন ঘাটোয়ালের কথা জানা যায়। গড়ে ৫০ বিঘা হিসাবে ঘাটোয়ালদের মোট জমি ছিল ৩৩০০০ বিঘা। ১৮০২ সালে বিষ্ণুপুর কমিশনার চার্লস ব্লান্টের হিসাবে মল্লরাজ্যে পঞ্চকি ঘাটের সংখ্যা ছিল ৪৩,ঘাটোয়াল ২২৯৯, ঘাটোয়াল-জমি ৩৫২৮২ বিঘা, আদায়যোগ্য পঞ্চকির পরিমাণ ৪৬৯০ টাকা ১২ আনা ৭ পাই। বেপঞ্চকি ঘাট ১টি।[২১] ব্লান্টের ১৮১৬ সালের হিসাব অনুসারে মল্লভূমে সরকারি পঞ্চকি ঘাট ৪১৬২০ বিঘা, জমিদারি পঞ্চকি ঘাট ১৪৭১০ বিঘা যা ১৮৪৫ সালের হিসাবে দাঁড়ায় সরকারি পঞ্চকি ঘাট ৫৮৫০৬ বিঘার, জমিদারি পঞ্চকিঘাট ২৪৮৬৩ বিঘার, বেপঞ্চকি ঘাট ২২০০ বিঘার। রবার্টসনের ক্ষেত্রসমীক্ষায় পঞ্চকি ঘাট ১৩৬৫৩৬ বিঘা, জমিদারি পঞ্চকি ঘাট ১৩০৩৫৮ বিঘা; বেপঞ্চকি ২৯৭১ বিঘা। ১৮৮৭ সালে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে এই জমির পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬৯০০০ বিঘা, ৩৫০০০০ বিঘা ও ২৭০০ বিঘা।[২২] ১৮১৬ খ্রিঃ ও ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের এই সুবিশাল ফারাকের কারণ, এই সময় সাঁওতালদের সাহায্যে, পতিত ও জঙ্গল জমি থেকে , কয়েকগুণ জমি হাসিল। রাজার অধীনস্থ সদর ঘাটোয়ালের অধীনে থাকত কয়েকজন সাদিয়াল ও সাদিয়ালের অধীনে কয়েকজন তাঁবেদার। সাধারণভাবে সদর ঘাটোয়ালের অধীনে ২০-৪০ বিঘা জমি থাকত। মাত্র সাত দশকে ঘাটোয়ালী কৃষিজমির বৃদ্ধি ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ (১৮১৬ সালের তুলনায় ১৮৮৭ সালে)। এই কৃষিজমিতে চাষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাঁওতাল ও নিম্নবর্গীয় মানুষদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে মে ঘাটোয়ালী জমি সমীক্ষা ও অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই অন্ত্যজ উপজাতীয় কৃষকরা, যারা সরাসরি অধিগ্রহণের সুফল ও কর ছাড়ের সুবিধা

থেকেও ছিল বঞ্চিত। ঘাটোয়ালী জমি অধিগ্রহণের শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ[২৩] (১) ১৮৪০-৪৭ সালের ক্ষেত্রসমীক্ষা মোতাবেক ঘাটোয়ালী জমি নির্ধারিত হবে, (২) স্থানীয় হারে কর নির্ধারিত হবে এবং ঘাটোয়ালীদের দীর্ঘ দখলদারির জন্য অবশিষ্ট জমিতে ২৫ শতাংশ কর ছাড় দেওয়া হবে, (৩) ঘাটোয়ালীদের অবশিষ্ট জমিতে বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব স্বীকার করা হবে, (৪) রাজস্ব আদায়কারী জমিদার আদায়ের অর্ধাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেবে, (৫) জমিদারকে দেয় কোনো পঞ্চকি থাকলে তা জমিদারের দেয় থেকে বিযুক্ত হবে। উল্লেখ্য, অধিগ্রহণ শর্তাবলীতে জমির মুনিষ-মাহিন্দার কোর্ফা রায়ত, ভাগীদারদের কোনো কথা নেই। কারণ এই অধিগ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোষাগারের কলেবর বৃদ্ধি। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৫ ও ১০৬ ধারামতে এই অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হলে দেখা যায় এই আয়বৃদ্ধি ছিল ২৫৪শতাংশ । নিম্ন ছকে তা দেখানো হল :

ঘাটের সংখ্যা	ঘাটের চরিত্র	এলাকা (একর)	নয়া ভূমিকর (টাঃ/আঃ/পাঃ)	পূর্বতন পঞ্চকি (টাঃ/আঃ/পাঃ)
৪৩	সরকারি পঞ্চকি	৪৫৭৭৩.৯	১৭৫৪২/১০	৫০০৩/৭/০
১৭৪	জমিদারি পঞ্চকি	৭৭৭৪৬.৯	১৯৭৭৯/১১/২	৫৫৬৩/১০/১১
৩৫	জমিদারি/সরকারি	২২৬২৯.০৪	৬৬৯১/৩/১	১৮৭৪/১৪/১০
মোট ২৫২		**১৪৬১৪৯.৮৪**	**৪৪০১৩/৮/৩**	**১২৪৪২/০/৯**

সুতরাং এ রাজস্ব সংস্কার কর্মকাণ্ডে নিম্নতম রায়ত কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষিতই থেকে যায়। জমি থেকে উচ্ছন্ন অনেক সাঁওতাল পরিবার স্বদেশে (দামিন-এ) ফিরে যায়। মল্লশাসনের Tribalisation কোম্পানী শাসনে Detribalisation - এ পর্যবসিত হয়, সেই একই ভূমির অধিকারকে কেন্দ্র করে।

সামগ্রিকভাবে মল্লভূমের ঘাটোয়ালী অধিগ্রহণে বর্ণেতর মানুষেরাই প্রভাবিত হয়েছিল কারণ এদের অধিকাংশই ছিল প্রান্তিক মানুষ। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘাটোয়াল তালিকা থেকে এই শ্রেণিচরিত্র উপলব্ধি করা যাবে[২৪]।

ঘাট	সর্দারের নাম	কর্মী সংখ্যা	ঘাটোয়ালী জমি (বিঘা/কাঠা/ছটাক)	পঞ্চকি টাকা/আনা	হজুর সেলামী টাকা/আনা	মোট টাকা/আনা
বুলরামগড়	হারাদুর চৌধুরী	১০৩	১৫৮৮	১২৪/৮	--	৮৭
মুকুন্দপুর	গোবিন্দ সিং	২০০	৩০৫৬	৪০৬/১০	১৯১	৮৬
বাঁকাদহ	সামসুর বাহাদুর	২০৪	৩১০৫	১৫৪	২০	৮৫
বেলশুলিয়া	নিতাই দিগর	৪১	৫৯১	৫০/১২	--	১৮/৪

ঘাট	সর্দারের নাম	কর্মী সংখ্যা	ঘাটোয়ালী জমি (বিঘা/কাঠা/ছটাক)	পঞ্চকি টাকা/আনা	হজুর সেলামী টাকা/আনা	মোট টাকা/আনা
কোতল	মুকতাল বুনি	১৬৭	২১৪৬/১৩	১৯৭/৩	১১৩/৬	৫০/২
জয়বেলিয়া	রতন সিং	১৬০	৩২৮০/১১	৫৫৯/৪	২২৯	৪৮
মোণীপুর	গৌর হাজারী	৩০	১০৯৩/৫	১৩৫	৫৩	৩৯
দেগপরপাল	তেতুলনন্দকিশোরসিং	১৫৪	২৩১৬/১২	১৬০/১০	৪৬	৭০/১০
তৈল সঞ্চরা ও জামজুড়ি	লালু রায় ও সৈরতুক হাজারী	৩৪	৩৮৭/১৬/৮	১৩০	৬৯	৪০/১৪
দেহেজামকুড়ি	বিনোদ সিং	১০	১০৪	১০	--	--
পৈতুমোরা	কোড়ারাম সর্দার	৩৫	৬০৯	৩৫	--	২৪
বীর সিং	কোড়ারাম সর্দার	৩৮	৬০২	২১	১৬/৬	৪৫/১০
চুয়ামসিনা	পাঞ্চু বাহাদুর	৫২	১০২৮/৩	১৩৩/১৩	৬	২০/২
বেলিয়ারা সবুক	বৈজুফেটি	--	--	--	--	--
বেলুড় বসন্তপুর	গোকুল বেরা	১১	১৯৬	১১/৬	--	১১/১২
নাকবাঁধ মুচি	মোচারাম					
ভোঙ্গী	কার্তিক দিগর	২৮	৬১৫	৩১/৮	--	১৪
বালসী	রামকান্ত সিং ও গোলাব রায়	১৩	১৭৩/১৮	২২	--	--
চাতরা	কালু সর্দার	২১	--	--	--	--
গোপালপুর	চৈতন সর্দার	১৪	৭১০	৬৫	--	--
ঘুটকুল	ভুরুট সর্দার	৩৯	--	--	১২	৭
	মোট	১৩১৯	২১৫৯৩/৪/৮	২২৪৭/১২	৮০৭	১২৬৪৭/৯

মোট দেয় কর — ৩৭০৩/৩

মল্লভূম ছাড়াও অন্যান্য ভূম রাজ্যেও ঘাটের অস্তিত্ব ছিল যা ছিল মূলত ভূমিজ নিয়ন্ত্রিত। অধ্যাপক চৌধুরী অম্বিকানগর-সুপুরের কাজলকুঁড়া, মেহরাডি মাকাসা, দেউলি ঘাট ও সামন্তভূমের আলিঝাড়া, ঝুঁমকা, চকপাহাড়ঘাট, মীনাপুর ঘাটের উল্লেখ করেছেন। ১৯২৩-২৪ সাল নগদ সমস্ত ঘাটের অধিগ্রহণ সমাপ্ত হলে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন রাঢ়ভূমির এই বিশেষ ভূমি ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

(৩) চাকরান জমি :

মল্লভূমের পশ্চিমাংশে যেমন ঘাটোয়ালদের আধিক্য ছিল, তেমনি পূর্বাংশে শান্তিরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলেন চৌকিদার, সীমান্দার, অষ্টপ্রহরী। চৌকিদারের সংখ্যা ছিল

৩৬৩৯ জন। এদের সেবার পরিবর্তে দখলীয় জমির পরিমাণ ছিল ২০১১৩ বিঘা।[২৫] জমিহীন চৌকিদাররা পেত ১.৫-২ টাকা মাসিক বেতন যা মূলত গ্রামবাসীদের যোগাতে হত। তৎকালীন গ্রামগুলির পরিবার সংখ্যা ছিল ২০-৫০। গ্রামে চৌকিদার নিযুক্ত হত ৪-৬ জন। এই চৌকিদাররা ছিল মূলত নিম্নবর্গীয়। অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ও দেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কোনো ভৌমরাজ্যে পাইকদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এদের নিষ্কর জমিকে বলা হত চাকরাণ জমি। এই চাকরাণ জমি অধিগ্রহণের পর জীবিকা উচ্ছন্ন পাইকরা নবপ্রবর্তিত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। রাইপুরের বিদ্রোহে এই পাইকদের যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল রাইপুরের ভৌগলিক সীমার বাইরেও। মোটকথা কোম্পানী শাসনের সূচনাপর্বে চুয়াড় বিদ্রোহের চালিকাশক্তি ছিল এই জমিহারা রায়তদের যন্ত্রণা। ১১৮৩ বঙ্গাব্দে একটি হস্তাবুদে রাজপোষিত বিভিন্ন কর্মিদের প্রকার ও দখলীয় জমির খতিয়ান নিম্নরূপ ঃ

সেবা রায়তের প্রকারভেদ	**রায়ত/ সেবকের সংখ্যা**	**অধিকৃত সমতুল্য গ্রাম সংখ্যা**	**দানপূর্ব রাজস্বের পরিমাণ (টাঃ/আঃ/পঃ)**	**জমির পরিমাণ (বিঘা/ কাঠা)**
সদর কাছারির সেবকের সংখ্যা	৭৮৭	৩৮-১৩/১৬	৪৬৩৩-১০-১৭	৯৭৪৭-৪
পরগণার ফৌজদারের অধীনস্থ কর্মিবর্গ	১৬৮	৭/১৬	১৯২-৬-৬	১৫০৮-১
ঘাটোয়ালী প্রতিষ্ঠানের কর্মি	৪৫৭৬	১৮	৯১৬৯-১৪-১১	৭০১৬০-১১
গ্রামকর্মি	১৫৫২	১৮	৯১৬১-১৪-১১	৯২৮১-১০
মোট—	৭০৮৩	৭৫-৪/১৬	২৩১৬৫-১-৫	৯১৭০৭-৬

ষোড়শ শতকের শেষে কনৌজ ও ওড়িশা থেকে বহু ব্রাহ্মণ, বিহার থেকে বহু ছত্রী, হুগলি, বর্ধমান, উঃ চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণগণ-বৈদ্য-কায়স্থ-গন্ধবণিক সহ অন্যান্য বর্ণের আগমনে জমির উপর চাপ বাড়তে থাকে। বাঁকুড়া মল্লসমকালীন রায়তদের শ্রেণিগত অবস্থান নিম্ন পিরামিডে দেখানো হল।

(১) রাজ পরিবার — বিষ্ণুপুর (মল্লরাজ), ছাতনা (সামন্তরাজ), মহিষাড়া (অধুর্য), সুপুর-খাতড়া-অম্বিকানগর (ধবল), রাইপুর (সিংহ), সিমলাপাল (মহাপাত্র), ভেলাইডিহা (সিংহচৌধুরী), ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর জমিদারদের খাস দখলীয় জমি। পিরামিডে শীর্ষে অবস্থান করত রাজ পরিবার।

(২) পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদে নিষ্কর জমি : যারা সহস্তে হলকর্ষণে সংস্কারগতভাবে অপারগ। রাজকীয় পাট্টার অধিকারী। কিছু জমি পঞ্চকি।

(৩) ঘাটোয়াল ও চাকরান : বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারিরা সেবার পরিবর্তে জমিদারি জমি ভোগ করতেন। ঘাটোয়াল জমির কর হত অল্প (পঞ্চকি)। মণ্ডলরা কিছু পরিমাণ নিষ্কর ও অন্যান্য জমি ভোগ করত যা কম করভুক্ত হতে পারে।

(৪) জোতদার : সরকার নির্ধারিত রাজস্ব দিতে স্বীকৃত রায়ত যারা বৃহৎ জোতগুলির বেশিরভাগই মাহিন্দার, মুনিষ, ক্ষেতমজুরদের দিয়ে চাষ করাতেন। সদগোপ, তিলি, গোয়ালা, তাম্বুলিরা ছিল ক্ষুদ্র জোতমালিক।

(৫) বাউরী, বাগদি, লোহার, মোদি, কোড়া, খয়রা, সাঁওতালরা ছিল দিনমজুর। এরা জমিতে ফসল ফলানোর প্রকৃত কারিগর। এদের অবস্থান ছিল পিরামিডের ভূমিতে।

বাদশাহী ও নবাবী যুগ : মল্ল-চেতুয়া বরদার রাজস্ব বিদ্রোহ

মোঘল আমলে বিভাগীয় ফৌজদারের অধীনে থাকত জেলান্তরের আমিল, কোষাধ্যক্ষ। পরগণায় চৌধুরি, কানুনগো। গ্রামে ক্রোড়ী, আমিন, পাটোয়ারী, টেপুকচি রাজস্ব কর্মচারি হিসাবে কাজ করত। আকবর রাজস্বের ২ শতাংশ পাটোয়ারী কানুনগোদের মধ্যে বিতরণ করে দুর্নীতি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ সময় বাংলার কৃষকরা বাৎসরিক রাজস্ব ৮ কিস্তিতে জমা দিতে পারতেন। বাৎসরিক নগদ বা শস্যক্ষেত থেকে দেয় নির্ধারণ বা উৎপাদিত ফসলের ভাগ হিসাবে রাজস্ব পরিশোধ করা যেত। কৃষকরা সরাসরি রাজকোষে জমা দিতে পারতেন। আকবরের আমলে কৃষকের অধিকার রক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় উইলসল ওল্ডহামের গবেষণায় ও পর্যবেক্ষণে,[২৬] 'Akbar's revenue system was ryotwaree, where the actual cultivators of the soil were the persons responsible for the annual payment of the fixed revenue, ... (Amil must) not entrust the principal men of the village with making the estimate of Kunkut, ... but transact his business with each husbandman separately.' উল্লেখ্য, আকবরের সময় থেকেই মল্লভূম বাদশাহী প্রভাবিত বা অনুগত অঞ্চলে পরিণত হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ টোডারমলের রাজস্ব ব্যবস্থা অনেকটাই অনুসরণ করেন। গ্রামের প্রশাসনে 'মোকাদ্দমা'কে নিয়োগ, কৃষকদের ঋণদানের জন্য 'তাকভি'

প্রদান অব্যাহত থাকে। রাজস্ব ছিল ১/৩, ১/৪ অংশ, যথাক্রমে সেচ ব্যবস্থা ও বৃষ্টি নির্ভরতার উপর। জমির ও ফসলের ধরনের উপর রাজস্ব ভেদ ঘটত। আকবরের আমলেই প্রথম নির্দিষ্ট জমি-মাপার স্থায়ী ৬০-গজী চেন ব্যবহার করে জমির ভুল মাপের ও ভুল রাজস্ব আরোপের দুর্নীতি বন্ধ হয়।[২৭] এতে কৃষকের স্বস্তি আসে। উল্লেখ্য, প্রাক্ মুসলিম যুগে ফসল ঝাড়াই পর্বে রাজস্ব আদায়ের রীতি ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেতের ফসলের উপর দেয় মাপ হত। মুসলিম যুগেও লাঙলওয়ারী বাটোয়ারা ও ক্ষেতওয়ারী বাটোয়ারার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাই হোক, মুর্শিদকুলির নয়া ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষির বিস্তার ঘটে ও রাজস্ব আদায় বর্ধিত হয়।

উল্লেখ্য, আকবরের কৃষক দরদী নীতি পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়নি।[২৮] জাহাঙ্গীরের নীতি ছিল তুলনায় কঠোর। শাহজাহানের সময় কর ভার আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তিনি আকবরের স্থায়ী রাজস্ব ধারণা (জাবতি) থেকে সরে অস্থায়ী রাজস্ব নির্ধারণে (নাশাক) গুরুত্ব দেওয়ায় কৃষকদের দুর্দশা বাড়ে। শাহজাহানের সময়ে ৫০টি অতিরিক্ত কর ভার যুক্ত হয়। ঔরঙ্গজেবের সময় ৬৮টি কর কোরান বিরোধী বলে ঘোষিত হয়। ফলে মুর্শিদকুলির সময়ে প্রত্যাশিত সংস্কার বাংলার কৃষকদের কাছে স্বস্তির কারণ হয়। খিলজিরা টাকায় রাজস্ব আদায়ের নীতি গ্রহণ করলেও ফিরোজ শাহের আমলে জমির পরিবর্তে সেবা, শস্যে রাজস্ব আদায় চালু হয়। মুঘল আমলে আকবর খিলজি ধারায় ফিরে গেলেও, পরবর্তী বাদশাহের আমলে তা অনেকটাই অনুসৃত হত না। মুর্শিদকুলির সময়ে আকবরের সমকালীন সুসময় অনেকটাই ফিরে এসেছিল। তিনি আমিল (আদায়কারী), সিকদার (হিসাবরক্ষক), আমিন (জমিমাপক) গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে এই রাজস্ব নির্ধারণ সম্পন্ন করেন। কিন্তু আকবরের পরবর্তী শাসকদের রাজস্ব ভাবনায় উদারতা অন্তর্হিত হয়েছিল। ধাড়ী হাম্বীরের আমলে নির্ধারিত ১৭০০০০ টাকার রাজস্ব, আকবরের আফগান বিরোধী অভিযানের সহযোগী হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ নামমাত্র পেশকুসে পরিণত হয়।[২৯] মল্লভূমে যুক্ত হয় মোঘল প্রভাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা। পরবর্তী বাদশাহদের ক্ষেত্রে এই ঔদার্য লক্ষিত হয়নি। বরং জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেবের আমলে রাজস্বের ভার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। আকবর পরবর্তী বাদশাহ জাহাঙ্গীর মল্লরাজ হাম্বীরের বিরুদ্ধে সুবাদার ইসলাম খাঁ—শেখ কামালকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে আকবরের সময়কার মিত্রতার পরিবর্তে রাজস্ব আগ্রাসনের ইঙ্গিত দেন। পরবর্তী মল্লরাজ রঘুনাথ-১ কে নবাবী কারগারে রাজস্ব অনাদায়ে কয়েদ রাখার মধ্যে এই প্রবণতা প্রমাণিত হয়। রঘুনাথপুত্র বীরসিংহ-২ এর সময়েও পরবর্তী বাদশাহ শাহজাহান পুত্র শাহসুজা (বাংলার সুবাদার) একইরকম ভাবে রাজস্ব আদায়ে মল্লভূম আক্রমণ করেন। শাহসুজার রাজস্ব সমীক্ষায় বিষ্ণুপুর-পঞ্চকোট-চন্দ্রকোণায় রাজস্ব নির্ণীত হয় ৫৯১৪৬ টাকা। শাহ সুজার রাজস্ব বৃদ্ধি ছিল আকবর - টোডরমলের আরোপিত রাজস্বের ১৫

গুণ। মোঘলদের এই রাজস্ব বৃদ্ধি ও তা আদায়ে মল্লভূম আক্রমণ বা মল্লরাজকে বন্দি করার প্রক্রিয়া প্রকারান্তরে মল্লভূমের রায়তদের দুর্দশা বৃদ্ধি করেছিল। ঔরঙ্গজেবের সময়ে এই রাজস্ব বৃদ্ধি, অতিরিক্ত সেস, ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক জিজিয়া করের বিরুদ্ধে, মল্লভূমের রায়তদের ধুমায়িত অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার নেয়। মল্লভূম ছাড়া গড়বেতা-চন্দ্রকোণা (চেতুয়া-বরদা) অঞ্চল এই বিদ্রোহে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১৬৯৫-৯৬ এই অঞ্চলের রাজা শোভা সিংহ, সেনাপতি রহিমখান, মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথের বিদ্রোহী জোট, বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, সুবেদার আজিম-উস-সান ও মিত্র বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে[২৯ক] এক অপ্রতিহত ক্ষোভে বর্ধমান-হুগলি সহ বিস্তীর্ণ অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। বর্ধমানে শোভা সিংহ দুর্ঘটনা কবলিত ও নিহত হলে এই বিদ্রোহ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু দিল্লিশ্বরের রাজস্ব অত্যাচারের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক দলপতিদের এই সাফল্যের পেছনে অবশ্যই রায়ত অসন্তোষ ও যোগদান বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এই বিদ্রোহের পেছনে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বাইরে গুরুতর অর্থনৈতিক তাৎপর্যও নিহিত ছিল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় রঘুনাথ মোঘলের সহযোগী হয়ে চেতুয়া-বরদার বিদ্রোহ দমনে অংশ নিলেও নবাবী রাজস্ব - আগ্রাসন স্তব্ধ হয়নি। তার বড় প্রমাণ মুর্শিদকুলির (১৭০৭-১৭২৭ খ্রিঃ) রাজস্ব সংস্কারে মল্লভূমের নির্ধারিত রাজস্ব ১২৯৮৮০৩ সিক্কা টাকা। যদিও দরবারে হাজির হয়ে রাজস্ব পরিশোধের রাজকীয় বাধ্যতা থেকে তাঁকে ছাড় দেওয়া হয় ও দরবারে প্রেরিত প্রতিনিধি মাধ্যমে রাজস্ব জমার অধিকার দেওয়া হয়। ১৭১৫ সালে নবাব জাফর খান মল্লরাজকে অন্যান্য অধীনস্থ জমিদারের সমতুল হিসাবে ঘোষণা করেন ও ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মল্লভূমকে দুইটি পরগণা হিসাবে জমাবন্দি করেন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নবাব সুজা রাজস্ব অনাদায়ের জন্য মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধের ঠিক আগে একই কারণে সিরাজদৌল্লার প্রত্যক্ষ সহায়তায় দামোদর সিংহ মল্লরাজ আক্রমণ করে সিংহগোলার যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আবার মির্জাফরের সহায়তায় অতর্কিতে বিষ্ণুপুর আক্রমণ ও দখল করেন দামোদর সিংহ। বাইরের রাজস্ব দাবির এই প্রাবল্য সত্ত্বেও, মল্লরাজেরা স্বাধীন ভাবেই রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং বৃহত্তর বাংলার রাজস্ব বৈশিষ্ট্যের বাইরে বহুকাল নিজস্ব ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চালু রাখতে পেরেছিলেন।

বৈদেশিক শাসনে বাঁকুড়ার কৃষক ঃ পাঁচসালা বন্দোবস্তে অকৃষকায়ণ Depeasantization

পলাশি যুদ্ধের পর ক্রমাগত বাংলার ভূমি ও ভূমিরাজস্ব কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে আসে। মল্লভূমে কোম্পানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকালে এখানকার ভূমি ব্যবস্থা ছিল বিচিত্র।

অজস্র নিষ্কর বা বেপঞ্চকি জমি, পঞ্চকি (কম রাজস্বের) জমির সমাহারে এই ব্যবস্থা। শুধু মন্দির কেন্দ্রিক দেবোত্তর জোতের সংখ্যাই ছিল ৩৬০টি। এগুলো ছিল মূলত ব্রাহ্মণ পরিচালিত ও রাজকীয় পাট্টা অনুমোদিত। ক্ষুদ্রাংশ বাদে এই শ্রেণী হলকর্ষণ করত না। স্বভাবতই কৃষি ছিল মুনিশ-মাহিন্দার নির্ভর। এই ধর্মীয় দান (ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, আইশ, মাদাদিমাস, ওয়াকম, মহতরান, মিল্লকি ইত্যাদি) ছাড়াও নিষ্কর বা নামমাত্র করের জমি ছিল প্রশাসনিক সেবার বিনিময়ে (নানকর, সেনাপতি, চাকরান, পাইকান, ঘাটোয়ালী, মণ্ডলী ইত্যাদি) এবং সামাজিক বৃত্তিপালনের জন্য (কুম্ভকার, কর্মকার, চর্মকার, নাপিত, হেকিম, গায়ক-বাদক প্রভৃতি)।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীরকাশিমের সনদে দক্ষিণ বাঁকুড়ার বৃহদাংশে কোম্পানীর আধিপত্য ছিল বিতর্ক বিঘ্নিত। ১৭৬৫ সালে শাহ আলমের বাদশাহী সনদে এই বিতর্ক অবসানে মল্লভূমে ব্রিটিশ আধিপত্য নিরঙ্কুশ হলেও বস্তুত সারা বাংলা জুড়েই কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছিল পলাশির যুদ্ধের পরেই।[৩০] লক্ষ্মণ সেনকে অতর্কিতে আক্রমণ করে নবদ্বীপ ছাড়া করে যেমন বাংলায় খিলজি আধিপত্যের সূচনা ঘটেছিল, তেমনি ১৭৬১ সালে মীরজাফরের সহায়তায় জ্ঞাতিভাতা দামোদর সিংহের অতর্কিত আক্রমণে চৈতন্য সিংহ বিষ্ণুপুর ছাড়া হন ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধে কোম্পানী জয়ী হওয়ার পর বিনা শুল্কে কোম্পানী বাণিজ্য করার অধিকার পেলেও মল্লরাজ সোনামুখীর ব্রিটিশ বণিকদের কাছ থেকে এই আদায় অব্যাহত রাখেন। ক্ষুব্ধ কোম্পানী এই মল্লরাজকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য নবাবকে আর্জি জানান।[৩০ক] চৈতন্য সিংহের অপসারণ অবশ্যই কোম্পানীর মদতেই সম্ভব হয়েছিল। এই কালপর্বে নবাবের রাজস্ব মন্ত্রী রেজা খাঁর রাজস্ব আগ্রাসনে বাংলায় রায়তদের দুর্বিষহ অবস্থা হয়। শুধু মল্লভূমেরই রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটে ১৭৫৮-৫৯ সালের তুলনায় ১৭৫৯-১৭৬০ সালে ৪২.৩১ শতাংশ বেশি। একেই ১৭৪২-১৭৬০ সালের বর্গী আক্রমণের তীব্রতায় মল্লভূমের রায়তরা ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছিল। সিলেক্ট কমিটির ফিফথ রিপোর্ট-এ উল্লেখ আছে ১৭৩০ থেকে ১৭৪৫ সাল পর্যন্ত মল্লরাজের যেখানে রাজস্ব ছিল ১২৯৮০০ সিক্কা টাকা, মারাঠা আক্রমণের কারণে পাঁচের দশকে তা কমে যায় ১১১৮০৩ সিক্কা টাকা।[৩১] তবে পাঁচের দশকের শেষে ১৭৫৯ সালে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ১৭৬৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬১০৪৪ সিক্কা টাকা। ১৭৭০ সালের প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও, ১৭৭২ সালে সুপারভাইজারের নিয়মিত হস্তাবুদে মল্লরাজের রাজস্ব বৃদ্ধি ছিল অস্বাভাবিক। ১৭৭৩ সালে রাজস্ব গিয়ে দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ৪৫১৭৫০ সিক্কা টাকায়।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ বাঁকুড়া ও ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মল্লভূমে কোম্পানীর নিরঙ্কুশ

আধিপত্য প্রতিষ্ঠা থেকে ছয়ের দশকের অন্তভাগ পর্যন্ত কোম্পানী বাঁকুড়ার ভৌমরাজ্যগুলিতে মূলতঃ বাৎসরিক ইজারাপ্রথা চালু করে ও দেশীয় আমিল মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের নীতি নেয়। ইজারা গ্রহণে স্থানীয় জমিদারের প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হলেও তার চেয়ে বেশি রাজস্ব ডাক দেওয়া ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়ার স্বাধীনতা ছিল কোম্পানী পরিচালকদের। রাজস্ব অনাদায়ে আনুপাতিক হারে তালুক, মহল, মৌজা নিলামে চড়ানো হত। এই নতুন ব্যবস্থা বাঁকুড়ার সাবেকি জমিদারির ভাঙন সূচিত করে বিভিন্ন কারণে। প্রথমত রাজস্ব নির্ধারণে গলদ। কোম্পানীর অনভিজ্ঞ কর্মীদের দ্বারা রাজস্ব (নিরিখ) বন্দিতে অনেক সময় অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত দায় দাঁড়ায় পতিত-অনাবাদী, ভবিষ্যতের চাষযোগ্য জমির হিসাব। এমনকি জমিদারের আদায়কৃত অতিরিক্ত বেআইনী সেস, আবওয়ারও এই হিসাবে ঢুকে যেত। ১৭৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ বাঁকুড়ার রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন মূলত ধারিন্দার চন্দন ঘোষের মতো রাজস্ব কর্মচারি, যাঁরা আদতে মেদিনীপুরবাসী। দ্বিতীয়ত হিন্দু-মোঘল-নবাবী শাসনে জমিদাররা রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হলে শাস্তি অত্যাচারের সম্মুখীন হতেন, কিন্তু কখনও জমিচ্যুত হতেন না। এই প্রথম রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি নিলামে চড়ানো হল। ফলে সৃষ্টি হল নব্য জমিদার শ্রেণি। তৃতীয়ত বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজস্ব নিলামের প্রক্রিয়ার সাবেকি জমিদাররা অংশগ্রহণ অসম্মানের মনে করত, কারণ অধস্তন কর্মী-বেনিয়া-মহাজনদের সাথে এই নিলাম ডাকে অংশ নেওয়া তাঁদের সামাজিক সম্মানের সাথে মানানসই ছিল না। উপরন্তু ছিল পরাজয়ের আশঙ্কা। চতুর্থতং রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারির অংশ নিলাম, জমিদারির খণ্ডীকরণ ত্বরান্বিত করে। পঞ্চমত নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় জেলাস্তর পর্যন্ত কোম্পানী আধিকারিক নিযুক্ত হয়নি। দেশীয় আদায়কারীরা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ও শোষক। যষ্ঠত অজন্মা ও বন্যাজনিত শস্য ধ্বংসের কারণে রাজস্ব হ্রাসের বা মকুবের ব্যবস্থা কোম্পানী রাজস্ব নীতি ছিল না, যা ছিল রায়ত ও জমিদারের স্বার্থবিরোধী। সপ্তমত নিষ্কর জমিতে কর ছাড়ে ছিল কোম্পানীর অনীহা যা নিষ্কর জমিভোগীদের বিদ্রোহী করে তোলে।

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানী প্রথম জেলাস্তরে ইংরেজ সুপারভাইজার ও দেশীয় আমিন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। বিষ্ণুপুরের সুপারভাইজার নিযুক্ত হন আলেকজাণ্ডার হিগিনস ও আমিন ছিলেন গোলাম মোস্তাফা, দেওয়ান রামকান্ত। ১৭৬৪ সালে চৈতন্য সিংহ কোম্পানী ও আদালতের আনুকূল্যে জমিদারি ফিরে পেলেও জমিদার ও রায়তরা স্বস্তি ফিরে পেলেন না। কোম্পানীর রাজস্ব দাবি বেড়েই চলল, সঙ্গে রায়তদের দুর্দশা। এর সাথে যোগ হল চৈতন্য সিংহের প্রশাসকদের দুর্নীতি। মন্ত্রী কমল বিশ্বাস, পেশকার দর্পনারায়ণ কর, চণ্ডী মুখার্জী থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের কর্মিরাও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত

হয়ে রাজস্ব আদায়ে ক্ষত তৈরী করে। গ্রামান্তরে মণ্ডলরাও রাজস্ব আদায়ে সহযোগী হলেন না। অনেকেই গেলেন, নানা কারণে, আদালতের আশ্রয়ে। এমনকি ১৭৭০ সালের প্রাণঘাতী মন্বন্তরে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ও কৃষক সমাজের অর্ধাংশের মৃত্যু হলেও রাজস্ব আদায় অব্যাহত থাকল। জেলায় এই দুর্দশায় তৎকালীন গভর্নরেরা ছিলেন উদাসীন। ভ্যান্সিটার্টের মন্তব্য ছিল "Bisnupur had not suffered any very considerable loss." প্রাদেশিক শাসনকর্তারা জেলার আধিকারিকদের সতর্কতা সম্পর্কে ছিলেন নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন। কৃষি ও কৃষকদের উপর এই মন্বন্তরের ভয়াবহতা সম্পর্কে ২৮/৪/১৭৭০ তারিখের আমিন গোলাম মোস্তাফার প্রতিবেদন ছিল,[৩২] "the fields of rice; parched by the heat of the sun, are becoming like fields of dried straw.....(Sadar Sub-Division of the district became) empty of inhabitants."[৩৩] জলবিরল এই ভূভাগে, জেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিষ্ণুপুর শহরের এক চতুর্থাংশও বসতিপূর্ণ থাকল না। হিগিনসের ১৭৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদনে এই করুণ চিত্র ধরা পড়ে। ১৭৬৫ সালে যেখানে প্রদেশের এই অংশে রায়তের সংখ্যা ছিল ৬০০০, মন্বন্তরোত্তর ১৭৭১ সালে তা দাঁড়ায় ৪৫০০। এই ভয়াবহ কালপর্বে কোম্পানী রায়তদের পাশে না দাঁড়িয়ে একরকম রাজস্ব লুণ্ঠনের নীতি নেয়। দুর্ভিক্ষের বছরে আদায় ছিল রাজস্ব দাবির ৮৬ শতাংশ। কোম্পানীর এই নীতির ফলে যে ক'জন রায়ত জীবিত ছিলেন তাদের একাংশ জেলাত্যাগী হন। রায়তদের উপর এ যাবৎ কাল রাজস্ব বর্বরতার খতিয়ান নিম্নরূপ :

সাল	রাজস্ব দাবি (টাকা)	বৃদ্ধির হার (%)
১৭৪২	১১১৮০৩	---
১৭৫৮	১২৯৮০৩	১৬.১০
১৭৬২-৬৩	১৩৬০৪৫	২১.৭০
১৭৬৫-৬৬	১৬১০৪৪	৪৪.০৩
১৭৬৫-৬৭	২২৫০০০	১০১.২৫
১৭৬৭-৬৮	২৯৭৪৯৯	৯৪.৬৩
১৭৬৯-৭০	২৫০৫০১	৯২৪.০৫
১৭৭০-৭১	২৮০৫০১	১৫০.৮০
১৭৭১-৭২	৪৭৯৬৬৬	৩২৯.০৩

স্বভাবতই এই রাজস্ব বর্বরতা ও ১৭৭০ মন্বন্তরের ফল ছিল পরবর্তী দুই দশকে জনশূন্য, রায়তশূন্য বাঁকুড়া। কারণ এই দুর্ভিক্ষে নবীন প্রজন্ম বিশেষত শিশু, কিশোররা

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই নির্বিচার শোষণের ফলে রায়তরা পুঁজি শূন্য হয়ে পড়ে। জমি অকর্ষিত পড়ে থাকে। যে ক'জন রায়ত বেঁচেছিলেন তার অধিকাংশই বর্ধমানের মতো সন্নিহিত জেলাগুলিতে পালিয়ে যান। ক্ষেত, বসতি, রাস্তা, জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। দেশ বাঘ, ভালুক, হাতি, শেয়াল, শূয়োরের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে পড়ে। ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশ ও জেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৭৭২-৭৩ সালে একশোর বেশি কৃষককে চাষ করতে উৎসাহী করা যায়নি।[৩৪] আর অন্ধকারময় এই দুই দশকের শেষে মাত্র ৩২৮ জন কৃষককে কৃষিকাজে ফিরিয়ে আনা গেছে বলে জেলাশাসক কিটিং বোর্ডকে জানাচ্ছে (০৩/০৬/১৭৮৯ তারিখের পত্র, রাজস্ব বোর্ডকে)। এই দুই দশকের বিভিন্ন নথিতে এই ভয়াবহতার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। যেমন—

(১) মেদিনীপুরের রেসিডেন্টকে লেখা রাজস্ব বোর্ডের প্রধান চার্লক স্টুয়ার্টের ১৭৭৩ সালের ১৭ মার্চের পত্র থেকে জানা যায় ৩০০০ সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরে ঘাঁটি গেড়েছে।[৩৫] স্বভাবতই এর পেছনে ছিল স্থানীয় রায়তদের সমর্থন। ক্ষীরপাইয়ের কোম্পানী কুঠি, বিষ্ণুপুর-ছাতনা রাজ্যের লুণ্ঠনে সন্ন্যাসীদলের সহায়ক ভূমিকা নেয় স্থানীয় বিক্ষুব্ধ রায়তরা। এমনকি সন্ন্যাসী মদতে ফার্গুসনের বাঁকুড়া অভিযান পর্বে বলরামপুর শিবির আক্রমণের পরিকল্পনা হয়েছিল বলে জানা যায়। কোম্পানী শাসকরা মল্লভূমে রায়ত-সন্ন্যাসী এই শক্তিকে পরাস্ত করতে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যাপ্টেন ফোবর্সের নেতৃত্বে কোম্পানী সেনাদল এই সন্ন্যাসীদের পিছু নেয়। সন্ন্যাসীদল বিষ্ণুপুর ছেড়ে রাইপুর ও তারপর ফুলকুসমায় প্রবেশ করে। উল্লেখ্য মল্লভূমের চৈতন্য সিংহের মতো রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিংহ ও ফুলকুসমার সুন্দরনারায়ণ ছিলেন কোম্পানীর রাজস্ব অবিচারের শিকার এবং একই সঙ্গে এই দুই রাজ্যের রায়তরাও বিক্ষুব্ধ। স্বভাবতই কোম্পানীর সেনা অভিযানের মুখে সন্ন্যাসীরা এই দুই রাজ্যকেই নিরাপদ মনে করেছিল। কোম্পানী সেনা ফুলকুসমায় পৌঁছলে সন্ন্যাসীদল উপজাতি অধ্যুষিত শিলদা ও পরে মারাঠা নিয়ন্ত্রিত গোপীবল্লভপুরে আশ্রয় নেয়। স্থানীয় প্রশাসনের ভাঙন, দুর্বল আর্থব্যবস্থা ও সামাজিক অসন্তোষ চিরকালই বহিরাগতদের অভিযানকে সহজ করে তোলে। বাঁকুড়ায় সন্ন্যাস অভিযান ছিল এমনই এক প্রেক্ষাপটে।

(২) ১৭৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে রায়ত শূন্যতা কাটাতে বিষ্ণুপুর-বীরভূম যুক্ত জেলার প্রশাসন বাঁকুড়া থেকে সন্নিহিত জেলাগুলিতে অভিবাসিত কৃষকদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করে। কোম্পানী প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে সিনহা-ব্যানার্জী সম্পাদিত 'জেলা থেকে চিঠি ঃ ১৮০২-১৮৬৯' তে উল্লেখ আছে (পৃঃ XIII) "As early as 1787 reports of desertion of cultivators from Bishnupur to 'the adjoining Zamindari of Burdwan' reached the collector's office in Birbhum;

frantic efforts were then made to get in touch with the 'appropriate authorities in Burdwan' to 'hand over the Bishnupur cultivators who may have taken refuge there.' But the desertion of cultivators into adjoining Zamindaries tended to increase as the years rolled on. It significantly affected cultivation in the different parts of the district...." অর্থাৎ আটের দশকে জেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অভিবাসন কমান যায়নি। এই দশকের অন্তভাগে বিষ্ণুপুরের কোম্পানী প্রতিনিধি হ্যাসেল রিজ একটি প্রতিবেদনে কৃষি ও কৃষকের করুণ চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। 'জেলা থেকে চিঠি' সংকলনে দেখি, "in his communications with the collectors of Birbhum, he graphically described the miserable plight of the rural population and the economic exhaustion of the district. He found that the population had 'decreased', ryots were 'a prey to their Gomasthas' 'while the western part of the district is far less cultivated now than it was formerly.' The situation was made worse by 'scandalous neglect of dams' resulting in occasional floods when 'whole villages were swept away', and a steady rise in prices 'during which time the lower class of people experienced a degree of misery' to which they 'had never before been a witness."[৩৬] অর্থাৎ বাৎসরিক ইজারা ও পাঁচশালা বন্দোবস্তে সাবেকি জমিদাররা ভূমিচ্যুত হলে, অনাবাসী জমিদার-ইজারাদারদের সেচ ও সেচের উৎসগুলি সংস্কারে অনীহা আটের দশকে কৃষিতে বন্যাজনিত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর ছিল আপ্রতিহত গোমস্তা-অত্যাচারে কৃষকের অভিবাসন জনিত জনক্ষয়।

(৩) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খ্রিঃ) পরবর্তী দু'দশকের জনক্ষয়, অভিবাসন, অনাবাদী জমি বৃদ্ধি, আনুপাতিক জঙ্গল ও বনপশু বৃদ্ধির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কবি মুকুন্দরামের (মুকুন্দরামের জন্মস্থান বাঁকুড়ার পূর্ব সীমান্তের অনতি দূরে বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে) দেড়শ বছর আগের রচনায় ও তৎকালীন জেলা প্রশাসন - প্রাদেশিক শাসকদের পত্রাচারে। কবিকঙ্কনের অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কবিকঙ্কন চণ্ডীর শেষাংশে মন্বন্তর সম্পর্কে বলেছেন, বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে দুর্ভিক্ষজনিত আজন্মা দেখা দিয়েছিল।[৩৭] চালের দাম টাকায় ১২ সের থেকে বেড়ে হয় ৪ সের, তেল টাকায় আড়াই সের, নুন টাকায় ১ সের, ডাল টাকায় ১১ সের। সব্জির দেখা মিলত না। ১১৭৭ বঙ্গাব্দের (১৭৭০ খ্রিঃ) ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত অভুক্ত, মৃত মানুষের হিসাব রাখা সম্ভব হল না। কবির এই বাস্তব উপলব্ধির কাছাকাছি থাকা জেলাশাসক হিগিনস কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যাতে বেঁচে থাকা রায়তদের রাজস্ব আদায়ে

চাপ না দেওয়া হয়। কারণ তাতে তাদেরকে ঘটি-বাটি-বলদ-লাঙল বিক্রি করে বকেয়া রাজস্বের কিয়দাংশ পরিশোধে বাধিত করলেও তাদের সম্ভাব্য দেশান্তর ভবিষ্যত রাজস্বের পথকে পুরোপুরি রুদ্ধ করবে। ১৭৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির এই পত্রে জেলাশাসক হিগিনস প্রাদেশিক কাউন্সিলকে লেখেন,[৩৮] "..... the bad consequences..... enforcing the collections of the last year's balance from the remaining poor ryots.... who have so considerably suffered from the late famine, that by for the greatest part of them are rendered utterly incapable of paying them..... to sell their cattle and utensils for agriculture, a small portion might be recovered; but this would certainly be the means of their deserting the province, and preventing the cultivation for next year, which would be much more fatal to revenue of the country than the whole loss of the balance." কিন্তু কোম্পানীর প্রাদেশিক কাউন্সিল পত্রপাঠ (১৭৭১ সালের ১৮ অক্টোবর) এই প্রস্তাব খারিজ করে বলে, রাজস্ব মকুব করা যাবে না, তবে অনাদায়ী রাজস্ব পরের অর্থবর্ষের রাজস্ব দাবির সাথে যুক্ত করা যাবে।[৩৯] কাউন্সিল বলে, "We can by no means recede from the demands for mofussil balances due from your districts, yet we can not but agree with you in the propriety of suspending them for the present, as continuing to harass the ryuts for them at the present season would be attended with prejudice to the ensuing year's caultivation and collections" ফলে জেলাশাসক হিগিনসের আশঙ্কা সত্যি করে বাঁকুড়া ভূমি জনশূন্য, রায়ত বিরল, জঙ্গলাকীর্ণ, বন্যপশু উপদ্রুত হয়ে পড়ে। দুই শতকের শেষে এই অবস্থা সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিশ কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে জানান প্রদেশের এক তৃতীয়াংশ এখন 'a jungle inhibited by wild beasts' এবং বন্য পশুদের হাত থেকে জন, জনসম্পত্তি রায়তদের রক্ষা কোম্পানীর কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৪০] বন্য পশুদের হত্যা করতে সরকারকে পুরস্কার ঘোষণা করতে হয়। ১৭৮৯ খ্রিঃ ৯ই অক্টোবর জেলাশাসক কিটিং বোর্ড অব রেভেন্যুকে জানান বন্য পশুদের উপদ্রবে কৃষিকাজ, শিল্পশহর, গোচারণভূমি, গরুর হাট পরিত্যক্ত চেহারা নিয়েছে। ১৭৯০ খ্রিঃ ২৯শে ডিসেম্বর ও ১৭৯১ খ্রিঃ ২৮শে জানুয়ারি বীরভূম-বিষ্ণুপুরের জেলাশাসককে একাউন্টটেন্ট জেনারেল আশ্বস্ত করেন যে আর্থিক সংকট সত্ত্বেও পশুহত্যার জন্য আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ করা হবে না।[৪১] হান্টারের এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গলে স্থানীয় এক সংবাদপত্রকে উদ্ধৃত করে ১৭৮০ সালে বীরভূম-বিষ্ণুপুর সড়কের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে— এই সড়কের পাশে সেনা অবস্থানের বা বিশ্রামের জন্য বিঘা খানেক জায়গাও ফাঁকা পাওয়া যায়নি। এমনকি

সড়কগুলিও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। কারণ ১৫ই মার্চ, ১৭৯০-এ কিটিং বোর্ড অব রেভেন্যুকে জানান,[৪২] "....shut off all communication between the two most important towns (Suri and Bishnupur) and to cause the mails to be carried by a circuit of fifty miles through another districts."

(৪) কোম্পানী শাসক-জমিদারদের নারকীয় অত্যাচার প্রতিরোধহীন ছিল তা নয়। আটের দশকে পশ্চিম বীরভূম সংলগ্ন মালপাহাড়ী উপজাতিরা যেমন যুক্ত জেলার রায়ত অসন্তোষের সুযোগে শয়ে শয়ে সমতলে নেমে কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি (ইলামবাজার, সোনামুখী, সিউড়ি, বিষ্ণুপুর) দখল করে নিয়েছিল, তেমনি মণ্ডল-থানেদার বৃহৎ রায়তদের নেতৃত্বে বর্ধমান-বিষ্ণুপুর-বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাধারণ রায়তরা কোম্পানী-জমিদার ও জমিদার আমলাদের কুঠি লুণ্ঠন করে দেশের এই অংশকে বিদ্রোহী কবলিত করে তোলে। বর্ধমানের জেলাশাসক এল. মার্শার বিষ্ণুপুর-বীরভূমের কালেকটর কিটিংকে ১৭৯০ সালের ৭ই এপ্রিল এক পত্রে জানান যে এই শক্তি জোট বিষ্ণুপুরে অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা অর্জন করেছে।[৪৩] ১৭৮৬ সাল থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত এই ছোট শক্তির নেতৃত্বে ছিলেন জীবন নাম্নী পাঞ্চেতের এক কৃষক ও থানেদার। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হলেন জীবনের ভাই বিষ্ণু, ভবানী সিং, ভুবন হাঁড়ি, গৌর হাঁড়ি, শিব হাঁড়ি, ভবানী সিং, উদিত লাল। ফৌজদারি আদালতে ২১/১০/১৭৮৯ তারিখে জি. এইচ. বার্লোর পেশ করা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বর্ধমান, পাঞ্চেত, বিষ্ণুপুর দক্ষিণ ও পশ্চিম বীরভূম ব্যাপী এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমেই। ইংরেজ নথিতে বিদ্রোহীদের 'ডাকাত', 'লুঠেরা' হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও এটি ছিল মন্বন্তরোত্তর যুক্ত জেলায় নিঃস্ব অত্যাচারিত কৃষকদের প্রথম সম্মিলিত প্রতিরোধ। তীর, ধনুক, ঢাল, তরোয়াল নিয়েই এরা প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিল। ১৮ই জানুয়ারি, ১৭৮৮ সালে জেলাশাসক কিটিং বোর্ড অব রেভেন্যুকে জানাচ্ছেন,[৪৪] "(it had become) an almost annual custom for the Ryotts...to assemble in arms in the months of Augran and Poose and put a stop to the collections till they have brought the farmers to term." স্পষ্টতই এই বিদ্রোহ ছিল জোরপূর্বক রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে। বীরভূমের পূর্বতন শাসক ফোলি সাহেব ১৭৮৬ খ্রিঃ ১২ নভেম্বরের পত্রে জানান অত্যাচারিত রায়তরা হয় দেশত্যাগী হয়েছে বা জমি অকর্ষিত রেখে দিয়েছে এবং কর ছাড়ের দাবিতে হাজার হাজার কৃষক তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছে (".... instead of attending to their lands, were surrounding me in thousands")। আসলে জেলাশাসক হতাশ হলেও কৃষকদের চাষ করার মতো পুঁজি, কৃষি উপকরণ ও মনের তাগিদ আর অবশিষ্ট ছিল না। রাজস্ব হ্রাসের দাবিতে ধর্না বা অভিযান, ট্রেজারি বা

জমিদার কাছাড়ি লুণ্ঠনে বিদ্রোহী দলে থাকত ৪০০ থেকে ৩০০০-৪০০০ মানুষ। কিটিং এই সংহতির পেছনে মণ্ডল ও বৃহৎ রায়তদের জোট (CABAL) কে দায়ী করেছিলেন। ১৮৮৯ সালে বিদ্রোহী নেতা জীবন সহ অনেকে গ্রেপ্তার হলে বিদ্রোহের তীব্রতা ধাক্কা খায়। ১৭৮৯ সালের নভেম্বরে পাহাড়ী উপজাতিরা বিষ্ণুপুরে হাজির হলে স্থানীয় রায়তরা তাদের স্বাগতই জানিয়েছিল। ১৭৯০ সালে কিটিং-এর সেনাদল বিষ্ণুপুর থেকে সিউড়িতে পশ্চাদপসারণ করলে বিদ্রোহীদের হাতে এলাকার নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। বছর খানেক বিদ্রোহী কবলিত থাকার পর অন্তর্কলহের কারণে বর্ষার পর শহরের দখল নেয় ইংরেজ সেনা। বহু বিদ্রোহী হতাহত হয়। ৭/৬/১৭৯২ তারিখে সরকারের উপসচিব বার্লোকে লেখা কিটিং-এর পত্রে দেখা যায় ফৌজদারি ও দেওয়ানী জেলাগুলিতে বিদ্রোহীদের রাখার স্থান সঙ্কুলান করা যাচ্ছিল না।[৪৫] সুতরাং আটের দশকের অন্তভাগে সংগঠিত এই রায়ত বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ছিল ব্যাপক। কারণ এই বিদ্রোহের অভিঘাতে কৃষি ও কৃষি রাজস্ব যেমন সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, সোনামুখীর বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট জন চীপের ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হতে বসেছিল। বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে যুক্ত জেলার রাজস্ব আধিকারিক আর্থ বিটনকে কোম্পানী প্রত্যাহার করে নেয়। ১৭৮৬ সালে ঘোষিত হয় রায়ত অনুকূল নীতি যাতে বলা হয় (১) জেলার রায়তদের উপর দমনমূলক ব্যবহার করা হবে না, (২) অতিরিক্ত সেস, কর প্রত্যাহার করা হবে, (৩) জেলার রায়তরা পতিত জমি উদ্ধার করলে তা ন্যায্য রাজস্ব হারে পাট্টা-দখলীকৃত করা হবে ও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হবে।

(৫) মন্বন্তরোত্তর কালপর্বে পাঁচশালা বন্দোবস্ত কৃষকদের ও রায়তদের কাছে স্বস্তির বার্তা আনতে পারেনি কারণ—

(ক) ইজারা ডাকের মাধ্যমে সর্বাধিক ডাকদাতাকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দান সাবেকি জমিদার ব্যবস্থার বিপর্যয় ডেকে আনে। অনাবাসী বেনিয়া জমিদাররা প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনধারা, দুঃখ-দুর্দশা ও পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ছিল উদাসীন। সাবেকি জমিদারদের প্রতি অনুগত প্রজারা সহজেই অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। গভর্নর হেস্টিংস এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলেন, “From a long continuance of the lands in their families, it is to be concluded they have revetted an authority in the district, acquired an ascendency over the minds of the Ryots ingratiated their affection.” এলাকার সামাজিক ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে অনাবাসী জমিদারদের কোনো অবদান ও যোগ ছিল না। প্রয়োজনীয় আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তো নয়ই, কৃষির পুঁজি যোগানে, কৃষি সেচের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির সংস্কারেও তাদের অনীহা গ্রামজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। বাঁধ-পুকুর

সংস্কারের অভাবে নদী সন্নিহিত কৃষি জমি যেমন নদী প্লাবনে বালুকাময় অনুর্বর হয়ে পড়ল; মজা পুকুর সন্নিহিত জমিতে সেচ দিতে ব্যর্থ হল।[৪৬]

(খ) পাঁচশালা বন্দোবস্ত বস্তুত এক তৃতীয়াংশ ইজারাদারাই ছিল কোম্পানীর কর্মি ও ঘনিষ্ঠ বেনিয়া। ইজারায় অস্বচ্ছতা, প্রভাব ও দুর্নীতি ঘটিয়ে ইজারা হাসিল করা হত।[৪৭] আর ছিল ডাকে যোগ দিতে সাবেকি জমিদারদের অনীহা। অধস্তন কর্মি বা বেনিয়াদের সাথে একাসনে বসে ইজারাডাক দিতে অনেকেই অসম্মানিত বোধ করতেন। আর ছিল পরাজয়জনিত সম্মানহানির আশঙ্কা। কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে লেখা কোম্পানীর ২২/০৯/১৭৭৫ তাং-এ পত্রে বলা হল, "...few men of credit (participated in auction)...to cover their (old zamindars) name from the discredit which may attend the rejection of their proposals... bid under their own name." এইভাবেই জমি থেকে রাজস্বলাভ আদায়ের লোভে বেনিয়া অসৎ মানুষেরা ইজারাদার হয়ে দাঁড়ায়। Land and Local kingship in Eighteen Century Bengal গ্রন্থে John R. Melane যথার্থই বলেছিলেন (পৃঃ-১২৪), "Birbhum, Bishnupur and most of the Midnapur were leased to new farmers not the Zaminder". আর এর মধ্যেই নিহিত ছিল পাঁচশালা বন্দোবস্তের ব্যর্থতা।

(গ) পুরাতন ভূম্যধিকারীদের ইজারায় অংশ না নেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল মন্বন্তরোত্তর বেহাল অর্থনীতিতে তাদের ঋণগ্রস্ততা ও অক্ষমতা। সবচেয়ে মারাত্মক নীতি ছিল রাজস্ব অনাদায়ে কারাদণ্ডের পাশাপাশি জমিদারিকে খণ্ড বা লটে বিভক্ত করে অনাদায়ী রাজস্বের জন্য নিলাম করা।[৪৮] হিন্দু শাসন, সুলতানী-বাদশাহী-নবাবী শাসনে রাজস্ব অনাদায়ে শাস্তি হলেও, ভূমিচ্যুত করা হত না। ইংরেজ আমলে এই নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটে। সৃষ্টি হয় নব্য জমিদার শ্রেণি।

(ঘ) নতুন বেনিয়া ইজারাদাররা ইজারা হাসিল করেছিল অতিরিক্ত ও অবাস্তব রাজস্ব ডাকে। যার পেছনে ছিল অতিরিক্ত মুনাফা ও অত্যাচারের অভিলাষ এবং বাস্তব সম্পর্কে অজ্ঞতা। রাজস্ব আদায়ে এর ফলে যেমন রায়তদের উপর অত্যাচার বেড়েছিল, ইজারাদারও রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এন. কে. সিনহা Economic History of Bengal-এ এ সম্পর্কে কোম্পানী নথি উদ্ধৃত করে বলেছেন, "a band of unworthy revenue officials... without sufficiently attending to what their future consequences might be" এমন রাজস্ব নির্ধারণ করে, যা রায়তরা, "...never piad before or could ever afford to pay". এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিল কোম্পানীর একাংশের উদাসীনতা ও নিষ্ঠুর মানসিকতা।[৪৯] 'বাংলার রাজস্ব পর্যালোচনা' ২৭/০১/৭৫ (Misc. Home, Vol.-206, P-147) —এ গভর্নর

ভান্সিটার্টের বিষ্ণুপুরের মন্বন্তর নিয়ে মন্তব্য ছিল, "Bishnupur had not suffered any very considerable loss." যদিও প্রদেশের এই অংশে লোকক্ষয় নিয়ে হান্টারের হিসাব ছিল মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, জন শোরের হিসাবে ১/৫ অংশ, মঙ্কটোন জোসের হিসাবে ১/৬ অংশ। সমকালীন সাহিত্যে দেখি টাকায় ২-২$^{১/৫}$ মণ চালের দাম দাঁড়িয়েছে, মন্বন্তরের সময়, টাকায় তিন সের। পানীয় জলও অমিল। জেলাশাসক হিগিনস তাঁর প্রতিবেদনে (Proceedings at Provincial Council dated 28/02/1771) জানিয়েছেন, "...(the district was in) a barren and depopulated state from the bad affects of the famine....places beyond description and dreadful. Many hundreds of villages are entirely depopulated, and even in the large towns there are not a fourth part of the houses inhabited. For want of rayots to cultivate the ground, there are immense tracts of a fine open country which remain wholly waste and unimproved." মন্বন্তরের বছরেও কোম্পানীর জবরদস্তি আদায় ছিল ৯৬.১৫ শতাংশ (২৫০৫০১ টাকার ২৪০৮৫১ টাকা)। ১৭৭২ সালে বিষ্ণুপুররাজের পাঁচশালা জমাবন্দি নির্ধারিত হয় অবিশ্বাস্য ৫২২৮১৬ টাকা ১৮ আনা ২০ গণ্ডা। গ্রামের রাজস্ব সংগ্রাহক মণ্ডল-সিকদাররা এই রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হন।[৫০] ১৭৭৫ সালে রাজস্ব দাবি কমানো হলেও পাঁচশালা বন্দোবস্তের শেষে রাজস্ব আদায় গগনচুম্বী হয়ে দাঁড়ায়। পাঁচশালা বন্দোবস্তকালীন রাজস্ব দাবি ও আদায় ছিল নিম্নরূপ ঃ—

সাল	রাজস্ব দাবি (টাঃ/আঃ/গঃ)	রাজস্ব আদায় (টাকা)	আদায়ের হার (%)
১৭৭২	৪৭৯৬৬৭	২৬৫৮৯১	৫৫.৪৩
১৭৭৩	৪৯৭৪০৪	৩০০৯১১	৬০.৫০
১৭৭৪	৪৯১১৮০	২৫৩৪৭১	৫১.৬১
১৭৭৫	৪৮৭২৪২	২৬০৫৩৫	৫৩.৫০
১৭৭৬	৫৩৭৯০০	৩০৫৬৬৩	৫৬.৮৩
১৭৭৬-৭৭	৫২২৮১৬/১৮/২০		
১৭৭৭-৭৮	৫১৮৭৩১/১৩/১৫		

দুর্ভিক্ষকালীন ৯৬ শতাংশ আদায় ও পাঁচশালা বন্দোবস্তে রাজস্ব দাবি প্রায় দ্বিগুণ করে জবরদস্তি অর্ধাংশ রাজস্ব আদায়ের সাফল্য ও যুক্তি বোঝা যাবে কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে দেওয়া ওয়ারেন হেস্টিংসের ৩ নভেম্বর ১৭৭২ সালের তথ্য থেকে, "It is natural to be expected that the diminution of the revenue should

have kept an equal.... with other consequences of so great calamity. .....was owning to its being violently kept up to its former standard. To ascertain all the means by which this was effected will not be easy." এই 'কঠিন রাস্তায় রাজস্ব আদায়' বলতে জবরদস্তি ছাড়াও পরিত্যক্ত জমিগুলির রাজস্বভার চাপানো হত অবশিষ্ট রায়তদের ঘাড়ে।[৫১] ন্যায়াজ বা জাত পতিত বলে পরিচিত এই অতিরিক্ত রাজস্ব সম্পর্কে হেস্টিংস বলেছিলেন, "...is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands, to make up for the loss sustained in the rents of neighbours who are either dead or have fled the country..." এই রাজস্ব সম্পর্কে পরবর্তীকালে জেলাশাসক শেরবোর্ন বোর্ড অব রেভেন্যুকে জানিয়েছিলেন (২০/০৬/১৭৮৭) "...contributions levied in other districts on the remaining ryots, to gather up deficient Jumma of those who have deserted their lands..." হেস্টিংস এই রাজস্ব আরোপের পক্ষে বলেছিলেন (কোর্ট অব ডিরক্টরকে, তাং ০৩/১১/১৭৭২) " (the tax) however irreconciliable to strict justice... It afforded a reparation to the state for occasional deficiencies; it was a kind of security against desertion, by making the inhabitants thus virtually responsible for each other, and precluded the inferiors collector from availing himself of the pretext of waste or availing himself of the pretext of deserted land to withhold any part of his collection." কিন্তু এই আদায়ের ক্ষতিকর দিকটা হল, "... not being levied by any fixed rate or standard fell heavily upon the wretched survivors of those villages which had suffered the greatest depopulation; it afforded an opportunity to the farmers and shikdars to levy other contributions on the people under cover of it, and even to increase this to whatever magnitude they pleased." এই অপ্রতিহত রাষ্ট্রীয় দমননীতির ফলে বাঁকুড়ার রায়তদের অস্তিত্ব পাঁচশালা বন্দোবস্ত শেষে ক্রমবর্ধমান জঙ্গল ও বন্য পশুদের আস্ফালনের অন্তরালে হারিয়ে যায়, যার প্রমাণ আটের দশকের প্রথমার্ধে অস্পষ্ট রাজস্ব সমাচার। বস্তুত সাতের ও আটের দশক (মন্বন্তরোত্তর) ছিল বাঁকুড়ায় কৃষক উৎসাদন বা Depeasantization-এর অন্ধকারময় যুগ।

দশশালা বন্দোবস্ত ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঁকুড়া ঃ কৃষকায়ন বা Peasantization :

১৭৭১-৭২ খ্রিঃ কালেকটর হিগিনসকে প্রত্যাহার করার পর ১৭৮৪-৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জেলাস্তরে কোনো ব্রিটিশ আধিকারিক ছিলেন না। প্রায় একদশক দেশীয় আমিল-

আদায়কারীদের অত্যাচার-দুর্নীতি, রায়ত শূন্যতা বাঁকুড়াকে ভূমি রাজস্ব মানচিত্রে অস্পষ্ট করে দেয়। প্রায় মানবশূন্য প্রদেশের এই অংশে কৃষি জমি উদ্ধারে কোম্পানী জোরদার প্রচেষ্টা শুরু করে দশসালা বন্দোবস্তজনিত বিপর্যয়ের পরে। এ সময় পলাতক রায়তরা পার্শ্ববর্তী জেলা ও পরগণায় গিয়ে উপস্থিত হলে এলাকার ভূস্বামীরা তাঁদের আবওয়াবের (অতিরিক্ত দেয়/সেস) ৫০শতাংশ ছাড়ে এবং ভূমি রাজস্বের ২৫শতাংশ ছাড়ে জমি চাষ করতে উৎসাহিত করে। এই পাইকস্ত রায়তদের সাহায্যে নতুন নতুন গ্রাম পত্তন হতে থাকে। ১৭৯২ সালের মধ্যে যুক্ত জেলায় এমন ৩২৮টি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য ১৭৬৫ খ্রিঃ যেখানে যুক্ত জেলার গ্রাম সংখ্যা ছিল ৬০০০, ১৭৭১-৭২ সাল নাগাদ ১৫০০ গ্রাম (২৫শতাংশ) ও ১৭৮৫ সাল নাগাদ ১৬০০ গ্রাম (২৭শতাংশ) জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এই ক্ষতিপূরণে সময় লেগেছিল অর্ধশতাব্দী। কারণ ১৮২২ সালে গ্রামের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৯৯৩।[৫২] পাইকস্ত রায়তদের আগমন ও সুবিধাগ্রহণে এলাকার আদি রায়তরা (খুদকস্ত) অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁদের যেখানে নগদে বিঘা প্রতি রাজস্ব দিতে হত পাঁচ টাকা আট আনা তেরো গণ্ডা সেখানে পাইকস্ত রায়তদের দিতে হত শস্যমূল্যে চার থেকে আট আনা প্রতি বিঘায়। এই অসাম্যজাত অসন্তোষ ছাড়া গুণমানে ও উৎপাদনের নিরিখে বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন রাজস্ব হারের অযৌক্তিক বৈষম্য রায়তদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।[৫৩] সাধারণত কোনো বিশেষ শ্রেণির জমিতে (বাঁকুড়ায় টাঁড়-বাইদ, কানালী, সোল অর্থাৎ খারাপ, মাঝারি, ভালো) গ্রামের দু-তিন বছরের উৎপাদন গড় নিয়ে গ্রামে ওই শ্রেণির ভূমি রাজস্ব স্থির করা হত। কিন্তু পাটোয়ারীরা নিরিখ নির্ণয়কালে অনেক সময়ই গ্রামের মণ্ডল-ধনী কৃষকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মণ্ডলের জমির রাজস্ব কম রেখে সাধারণ রায়তদের জমিতে কর ভার বহুগণিত করত। দেখা যেত মণ্ডলী জমিতে রাজস্ব যেখানে ১/২ টাকা প্রতি বিঘা, পাশের দরিদ্র রায়তের রাজস্ব ৫ টাকা প্রতি বিঘা। জেলাশাসক শেরবোর্ন তাঁর সময়ে নিরূপিত রাজস্বকে "Moderate; inoppressive, equitable" অভিহিত করে আশা প্রকাশ করেছিলেন, এটি ছোট রায়তদের করভার লাঘব করবে, "The inferior ryots will be greatly eased in their present rents and the increase consequently falls on the Mundules and those of the superior order." একই সঙ্গে মণ্ডলদের প্রভাবে বর্ধিত করভার দরিদ্র রায়তদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, "...the secret influence of the Mundules and the superiors order of Ryots has in general prevailed, and that they have eluded the payment of any of the increase themselves and shifted it... on those it has been my study to relieve." (বোর্ড অব রেভেন্যুকে ১৩/০২/১৭৮৮ তাং-এ শেরবোর্নের পত্র)। কালেক্টর পাই

সাহেবের সময় থেকেই 'বাজে জমিনের' মতো নিষ্কর জমির অধিগ্রহণ ও 'বিভিন্ন নিরিখ বেশি'-র মতো সেস বা আবওয়াবগুলো প্রত্যাহার করা হচ্ছিল। ১লা মে ১৭৮৭ খ্রিঃ শেরবোর্ন বোর্ডকে জানান এই কাজে নিম্নবর্ণীয় রায়তরা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না। মণ্ডল ও মুখ্য রায়তদের বাধায় নিরিখ নির্ধারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছিল। ১৭৮৮ সালের ১৮ জানুয়ারী তিনি বোর্ডকে জানান এই বাধা অতিক্রম করে পর্যায়ক্রমে লক্ষিত রাজস্ব আদায় সম্ভবপর হবে। ১৭৬৫ সালে যেখানে বিঘা প্রতি রাজস্ব ছিল ৫ টাকা ৯ আনা ১৩ গণ্ডা, শেরবোর্নের সহজ রাজস্ব ছিল বিঘা প্রতি ২ টাকারও কম।[৫৪] এছাড়াও অনেক রায়ত পলাতক রায়তের জমি পাইকস্ত হারে এবং বিনা করে বর্গাদার হিসাবে চাষ করত (বোর্ডকে কালেক্টরের ১৩/০২/১৭৮৮ পত্র ও বোর্ডের ০৬/০৫/১৭৮৮ তারিখের প্রসেডিংস)। শেরবোর্ন চাষ বাড়াতে রায়তের উপর জোর করে পতিত জমি বরাদ্দের বিরোধী ছিলেন কারণ, "every imposition of land on him over and above his original quantity, and beyond his means or ability to cultivate is equally oppressive."[৫৫]

১৭৮৮ খ্রিঃ ডিসেম্বরে ক্রিস্টোফার কিটিং বীরভূম-বিষ্ণুপুর যুক্ত জেলার জেলাশাসকের দায়িত্ব নেন। এ সময় জেলায় খুদকস্ত ও পাইকস্ত রায়তদের বিরোধ তীব্রতর হয়েছে।[৫৬] এই বিরোধ মেটাতে ও কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি করতে কিটিংও এই দুই প্রকারের রায়তদের একই রাজস্ব হারে নিয়ে আসতে পক্ষপাতী ছিলেন।[৫৭] সরকারও এই আর্জি মেনে নেয়। এই সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত ও অসন্তুষ্ট পাইকস্ত রায়তরা বর্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে এবং উৎপাদিত ফসল নিয়ে নিজের আদি গ্রামে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টর ও জমিদারদের প্রশ্রয় ছিল। পাইকস্ত রায়তদের কাছে প্রাপ্য কিন্তু অনাদায়ী এমন রাজস্ব ১৭৯০ সালে দাঁড়িয়েছিল ৩২৩৯৭ টাকা ৫ আনা ৭ গণ্ডা (মোট বকেয়ার প্রায় দশ শতাংশ)। ইতিমধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিশের পক্ষ থেকে দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারণা রূপায়ণে জেলাশাসকদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো যুক্ত জেলায় কিটিং-এর সময়ে ১৭৮৯ খ্রিঃ নতুন 'নিরিখ' সব পরগণাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। জমিদার ও কালেকটরদের নেতৃত্বে নব নিযুক্ত পাটোয়ারীদের এই নয়া জমাবন্দি মোতাবেক সাধারণ রায়তদের জমাবন্দি পাট্টা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত রাজস্ব আরোপের অভিযোগে বহু রায়ত পাট্টা নিতে অস্বীকার করে। ১৭৯২ সালের ১লা জানুয়ারি কিটিং বোর্ডকে জানান জেলার মাত্র ৩৮৬৭ জন রায়ত এই জমাবন্দি পাট্টা গ্রহণে রাজি হয়েছে। এই অধিক রাজস্বে (প্রায় দ্বিগুণ) দশসালা বন্দোবস্তের বিরোধিতা করে জেলাশাসক বলেন এর ফলে রায়তদের জেলাত্যাগ ও কষ্ট বাড়বে। তাঁর মতে[৫৮], "....enforcing of Jummabaundy caused great clamour, incredible desertions and in fact

has with former additional causes affected the district in such a manner that I fear a series of years will be required to bring it into its former flourishing state .... the assessment in the neerick will most undoubtedly cause the return of his (Zamindar's) deserted Ryots and consequently an increase of cultivation and in lieu of present annual decrease (of revenue) the cultivation being promoted an increase will occur." জেলাশাসক বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেই সঠিক রাজস্ব নির্ধারণ করেই দশসালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন চেয়েছিলেন। নতুবা পাঁচশালা বন্দোবস্ত জনিত বিপর্যয় আরেক বার ঘনিয়ে আসবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কালেকটর কিটিং-এর রায়তদরদী মনোভাব পাওয়া যায় সমকালীন নথিতে। (১) নিম্নশ্রেণির রায়তদের রাজস্ব হ্রাসের পক্ষে তিনি বলেন, "If a judgement can be formed from the number who have deserted during the past three years and squalid wretched appearance of the lower Ryots the rates of the lands are certainly unfavourable... soil was in many places unproductive, and the ryots after hard labour were scarcely left with any surplus, having met the carriage cost and the consumption of their families. The lack of market facilities also hit them hard."[৫৯] বস্তুত তাঁর উদ্যোগেই জমিদাররা এই জমাবন্দি হারের হ্রাস ঘটায়, অতিরিক্ত সেসগুলি বর্জন করে। এই নতুন জমাবন্দি (বেলমুক্তা নামে পরিচিত) স্বল্প হলেও রায়তদের স্বস্তি দেয় (টাকায় ১ গণ্ডা কম)। (২) কিটিং-এর সময় রায়তদের রাজস্ব বয়কট আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। এ সময় বিষ্ণুপুরে বর্গমাইল প্রতি আরোপিত গড় রাজস্ব ছিল ৮৪ টাকার মতো। এমনকি সামরিক অভিযানের পরও রাজস্ব অনাদায়ী থেকে যায়।[৬০] ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৯ সালে কিটিং বোর্ডকে জানান বিগত বছরের বর্ধিত রাজস্ব রায়তরা দিতে অস্বীকার করেছে, কারণ এই বৃদ্ধি ছিল শস্য বপনের পর। অনেক রায়তই রাজস্বভারে জেলাত্যাগী হন। ফলে তাঁদের সম্পত্তিও ক্রোক করা যায়নি। অন্য জেলায় তাঁরা আদৃত হন কারণ সেখানকার পতিত-অকর্ষিত জমি চাষে তাঁদেরকে লাগানো হয়। কিটিং ৩০শে অক্টোবর, ১৭৮৮ সালে বর্ধমানের জেলাশাসক টি ব্রুককে এই পলাতক রায়তদের ফিরিয়ে দিতে পত্রাচার করেন। বোর্ডকে জানিয়েও (১০/০৫/৯০ তাং-এ) এই রায়তদের ফিরিয়ে আনা যায়নি, বরং বোর্ড এই রায়তদের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। এই রাজস্ব সংকটের জন্য বীরভূমের রাজস্ব আধিকারিক আর্থ বিটনকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

বিষ্ণুপুরের রাজস্ব সংকট মোকাবিলায় হ্যাসেল রিজকে বিষ্ণুপুরে কোম্পানী প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করা হয়। রাজস্ব খেলাপী বিষ্ণুপুররাজ আটের দশকে দুইবার, ন'য়ের দশকে একবার কারাবন্দি হলে এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়। ১৭৮৯ সালেই

তাঁর কাছ থেকে অনাদায়ী রাজস্ব ছিল ৫০০০০ টাকা। পরের বছর দশসালা বন্দোবস্তে বন্দি রাজার দেয় রাজস্ব নির্ধারিত হয় অত্যধিক চার লক্ষে। জ্ঞাতিভ্রাতা দামোদর সিংহের ভয়ে তিনি এটা মেনে নিলেও, এই অসম্ভব করভার মল্লভূমের পতনের সূচনা করে। এক বছরেই রাজস্ব অনাদায়ে বড় হাজারী ও করিসুণ্ডা মহল দুটি নিলাম হয়ে যায়। বর্ধমানরাজ ২১৪১৪৭ টাকা ২ আনা ১১ গণ্ডায় মহল দুটি কিনে নেন। বকেয়া রাজস্ব জমা থেকে এই নিলামী রাজস্ব বাদ দিয়ে চৈতন্য সিং বাকি ১৮৫৮৫৩ টাকা দিতেও ব্যর্থ হলেন। অতিরিক্ত রাজস্ব নির্ধারণে জমিদার ও রায়তদের দুর্দশা নিয়ে কালেক্টর কিটিং নিজেই ছিলেন সরব। এ সময় বিষ্ণুপুররাজের রাজস্ব ২০৪৬৭ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৭৯৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কালেকটর স্যামুয়েল ডেভিস দশসালা বন্দোবস্ত মল্লরাজের উপর অযৌক্তিক অতিরিক্ত রাজস্ব দাবি কমানোর অনুরোধ জানালেও রাজস্ব বোর্ড তা বিবেচনা করেনি।[৬১] ১৭৯৪ সাল নাগাদ দেখা যায় অধীনস্থ মণ্ডল, ঘাটোয়ালদের অনেকেই রাজস্ব না দিয়ে আইনের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে অনাদায়ী রাজস্বের দায়ে কোম্পানী ১৭৯৮ খ্রিঃ মল্ল জমিদারির বৃহদংশ নীলামে চড়ায়। ১৮০৬ খ্রিঃ নাগাদ জমিদারির বাকি অংশ কিনে নেয় বর্ধমানরাজ ২১৫০০০ টাকায়। মল্লরাজ এই পর্যায়ে প্রচুর জমি দান করেও (নিষ্কর হিসাবে) নিজের রাজ্যপাট বাঁচাতে পারলেন না।[৬২] ১৮০১ সালে উইলিয়াম ব্লান্ট হিসাব দিয়েছিলেন মল্লরাজের এমন লাখেরাজ সম্পত্তির রাজস্ব ফাঁকি ছিল ৪০০০০ টাকা।[৬৩] মল্লরাজের পতনের নির্ঘন্ট নিম্নরূপ :

সাল	মহলের নাম	এলাকা (একর)	ক্রেতা (একর)	নিলামী মূল্য (টাঃ/আঃ/গঃ)
১৭৯১	বড়হাজারী	১৩১৯৪৩-৫	তেজচাঁদ, বর্ধমান	১৯২৬৩৩-৫-৯
১৭৯১	কড়িসুণ্ডা	১৩১২৯	ঐ	২৩৩৯৫-৫-০
১৭৯৮	জঙ্গলমহল	১২২৩৫৪-৫	ঐ	৩৪৯৯-৪-৬
১৭৯৮	কুচিয়াকোল	৮৫৪২-৫	নিমাই সিংহ	৮২৩৭-১০-০
১৭৯৮	পাঁচাল	৪৯৩	---	৪০৮-৯-৯
১৭৯৮	জামতাড়া	৯৫৭৫-৫	---	৬৩১০-৯-৬
	মালিয়াড়া	৩২০৪৩-৫	বোর্ড অব রেভেন্যুর	৫২০২-৮-৯
	সাহাড়জোড়া	১৬৬২৩	নির্দেশ স্বতন্ত্র তালুক	৩১১০-০-৫
	কিসমত সাহাড়জোড়া	৪৬৬৫	তেজচাঁদ, বর্ধমান	১১৫৬-১০-৮
১৮০৬	বিষ্ণুপুর	২০৬৪৭১-৫	ঐ	১৩৬৯৮৯-৬-৫

বিষ্ণুপুরের জমিদারি দখলের পর (৯৩.৩৭ শতাংশ) বর্ধমানরাজের লক্ষ্য হল বিষ্ণুপুর রাজের প্রভাব মোকাবিলা, লাখেরাজ-সেনাপত জমির অধিগ্রহণ ও পত্তনি প্রথা চালু। তাঁর ঠাকুরসেবা ও সেনাপত জোত অধিগ্রহণ প্রচেষ্টায় জেলায় ব্যাপক অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। গোঁসাই, পণ্ডিত, মহন্তরা একযোগে কালেকটর ব্লান্টের কাছে প্রতিবাদ জানান। উল্লেখ্য মল্লভূমের ৯০ শতাংশ ব্রাহ্মণই দান জমির মালিক ছিলেন। সেনাপত মহলের জমি ৪০ সর্দারের অধীনস্ত ৩০০০ মানুষের দখলে ছিল। ১৮০৯ খ্রিঃ ব্লান্টের হিসাবে এ ধরনের ১৫৯৯৯ বিঘা জমিতে রাজস্ব দাবি ১০০০০ টাকা। যেখানে মল্লরাজের আদায় ছিল ১৫০০ টাকা, কোম্পানীর হিসাবে জমাবন্দি হল ৩০০০ টাকা। বর্ধমানরাজ এই জমি থেকে দাবি করেন ১৩৭৬৭ টাকা। এই মহলগুলি ও অন্যান্য জমিদারি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে তিনি ডাকের মাধ্যমে ইজারাদারদের অর্পণ করেন রাজস্ব আদায়ের জন্য। পত্তনিদারের অধীনে একইভাবে দরপত্তনিদার, তার অধীনে সে— পত্তনিদার এইভাবে রায়ত ও রাজার মধ্যে বহুস্তরীয় রাজস্ব স্বত্বাধিকারীর (Rank-renting). সৃষ্টি হল। আর বাঁকুড়ায় সূচিত হল রায়ত শোষণের আরেক ধারা।

এই নয়া ব্যবস্থা ও কোম্পানীর ঘাটোয়ালী জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া জমি উচ্ছন্ন বিশাল সংখ্যক রায়ত ও কৃষককে বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দেয়। কমিশনার ব্লান্ট বর্ধমানরাজের গৃহীত পদক্ষেপকে বলেছিলেন, "inordinate desire of accumulation of money"এবং "inflexible severity against the local people" যা ১৮০৮ সালের 'চুয়ার বিদ্রোহের' অন্যতম কারণ। এর ফলে ওন্দা, বিষ্ণুপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, জয়পুর, সোনামুখী বিদ্রোহী কবলিত হয়ে পড়ে। ১৭৯৭-৯৮ খ্রিঃ কোম্পানী সেজোয়াল রামকান্ত দাস ইন্দাসে অবস্থানকারী চৈতন্য সিংহের কাছে রাজস্ব আদায়ে যেতে চাইলে নিমাই সিং - মাধব সিংহের নেতৃত্বে চোয়ার বাহিনীর সাথে তাদের তীর ধনুকের খণ্ডযুদ্ধ হয়। ১৭৯৯ খ্রিঃ ৭ই ফেব্রুয়ারির ঠিক আগে বিষ্ণুপুর আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওন্দার ডোমপাড়া জঙ্গলে মল্লরাজপুত্র মাধব সিংহের (ষোলো বর্ষীয়) নেতৃত্বে ২৫-৩০ জন চোয়াড় সমবেত হয়, যাদের (মাধব সিং সমেত) ৭ জনকে কমাণ্ডার স্পটিশউড গ্রেপ্তার করলে অভিযান ব্যর্থ হয়। চুয়াড়দের অন্য একটি দল শহরের উপকণ্ঠে একটি গ্রাম ভস্মীভূত করে। ব্লান্টের ০৯/০৩/১৮০৮ তারিখের প্রতিবেদনে বর্ধমানরাজের অভিযোগ উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ২৯/০২/১৮০৮ তারিখে ১০০০ জনের চোয়াড়িদল পাত্রসায়ের কাছারি আক্রমণ করে সেজোয়াল খোসল সিংকে মারাত্মক জখম করেছে, যিনি পাত্রসায়ের কোম্পানী কুঠিতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। এই অভিযানে সাধারণ মানুষ ছাড়া ছিলেন ২৫০ জন মত সেনাপত মহল থেকে উচ্ছেদ হওয়া রায়ত। পরবর্তীকালে, সেজোয়াল জীবনলালও রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হন।

উত্তর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ভৌম রাজ্যের মতো দক্ষিণ বাঁকুড়ার কৃষি সমৃদ্ধ রাইপুর জমিদারিতে একই রকম চুয়াড় বিদ্রোহের অভিঘাত অনুভূত হয়েছিল। কোম্পানী শাসনের শুরুতে রাইপুরের রাজস্ব ধার্য হয় ১৫০০ টাকা, কিন্তু জমিদার তা মানতে অস্বীকার করায় ১৭৬৭ সালে ফার্গুসন রাইপুর অভিযান করেন। কিন্তু কোম্পানীর অতিরিক্ত রাজস্ব ও চাকরান - পাইকান-নিষ্কর জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তিন দশকেরও অধিককাল দক্ষিণ বাঁকুড়ায় চোয়াড় বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন দুর্জন সিংহ (রাইপুরের জমিদার)। তিনি ফুলকুসমা, ভেলাইডিহা, বগড়ি, কর্ণগড়, ঘাটশিলার জমিদারদে সাথে একটি বিদ্রোহী জোট গড়ে তোলেন। ক্যাপ্টেন ফোবর্স ও লেঃ নান এই বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে, দুর্জনকে কৌশলে বর্ধমানে ডেকে ১৭৭৯ সালে কারাবন্দি করা হয়। যদিও সাক্ষীর অভাবে তিনি বিচারে মুক্তি পান। উল্লেখ্য এর আগে ১৭৭৩ সালে তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র বাঁকুড়া জুড়ে (ছাতনা, বড়হাজারী, মালিয়াড়া, সাহারজোড়া) চোয়াড় আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলে। ১৭৮৩ সালে রাইপুরে রাজস্ব দাঁড়ায় ২৫০৯ টাকায়। কর পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১৭৯০ খ্রিঃ সেজোয়াল পাঠানো হয়। ১৭৯২-৯৩ খ্রিঃ কালেকটর ও কমাণ্ডার-ইন-চিফ কিটিং রাইপুর অভিযান করেন (বাঁকুড়া-পাতাকোল-রাইপুর পথে) দুর্জনকে দমনের জন্য। ১৭৯৩ সালের ১৯শে জুলাই ৩১৪৫ টাকার অনাদায়ী রাজস্বের দায়ে দুর্জনকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৭৯৩ খ্রিঃ ২০ আগস্ট রাইপুর জমিদারি নীলামে উঠলে শিউপ্রসাদ ৭০২৫ টাকায় তা বন্দোবস্ত নেন। দুর্জনপুত্র ফতে সিংহের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। এরপরই রাইপুর কার্যত বিদ্রোহীদের কবলে চলে যায়। শিউপ্রসাদের আদায়কারীরা অবরুদ্ধ, প্রহৃত ও নিহত হলেন। ১৭৯৮ পর্যন্ত শিউপ্রসাদ রাজস্ব আদায়ে কার্যত অক্ষম হলেন। পাইকদের উচ্ছেদ করার নীতি বিদ্রোহে ঘৃতাহুতি দেয়। ১৭৯৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে নতুন জমিদার হীরালাল দায়িত্ব নিলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। দুর্জন ১৫০০ চুয়াড় বাহিনী নিয়ে ৩০টি গ্রাম থেকে কোম্পানীর শাসন চিহ্ন অপসৃত করেন। প্রাণভয়ে নায়েব, গোমস্তা, দারোগা মেদিনীপুরে পালান। সেনাপতি হেনরী ও সুবেদার আহ্লাদ সিংহের বাহিনী ১৭৯৮ সালের এই ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। ৫০০ চুয়াড় কাছারি বাড়ি লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে। নিকটস্থ গুনারি থানা আক্রমণ করে বিদ্রোহীরা। কালেকটরের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৭৯৯ সালে বিদ্রোহ সুপুর-অম্বিকানগরে ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্রমাগত বিদ্রোহের মুখে হীরালালকে ৬৮৫৭ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফতে সিংহকে জমিদারি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় কোম্পানী।[৬৪] রাইপুরের এবং মল্লভূমের চুয়াড় বিদ্রোহের বিশেষ দিক হল সাধারণ রায়তদের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কৃষক বিদ্রোহে বাঁকুড়ার রায়ত নাম্নী অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

ক্লাইভের সাফল্যে প্রবর্তিত ইংরেজ শাসনের জেলা ও প্রদেশের ধারার বিরোধ বা সাযুজ্য বুঝতে দুই শ্রেণির প্রশাসকদের নাম ও কার্যকলাপ বোঝা দরকার।

নিম্নে বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসনপর্বে জেলার ও উচ্চতর বিভাগের শাসকদের তালিকা দেওয়া হল :

সাল	এস্টেট	মালিক	জেলাশাসক	প্রাদেশিক/ রাষ্ট্রশাসক
১৭৬০	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	রেসিডেন্ট জনস্টন	ক্লাইভ / ভান্সিটার্ট
১৭৬৩	বিষ্ণুপুর	দামোদর সিংহ	রেসিডেন্ট জনস্টন	ভান্সিটার্ট
১৭৬৫	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	রেসিডেন্ট গ্রাহাম	ক্লাইভ
১৭৭০	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	রেসিডেন্ট ভেরেলস্ট	কার্টিয়ের
১৭৭১	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	সুপারভাইজার হিগিনস	কার্টিয়ের
১৭৭৩	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	ডিভিশন চীপ কারনাম	হেস্টিংস
১৭৭৫	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	ডিভিশন চীপ ডসন	ম্যাকফারসন
১৭৮৪	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	মুর্শিদাবাদ কালেক্টর অটো	হেস্টিংস
১৭৮৬	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	বিষ্ণুপুর/যুক্তজেলার ডব্লু পাই	কর্ণওয়ালিশ
১৭৮৭	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	হেসেলরিজ ও শেরবর্ণ	কর্ণওয়ালিশ
১৭৮৮-৯৩	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	হেসেলরিজ ও কিটিং	কর্ণওয়ালিশ
১৭৯৩-৯৯	বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	সি আর ব্লান্ট/ওসওয়াল্ড	জন শোর
			ডেভিস	
			আয়ারল্যাণ্ড	
			ক্যানিংহাম	
			বার্গেস	
১৮০২	বিষ্ণুপুর	মাধব সিংহ	থম্পসন	ওয়েলেসলি
১৮০৫-৩০		তেজচাঁদ	ব্লান্ট	বার্লো
			টড	মিন্টো
			কেলভিন	হেস্টিং
			কেমিন	অ্যাডাম
			বেল	আর্মহাস্ট
			রাসেল	বেলে
			হ্যালকট	বেন্টিঙ্ক
১৮৩৩-৩৬		তেজচাঁদ	উইকিলসন	বেন্টিঙ্ক/মেটক্যাফ
			হ্যারিংটন	

সাল	এস্টেট	মালিক	জেলাশাসক	প্রাদেশিক/ রাষ্ট্রশাসক
১৮৩৬-৭৮		বর্ধমান রাজ	এলিয়ট	অকল্যাণ্ড
			গ্রাহাম	এলেনবরো
		বিষ্ণুপুরের ইজারাদার	লচ	বার্ড
		গিসবর্ণ মোঃ এবং	ম্যাকটিয়ের	হার্ডিঞ্জ
		রাইপুরের	প্যাংকল	ডালহৌসি
		ইজারাদার ওয়াটসন	রোজ	ক্যানিং
		ব্রাণ্ড কোং	গ্রান্ট	এলগিন
			ডুমণ্ড	নেপিয়ার
			কেরলস্করি	ডেনিসন
			ওয়ালার	
১৮৮০-১৯৪৭		বর্ধমান রাজ	রমেশ দত্ত-এস এন মিত্র	লিটন
				রিপন
				ডাফরিন-মাউন্টব্যাটেন

পলাশি যুদ্ধের তিন বছর পর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর নবাব মীরকাশিম পরগণা বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর, থানা চট্টগ্রামের সনদ প্রদান করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে। এর ফলে পরগণা বর্ধমানের রাইপুর থানা, চাকলা মেদিনীপুর অন্তর্গত ছাতনা ও অম্বিকানগর কোম্পানীর অধিকারে আসে। যার ফলে সমগ্র বাঁকুড়ায় কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। শুরু হয় বৈদেশিক শাসন ও শোষণের দুই শতাব্দীর নতুন অধ্যায়।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গল মহলে ফার্গুসনের অভিযান ঃ নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার সূচনা

১৭৬০ খ্রিঃ এতদঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত বর্ধমানে (কাজ পরিচালিত হত কলকাতা থেকে) ও মেদিনীপুরে দুটি রেসিডেন্ট অফিস তৈরী করা হয়। মেদিনীপুরে রেসিডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন জন জনস্টন। আগেই বিবৃত হয়েছে মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-নবাবী আধিপত্যের যুগেও জঙ্গলমহলের রাজারা কার্যত স্বাধীনতা ভোগ করতেন। রাজস্ব আদায়ের চাপ কোনোকালেই অনুভূত হয়নি। বরং এই সব রাজ্যে স্থানীয় শিল্প, স্থাপত্য, চারুকলার বিকাশ ঘটেছিল শান্তির ঘেরাটোপে। একাদশ শতক পর্যন্ত জৈন সভ্যতার বিকাশ ও ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব ভাবধারা বাঁকুড়ার

জনমানসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু বেনিয়া ইংরেজের অর্থগৃধ্নুতা বাঁকুড়ার কৃষক ও শিল্পীদের অবর্ণনীয় দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত করেছিল। কারণ বাঁকুড়ার এস্টেটগুলির ইংরেজ আগমনপূর্ব রাজস্ব যেখানে ছিল ২২২৯৫৮ সিক্কা টাকা, কোম্পানীর সেখানে ইজারা দাবি ছিল ৭৬৫৭০০ সিক্কা টাকা, যা চারগুণের কাছাকাছি। স্বাভাবিক ভাবেই জমিদার তথা রায়তদের পক্ষে এই রাজস্ব দাবি মানা বা বহন করা সম্ভব হয়নি।

১৭৬৫ খ্রিঃ মেদিনীপুর রেসিডেন্টের দায়িত্বে আসেন হ্যারি ভেরেলস্ট, যিনি চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তবে ১৭৬৭ সালের ২৬ জানুয়ারি ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর, ভেরেলস্ট গভর্নরের দায়িত্ব নিলে, রেসিডেন্ট হন কুখ্যাত গ্রাহাম সাহেব। তিনি দক্ষিণ বাঁকুড়ার বেয়াড়া জমিদারদের দমন করতে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেন। ১৭৬৭ খ্রিঃ সমরকর্তা লেঃ জন এনসাইন ফার্গুসনের নেতৃত্বে এই অভিযান শুরু হয়। কোম্পানীর কাছে এই অভিযান এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ফার্গুসন এই দীর্ঘ কঠিন জঙ্গল অভিযানে বাধ্য হয়ে সঙ্গে নেন তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে। অভিযানে সামিল করা হয় এলাকা সম্পর্কে সম্যক অবহিত কার্ত্তিক রাম ও রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ চন্দন ঘোষকে। যাত্রাপথ ছিল মেদিনীপুর-ধারোয়ার-বলরামপুর-ছাতনা-সপুর-রাইপুর ছুঁয়ে। বিষ্ণুপুর ছাড়া ফার্গুসন নির্ধারিত অন্যান্য জমিদারদের দেয় রাজস্ব নিম্নরূপ ঃ

এস্টেট	জমিদার/ইজারাদার	আরোপিত রাজস্ব
ছাতনা	লক্ষ্মীনারায়ণ	৮৭৯ টাকা ১১ আনা
সুপুর	টেকচাঁদ ধবল (?)	৫৪ টাকা
অম্বিকানগর	অনন্তলাল ধবল (?)	৩১১ টাকা
রাইপুর	দুর্জন সিং/জয়দেব (বগড়িরাজ)	২৫০৯ টাকা
শ্যামসুন্দরপুর	ছত্রনারায়ণ (?)	(ফুলকুসমার সঙ্গে)
ফুলকুসমা	সুন্দর নারায়ণ	৫০০ টাকা
সিমলাপাল	(?) সিংহ চৌধুরী	নির্ণীত ও গৃহীত
ভেলাইডিহা	মোহনদাস চৌধুরী	(সিমলাপালের সঙ্গে)
বিষ্ণুপুর	চৈতন্য সিংহ	২২,৫০০০ টাকা (১৭৬৬ সালে) [বর্ধমান রেসিডেন্সি]

জন এনসাইন ফার্গুসনের অভিযানের ফলে ১৭৬০ খ্রিঃ রাইপুর, ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, সুপুর, অম্বিকানগর, ছাতনা কোম্পানীর খাস

দখলে আসে। কিন্তু সূচনা পর্ব থেকে এই ভূম রাজ্যগুলি স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল। এরা সবাই ছিল প্রচলিত লোককথা অনুসারে ঈশ্বর প্রেরিত রাজবংশ। আদতে হিন্দুকৃত উপজাতীয় দলপতি। তাঁরা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য শাসিত জনপদগুলি কয়েকটি তরফে বিভক্ত করেন। এর প্রশাসক ছিল তরফ-সর্দার বা সদর-ঘাটোয়াল বা দিগওয়ার। তরফের কিছু গ্রাম নিয়ে তৈরি প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্বে ছিল সাদিয়াল বা মনকি। একেকটি গ্রামের দায়িত্ব ছিল গাঁও সর্দারের হাতে। পাড়ার দায়িত্বে ছিল তাঁবেদার। এরাই ছিল রাজ্য ও গ্রামের কৃষক-সাধারণ মানুষের যোগসূত্র। এই প্রশাসকরা ছিল আইনশৃঙ্খলা ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এরা দায়িত্ব পালনের জন্য নগদ মাহিনার পরিবর্তে, নিষ্কর বা পঞ্চকি (নামমাত্র স্থিরিকৃত কর) জমি ভোগ করত ও প্রয়োজন পড়লে রাজার সামরিক অভিযানে যোগ দিত (হিষ্ট্রি অব বগড়ী রাজ্য - গুরুপদ চ্যাটার্জী)। সাধারণ কৃষকও একইভাবে জমির উপর পঞ্চকি স্বত্ব ভোগ করত। এই ভূম রাজ্যগুলির সামরিক শক্তির উৎস ছিল প্রত্যেক গ্রামে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পাইক। এতদিন সাধারণ কৃষকের উপর অত্যাচার ও উচ্ছেদের কোনো খবর ছিল না। এমনকি দীর্ঘ হিন্দু, ওড়িয়া ও মুসলিম আগ্রাসনের সময়ও রাজারা রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতায় শাস্তি পেলেও জমি থেকে উৎসাদিত হননি। কিন্তু কোম্পানী শাসনের মূল মন্ত্র ছিল, হয় আদায় দাও নয়তো অন্য কাউকে আদায় করতে দাও। এই নীতির ফল হল মারাত্মক। প্রথমত অতিরিক্ত রাজস্ব নির্ধারণের ফলে জমিদাররা রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত পাইকানদের ও অন্যান্য নিষ্কর জমিতে কর আরোপের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এইসব জমি সরকার অধিগ্রহণের পথে গেলে বিপুল সংখ্যক পাইক জমি থেকে উৎসাদিত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত অধিগৃহিত পাইকান ও অন্যান্য সেবা-বিনিময় জমিগুলিতে রায়ত না মেলায় তা অনাবাদী পড়ে থাকে। ফলে কোম্পানী নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ে জমিদাররা আরো কঠিন সংকটে পড়ে। চতুর্থত এতদিন ভূমরাজ্যগুলি হয় প্রায় স্বাধীন থেকে ইচ্ছামতো পঞ্চকি প্রদান করত বা অধিকাংশ সময় স্বাধীনতা ভোগ করত। কিন্তু কোম্পানী শাসনে নিয়মিত ও অত্যধিক রাজস্ব আদায়ের ফরমান জারি হলে, নতুন ব্যবস্থায় অনভ্যস্ত জমিদাররা তা দিতে ব্যর্থ হয়। পঞ্চমত রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ জমিদারদের স্থলে সর্বোচ্চ দরদাতা ইজারাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বহু প্রজন্মের এই রাজা-ভূস্বামীদের অধিকারচ্যুত করে বিদ্রোহী করে তোলে। ষষ্ঠত অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাবাসী ইজারাদাররা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেলে, সাধারণ রায়তরা তাদের মেনে নিতে পারেননি। সপ্তমত এই অনাবাসী নব্য ভূম্যধিকারীরা রাজস্ব আদায় ভিন্ন আর কোনো সামাজিক দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক ছিলেন না। এর ফলে এলাকার সেচের উৎসগুলির সংস্কার, নতুন পুকুর খননের কাজ, শস্য

বপনের আগে ঋণদান প্রভৃতি কৃষি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি অবহেলিত হলে, কৃষি সমাজ বিপন্ন ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এতদিনকার জমিদার-রায়ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক হঠাৎ ভেঙে পড়ায় রাষ্ট্রবিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কিন্তু কোম্পানী প্রশাসকরা এর তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন এবং রাজস্ব আদায়ে জঙ্গলমহলে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন, ১৭৬৬ সালের মার্চ মাসে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল (১) জঙ্গলমহলের রাজাদের কোম্পানী নির্ধারিত হারে রাজস্ব প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ করা, (২) রাজাদের আনুগত্য নিশ্চিত করা, (৩) কোম্পানীর অনুকূলে বাণিজ্যের পরিবেশ তৈরী করা, (৪) অভিযান চলাকালেই এলাকা বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন করে রাজস্ব নির্ধারণ করা, (৫) কোম্পানীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সামরিক ঘাঁটিগুলি রেখে বাকি ঘাঁটি ও দুর্গ ধ্বংস করে ফেলা। অভিযানের প্রারম্ভে গ্রাহাম ৩০শে জানুয়ারির নির্দেশে ফার্গুসনকে বলেন, “The party which you are appointed to command of, is destined, therefore to proceed against these Zamindars, with a view to reduce them to a proper subjection to our Government on payment of just revenue, to enforce their obedience to the authority of the resident of Midnapore and to encourage, if possible, the merchants of western district to open against their wanted communication with these provinces”.অভিযানের প্রস্তুতি ও সেনা সংগ্রহে বিলম্বের কারণে অভিযান শুরু হয় ১৭৬৭ সালের জানুয়ারিতে। এই ৩-৪ কোম্পানী সেনাদলে ধারিন্দার সহায়তা ছিল সবচেয়ে বেশি। এখানকার পাইক কার্ত্তিক রাম জঙ্গলমহল সম্পর্কে ভৌগলিক জ্ঞান থাকার জন্য অভিযানে যোগ দেন। আর যোগ দেন রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ চন্দন ঘোষ। ধারিন্দার ৫০টি ঘোড়া ও ৪০০-৫০০ পাইক এই অভিযানে যোগ দেয়। বাঁকুড়া প্রবেশ করলে ছাতনারাজ দেন ১০০০ পাইক। একইভাবে সিমলাপালরাজও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ফার্গুসন কল্যাণপুর-ধারোয়ার শিবিরে অবস্থানকালে তিনি রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা, কর্ণগড়, ঝাড়গ্রাম, কল্যাণপুর, ফুলকুসমার রাজস্ব নিস্পত্তির চেষ্টা করেন। ফুলকুসমার রাজস্ব দাবি ৫০০ টাকা হলেও, রাজা ৩০০ টাকার বেশি দিতে রাজী ছিলেন না। এদিকে ঝাড়গ্রামরাজ কোম্পানী আরোপিত রাজস্ব আদায়ে আগ্রহ না দেখানোয় ৬ই ফেব্রুয়ারি ঝাড়গ্রাম অভিযান করেন ফার্গুসন। তবে এই কঠিন অভিযান যে বিলম্বিত হতে চলেছে তা গ্রাহামকে জানিয়ে মার্চে এক পত্রে লেখেন, “-- To have pursued each separately would have been a work of time and to have divided my force, would have rendered my force success doubtful, as none of these Zamindars by our intelligence have

2000 people in their parganas.” এরপর ফার্গুসন ঘাটশিলা হয়ে বলরামপুরে পৌঁছে, শিবিরে রাইপুর ও ফুলকুসমার জমিদারদের রাজস্ব নিষ্পত্তি করতে চেয়ে তাঁদের আলোচনায় ডাকেন। এর আগেই মানভূম, ছাতনা ও সুপুরের জমিদার কোম্পানী রাজস্ব প্রদানে অনুকূল মনোভাব দেখায়। তবে রাইপুর ও ফুলকুসমার রাজার আচরণ সম্পর্কে গ্রাহাম ছিলেন সন্দিহান এবং তারা আলোচনার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সময় নষ্ট করে নিজেদের সামরিক অবস্থান সুসংহত করবে বলেও ফার্গুসনকে সাবধান করেন। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ ও দেশীয় লবণ বণিক অধ্যুষিত আনন্দপুর লুণ্ঠনে ফুলকুসমার হাত আছে বলে গ্রাহাম বিশ্বাস করতেন। এই সন্দেহ থেকেই ফুলকুসমার রাজস্ব দাবি ৫০০ টাকা থেকে কমাতে কোম্পানী রাজি ছিল না। ফার্গুসন ছাতনা হয়ে রাইপুর অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। ছাতনারাজ সহজেই কোম্পানী আরোপিত রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হলেও এক্তিয়ারের প্রশ্নে বিরোধ দেখা যায়। এই সময় ছাতনার রাজস্ব আদায় করতেন মুর্শিদাবাদ রেসিডেন্টের হয়ে পাঞ্চেতরাজ। মেদিনীপুরের নতুন রেসিডেন্ট মুর্শিদাবাদ রেসিডেন্ট সাইকসকে জানান, ছাতনা যেহেতু ওড়িষা সুবার মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত ছিল, এর রাজস্ব মেদিনীপুর রেসিডেন্টের মাধ্যমে আদায় হওয়া উচিত। এদিকে পাঞ্চেতরাজ মুর্শিদাবাদ কর্তৃপক্ষের মদতে ছাতনার রাজাকে ডেকে পাঠিয়ে রাজস্ব পরিশোধের অথবা সামরিক ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার হুমকি দেন। মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট ভেরেলস্ট বাংলার কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেলকে তাঁর যুক্তিতে অবিচল থেকে জানান, “I have written the Raja that Chhatna belongs to the Province Orissa and that the rents are already settled and if presumes to send any his people into the parg. I shall certainly punish them.” মুর্শিদাবাদের কোম্পানী আধিকারিক সাইকস ছাতনা থেকে পাঞ্চেতরাজের প্রতিনিধি তুলে নিলে এই বিরোধের অবসান ঘটে। একইভাবে অম্বিকানগর সন্নিহিত রাইপুরের রাজস্ব এক্তিয়ার নিয়েও এসময় বিতর্ক হয়েছিল। রাইপুর বর্ধমান রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত, এই অজুহাতে ফার্গুসনের (মেদিনীপুর রেসিডেন্সির পক্ষে) রাজস্ব নির্ধারণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অবশেষে বগড়ীরাজের মাধ্যমে বর্ধমান রেসিডেন্সিতে রাজস্ব জমা দেওয়ার শর্তে এই বিরোধের মীমাংসা হয়। ফার্গুসনের রাইপুর অভিযান পর্বে সুপুর শিবিরে অবস্থানকালে অম্বিকানগর-সুপুরের রাজস্ব দাবি মীমাংসিত হয়েছিল। এইসব সত্ত্বেও রাইপুর সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোম্পানী আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঁকুড়ার বিপন্ন রাজতন্ত্র ঃ আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উত্তরণ

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর দশম-একাদশ শতাব্দীর প্রাচীন রাজবংশগুলি দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। আর দরিদ্রতর হয়ে পড়ে বাঁকুড়ার জনজীবন। এর কারণ ছিল বহুবিধ। (১) হিন্দু ও মুসলিম শাসনে জঙ্গল দলপতিরা ছিল স্বাধীন বা নামমাত্র পেশকুশের বিনিময়ে স্বতন্ত্র ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। ফলে সাধারণ কৃষক জীবন ছিল রাজস্ব আদায়ের অতি আচার বা অভিঘাত থেকে মুক্ত। আকবর-মানসিংহের সময়ে মল্লরাজের টোডরমলী পেশকুশ নির্ধারিত হয়েছিল ১১১৮০৩ টাকা (১২টি জমিদারি এলাকার মধ্যে তমলুক, মহিষাদল, বামনভূম, রাইপুর, মানভূম ছিল তাঁর অপরোক্ষ দখলে)। টাকা জমা পড়ত মর্জি মতো। নবাবী দরবারে হাজিরা দেওয়াও বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৬০৮ খ্রিঃ জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খান মল্লরাজ্য আক্রমণ করলেও মল্লরাজকে মিত্ররাজ্য বলে স্বীকার করে নেন। শাহজাহান পুত্র শাহ সুজা রাজস্ব সংস্কার করে, ৫৯১৪৬ টাকা মল্লরাজস্ব (বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট, চন্দ্রকোণা সহ) নির্ধারণ করলেও তা আদায়ে সক্ষম হননি (সূত্র ঃ হলওয়েল)। বরং রাজদরবারে আনীত দ্বিতীয় বীর মল্লের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হয়তো একারণেই ১৬৯৫-৯৬ খ্রিঃ বিদ্রোহী চেতুয়া-বরদারাজকে দমনে ঔরঙ্গজেব প্রেরিত আজিম-উস- সান (পৌত্র)র সেনাকে মল্লরাজ সহযোগিতার নীতি নেন। গোপাল সিংহের বিরুদ্ধে নবাব সুজা খান রাজস্ব আদায়ে মল্ল অভিযান করলেও সফল হতে পারেননি। ১৭১৫ খ্রিঃ জাফর খান মল্লভূমকে দুটি বৃহৎ ইহতমামের সমষ্টি ঘোষণা করলেও (যার সনদী জমিদার হলেন গোপাল সিংহ) সেই অর্থে রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেনি (সূত্র ঃ ফিলিপ ফ্রান্সিস, রজতকান্ত রায়)। হলওয়েল গোপাল সিংহ সম্পর্কে বলেছিলেন তিনি বছরে কখনো ১৫০০০ টাকা, কখনো ২৫০০ টাকা নবাব দরবারে পাঠাতেন কর হিসাবে, কিন্তু ১৭৪০ সালের পর থেকে ভাস্কর পণ্ডিতদের বর্গী আক্রমণের ফলে রাঢ় অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ১৭৬০ সালে শিউভট্টের বর্গীদল মোঘলের মিত্র হিসাবে নবাব ও কোম্পানী প্রভাবিত বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে রাজ্যের অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি করে। ১৭৫৬ খ্রিঃ সিরাজের সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহী জ্ঞাতিভ্রাতা দামোদর সিংহ মল্লভূম আক্রমণ করলে চৈতন্য সিংহের সেনাপতি কমল বিশ্বাস সিংহগোলার যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে (সূত্র ঃ ডাঃ ফোর্ডের ফলতা সিলেক্ট কমিটিকে পত্রাচার)। পলাশির যুদ্ধের পরে মল্লভূমের রাজস্ব দাঁড়িয়েছিল ১২২৯০৩ টাকা।[৬৫] কিন্তু ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বৃদ্ধি ছিল তরিৎগতির। আর বাৎসরিক ডাকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ

ডাকদাতাকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়ার অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বাঁকুড়ার কৃষক সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেল। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের পাঁচসালা বন্দোবস্ত ছিল ডাকদাতাদের পলায়ন আটকে বাৎসরিক আদায় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, রায়তদের কষ্ট লাঘবের জন্য নয়। কোম্পানী শাসনে রাজস্ব বৃদ্ধি ছিল নিম্নরূপ ঃ—

অর্থবর্ষ	রাজস্ব ডাক (টাকা/আনা/পয়সা)
১৭৬২-৬৩	১৩৬৪০৫
১৭৬৪-৬৫	৩৫০০০
১৭৬৫-৬৬	১৬১০৪৪
১৭৬৬-৬৭	২২৫০০০
১৭৬৯-৭০	২৫০৫০১
১৭৭০-৭১	২৮০৫০১
১৭৭১-৭২	৪৭৯৬৬৬-১৫-১৬
১৭৭৬-৭৭	৪৩১৫০০-৩-৪
১৭৭৯-৮০	৪০০০০০

(২) সাবেক জমিদারদের বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। জেলার সাবেক জমিদারদের অধীনস্ত তালুকদার, চৌধুরি, পাটোয়ারী, মণ্ডল, ঘাটোয়াল, চৌকিদাররা এই নতুন আদায়কারীদের ভালভাবে গ্রহণ করেননি। অনেক ক্ষেত্রে উচ্ছন্ন কর্মচারি-জোতমালিকরা এদের বিরুদ্ধে ও সামগ্রিকভাবে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়।

(৩) ডাকদাতারা অধিকাংশই ছিল অনাবাসী ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মি, এদের না ছিল ভূমি বা ভূমিরাজস্বের অভিজ্ঞতা, না ছিল জমিদারি এলাকায় বসবাসের ইচ্ছা। অত্যাচার-অনাচারের মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব বাৎসরিক আদায় করে, শহুরে আয়েশী জীবন কাটানোতেই ছিল এদের আগ্রহ। এদের সেই লালসার মাসুল দিতে হয়েছিল বাঁকুড়ার সাধারণ কৃষি সমাজকে।

(৪) এই এক বছরের মুনাফাদাররা কোনোভাবেই কৃষি উন্নয়নে মনোযোগ দেয়নি। জমির উন্নয়ন, শস্য আবর্তন, পুকুর খনন ও সংস্কারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। রামপুর, বালসি, হদলনারায়ণপুর সহ অজস্র সেচ সেবিত গ্রাম শুষ্ক হয়ে ওঠে।

(৫) ডাকদাতারা ডাক পাওয়ার লোভে অবাস্তব রাজস্ব আদায়ের অঙ্গীকার করে, যার ফলে বৎসর শেষে প্রতিশ্রুত আদায় দিতে ব্যর্থ হয়। কোম্পানীর কৃষি উন্নয়ন ও

কর আদায়ের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

(৬) বস্তুত কোম্পানী আমলে ভূমি অর্থনীতির আধা-সামন্ততান্ত্রিক ধারা আধা-পুঁজিবাদী ধারণায় উত্তীর্ণ হয়। গ্রামীণ সমাজজীবনে এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী ও বিপর্যয়কর। পূর্বতন মালিক কৃষক সুসম্পর্কের স্থলে জায়গা নেয় ক্রেতা-বিক্রেতার মতো মুনাফার সম্পর্ক।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দেওয়ার শর্তে জমিদারি ভোগ করতে পারত। বর্ধমানের জমিদার একইভাবে একাধিক তালুক নিলামী ডাক মারফত চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক লিজে দিয়ে দেন। এই পত্তনিদাররা একইভাবে দরপত্তনিদারদের এবং তারা সে - পত্তনিদারদের জমি বন্দোবস্ত দিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মধ্যসত্বভোগীর সংখ্যা দুই অঙ্ক ছাড়াত। প্রত্যেকের আদায়কৃত রাজস্ব, দেয় রাজস্বের চেয়ে যথাসম্ভব বেশি রাখার তাগিদ বাঁকুড়ার কৃষককুলকে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। নবপ্রবর্তিত পত্তনি প্রথা বাঁকুড়ার সমাজ জীবনে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সাবেকি জমিদারির অবসান ঘটে। গ্রামে বসবাসকারী জমিদারদের জায়গা নেয় অনাবাসী বিভিন্ন ব্যবসায়ী নিলামীর দল। এর ফলে গ্রামের পূজা-পার্বণ, উৎসব, মেলা, দাতব্য চিকিৎসালয়-বিদ্যায়তন, কৃষিপুঁজির যোগান, পুকুর-সেচখাল খনন ও সংস্কারে জমিদারি আনুকূল্য অন্তর্হিত হয়। এর ফল ছিল কৃষি নির্ভর গ্রাম জীবনের পক্ষে বিপর্যয়কর। এমন কিছু পত্তনিদারদের (মোট জমি ২৩ শতাংশ) তালিকা হল (১) বর্ধমানের উকিল দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, পিয়ারডোবা, (২) উকিল হরিশঙ্কর মুখার্জী, ওন্দা, (৩) ঢাকা থেকে আগত হাজরা পরিবার, পাত্রসায়ের, (৪) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্জুনপুর, (৫) যশোর থেকে অযোধ্যায় নীলব্যবসায়ী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার (৬) কোতুলপুরে ব্যবসায়ী ভদ্র পরিবার, (৭) হলদ-নারায়ণপুরে সদগোপ মণ্ডল, (৮) রানীগঞ্জের রামবল্লভ মারোয়ারী, (৯) মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী হরিকিষেণ রাঠী, (১০) রোলে সৈয়দ পরিবার, (১১) বেতুড়ের পালিত পরিবার, (১২) গোপালনগরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, (১৩) চামড়া ব্যবসায়ী মুন্সী আলি জামিন, (১৪) সোনামুখীর গন্ধবণিক 'ঘর', (১৫) গহনাশিল্পী মাকড়া পরিবার কৃষ্ণবাটীতে, (১৬) সুবর্ণবণিক পূর্ণচন্দ্র দে, (১৭) কাশ্মীরের দেওয়ান নীলাম্বর মুখার্জী, (১৮) কোডারমার অভ্র ব্যবসায়ী সাহানা পরিবার, (১৯) কয়লাখনি ব্যবসায়ী কালীপ্রসাদ বশিষ্ঠ মহিষাড়ায়, (২০) রামেন্দ্র মালিয়া, পাটপুরে, (২১) লঞ্চ ব্যবসায়ী ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (২২) ভাদুল ও কুচিয়াকোলের সিংহরা, (২৩) বাঁকি গ্রামের ভট্টাচার্য, (২৪) হাড়মাসড়ার বৈদ্য রায় প্রমুখ। অর্থাৎ কৃষিতে ব্যবসায়ী, ধনিক শ্রেণির পুঁজির বিনিয়োগ ছিল স্পষ্টতর। বিনিয়োগের প্রতিদান

প্রাপ্তির দিকেই ছিল এই শ্রেণির আগ্রহ। সাধারণের কল্যাণ নয়। গ্রামীণ জনতা দুঃখের দিনে এই অনাবাসী জমিদারদের সাহচর্য থেকেও ছিল বঞ্চিত। এই সর্বগ্রাসী শোষণ ও নৈরাশ্যের ফল হল বাঁকুড়ার কৃষক বিদ্রোহ। রাঢ় বাঁকুড়ার রাজতন্ত্রের বিপন্নতার খতিয়ান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিষ্ণুপুর জমিদারির অবসান ঘটে ১২ নভেম্বর, ১৮০৬ সালে। নয়া জমিদার হন বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ, সামান্য অংশে পাঞ্চেতরাজ, শিয়ারশোলে মালিয়াড়ারাজ। মালিয়াড়া, সিমলাপাল ও ভেলাইডিহা ছাড়া বাঁকুড়ার বাকি জমিদারিগুলির অবসান ঘটে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই। জঙ্গলমহল রেগুলেশনের রক্ষাকবচে জঙ্গলমহল জমিদারিগুলির বিনাশ বিলম্বিত হলেও আটকানো গেল না। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই এদের সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। সরকারি রাজস্ব পরিশোধে জমিদাররা ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৭০ সালেই শ্যামসুন্দরপুর, রাইপুর, সুপুর, ভেলাইডিহা, ফুলকুসমা, অম্বিকানগরের ইজারাদারি গিসবর্ন অ্যান্ড কোম্পানীর হাতে চলে গিয়েছিল। সুপুর পরগণা, ঋণ পরিশোধজনিত আদালতের ডিক্রি বলে নিলাম হয়ে যায়। ১৮৭৮ সালে এটি ক্রয় করেন শ্রীরামপুরের গোস্বামী পরিবার। এই অবস্থা চলে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর বিশ শতকে ছাতনার ইজারা চলে গিয়েছিল বেগডানলপ কোম্পানীর হাতে। ১৮৮১ সালে অম্বিকানগর ও শ্যামসুন্দরপুরের জমিদারি ক্রয় করেন কলিকাতার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। অলাভজনক এই জমিদারি তিনি চিরস্থায়ী মোকাবরী স্বত্বে ইজারা দিলেও ১৯০৮ সালে শরৎ কামিনী এস্টেটের চন্দ্রশেখর সরকারকে তা বিক্রি করে দেন। সেস অনাদায়ে শ্যামসুন্দরপুর ও বন্ধকী ঋণের দায়ে রাইপুর জমিদারি যথাক্রমে ১৮৮৯ ও ১৯১৩ সালে নিলাম হয়ে যায়। অনাদায়ী ঋণের জন্যে আদালতের ডিক্রির সাহায্যে ফুলকুসমা জমিদারির পতন হয় ১৯১৫ সালে। কেনে রামগড়ের বানোয়ারীলাল। পরে অম্বিকানগর, শ্যামসুন্দরপুর, রাইপুর জমিদারিগুলি কিনে নেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজ। ছাতনার শেষ রাজা ছিলেন হেমেন্দ্রলাল। শ্যামসুন্দরপুরের সুন্দরনারায়ণ দেও। বিষ্ণুপুরের মাধব সিংহ। অম্বিকানগরের নিমাইচরণ। টিকে ছিল ক্ষুদ্র ভৌগলিক পরিসরের মালিয়াড়া ও প্রজা অসন্তোষ ও মোকদ্দমা জর্জরিত সিমলাপাল ও সিমলাপাল থেকে সৃষ্ট ভেলাইডিহা। স্পষ্টতই জেলার জমিদারদের হাত থেকে ভূমিস্বত্ব চলে গিয়েছিল জেলার বাইরের লোকেদের কাছে। উল্লেখ্য মল্লরাজ্য নীলামের সময় কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, গৌরীচরণরা জমিদারি ক্রয় করলেও স্থানিক বাধায় দখল নিতে পারেননি। এই অনাবাসী জমিদার ও দেশীয় মহাজনদের অত্যাচারে নিম্নবর্গীয় রায়তদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তাম্বুলি স্বত্বধারী রায়তদের মহাজনী শোষণ নিয়ে ম্যাকালপিন লিখেছেন, এদের জমি বন্ধকী ঋণ ছিল ২৫-১৭.৫% সুদে। রাইপুর থানার

তারাচাঁদ চৌধুরী ও ছাতনা থানার গয়ারাম কর ছিলেন এমন দুজন অত্যাচারী মহাজন। ১৯৪১ সালে এই অনাচারের বিরুদ্ধে ছাতনায় একটি সাঁওতাল মহাসম্মেলনের সমাচার পাওয়া যায়।

বিপন্ন জমিদারগুলি বাঁচানোর অভিনব গণ উদ্যোগ লক্ষ করা যায় ছাতনার ক্ষেত্রে। রামানুজ করের মতো বিশিষ্ট মানুষেরা কালেকটর ভ্যাস ও মহাকুমাশাসক ভূপেন্দ্রনাথের কাছে বাসুলি মাতার নামে একটি সমবায় গঠন করে ছাতনা জমিদারির (ইতিমধ্যে দুই লক্ষ টাকা ঋণভার জর্জরিত) দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই মর্মে প্রাদেশিক সমবায় রেজিস্টারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। গুরুসদয় দত্ত জেলাশাসক থাকাকালীন কালেকটরকে সভাপতি করে, ছাতনা পরগণার দশ জনকে ডাইরেক্টর করে, জনগণকে ২৫ টাকা মূল্যের অংশীদারিত্ব দিয়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব দেওয়া হয়। পরবর্তী কালেকটর ফ্রেঞ্চ ও মহাকুমাশাসক সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রয়াসের অংশীদার হলেও, দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এ প্রয়াস মান্যতা পায়নি। তবে বাঁকুড়া ছিল সমবায় জমিদারি ভাবনার পথপ্রদর্শক।

কোম্পানী শাসনে কৃষির অবস্থা ঃ শস্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ

কোম্পানী শাসনে বাঁকুড়ার মুখ্য ফসল ছিল ধান। তাছাড়া অন্যান্য ফসলগুলি হল তুলা, মালবেরি রেশম, তসর, লাক্ষা, ইক্ষু, নীল, তাম্বুল, সুপারি, আলু, সবজি। (১) প্রাচীনকাল থেকেই বাঁকুড়া ভূমিতে ধানচাষের চল ছিল। পোখন্নাতে ধানের প্রাচুর্য ও গোলা সম্পর্কিত লোকগান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত শস্যের অবশেষ এই প্রাচুর্যকে প্রমাণিত করে। ভূমরাজত্বে ওন্দা সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচুর ধানচাষ হত বলে এই অঞ্চল সে যুগে 'ধানের ভাণ্ডার' (ওন্দার মাঠ) হিসাবে পরিচিত ছিল।[৬৬] গোপাল সিংহের আমলে মন্ত্রী শুভঙ্করের তত্ত্বাবধানে বড়জোড়া সন্নিহিত এলাকায় একটি সেচ খালের খনন কৃষি সেচের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা নিয়েছিল। যেহেতু ভাত হল জেলাবাসীর প্রধান খাদ্য, কৃষকরাও বর্ষাকালীন ধান রোপণ করত অধিকাংশ জমিতে (তিনের চার ভাগ জমিতে)। তবে উন্নত বীজধানের অভাব, অপর্যাপ্ত সার, বর্ষা নির্ভরতার কারণে জেলার ধানের উৎপাদন হার ছিল অনেক কম। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মাঝারি মানের জমিতে বিঘা প্রতি ফলন ছিল বড়জোর ৬-৮ মণ ধান এবং ১০-১২ পণ খড় (৬৪ বাণ্ডিলে এক পণ)। ভালো জমিতে এই হার দাঁড়াত সর্বাধিক সোয়া দশ মণ প্রতি বিঘা। এ ধরনের জমিতে গমের উৎপাদন ছিল তিন মণ প্রতি বিঘা। সেচ ও পুঁজির অভাবে জমি ছিল একফসলি। ১৮৫১ সালে চালের পাইকারী ও খুচরা দাম ছিল যথাক্রমে টাকায় ১ মণ ১২ সের ও ১ মণ ১০ সের। খড় টাকায়

১১ পণ। ভালো জমির বিঘা প্রতি কর তিন টাকা ও মাঝারি জমিতে ১ টাকা ৮ আনা। অর্থাৎ খড়-ধানের দাম বাবদ বিঘা প্রতি গড়পড়তা মিলত ৫-৬ টাকা। অর্থাৎ কৃষককে রাজস্ব বাবদই দিতে হত আয়ের ২৭.৬ শতাংশ - ৫৫.২ শতাংশ। শ্রম, বীজের দাম, সার, কৃষি সরঞ্জামের খরচ বাদে কৃষকের হাতে খুব সামান্য টাকাই পড়ে থাকত। এ কারণে ধান চাষ সে যুগে লাভজনক ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জেলার ধানচাষের ৮৩ ভাগই ছিল হৈমন্তিক ও ১৭ ভাগ আশু।

ধান মাণ্ডি ও সরকারি ধানের গোলা :

ধান চাষের আগাম দেওয়া শুরু হত আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বরের মাঝ থেকে নভেম্বরের মাঝ পর্যন্ত) মাসে। মাঠে ধানের ফসল বোনা শুরু হলে। দ্বিতীয় দফায় একাজ হত পৌষে ফসল ওঠার পর। সুদ দিতে হত টাকায় দুই আনা (১২.৫শতাংশ)। কৃষকের লাভের অধিকাংশ চলে যেত এই সুদ পরিশোধে। ধান মাণ্ডির নিয়ন্ত্রণ ছিল কার্যত মহাজন-বণিক-জমিদারদের হাতে, কৃষকের সেখানে বিন্দুমাত্র হক থাকত না। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে বণিকরা এখানকার ধান কিনে নেওয়ার ফলে ধানের মূল্য বেড়ে যেত যথেষ্ট। ১৭৮৮ সালে টাকায় ধান মিলত চার মণ। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ১৭৮৯ তে তা কমে দাঁড়ায় ৩ মণ ২০ সের, ১৭৯০ সালে মাত্র ১ মণ ১৫ সের, যা ১৮০৯ সালে দাঁড়ায় ৪২ সের, ১৮৪৬ খ্রিঃ চালের দাম ছিল টাকায় মাত্র ১৬.১৮ সের (সূত্র ঃ জেলাশাসক জর্জ লচ) অর্থাৎ কোম্পানী শাসনের প্রথম চার দশকে মূল্য বৃদ্ধি পায় ৪০শতাংশ, পরবর্তী পাঁচ দশকে প্রায় ৫০শতাংশ। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন কোম্পানী শাসকরা কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় ও গোলাজাত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিপুল সংখ্যক সিপাহী ও কয়েদিদের পালনের দায়ও ছিল কোম্পানীর উপর। কিন্তু এই উদ্যোগে তারা কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের কাছে। অক্টোবর নভেম্বরে অগ্রিম দিয়ে কৃষকের ফসল নিশ্চিত করা, অন্যান্য বিনিয়োগের সাথে এই নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখা, ফসল নষ্ট হলে আবশ্যিক ঝুঁকির ব্যাপার, মাটির গোলাতে যথাযথ সংরক্ষণের বিষয়গুলি কালেকটরের পক্ষে বিপত্তিজনক হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৯৬ সালের মধ্যেই এই উদ্যোগের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে গোলা নির্মাণের ঘটনা বিরল নয়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে জেলাসদরের ৫০০ কয়েদি ও ২০০ সিপাহীর সারা বছরের খোরাকির জন্য ৪টি গোলা তৈরি করে ৩১৫০ মণ ধান রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এসময় সরকারি হিসাবে মাথাপিছু দৈনিক চালের খাদ্যগ্রহণ ছিল ২.৫ সের। স্পষ্টতই এই মূল্যবৃদ্ধি কৃষকের তুলনায় মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করেছিল। তবে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ধান-চালের দাম অনেকটাই স্থিতিশীল ছিল। এসময় চালের প্রাপ্তি ছিল টাকায় ১৮৯৩ সালে ১১ সের ১২ ছটাক, ১৮৯৫

সালে ২০ সের ১০ ছটাক, ১৮৯৭ সালে ১১ সের, ১৮৯৯ সালে ১৭ সের ৮ ছটাক, ১৯০২ সালে ১৫ সের ৮ ছটাক, ১৯০৫ সালে ১৬ সের, ১৯০৮ সালে ১৭ সের ৮ ছটাক, ১৯১১ সালে ১৪ সের ৪ ছটাক। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাইপুরে ১ আড়া (১ কুইন্টাল ৬ কেজি) ধানের দাম ছিল ২ টাকা।

(২) বাঁকুড়ায় ইক্ষু চাষের চল ছিল। এমনকি ১৯৪৪-৪৫ সালের ঈশাকের কৃষি সমীক্ষাতেও বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইক্ষু চাষের প্রমাণ ছিল।[৬৭] ১৫ই জুন ১৭৮৯ সালের বোর্ড অব রেভেন্যুর প্রতিবেদনে দেখা যায় একই জমিতে ধান ও ইক্ষু চাষ করা গেলে বছরে ৬০শতাংশ বেশি লাভ সম্ভব। কোম্পানীর আগমনের আগেই বাঁকুড়ায় ইক্ষু চাষ, চিনি-গুড়ের উৎপাদন প্রচলিত ছিল। ১১ নভেম্বর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে জেলাশাসক কিটিং বোর্ড অব রেভেন্যুকে বীরভূম যুক্তজেলায় ইক্ষু চাষ এলাকা ১১৪০০ বিঘা বলে জানান। ইংলণ্ডে এ সময় চিনির চাহিদা থাকলেও কিটিং সরকারি উৎসাহে ইক্ষু চাষের বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁর মতে তা কৃষকদের মনে বিরূপ ধারণার জন্ম দিতে পারে। ইতিমধ্যে ইক্ষু জমির পরিমাণ নির্ধারণ সমীক্ষাই কৃষদের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল, কারণ তারা মনে করতে শুরু করেছিল কোম্পানী একচেটিয়া ইক্ষুচাষ করতে চায়। প্রারম্ভিক খরচ, ঘনঘন খরা, সরাসরি সরকারি সাহায্যের অভাব ইক্ষু চাষের প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পাইকার, পরোক্ষভাবে চাষীদের দাদন দেওয়া হত এবং ভালো দাম ও চাহিদা থাকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেক কৃষকই ধানের পরিবর্তে ইক্ষু চাষ করতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইক্ষুচাষ এলাকা কমলেও ১৮৪০ সালের পর তা আবার বাড়তে থাকে (১৮৩০ সালে ১০ - ২০ শতাংশ হ্রাস পায়)।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইংলণ্ডে চা পানের ব্যাপক প্রচলন ও ওয়েস্টইণ্ডিজ-ডোমিনিকোর ইক্ষু শ্রমিকদের বিদ্রোহের কারণে চিনি অগ্নিমূল্য হয়। এই পটভূমিতে বাংলায় ইক্ষুচাষের কদর বাড়ে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম-বিষ্ণুপুর যুক্ত জেলা থেকে মোট উৎপাদন ছিল ১৮৭৯৮ মণ ১৬ সের, যার মধ্যে ৭৬৯৯ মণ ২৪ সের স্থানীয় ব্যবহারের জন্য রেখে, বাকি সমস্তটাই ইংলণ্ডে রপ্তানী করা হয়। চিনি উৎপাদনে সোনামুখী রেসিডেন্টের বিনিয়োগ ছিল ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ৭৯৫৮৪ টাকা, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ১৫৭৩৪৪ টাকা (শোধিত চিনির দাম ৮৪০০০ টাকা, ৭৩৩৪৪ টাকায় অশোধিত চিনি), ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৫০০০৩ টাকা (২২৫০০ মণ শোধিত চিনি), ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ৫৪৫০০০ টাকা। এই সময়কালে রাজস্ব ও উৎপাদনের খতিয়ান নিম্নরূপ (১৭৯২-৯৩ খ্রিঃ) ঃ (বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন তাং ৩০/০৫/১৭৯৩)

জমির শ্রেণি	বিঘা প্রতি রাজস্ব	বিঘা প্রতি উৎপাদন	বিঘা প্রতি মূল্য
ভালো জমি সর্বাধিক	৪টাঃ৬আঃ১৪গঃ২কড়ি	৪মঃ২৬সেঃ১২ছঃ	৭টাঃ৮আঃ১৫গঃ
মাঝারি জমি		৩মণ ১০ সের	প্রায় ২ টাকা
খারাপ জমি সর্বনিম্ন	১টাঃ১৪গঃ৩কড়ি	২মণ১৩সের৫ছটাক	৩টাঃ১২আঃ৯গঃ

অর্থাৎ আরোপিত রাজস্ব ছিল অত্যধিক, ইক্ষুমূল্যের ২৭-৫৯শতাংশ। এই শ্রমনিবিড় কৃষিতে পাইকস্ত (অস্থায়ী) রায়তদের উৎসাহ দিতে ২০-১৫শতাংশ কর ছাড় দেওয়া হয়েছিল ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত।

(৩) ইক্ষুর মতো তুলা চাষও বাঁকুড়ার সনাতন ফসল। কোম্পানী শাসনের পূর্বে সোনামুখী আওরঙের প্রয়োজনীয় তুলা জেলাতেই উৎপাদিত হত। কোম্পানী আমলে ব্যবসার বিস্তারের কারণে তুলার চাহিদাও বাড়তে থাকে। ১৭৮৯সালে জেলার চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২০০০ মণ, যার ৪০০০০ মণ উৎপাদন ছিল জেলার, ১২০০০ মণ ছিল পাটনা-মুর্শিদাবাদ থেকে আমদানিক্রীত। জেলাশাসকের হিসাবে এসময় জেলার ১৩০০০ বিঘাতে তুলা চাষ হত এবং বিঘা প্রতি ফলন ছিল ২.৫ মণ থেকে ৩ মণ (বোর্ড অব রেভেন্যুর ১৫ই জুনের প্রতিবেদন)। তুলার দামের উপর চাষিদের চাষে উৎসাহ অনেকটাই নির্ভর করত। বিভিন্ন সময়ে মণ প্রতি তুলার দাম ছিল নিম্নরূপ :

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ — ১৩ সিক্কা টাকা ৮ আনা
১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ — ১০ সিক্কা টাকা ১২ আনা
১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ — ২১ সিক্কা টাকা ৮ আনা
১৮০০ খ্রিস্টাব্দ — ২০ সিক্কা টাকা ০ আনা
১৮০১ খ্রিস্টাব্দ — ২৩ সিক্কা টাকা ৮ আনা
১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ — ১৭ সিক্কা টাকা ১২ আনা

ভূমি রাজস্ব, শ্রম, সার, উপকরণ খরচ বাদে বিঘা প্রতি লাভ ছিল ভালোই। তবে ঢাকার তুলনায় এখানকার তুলা ছিল খারাপ মানের। জেলা প্রশাসনকে রেভেন্যু কমিশনারের পরামর্শ ছিল সী আইল্যাণ্ড, নিউ ওয়লিয়ন, মেক্সিকান প্রজাতির তুলা চাষ করে এই ফলনকে বহুগুণিত করার। কিন্তু জেলা প্রশাসনের অভিমত ছিল যেহেতু একই আবহাওয়া ও ভূমিরূপ বিশিষ্ট বিহারে এই প্রজাতির তুলার ফলনে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়নি, বাঁকুড়ার মতো জায়গায় তার সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। ইক্ষুর মতো এক্ষেত্রেও কৃষকদের কোনরূপ সরকারী আগাম দেওয়া হত না। কমার্সিয়াল রেসিডেন্টরা তন্তুবায়দের আগাম দিতেন। তবে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ইংলণ্ডের যুদ্ধব্যস্ততা

ও অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক বাধার কারণে এদেশ থেকে তুলা রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধান্তে ব্রিটিশ ক্যালিকোজ বাংলার বাজারকে প্লাবিত করে। যার সঙ্গে বাংলার ক্যালিকোজ মান ও মূল্যে টিকে থাকতে না পেরে ১৮৩০ সাল নাগাদ পুরোপুরি বিদায় নেয়। ১৮৬২-৪৮ সাল নাগাদ এই চাষ কমে দাঁড়িয়েছিল নামমাত্র জমিতে, তাও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে। তাছাড়া এই সময় উৎপাদন হারও অনেক কমে গিয়েছিল। সোনামুখীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন চীপ এই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল আবহাওয়া ও জমির অনুর্বরতাকে দায়ী করেছেন। কিটিং-এর সময়ে তুলা চাষের জন্য ভালো, মাঝারি ও নিকৃষ্ঠ জমিতে ভূমিরাজস্ব ছিল যথাক্রমে ৪,৩,২ টাকা প্রতি বিঘা।

(৪) বাঁকুড়ায় রেশম ও তসরের চাষের কদর বাড়ে বাদশাহী আমলে। মল্লযুগে রেশম ছিল অন্যতম অধিক উৎপাদিত ফসল। এমনকি সোনামুখী অঞ্চল থেকে বাদশাহদের পাগড়ী সরবরাহ করা হত বলে জানা যায়। কোম্পানী শাসনেও এই কদর অব্যাহত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তুলা চাষের দুর্দশার কালে রেশম শিল্পের প্রসার ঘটে। চীপের সময়ে এই চাষের স্থবিরতার কারণ স্বরূপ অতিরিক্ত রাজস্বকে দায়ী করা হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে জেলার রেশম চাষের সুদিনে রেসিডেন্ট কলিন সেক্সপীয়র রেশম চাষের বিঘা প্রতি লাভ-ক্ষতির যে হিসাব দিয়েছিলেন তা হল,

ব্যয়	:	ভূমি রাজস্ব	৪ টাকা ৪ আনা
		সার	১ টাকা ৮ আনা
		মজুরি	৪ টাকা (বছরে ৪০ দিনের)
		মোট	৯ টাকা ১২ আনা

আয় : পাতা ৪ টাকা (বিঘায় ১৪ বোঝা পাতা ১ টাকা হারে), চাষী পাতায় গুটি উৎপাদন পর্যন্ত নিজ শ্রম করলে আয় হত ৪৩ টাকা ৪ আনা।

লাভ — ৪ টাকা ৪ আনা

লাভের আধিক্য সত্ত্বেও এই চাষের সন্তোষজনক প্রসার না ঘটায় ১৮৩১ সালে বোর্ড অব ট্রেড বিস্ময় প্রকাশ করে। ১৮৩০ সালে রেশম চাষে সরকারি আনুকূল্য বন্ধ হলে ব্যক্তি বিনিয়োগ এই চাষ অব্যাহত ছিল অনেককাল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ওন্দা-পুনিশোলের ২০ বিঘা ও কোতুলপুরের ১৮টি গ্রামে রেশম চাষের প্রসার ঘটে।

জেলায় শাল গাছের আধিক্য থাকায় শালকেন্দ্রিক তসরের চাষ ছিল মধ্যযুগ থেকে।

কোম্পানী শাসনে বনোচ্ছেদ করে কৃষি জমি বিস্তারের নীতিতে শাল জঙ্গলের আকাল দেখা যায়। বাঁকুড়ায় তসরের গুণমান ছিল উৎকৃষ্ট। পূর্ববঙ্গে বাঁকুড়ার তসরের কদর ছিল।[৬৮] ১৯৫৯ সালে জেলায় মালবেরী তসরের চাষ কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৮০ বিঘায়। বিঘা প্রতি পাতার উৎপাদন ছিল ৬০০০। তসরকেন্দ্রিক কর্মশালা গড়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া, বীরসিংহপুর গ্রামে।

(৬) সোনামুখীর বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট জন চীপের উদ্যোগে ১৭৯৬ সাল নাগাদ জেলায় নীল উৎপাদনে গতি আসে। চীপের সহযোগী এরস্কিন, চীপ সাহেব, স্কেল সাহেব, পরবর্তীকালে কিছু দেশীয় উদ্যোগপতির (লোকপুরের ঋষিবর মুখার্জী, ভেলাইডিহার হরচন্দ্র-চৈতন্য সিংহচৌধুরী, হাড়মাসড়ার নদেরচাঁদ রায়) সাহায্যে জেলায় নীল চাষে সমৃদ্ধি আসে। এরস্কিনের নীলচাষের জমি দাঁড়িয়েছিল জঙ্গলমহলের ২১২৫ বিঘার অতিরিক্ত, যুক্তজেলায় আরো ১৪৫২৫ বিঘা। ১৮৩০ সালে এরস্কিন ৯৮৯০ রায়তকে দাদন দিয়েছিলেন ৪১৫০০ টাকা। বিঘা প্রতি দাদন ছিল ১-৪ টাকা। জমিদার বণিক নিযুক্ত তাগাদাদারকে এই আগাম ফেরৎ দিতে হত ২৫ শতাংশ সুদ সহ। সাধারণ রায়তকে সুদসহ পুরানো বাকি বা অপরিশোধিত উৎপাদন মূল্য/দাদন ফেরৎ দিতে বাধ্য করা হত। তবে বাঁকুড়ার নীলকরদের সহযোগিতা ও প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার জন্য এ জেলায় নীল বিদ্রোহ মাথা তুলতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মধ্যস্বত্বভোগীরা এ ব্যবসায়ে নেমে পড়েন। ১৮৮০ সালে ঠিকা বন্দোবস্তভিত্তিক ব্যবস্থায় মণ প্রতি উৎপাদন মূল্য দাঁড়িয়েছিল ১০০ টাকা, এর উপর লাভ রাখা হত ১৫০ - ২০০ টাকা। এর সাথে যুক্ত হত দাদনের উপর সুদ, চুক্তিমতো ঠিকাদার মুনাফার কমিশন, অতিরিক্ত উৎপাদনের মুনাফা। নীলচাষকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গ্রামে নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল তা হল আসুড়িয়া, দেরুড়িয়া, নারায়ণপুর, রামপুর, তামুলি, কৃষ্ণনগর, ধড়িমপুর, হলদ, পারুলিয়া, অযোধ্যা, আমচিংড়া, চম্পাতলা, জয়পুর, কোতলপুর, গোপালনগর, ঘাটনগর, বরা, জামুরিয়া, কাঁকলা, পাত্রসায়ের, সাঁতুড়ি, দীঘা, কুপায়, রোল, ওন্দা, চ্যামটা, নিকুঞ্জপুর, সারেঙ্গা, দেউলি, সালুকা, সুরুল, লোকপুর প্রভৃতি।

(৭) সামন্তরাজাদের আনুকূল্যে রাজগ্রাম বাণিজ্যকেন্দ্র পত্তনের সময় থেকেই রাজগ্রামের বাণিজ্য তালিকার উল্লেখযোগ্য হিস্যা ছিল লাক্ষার। সোনামুখী কেন্দ্রিক ব্রিটিশ বাণিজ্য অভিযানেও লাক্ষা ছিল অন্যতম সামগ্রী। ১৭৯২ সালে ৫০০ মণ লাক্ষার জন্য কোম্পানীর বিনিয়োগ ছিল ১০০০০ টাকা। তবে ১৭৯৭ সাল থেকে স্টিফেনের মতো বণিকের সাথে কোম্পানী সরাসরি চুক্তিবদ্ধ হয়ে লাক্ষা সংগ্রহের দায়িত্ব দিলে সোনামুখী রেসিডেন্সির ভূমিকা এই ব্যবসায়ে সংকুচিত হয়।[৬৯] রামানুজ করের ১৯২৫ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়ার কোনো কোনো গ্রামে

লাক্ষার চাষ অব্যাহত আছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে লাক্ষা উৎপাদনের সময় যথেষ্ট দাম না থাকায় চাষীরা কার্তিক মাসে বিক্রয়ের দিকে ঝুঁকত। লাক্ষা চাষ হত পলাশ, কুল, কুসুম, সিধা, অড়হড় গাছে।

(৮) তাম্বুল : রাজগ্রাম বিপণন কেন্দ্রের অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল রাজহাটির বাণিজ্যকেন্দ্র। এই বাজারে পানের কেনাবেচা ছিল মোট কেনাবেচার বৃহদাংশ। বাঁকুড়ার 'বারুই' সম্প্রদায় পানের বরজ করে পান চাষ করত। তাম্বুলি সম্প্রদায় মূলত এই ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন। ১৯২৫ সালে জেলার উৎপাদন ছিল কয়েক কোটি পাতা, যার জন্য প্রয়োজনীয় ১০০০ মণের মতো সুপারি মুর্শিদাবাদের মতো জেলা থেকে আমদানি করা হত। অর্থাৎ জেলায় সুপারি উৎপাদন ছিল অকিঞ্চিৎকর। তামাকের উৎপাদনও তথৈবচ।

(৯) আলু-সবজি : ক্রিস্টোফার কিটিং ডিসেম্বর, ১৭৮৮ সাল থেকে ০৬/০৮/৯৩ পর্যন্ত বীরভূম-বিষ্ণুপুর যুক্তজেলার জেলাশাসক থাকাকালীন বেগুন, আলুর মতো সবজির প্রবর্তন ও জনগ্রাহ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করে গেছেন। বেগুনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তিনি সফল হলেও, আবহাওয়া ও কাঁকুড়ে মাটির কারণে আলু চাষ কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় হয়নি। এইসব চাষের বিষয়ে কালেক্টরকে সাহায্য দিয়েছিলেন হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা-অধীক্ষক কর্নেল রবার্ট কিড। বেগুন চাষের সাফল্যে উৎফুল্ল জেলাশাসক ২৫/০২/১৭৯২ সালে কিড সাহেবকে লেখেন, 'বেগুনের উৎপাদন অত্যন্ত আশাপ্রদ..... এবং আশা করি এই ফসলটি জেলাবাসীর কাছে আদৃত হবে।'

বাঁকুড়ায় কৃষি পরিকাঠামো :

যে কোনো অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এলাকার সড়ক যোগাযোগ, বাজার, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি শ্রমিকদের যোগান, মহিষাদির প্রাপ্যতা। পুরাতন বাঁকুড়ায় এই বিষয়গুলির হাল হকিকত নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) সড়ক ঃ যে কোন স্থানের সার্থক কৃষি বিপণনের উপর কৃষকের স্বার্থোপযোগী কৃষিপণ্যমূল্য নির্ভর করে। এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন সংযোগকারী সড়কের। মৌর্যপূর্ব বাঁকুড়া ছিল 'পথহীন' ও 'অরণ্যসঙ্কুল'। মৌর্য সমকালীন রাঢ়ে পাটলিপুত্র-তাম্রলিপ্ত বাণিজ্য সড়কের ও পরবর্তীকালে পুরী পর্যন্ত একটি তীর্থ সড়কের সমাচার পাওয়া যায়। বেগলারের মতে এই সড়ক ছিল মুঙ্গের, রাজগির,ঝড়িয়া, তেলকুপী, রঘুনাথপুর, ছাতনা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, তমলুক, দাঁতন ওড্র হয়ে।[৭০] পরবর্তীকালে রাজহাটী-বীরসিংহপুর, রাজগ্রাম, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, বাঁকুড়ার মতো বাজার ও সংযোগকারী

সড়কগুলি গড়ে ওঠে। পাশাপাশি বড়জোড়া, কেঞ্জাকুড়া, কোতলপুর, অম্বিকানগরের বাজার ও সংযোগকারী রাস্তাগুলি নির্মিত হয়।

জেলার বর্ষার জলে পুষ্ট নদীগুলিতে বর্ষার সময় ২-৩ মাস কিছু সামগ্রী নৌকা-ডোঙা-ভেলার মাধ্যমে পরিবাহিত হত। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষ দু-দশকেই নদী বাণিজ্যের পরিবর্তে সড়ক বাণিজ্যের রমরমা বাড়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকেই গড়ে উঠতে থাকে জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলি। বীরভূম-বাঁকুড়ার সড়কগুলি গড়ে তোলার পেছনে সোনামুখীর চীপ সাহেবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁর বিশেষ উদ্যোগে গড়ে ওঠে সুরুল-সোনামুখী, সুরুল-ইলামবাজার-বাঁকুড়া সড়ক। প্রতি মাইলে খরচ ধরা ছিল ১০০ টাকা। এই উদ্যোগে স্থানীয় মানুষদের যোগদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জন চীপ বিচারসচিবকে ২৯ জুন ১৮১৬ খ্রিঃ জানান, "even the carters set their aid by conveyance of sand and canker to such parts of the road as were muddy to give it firmness."এছাড়া কয়েদিরাও কায়িক শ্রমে রাস্তা নির্মাণ কাজে নিয়োজিত হতেন। কালেকটর উইলিয়াম ব্লান্ট (১৮০৫-১৮১০) জেলার কয়েকশো কয়েদির সাহায্যে বাঁকুড়া-সোনামুখী ও বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর সড়ক নির্মাণে হাত দেন (এসময় মোট কয়েদির সংখ্যা ছিল ৫০০)। এদের প্রহরায় নিযুক্ত থাকত সিংভূমের পাতকুম জঙ্গল থেকে আনা ২০ জন দুর্ধর্ষ উপজাতি। কয়েদি পিছু বরাদ্দ ছিল মাসিক ১.৫ টাকা। এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৮১৯ সালের মে মাসে।

পথ-ঘাট ঃ কৃষি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীপথই ছিল মূল মাধ্যম। বাকি অংশ পরিবাহিত হত পশুপৃষ্ঠে বা কুলিদের মাধ্যমে। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত দামোদরের মেজিয়া (রাণীগঞ্জ কোলিয়ারির কয়লা পরিবহন), দ্বারকেশ্বর নদীতে বাঁকুড়া পর্যন্ত এবং কংসাবতীর নাব্যতা কাজে লাগিয়ে কৃষি পণ্য পরিবহন করা হত। ও'ম্যালী এই নদী পরিবহনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছিলেন,[১১]— 'During the rains numbers of logs are fastened together by ropes to form rafts known as MARS, with three or four men to steer them. The rafts are sometimes 50-60 yards long and generally 10 or 12 are launched together from the timber letting tracts higher up the river.'ও'ম্যালী মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে মহিষ, গাধা, উট (বাঁকুড়া-গঙ্গাজলঘাটি সড়কে), ষাঁড়, গো-যানের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৩ সালের গ্যাসট্রেলের ভূমি সমীক্ষায় বাঁকুড়ায় ৪টি মুখ্য সড়কের উল্লেখ আছে। ১৯০৮ সালে বাঁকুড়া গেজেটিয়ার্সে ও'ম্যালী বেশ কয়েকটি সড়কের উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৫ খ্রিঃ বাঁকুড়া রেল মানচিত্রে সংযুক্ত হলে পণ্য পরিবহনে সাবেকিয়ানা থেকে আধুনিকতায় জেলায় উত্তরণ ঘটে।

তবে প্রশাসনিক অবহেলায় জেলা সড়কগুলি বেহাল হয়ে পড়ে ১৮৬৩ সালের মধ্যেই। এই সময়কার গ্যাসট্রেলের বিবরণে পাই[৭২],— 'All the main roads were once well metalled and bridged but were not in good repair at the time of survey operation .... In several places the bridges had been cut off by the streams from the road which, therefore, passed down into and through the water instead of over the bridge.' তাছাড়া সড়ক যোগাযোগ তখনও পর্যন্ত ছিল ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ।

(২) **কৃষিতে পুঁজি :** মৌর্য-গুপ্ত শাসনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সহায়তায় কৃষকদের কৃষিকাজে নিয়োজিত রাখা, বাদশাহী শাসনে তাকাভি কৃষি ঋণের মাধ্যমে কৃষককে পুঁজির সরবরাহের নীতি থাকলেও, ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকদের বাঙালি বা ওড়িয়া মহাজনদের ঋণজালে বদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ১৮৭১ সালে জেলাশাসকের এক প্রতিবেদনে কৃষকদের দুর্দশার চিত্র ধরা পড়েছে। ১৮৭৮ খ্রিঃ হান্টারের প্রতিবেদনে মহাজনী সুদের হার উল্লেখ আছে ১৮-৩৬ শতাংশ। পরবর্তী অর্ধদশক এই ধারা অব্যাহত ছিল, কারণ ১৯২৯ সালের ব্যাঙ্কিং তদন্ত প্রতিবেদনেও সুদের হার ধরা পড়েছে ১৫-৩৭.৫ শতাংশ। ঋণ কেন্দ্র হিসাবে মদের ভাটি ও গোলদারী দোকান ছিল সাধারণ মানুষকে প্রতারিত ও শোষণ করার মাধ্যম। মহাজনী চক্রান্তে রায়ত নিজ জমি থেকে উৎসাদিত হয়ে খারাপ জমিতে বা পূর্বতন দখলী জমিতে কড়া শর্তে (সাজা বন্দোবস্ত) চাষ করে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেত। ১৯১৭-২৪ সালে এক চতুর্থাংশ কৃষকই সাজা প্রথার কৃষকে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৭ খ্রিঃ জেলাশাসক হার্ট এই প্রথা ও ফসলে খাজনা দেওয়ার পদ্ধতিকে চাষীর পক্ষে ক্ষতিকর বলে অভিমত দিয়েছিলেন।

জেলা প্রশাসনের উদ্যেগে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানের ও সেচের সুবিধার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমবায় গঠন করা হয়। সদর মহকুমায় এমন ২৪টি সমবায়ের ৮টি ছিল সিমলাপালে, গঙ্গাজলঘাটিতে ৬টি, ছাতনায় ১টি, রাইপুরে ৫টি। বিষ্ণুপুর মহকুমায় পাত্রসায়েরে ১টি। প্রাচীনকাল থেকেই ধানের গোলা শস্য সংরক্ষণে, কম দামে বাধ্যতামূলক বিক্রয় রোধে, সারা বছরের প্রয়োজন মেটাতে ও উদ্বৃত্ত অর্থনীতি ও বাণিজ্যের স্বার্থে বাঁকুড়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। পোখন্নায় প্রাচীন যুগে ও মল্ল রাজধানীতে এমন গোলার চল ছিল তা প্রমাণিত। দামোদর নদীর অন্য পাড়ে জেলা বর্ধমানে ও নিজ জেলার ডিহর পরিমণ্ডলে এই উদ্বৃত্ত অর্থনীতির নিশ্চিতভাবেই যোগান ছিল। বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে ধ্বংসপ্রাপ্ত শস্যাগার এবং ভেতর জোতের উৎপাদিত ধান মল্লরাজের আপদকালীন সঞ্চয় হিসাবে ব্যবহৃত হত। ১৯২৪-২৫ সালে কৃষকদের মহাজনী শোষণ থেকে বাঁচাতে গঙ্গাজলঘাটিতে ৫টি, ছাতনায় ১টি, পাত্রসায়েরে ২টি,

সোনামুখীতে ২টি, ধর্মগোলা সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। কৃষকদের সামগ্রিক হিতের জন্য জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত (১৯২২-১৯২৩ খ্রিঃ) জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি গড়ে তোলেন, যার সভ্য ছিলেন দুই মহকুমা শাসক, বি. রায় (সম্পাদক), প্রসন্ন ব্যানার্জী, অমরেশ মুখার্জী, শশাঙ্ক ব্যানার্জী, অতল চ্যাটার্জী সহ ৫০ জন।

(৩) **কৃষি সেচ** ঃ বাঁকুড়া জেলার নদী-জোড়গুলি ছাড়া সেচের বড় উৎস হল জেলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য জলাশয় ও সরোবর। এইসব জলাশয় কবে তৈরি হয়েছিল তার কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই। তবে সারা বাংলা জুড়ে পাল আমলে বহু জলাশয় খনন করা হয়েছিল সেচের উন্নতির জন্য। পাল প্রভাবিত বাঁকুড়াতেও এই যুগে কিছু বৃহৎ জলাশয় খনন অসম্ভব কিছু নয়। তাছাড়া তৃতীয় শতাব্দীতে জৈন প্রভাব ও একাদশ শতাব্দীর আগে-পরে জৈন বণিক ও ওড়িষার কৃষক-বণিকদের আগমনের ফলে জেলার কৃষি মানচিত্রের বদল ঘটে। আদিবাসীদের দ্বারা ঝুম চাষের পরিবর্তে ওড়িয়া প্রভাবে জলাভূমি চাষ চালু করারা সময় কিছু জলাশয় তৈরি করা হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তীকালে ভৌমরাজ শাসনে বিভিন্ন সেচ প্রকল্প গৃহীত হয়। মল্লরাজ গোপাল সিংহের সময়ে মন্ত্রী শুভঙ্করের তত্ত্বাবধানে বড়জোড়া থেকে পাত্রসায়ের পর্যন্ত সেচ খাল খননের মাধ্যমে এই এলাকায় অনুর্বর ২০০০ বিঘা জমি সেচসেবিত হয়। রাইপুরের যমুনা বাঁধ থেকে এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলসেচ করে শস্যশ্যামলা করে তোলায়, ভৌমরাজের প্রশংসা করেছিলেন এলাকায় অভিযানরত ফার্গুসন সাহেব। ভৌমরাজ ও ব্রিটিশ শাসনে জলশাসন স্বত্বের অনুষঙ্গে ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিলের সহায়তায় অনেক জলাশয় খনন করা হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তালডাংরা থানার আমজোড় ও রুক্মিণী খাল খননের পরিকল্পনা রূপ দেওয়া হয়। ১৯২৪ খ্রিঃ ৭ই জানুয়ারি লর্ড লিটন এই প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বি. ডি. হাজরা জেলাশাসক (১৯২৩-২৪) থাকাকালীন ওন্দার বিড়াই খাল সেচ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এছাড়া বাঁকুড়া-ছাতনা থানার সেচের প্রসারে ছাগলকুটা জোড় ও মোলবাঁধ সেচ প্রকল্প শুরু হয় শেষ চারের দশকে। জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সভার কাজের প্রশংসা করে লর্ড লিটন বলেছিলেন, 'অনাবৃষ্টির জন্যে শস্য না জন্মালে যে ভীষণ বিপদ ঘটে, তা সমাধান করার জন্য নিজগ্রামে সেচ সমবায় সমিতিগুলি যে কাজ করছে তা অত্যন্ত উৎসাহজনক। দরিদ্র শ্রেণির লোকও কীরূপ সমৃদ্ধি ও সম্পত্তি অর্জন করতে পারে, এই সকল সমিতির সভ্যরা তা দেখিয়েছেন। এবং জেলার ভবিষ্যতের পক্ষে এটি আশাব্যঞ্জক......। এদের প্রশংসনীয় উদ্যোগকে যাতে যথার্থ উৎসাহ দেওয়া হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখব। ...... জেলায় কৃষি ও হিতসাধনা সভার কাজের বিষয়টিও জেনেছি, যা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

ধন্য তাদের চেষ্টা, ২৬০০০ বিঘা জমি যাতে অনাবৃষ্টিজনিত শস্যহানি ছিল স্বাভাবিক, এখন তা সে অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পেয়েছে।'

(৪) **কৃষিকাজে মহিষের যোগান** ঃ ১৮৮১ খ্রিঃ বাঁকুড়া জেলা সৃষ্টির কালে সদর মহকুমায় জোতের সংখ্যা ছিল ২১৯৫৬ (৫৪০০৩৭ একর) টি, বিষ্ণুপুর মহকুমায় ২৪৫৬৯৯ (একরে ২০৩১৬৭)টি। বপন সময়ে এক একটি লাঙল ৫ একর জমি চাষ করতে পারে ধরে নিয়ে জেলার মোট জমির ৭৮৫৭৩৬ একরে লাঙল দিতে প্রয়োজন হত ১৫৭১৪৭ জোড়া অর্থাৎ ৩১৪২৯৪টি বলদের। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষদিকে জে. আর. ব্ল্যাকউডের সমীক্ষা মোতাবেক বাঁকুড়ার মোট বলদের সংখ্যা ছিল ২১৬৭১৯ (১১৬৮৮ আমদানিকৃত বলদসহ), যা চাষে প্রয়োজনীয় বলদ সংখ্যার ৬৯ শতাংশ। এছাড়া পরিবহনে নিযুক্ত বলদ ও অশক্ত বলদের হিসাব বাদ দিলে ঘাটতি আরো বেশি দাঁড়াবে। স্বভাবতই বলদের অভাবে অনেক জমি অকর্ষিত পড়ে থাকত। সদর মহকুমায় বলদের সংখ্যা ছিল ১৫২৫৮৫ (৮৩৯৪ আমদানিকৃত বলদ সহ) বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৬৪১৩৪টি (৩২৯৪টি আমদানিকৃত)। সদর মহকুমারা ৫৪০০৩৭ একরে যেখানে বলদের প্রয়োজন ৯৮২৮০টির মতো, সেখানে মহকুমার মোট বলদ ছিল ৬৪১৩৪। অর্থাৎ বলদের অভাবে ২৫-৩০ শতাংশ জমি অকর্ষিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জেলার একমাত্র পশু হাট ছিল কোতুলপুরে। শুক্রবারে সকাল ৭টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কেনাবেচা চলত। দৈনিক কেনাবেচা হত ৪০০টির মতো। জেলার এই সংকট নিরসনে ১৯১৩-১৪ সালে ৩২২১১টি গাভীকেও কৃষি ও পরিবহনের কাজে ব্যবহার করতে হয়েছিল।[৭৩]

এই সময়কার থানাওয়ারী বলদের হিসাব নিলে জমি কর্ষণের একটা চিত্র পাওয়া যাবে (সূত্র ঃ ব্লাকউড সমীক্ষা) :

থানা	আমদানি বলদ	স্থানীয় বলদ	মারাইয়ের কাজে বলদ	আমদানি গাভী	স্থানীয় গাভী	স্থানীয় ব্রাহ্মণী ষাঁড়
বাঁকুড়া	২১০৮	২৪৬৪৭	৫১১৮	৯০	২৮১০৩	১৩৯
ওন্দা	২২৪	১৪২৯৯	২৮৭৬	২০	২৪১২৪	৭৪
গঙ্গা-ঘাটি	২৭০৮	৩৭৭৫২	৫৭৭৮	১৮৮	৩২৫০৯	৩০১
খাতড়া	২২১৭	২৭৬১৭	৮৩৮২	২৫৭	৩০২৪৪	২১৭
রাইপুর	৯৬৪	২৯২৯৯	৮০৯০	২৯২	২৮২০৪	৭০
সদর-পুরসভা	১৭৩	৫৭৭	৩১১	২৯	৩০৩০	১০
বিষ্ণুপুর	৮৭৩	১০২৩৪	১১৪৭	৬৮	১৯২২	৮

থানা	আমদানি বলদ	স্থানীয় বলদ	মারাইয়ের কাজে বলদ	আমদানি গাভী	স্থানীয় গাভী	স্থানীয় ব্রাহ্মণী ষাঁড়
সোনামুখী	১৪৬	১২৭৬৬	২২৩	৫	১৩০৯২	১০
ইন্দাস	৫৮৭	১৫৬১৩	১১২	৯৯	১১৯৪১	৬
কোতুলপুর	১৬৪৯	২০৭৬৩	১২২	৭০	১২৪৯০	৩৫
বিষ্ণুপুর (পৌর)	৩৯	১৪৬৪	৫২	৬	৩৫৬৩	১৯

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া, রাইপুর, খাতড়া, কোতুলপুর থানার কৃষির ও শস্যের ঘনত্ব সম্ভবত অন্য থানাগুলির চেয়ে বেশি ছিল।

(৫) গোবর সার : এইসব গোসম্পদ থেকে প্রাপ্ত গোবরই ছিল মূলত কৃষিক্ষেতে ব্যবহার্য সার। তাও আবার রান্নার জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হত অধিকাংশ গোবর। ফলে কৃষি জমিতে গোবর সারের ব্যবহারও ছিল অকিঞ্চিৎকর। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে জেলায় তুলা চাষের ফলন হ্রাসের পেছনে সারের অভাব ছিল খারাপ আবহাওয়ার পাশাপাশি অন্যতম কারণ (সূত্র ঃ জন চীপ)। বেশিরভাগ রায়তের বলদ কেনা ও পালন করার ক্ষমতা না থাকাতেই এই সংকট। ১৮২৪ সালে একজোড়া বলদের দাম ছিল ৩০ টাকা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উর্বরতা বৃদ্ধিতে পুকুরের পাঁক মাঠে দেওয়া হত। কখনও কখনও ছাইও মেশানো হত।

(৬) সাঁওতাল শ্রমিক ও পাইকস্ত রায়ত ঃ উনিশ শতকের Detribalization : বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই প্রাণঘাতী ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষে জেলার জনশক্তির দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষয় ঘটে। এই জনাভাব পূরণে মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর থেকে রায়তদের আনানো হয়, যারা পাইকস্ত রায়ত নামে পরিচিতি পায়। ১৭৮৮ সালে এমন প্রজার সংখ্যা দাঁড়ায় মোটের ১০ শতাংশ বা তার বেশি। এদের নামমাত্র রাজস্বে চাষের অধিকারে, স্থানীয় রায়তরা (খুদকস্ত রায়ত) অসন্তুষ্ট হয় ও সমান রাজস্বের দাবিতে সোচ্চার হন। অবশেষে এই অসন্তোষ নিরসনে ১৭৮৯ সালে সরকার দু'পক্ষের রাজস্ব সমান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় ধানিজমির বিঘা প্রতি খুদকস্ত রাজস্ব ছিল ১২ আনা ১ টাকা ৪ আনা, সেখানে পাইকস্ত রায়তদের দিতে হত এর অর্ধেক। এই সময়ে বাঁকুড়ার জমি উদ্ধারে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের প্রচুর সাঁওতালের আগমন ঘটে, কারণ তারা ছিল জঙ্গল সাফ করে জমি উদ্ধারে সিদ্ধহস্ত। জঙ্গল সাফাই করে সাঁওতালদের বসতি ও জমি পত্তনের প্রক্রিয়া আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। একটি এলাকায় রাজ আনুকূল্যে জমি পত্তনের পর তারা গোষ্ঠী হিসাবে রাজস্ব দিত গোষ্ঠীপতির (যাঁকে মণ্ডলও বলা হত) মাধ্যমে। ১৮৩৯ সাল নাগাদ এই ধরনের বন্দোবস্ত জমিদার-মণ্ডল তিক্ততার অবসান ঘটাতে মণ্ডল ও জমিদারদের অধিকার

নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এ ধরনের মণ্ডল প্রথা দেখা যেত ভূমিজ-মাহাতো অধ্যুষিত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঁকুড়ায়। এই অঞ্চলের ভূমিভাগ রাইপুর-ছাতনা ছাড়া বাকি অংশে এদের বসতি স্থাপনের আগে ছিল পতিত বা জঙ্গলময়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে এই মণ্ডলী প্রথা ভেঙে পড়ে বাঙালি ও ওড়িয়া মহাজনদের কৌশলে। ১৯০৯ সালে ম্যাকালপিন প্রতিবেদনে এই ভাঙন ও শোষণের চিত্র ধরা পড়ে।[৭৪] ১৮৫৪ খ্রিঃ গ্যাসট্রেলের হিসাবে জেলার পতিত জমি ছিল ৩৮.৬২ শতাংশ। রবার্টসনের হিসাবে ১৯১৭-১৮ সালে পতিত জমি কমে দাঁড়িয়েছিল ৩১ শতাংশ। বস্তুত ১৮৮১ খ্রিঃ তুলনায় ১৯২১ সালে জনসংখ্যা ২ শতাংশ কমলেও (বিষ্ণুপুরে জনহ্রাস ছিল ১৮ শতাংশ) সাত শতাংশ পতিত জমি উদ্ধারের পেছনে ছিল সাঁওতালদের অবদান। ঋণজালে জর্জরিত করে সরল, নিরপেক্ষ উপজাতিদের জমি দখলের মহাজনী তৎপরতা ও চক্রান্ত শুরু হয় ১৮৬৫-৬৬ সালের 'বাহাত্তরের মন্বন্তরের' পরই। ১৯০৬ সালে ভূমিচ্যুত সাঁওতালের সংখ্যা ছিল ক্রয়ের মাধ্যমে ১৩৭, আদালতের মাধ্যমে ২২, বন্ধকের মাধ্যমে ১৭৪, মোট ৩৩৩টি। ১৯০৬ সালের হিসাবে এ ধরনের ভূমিচ্যুতি যথাক্রমে ৫৪, ২৫, ২০১ ও মোট ৩৮০। ১৯০৯ সালে ২৫ শতাংশ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দাম দেওয়া হয়েছিল বিঘা প্রতি ১০ টাকা। সবচেয়ে বেশি ভূমিচ্যুতির ঘটনা ঘটেছিল উপজাতি অধ্যুষিত খাতড়া ও রাইপুরে। ম্যাকালপিনের সমীক্ষায় শ্যামসুন্দরপুরে সাঁওতাল মাঝির আওতাধীন গ্রামসংখ্যা ছিল ১৮৯২ সালে ১৪, যা ১৯৯০ সালে কমে দাঁড়ায় ১০; রাইপুরে ১৮৮৪ সালে এমন গ্রামের সংখ্যা ১৮৮৪ সালের ১৯ থেকে কমে ১৯০৪ সালে দাঁড়ায় মাত্র ২টিতে। থানাওয়ারী গ্রাম-সমীক্ষাতে তিনি খুব কম গ্রামে অক্ষত সাঁওতাল গোষ্ঠীকাঠামো খুঁজে পেয়েছিলেন। নিম্ন সারণী থেকে তা পরিষ্কার হবে।

থানা	মোট সাঁওতাল গ্রাম	সমীক্ষাকৃত গ্রাম	ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম (ভাঙা গোষ্ঠী)
ছাতনা-বাঁকুড়া	১৪৫	১৪৫	১৪৫
শালতোড়া-জি. ঘাটি	৯০	৯০	৮৭
ইন্দপুর	৫৬	৩২	২৪
খাতড়া	১২৫	৮৪	৬৪
রাইপুর	৪৭৫	২০২	১৭৬
সিমলাপাল	১১৯	৮৪	৫৫
ওন্দা	৪৮	২২	২২
তালডাংরা	১০০	৭১	৪২
মোট —	**১১৫৮**	**৭৩০**	**৬১৫**

অর্থাৎ সমীক্ষাকৃত গ্রামের প্রায় ৮৫ শতাংশ গ্রামেই সাঁওতাল গোষ্ঠীজীবনের অবসান ঘটেছে, মূলত অনুপজাতীয়দের আগ্রাসনের ফলে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অভিঘাতজাত ক্লান্ত পটভূমিতে (একদশকেই বাঁকুড়া বনপশু-অরণ্য আচ্ছাদিত পতিত ভূমিতে পরিণত) যে উপজাতিরা সুদূর হাজারিবাগ-সিংভূম চাও-চম্পাভূমি থেকে বাঁকুড়ায় এসে দিবারাত্র কায়িক শ্রমে অহল্যাভূমির ঘুম ভাঙিয়েছিল, বাহাত্তরের মন্বন্তরের পর তারাই বাসভূমি-কৃষিভূমি হারিয়ে অনেকেই নতুন সাঁওতালদেশ দামিন-ই-কোহ্‌তে ফিরে যায়। সম্পূর্ণ হয় ইতিহাসের একটি বৃত্ত। জমি চাষে বর্ণেতর মানুষের ভূমিকা ও মজুরি সম্পর্কিত তথ্যাদি পরের সরকারি সমীক্ষা আলোচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৭) **কৃষি বিপণন কেন্দ্র ঃ** গুপ্ত যুগে পোখন্না ছিল একটি উল্লেখযোগ্য কৃষি বিপণন কেন্দ্র। নদী ও সড়কপথে পোখন্নাকেন্দ্রিক বর্মা রাজত্বের ধান সহ অন্যান্য কৃষি ফসল জেলা বর্ধমান ও ডিহড় পরিমণ্ডলে বিক্রিত হওয়ার অনেক সূত্র মেলে। পোখন্না-ডিহড়ের কৃষি সমৃদ্ধি লোকগান ও প্রত্নদৃষ্টান্তেই প্রমাণিত। দুই পরিমণ্ডলেই বাণিজ্যিক ব্যাপ্তির প্রত্নচিহ্নও আবিষ্কৃত।

অষ্টাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী ব্যাপ্ত জৈন প্রভাবিত কৃষি-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির যুগে দ্বারকেশ্বর তীরে ওন্দা থানায় বীরসিংহপুর-রাজহাট বাণিজ্য কেন্দ্র জেলার কৃষি বিপণনের সহায়ক হয়েছিল। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রটিকে "important centre of tussar-ssilk" বলে অভিহিত করেছিলেন।[৭৫]

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বীরসিংহপুর কেন্দ্রের তুলনায় পরবর্তীকালে সামন্ত রাজাদের মদতে গড়ে ওঠা রাজগ্রাম বাণিজ্য কেন্দ্রটি জেলার কেন্দ্রীয় বিপণন কেন্দ্রের ভূমিকা নেয়। বর্ধমান, পশ্চিম-পূর্ব বাঁকুড়া, দক্ষিণ বাঁকুড়া, ঝাড়খণ্ড থেকে নিয়মিত কৃষি পণ্যের আদান প্রদান হত এই বাজারে।

ইংরেজ বণিকদের মুখ্য বাণিজ্যকেন্দ্র সোনামুখীর (কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের কার্যালয় ছিল এই সোনামুখী) উদ্ভবকাল সম্ভবত যোড়শ শতকের মধ্যভাগে। রেশম, তুলা, তুঁত, তসর, লাক্ষা, নীল, ইক্ষু সহ বিভিন্ন চাষে বিনিয়োগ ছিল কোম্পানীর। জেলাব্যাপী বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ভারকেন্দ্র ছিল সোনামুখী। তা বজায় ছিল কোম্পানী শাসনের অবসান পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে যে সব বিপণন কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠে তা হল —বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, কোতুলপুর, বড়জোড়া, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, শুশুনিয়া, উপরডিহি, ঝাঁটিপাহাড়ী, রামসাগর, ওন্দা, গামার, গামিদ্যা, অযোধ্যা, বেলিয়াতোড়, ইন্দাস, ইন্দপুর, খাতড়া, ফুলকুসমা, অম্বিকানগর, গঙ্গাজলঘাটি, মালিয়াড়া, সিমলাপাল, লক্ষ্মীসাগর, বোয়াইচণ্ডী প্রভৃতি। অর্থাৎ সারা জেলা জুড়েই বিপণনের জাল বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল।

পাশাপাশি ধর্মীয় মেলাগুলি এ ধরনের বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত।[৭৬] হান্টারের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঁকুড়া থেকে রপ্তানী (মূলত হুগলি, মেদিনীপুরের মতো সন্নিহিত জেলাগুলিতে ধান, তৈলবীজ, তাঁত, রেশম, রেশমগুটি প্রভৃতি) আমদানির (ইংলন্ডের জামাকাপড়, তামাক, মশলা, নারকেল, ডাল প্রভৃতি) চেয়ে বেশি হওয়ায় বাঁকুড়ার বণিক মহাজনদের হাতে সম্পদ সঞ্চিত হত।[৭৭] তাঁর মতে "The collection states that there is very reason to believe that the exports are much greater than the imports and that an accumulation of coin is going on. In consequence of the balance of trade being in favour of the district. --- mahajan or traders are said to have amassed considerable wealth." এই মহাজন-বণিকদের প্রভাব ও রায়তদের দুর্দশা অনুসন্ধানে ১৯২৬ সালে সরকার কর্তৃক একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটির পর্যবেক্ষণ মোতাবেক গ্রামীণ হাটগুলি বসত সাধারণত সপ্তাহে দু'দিন এবং হাটগুলি ছিল সাধারণত কৃষকদের হাঁটাপথের ৪-৫ কিমির মধ্যে। কৃষি বিপণনে ফড়িয়া-পাইকার, ব্যাপারী, আড়তদারদের ভূমিকা নিয়ে কমিটির মন্তব্য,[৭৮] "The middlemen play an important part in the business. Condition, however, vary in respect of different crops and in different localities. In the case of commercial crops, the number of middlemen is greatly larger than in the case of commercial crops. Ordinarily, these middlemen fall into three categories, viz (i) farias or paikars' men of small capital who collect the produce and sell it to (ii) beparis and (iii) aratdars who are established at the principal markets. These sell in turn either to markets who either dispose of the goods locally." এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় রায়তদের ধানঝাড়াই-মাড়াই পর্বেই রায়তদের মহাজনী ঋণ শোধ করতে হত। কিছু অংশ নিজ প্রয়োজন বা বিক্রির জন্যে রেখে, বাকি অংশ নিকটস্থ শহর-বাজারে বিক্রি করা হত। খুব অর্থের প্রয়োজন ছাড়া কৃষকরা সাধারণত খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করত না। সাধারণভাবে বিক্রয়ের মাধ্যম ছিল কৃষক-ফড়িয়া, ফড়িয়া-আড়তদার, আড়তদার-মহাজন/বণিক, যারা আবার বিক্রি করত মিল মালিকদের কাছে। ব্যাপারীরা ব্যবসা করত নিজ অর্থে বা মহাজন-বণিকের পুঁজিতে। এসময় বাঁকুড়ার ফড়িয়া-আড়তদারের লাভ ছিল ১-২ আনা প্রতি মণ, মিল-মালিকদদের লাভ ৬-৮ আনা প্রতি মণ। বাঁকুড়ার জেলাশাসক এস. জি. হার্ট (১৯২৮-৩০) সমবায় নিবন্ধককে বিভিন্ন শস্যের বপন, ফলনকাল, দাদন, বিপণন, সম্পর্কে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন পাঠান।[৭৯] তিনি লেখেন, 'জেলার মুখ্য ফসল হল ধান'। এই ধানের ফলন হয় কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে যা আউস নামে পরিচিত। জেলার শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে

ফলন অল্প। বেশিরভাগ প্রজাতির ধানই রোপণ করা হত দেরিতে। বেশিরভাগ ধানই হৈমন্তিক, ফলন পাওয়া যেত অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) বা পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) মাসে। উৎপাদিত ধান বাঁকুড়া-দামোদর রেলপথ ও বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে কলকাতার চেতলা, খড়্গাপুর, টাটানগরে পাঠানো হত। জেলার উত্তর পশ্চিমের ধান আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুরে বিক্রি হত বা সেখান থেকে হুগলি-ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে পাঠানো হত। কৃষকদের কাছ থেকে মিল বা আড়তে কৃষিপণ্য পৌঁছাত গরুর গাড়িতে। ভাড়া গাড়ি প্রতি ৪ আনা, বর্ষা ঋতুতে ৮ আনা। কলিকাতায় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মহাজনের কমিশন হল মণ প্রতি ২-৬ পাইস। হৈমন্তিক ধানের ক্ষেত্রে দাদন দেওয়া হত বৈশাখ (এপ্রিল-মে) থেকে ভাদ্রের (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মধ্যে, বীজ ধানের মাধ্যমে। পরিশোধ দিতে হত ২৫ শতাংশ বেশি, মাঘ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে। লাক্ষা ও রেশম চাষ নিয়ে জেলাশাসক হার্টের মন্তব্য 'খাতড়া, শালতোড়া, সোনামুখী সন্নিহিত অঞ্চলে লাক্ষা উৎপাদিত হত, খাতড়া, সোনামুখীতে কিছু ছোট কারখানা আছে। এর বেশিরভাগই কলকাতা ও কিছু অংশ মানভূমে বিক্রিত হয়। উৎপাদক, সংগ্রাহক, জাহাজীর (রপ্তানীর জন্য) মধ্যে অনেক মধ্যস্বত্বভোগী কাজ করে। দালালী ছিল মণ প্রতি ৫ টাকা। রেশম গুটির অপ্রতুলতার কারণে বিষ্ণুপুর-সোনামুখীর রেশম শিল্পীদের মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে গুটি আনাতে হয়। তসর গুটি আসে চাইবাসা, জামতোড়া, গিরিডি, দুমকা, ময়ূরভঞ্জ থেকে।

কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন :

বাঁকুড়ার কৃষি সম্পর্কে প্রাক ঔপনিবেশিক বিস্তৃত কোনো ভাষ্য নেই। কেবল গোপাল সিংহের (১৭১৩ খ্রিঃ - ১৭৫১ খ্রিঃ) সমকালীন দেওয়ান শুভঙ্করের আর্যা থেকে তৎকালীন কৃষিচিত্র সম্পর্কে আংশিক ধারণা মেলে। ঔপনিবেশিক কালপর্বে বিভিন্ন কৃষিসমীক্ষা ও ভূমিসমীক্ষা, তদন্ত-প্রতিবেদন বাঁকুড়ার কৃষি ও কৃষকের অবস্থান অনেকটাই স্পষ্ট করে উপস্থাপিত করেছে। নিম্নে শুভঙ্করী আর্যাসহ কৃষি ভাষ্যগুলি তুলে ধরা হল।

(ক) প্রাক-ঔপনিবেশিক কৃষিমানচিত্র ঃ শুভঙ্করী আর্যা

ব্রিটিশ শাসনে একাধিক প্রতিবেদনে কৃষি ও কৃষকের অবস্থান নিয়ে বিশ্লেষণ থাকলেও, প্রাক্-ঔপনিবেশিক লিখিত নথি এ বিষয়ে অপ্রতুল। চৈতন্য সিংহের আমলে কোম্পানী শাসনের সূচনার পর, কৃষি সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাষ্য মেলে। চৈতন্য পূর্ববর্তী

লিখিত কৃষি বিবরণ মেলে রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী শুভঙ্করের আর্যায়।[৮০] এই বিবরণ অনুসারে বাঁকুড়ার মূল ফসল ছিল ধান। অন্যান্য ফসল ছিল গম, মুগ-মটর-মুসুর-বিড়ি-খাসারি কলাই, সরিষা-তিল-তিসি তেলবীজ, কার্পাস, ইক্ষু, পান। আখের চাষ ছিল ব্যাপক। আখ থেকে রস, গুড় তৈরীকে বলে আখ-খুইটা (এর থেকেই রানিবাঁধে আখ-খুইটা মোড়ের নাম)। বিপণন ও বাজার সম্পর্কেও বিবৃতি আছে এই আর্যায়। বিষ্ণুপুরের ব্যক্তি পরিচালিত অর্জুনের হাটে চালের দাম ছিল কড়ায় পাঁচ সের, আটা তিন কড়ায় এক সের। বলদের পিঠে ছালা ভর্তি চাল-গম-কলাই-সরিষা-হরিতকি নিয়ে অন্তঃরাজ্য ও আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য চলত। উল্লেখ্য এই শুভঙ্কর কচ্ছপ-পৃষ্ঠের মতো অনুর্বর বিরলপ্রজ উচ্চভূমিকে (যেখানে খুব বৃষ্টি হলেই কেবলমাত্র চাষ হত) খাল খনন করে উর্বর করে তোলেন। আর্যায় 'কর্জ', 'সুদ', 'হার' শব্দগুলির ব্যবহার প্রাক-ঔপনিবেশিক মহাজনী ব্যবস্থার অস্তিত্ব জানান দেয়। মাসিক টাকা প্রতি সুদের হার ছিল অর্ধ পাই বা এক পাই বা দেড় পাই অর্ধ আনা বা তিন পাই। বন্ধকী কর্জের ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল কম। মাসে টাকায় এক আনা সুদের হার ছিল অতিরিক্ত, কারণ এটি দাঁড়াত বছরে বারো আনা (৭৫শতাংশ)। দিনপ্রতি সুদও নেওয়া হত। আর্যায় কেনাবেচার মুদ্রা ব্যবহারের উল্লেখ আছে। টাকা, আনা ইত্যাদি ছিল পাকা কড়ি। কাহন, পণ ইত্যাদি ছিল কাঁচা কড়ি। তবে রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে এ ধরনের লেনদেন ছিল উচ্চকোটির সমাজেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে লেনদেনে অংশ নিত। কৃষি জগতের কর্মি ছিল চাষী, ক্ষেতমজুর, আখ তৈরীর কারিগর, চোখবাঁধা বলদের সাহায্যে ঘানিতে তেল উৎপাদক কলু ও বিক্রেতা তিলি, পানোৎপাদক বারুই, ঘি উৎপাদক গোয়ালা, বস্ত্রোৎপাদক তন্তুবায়। রাজস্বকর্মিরা ছিলেন গোমস্তা-তহশীলদার (আদায়কারী), কানুনগো (জমি জরিপ ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার জন্য)। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় লিখিত নথি চালু ছিল। জঙ্গল পরিস্কার করে জমি পত্তন হলে, আমিন জমি পরিমাপ করে মালগুজারি, লাখেরাজ, খায়ের ইত্যাদি জমা আদায় সংক্রান্ত নথি প্রস্তুত করত। রাজস্ব ছিল চড়া। বিঘা প্রতি সার জমির রাজস্ব ছিল এক টাকা। অজন্মার বছরেও রাজস্বে ছাড় ছিল না। কোনোভাবে ফসলে ক্ষতি হলেও রাজস্ব ছাড় মিলত না। পাখিতে ফসলের ক্ষতি করত।

খ) ঔপনিবেশিক কালপর্বে কৃষি প্রতিবেদন :

১৬৬৭-৭৪ সালে মেজর জেমস রেনেল, ১৮৫০ সালে তারকনাথ ঘোষ, ১৮৫৪-৫৬ সালে জে. ই. গ্যাসট্রেল, ১৮৫৩-১৮৫৫ সাল ও ১৮৬২-৬৪ সালে এইচ. এম. রিডের থাকবস্তু সমীক্ষা, ১৮৮৮-৯৩ সালে রাজস্ব দপ্তরের ক্যাডাসট্যাল সমীক্ষা,

১৯০৯ সালের ও'ম্যালীর গেজেটিয়ার্স, ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হান্টারের 'এন্যালস অব রুরাল বেঙ্গল' ও স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস, ১৯০৯ সালের ম্যাকালপিন প্রতিবেদন, ১৯১৭-২৪ সালের রবার্টসনের ভূমি সমীক্ষা, ১৯৪৪-৪৫ সালের এইচ. এস. এম. ঈশাকের কৃষি সমীক্ষা থেকে কোম্পানী ও ব্রিটিশ শাসনে বাঁকুড়ার ভূমি রাজস্ব ও কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে একটি পূর্ণ চলচ্ছবি নির্মাণ করা যায়। বিভিন্ন প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ—

১) ১৬৬৭-৭৪ সালে মেজর জেমস রেনেলের সমীক্ষা : ১৭৬০ সালে বাঁকুড়ার রাজস্ব অধিকার প্রাপ্তির পর কোম্পানীর কাছে সবচেয়ে বেশি অসুবিধার জায়গা ছিল এলাকা সম্পর্কে অজ্ঞতা। ১৭৬৬-৬৭ সালে ফার্গুসনের বাঁকুড়া অভিযানের সময় এই সমস্যা প্রকটিত হয়। এই অজ্ঞতা নিরসনেই রেনেলের ভূমিসমীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৬৬৭-৭৪ খ্রিঃ সময়কালে।[৮১] তিনি ১ ইঞ্চি সমান ১০ মাইল স্কেলে মানচিত্র প্রস্তুত করে ১৭৭৯-৮১ সালে বিখ্যাত রেনেল মানচিত্রে তা প্রকাশ করেন ১ ইঞ্চি সমান ২০ মাইল স্কেলে। এই সমীক্ষায় তাঁর সহযোগীরা ছিলেন কার্টার, ডুগ্লস, কল, পোর্টসমাউথ, রিচার্ড, মার্টিন। এই মানচিত্র সম্পর্কে রবার্টসনের মন্তব্য ছিল, 'The maps are of little but sentimental and historical value; and the boundaries shown on them are not to be relied upon. The most correct work will be found along the paths and tracts shown on the maps as roads, and near the lines or communications." রেনেলের মানচিত্রে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থান এবং নদী, রাস্তা দক্ষিণের অগম্য জঙ্গল চিত্রায়িত আছে।

২) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বাবু তারকনাথ ঘোষের সমীক্ষা : তারকনাথের সমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঘাটোয়ালী প্রথার বিবর্তন ও অবসানের প্রেক্ষিতে।[৮২] ১৭৯৪ খ্রিঃ বোর্ডকে লেখা কালেকটর ডেভিসের একটি পত্র থেকে দেখা যায় মোকাবরী স্বত্বধারী ও ১২০০০ সিক্কা টাকা নির্দিষ্ট জমা প্রদানকারী ঘাটোয়ালদের, জমিদারের পরিবর্তে দারোগাদের অধীনে আনলে, রাজস্বাদায়ে প্রকৃত সমস্যার সূত্রপাত হয়। ঘাটোয়ালরা জমিদারদের রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। এর পেছনে জমিদারদের ইন্দনও ছিল। তাছাড়া জমিদাররা সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট ঘাটোয়ালী জমিতে অন্য রায়তদের অধিকতর রাজস্বে বা প্রিয়জনদের বিনা বা কম রাজস্বে প্রতিষ্ঠিত করাতে ঘাটোয়ালেরাও জমিদারদের উপর ক্ষুব্ধ ছিল। এনিয়ে দেওয়ানী আদালতে মামলা স্তুপীকৃত হতে থাকে। এই সমস্যা মেটাতে বিষ্ণুপুরের কমিশনার ব্লান্ট ঘাটোয়ালী জমিগুলি সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে সমপরিমাণ রাজস্ব রাজার দেয় থেকে বাদ দেবার প্রস্তাব চৈতন্য সিংহকে দেন। আরও ঠিক হয় কখনো ঘাটোয়ালী প্রথার অবসান ঘটলে রাজস্বসহ জমি রাজার

জমিদারিতে পুনরায় যুক্ত হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে অধিগৃহীত ঘাটগুলিকে বলা হয় সরকারি ঘাট। এর পেছনে ব্লান্টের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, জমিদারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গিয়ে ঘাটোয়ালদের কার্যকারিতা বাড়ানো ও তাদের ডাকাতি-দস্যুতার পথ থেকে সরিয়ে আনা। এই পদক্ষেপে বাঁকুড়ার ঘাটগুলি (১) সরকারি পঞ্চকি (২) বেপঞ্চকি (৩) বিষ্ণুপুর জমিদারির বাইরের অন্য জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে জমিদারি পঞ্চকি নামক তিনপ্রকার ঘাটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঘাটের হিসাবে সম্পর্কিত মাতোয়ারী নথি, ঘাটোয়াল নিয়োগকালীন জমি সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র (ইসমনবিশি) থেকে ব্লান্ট ১৮০২ সালের আগস্ট মাসের হিসাবে রাজার অধীন এমন ৪৩টি ঘাটের ২২৯৯ কর্মির ৩৫২৮২ বিঘার পঞ্চকি হিসাব করেছিলেন ৪৬৯০ টাকা ১২ পয়সা ৭ আনা। আগস্ট মাসে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশও জারি হয়। ১৮০২ সালে ব্লান্টের হিসাবে সরকারি পঞ্চকি জমি হল ৩৫৩২০ বিঘা, ১৮১৬ সালের মাতোয়ারী নথিতে তা দাঁড়ায় ৪১৬২০ বিঘা। এই সময়ে জমিদারি পঞ্চকি জমি ছিল ৪৭১০ বিঘা, যা ১৮৪৫ সালে দাঁড়ায় ২৪৮৬৩ বিঘা(১৮৪০ সালে এমন ঘাটের সংখ্যা ছিল ১৪৮৫ ও পঞ্চকি ৬৩২৩ টাকা) ১৮৪৫ সালে বেপঞ্চকি ঘাট ছিল ২২০০ বিঘা।

১৮৩৬ সালে জেলাশাসক ডব্লু. এইচ. এলিয়ট এই ঘাটগুলির হিসাবের গরমিল নিরসনে সচেষ্ট হন এবং ১৮৪৯ সালে রাজ্যের এল. আর. হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে স্তুপীকৃত দেওয়ানী মামলা ও ঘাট-এলাকার গরমিল নিরসনে পুনর্বার সচেষ্ট হন। তাঁর প্রচেষ্টায় বোর্ড অব রেভেন্যু ১৮৫০ সালের জুনে জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু তারকনাথ ঘোষকে এই সরকারি ঘাটগুলির পরিমাপের দায়িত্ব দেয় ('-to effect a detailed measurement of the Ghatwali lands now in the possesison of the ghatwals or included in the matwari paper.' ১৮৫০ সালে বাবু তারকনাথের সমীক্ষায় সরকারি পঞ্চকি ঘাটের একাংশের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫০০০ বিঘা। এই মাপের যথার্থতা নিয়ে ঘাটোয়ালদের প্রতিবাদের মুখে সমীক্ষা পরিত্যক্ত ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জেলা পরিক্রমাকালে সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন তারকনাথ। শিক্ষার ব্যাপ্তি নিয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল,[৮৩] 'Education is very little attended to, few indeed can do more than write their names even in the towns, in the villages education may be said to be entirely neglected. In the towns the children of traders people attend the Gooroo Muhasoy Pandits School until they understand common account. The pay of the School Masters is very poor and irregular.'স্বভাবতই এ সময় কৃষি সমাজ ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

উল্লেখ্য, তারকনাথের অসম্পূর্ণ সমীক্ষা ১৮৬২-৬৮ সালে থাকবস্ত (গ্যাসট্রেল, রিডের) সমীক্ষাকালে সম্পূর্ণ করা হলে বিষ্ণুপুর পরগণায় সরকারি পঞ্চকি জমি দাঁড়ায় ১৩৬৫৩৫ বিঘা।[৮৪] ৯১৭ বিঘা বেপঞ্চকি, ১৩০৩৫৮ বিঘা জমিদারি পঞ্চকি। ১৮৭৭-৭৮ সালে জেলায় অপরাধিত্বের বৃদ্ধি ঘটলে ডি. আই. জি বার্কার ঘাটোয়ালী প্রথার অকার্যকারিতার কথা তুলে ধরে ক্রমান্বয়ে এর বিলোপ সাধনের পক্ষে মত দেন। সরকার এই যুক্তি মেনে নিয়ে ১৮৭৫ সালের পঞ্চম আইন মোতাবেক ভূমিসমীক্ষার নির্দেশ দেয়। ১৮৮০ সালে ১লা জুলাই ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণদয়াল সিংহ ভূমিসমীক্ষার কাজ শুরু করে ৩১শে আগস্টের মধ্যে গঙ্গাজলঘাটির ২৭০টি গ্রাম ও ওন্দা থানার ১৫৯টি গ্রামের ঘাটোয়ালী জমির সীমা নির্দিষ্ট করে ফেলেন। কিন্তু অত্যধিক মামলার চাপে এর পরই সরকারি নির্দেশে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য এই সমীক্ষার ভিত্তি ছিল ১৮৫১ সালে প্রকাশিত তারকনাথের ছিটম্যাপ ও থাকবস্ত সমীক্ষা। কৃষ্ণদয়ালের অসম্পূর্ণ সমীক্ষা পরবর্তী বছর আবার শুরু করেন এইচ. এইচ. রিসলে ও ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. সি. রাই। তাঁরা জঙ্গলমহলের ছাতনা, রাইপুর, খাতড়া, সিমলাপালের ৫২১৭০০ বিঘা ঘাটের জমির সমীক্ষা শেষ করেন ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ সালে। এর মধ্যে ১৬৯০০০ বিঘা জমি সরকারি পঞ্চকি, ৩৫০০০০ বিঘা জমিদারি পঞ্চকি, ২৭০০ বিঘা বেপঞ্চকি। বিষ্ণুপুরের ও রাইপুরের দুই ইজারাদার ওয়াটসন এণ্ড কোং ও গিসবর্ণ এণ্ড কোং এই সমীক্ষালব্ধ পঞ্চকি জমি ৫২১৭০০ বিঘা, ১৮০২ সালের ৬৩৮৩৪ বিঘার তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত ও 'জোরদখলের কারণে' বলে অভিযোগ করে। তবে বিভাগীয় কমিশনার রমেশচন্দ্র দত্ত ঘাটোয়ালদের দ্রুত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে সেই জমির নতুন রাজস্ব নির্ধারণ-এর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ সালে ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট জ্ঞানশঙ্কর সেনের নেতৃত্বে ঘাট অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়। ৪৩টি সরকারি পঞ্চকি ঘাটের ৪৬৭৭৩.৯ একরে রাজস্ব নির্ধারিত হয় ১৭৫৪২ টাঃ ১০ পঃ, যা পূর্বেকার ঘাটোয়ালী পঞ্চকির তুলনায় ১২৫৩৯ টাঃ ৩ পঃ বেশি। এছাড়া আরো ১৭৪টি বেপঞ্চকি ও জমিদারি পঞ্চকি ৭৭৭৪৬.৯ একর জমির রাজস্ব নির্ধারিত হয় ১৯৭৭৯ টাকা ১১ আনা ২ পয়সা। বর্ধমানরাজের ঘাটোয়াল সম্পর্কিত আপত্তির জন্যে তাদের মোকাবরী স্বত্ব দেওয়া হয়। মহিষাড়া, পাঞ্চেত, খাতড়া, রাইপুর, গঙ্গাজলঘাটির ঘাটোয়াল-জমিদার রাজস্ব পরিমাণ সম্পর্কিত বিবাদ ১৯১৭-২৪ সালের সমীক্ষায় মীমাংসার জন্য রাখা হয়। এই সমীক্ষায় ৯টি বন্দোবস্ত অরাজি ঘাট ও ৮টি রাজস্ব বিবাদের বিষয় (কালেকটরের কাছে প্রেরিত) ছাড়া সব অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়। ঘাটোয়ালদের দেওয়া হয় পাট্টা, কবুলিয়তের বিনিময়ে।

তারকনাথের সমীক্ষায় জমি মাপের ব্যবহৃত এককগুলি হল নিম্নরূপ :

১২ ছটাক = ১ কানি, ৪ কানি = ১ আনা = ৩ কাঠা,
৫০ আনা = ১ আড়ি = ৭.৫ বিঘা, ৪ আড়ি = ১ দ্রুণ = ৩০ বিঘা,
২০ গণ্ডা = ১ ছটাক = ৫ বর্গগ , ১৬ ছটাক = ১ কাঠা = ৮০ বর্গগজ,
২০ কাঠা = ১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ। অন্যান্য ব্যবহৃত এককগুলি হল—
১৬ গণ্ডা = ১ বেসানেস = ৪ বর্গগজ, ২০ বিসানসে = ১ বিশ্ব = ৮০ বর্গগজ
২০ বিশ্ব = ১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ।

৩) গ্যাসট্রেলের ভূমি-সমীক্ষা : গ্যাসট্রেলের ১৮৫৪-৫৬ সালের সমীক্ষা প্রতিবেদনে কৃষি ফসলের ধরণ ও সময়কাল, ভূমির অনুর্বরতার কারণ, মহাজনী শোষণ, ওজনের কারচুপি, সাঁওতালদের সমীক্ষায় সক্রিয় সহযোগিতার কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত ভাষ্য আছে। তিনি জানান সুনা শ্রেণির জমিতে সব ধরনের ফসল হত। শালি শ্রেণির জমিতে সাধারণত ফলত মোটা চালের ধান। ধানি জমি প্রস্তুত করতে চারবার লাঙল দেওয়া হত। প্রথম লাঙল দেওয়া হত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে, বাকি তিনটি দেওয়া হত জুলাই-আগস্ট মাসে। জমির উর্বরতা বাড়াতে পুকুরের পাঁক মেশান হত। উঁচু জমিতে ছাই ও মেশান হত। জমিগুলিতে আইল দিয়ে জল দেওয়া হত, যাতে আগের বছরের খড়ের (শুকনো ধান গাছ) মূল পচে জমিতে মিশে উর্বরতা বাড়ায়। জমির একাংশে বীজ ছড়িয়ে চারা তৈরী করা হয়। হাল-মই সহযোগে জমি সমান করে, আগাছা পরিস্কার করে ২ মাস পর নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর চারা রোপন করা হত (রোয়া)। প্রয়োজন মতো আগাছা পরিস্কার করা হত (নিড়ানি)। চারা বড় হলে বাঁশ দিয়ে একদিকে হেলিয়ে দেওয়া হত (বাতাসের প্রবাহের দিকে)। ধান কাটা হত ডিসেম্বরে, আঁটি বেঁধে শস্য সমেত গাছ কেটে ঝাড়াই খামারে রাখা হত যা পশুদের দিয়ে মাড়াই করা হত বা সমান জায়গায় ঝাড়াই করা হত। তিনি কুয়ো ও পুকুর থেকে সেচের কথা বলেছেন। সুনা জমিতে ভাল প্রজাতির ধান, ইক্ষু, নীল, তামাক, ওষধি, সবজি, তেলবীজের চাষ হত। এই ধরনের জমিতে শস্য আবর্তনের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন মার্চ-এপ্রিলে জমি প্রস্তুত করে ফেলা হত। কোনো কোনো জমিতে ডালের চাষও হত। ইক্ষু উৎপাটনের সময় ফেব্রুয়ারি-মার্চ। এরপর তিলচাষ করে তার ফসল তোলা হত মে-জুনে। এরপর আউস ধান রোপণ করা হত জুন-জুলাইয়ে। ধান কাটা হত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। এরপর দুইবার লাঙল মই দিয়ে সরিষা-মটরের চাষ করা হত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে এই ফসল ওঠার পর আবার ইক্ষু চাষের জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করা হত।

জমির ক্রমবর্ধমান অনুর্বরতা বিশ্লেষণে জে. এরস্কিনের মন্তব্য ছিল[৮৫] "There can be no doubt that the unrestricted clearing of the jungles-- had great influence in decreasing the annual amount of rain and impoverishing the country---- Whereever the land was fit for cultivation it was ploughed up, the successive rains have washed away the soil of the uplands, and have left only a bed of kunkury earth (rock) on which nothing will grow. It is only the valleys, where there is paddy cultivation, that there is any good soil to be found," তিনি নিজে জঙ্গল সাফাই করে কৃষিক্ষেত স্থাপনের কারণে বৃষ্টি হ্রাস নিয়ে লিখেছেন, "How much of this may be attributed to the clearance of the jungle tracts in the western districts it would be difficult to say. But that in a great measure caused by it there can be no reasonable doubt. In all the countries the denudation of the land of forests and jungle has been marked by decrease of, and uncertainty in the rainfall."

তাঁর প্রতিবেদনে মহাজনী শোষণে রায়তদের দুর্বিষহ অবস্থার কথা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। রায়তদের কাছে নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে শস্য বপণের মতো বীজও অবশিষ্ট না থাকাতে মহাজনদের উচ্চ হারের সুদের আশ্রয় নিতে হত। শুরু হত শোষণের এক অধ্যায়। মহাজনী কৌশলে রায়ত কোনোদিনই ঋণ পরিশোধে সমর্থ হত না। অবশেষে মহাজনদের কাছে জমি-সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হলেই এই কাহিনি সমাপ্ত হত। তাঁর বিবরণে দেখি[৮৬], "Few of the cultivators can afford to save up seed from their crops-- Recourse is therefore had to the Mahajun, who never lends at a lower rate of interest than 24% per annum, and there only on mortgage of Land and property. The Mahajuns on lending money usually takes a bond for much larger amount to that he actually pays down,--- Sometimes the Rayot borrows in kind, and this is a favourite mode when Mahajun or Jamindars are lending to very poor men. In such cases the agreement generally entered into by the Rayot is to repay in at the ensuing harvest, with form 50 to 100 or more percent increased in the quantity borrowed--- and the poor man finds himself unable to pay up principal and interest, he pays all he can and the Mahajun hikes the balance. He then if he can enter into on a new loan including the balance of the former one, and so he goes on until body and soul he is bound to the inexorable money lender." সাঁওতাল ও নিম্নবর্গীয় মানুষদের আর্থিকভাবে দুর্বল করার জন্য

মহাজনরা এদের পাড়ার কাছে মদের দোকান খুলে তাদের নেশাগ্রস্ত করে রাখত। গোলদারি দোকান ছিল শোষণের আর এক কেন্দ্র। ওজনের কারচুপি নিয়ে গ্যাসট্রেল একাধিক মাপক যন্ত্রের অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন। ব্যাপারিরা সুবিধামতো পরিমাপক ব্যবহার করে কৃষকদের ঠকাতো। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "In the Bishnupur and many other princiapl bazars the standard seer of 80 rupees weight is chiefly used. But in the western village a seer of 98 rupees is still in use at most of the huts. At the same time a smaller seer of form 60 to 65 rupees is also used. The chief object in having these different weighted seer is apparently that, by using them, the Bunyas, who bartering at the hauts with the peasants, are able to take advantage of their ignorance and gain by the exchange more they could do with one weight in use."

এই জমিচ্যুত করার চক্রান্ত থেকে বাঁচতে সাঁওতালদের মতো নিম্নবর্গীয় মানুষদের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল সমীক্ষা চলাকালে তাদের জমির সমীক্ষা-পরিমাপ ও অধিকারসূচক চিহ্ন প্রাপ্তিতে সমীক্ষাদলের কাছে পীড়াপীড়িতে। গ্যাসট্রেল লিখেছেন, "The exception were the Ghatwalls and santhals, who are not only anxious that the native surveyors should survey their village boundaries, but begged them to survey and lay down their small internal holdings also, putting up marks for their purpose most carefully; these generally were exactly the same as the village boundaries."

গ্যাসট্রেল বাঁকুড়া সমীক্ষায় কৃষক প্রতি গড় কৃষিযোগ্য জমি নির্ধারণ করেছিলেন ১.৬৬ একর, পতিত জমি ১.২০ একর। তিনি দুই ধরণের রায়তের কথা বলেছেন (১) **মোকরারিদার :** রাজার কাছে নির্দিষ্ট রাজস্বহারে প্রাপ্ত জমি, (২) **মৌরসি জোত :** নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের শর্তে স্থায়ী লিজধারী। সমীক্ষাকৃত মহল পরগণাগুলির জমা নির্ধারিত হয়েছিল নিম্নহারে :

পরগণা/মহল তালুক / কিসমত	**আয়তন (একর)**	**সদর জমা (টাকা/আনা/পয়সা)**
পরগণা বিষ্ণুপুর	২০৬৪৭১.৫	১৮০৪৩২-১৪-৯ ৩/৪
পরগণা বারোহাজারী	১৩১৯৫৩.৫	১৯৬০১২-০৯-০
পরগণা করিসুণ্ডা	১৩১২৯.০	২৩৪৬৬-০৬-২
তরফ জঙ্গলমহল	১২২৩৫৪.৫	৩৫০২-০৭-১
তালুক কেশিয়াকোল	৮৫৪২.৫	৮২৮৪-০৭-৯

পরগণা/মহল তালুক / কিসমত	আয়তন (একর)	সদর জমা (টাকা/আনা/পয়সা)
তালুক পাচুয়া	৮৯৩.০	৪০৮-০০-৯
তালুক জামতোড়া	৯৫৭৫.৫	৬৩৪১-১৫-২
পরগণা মালিয়াড়া	৩২০৪৩.৫	৫২৭৬-০৪-৯
পরগণা সাহারজোড়া	১৬৬২৩.০	৩১১০-০০-৫
কিসমত সাহারজোড়া	৪৬৬৫.০	১১৬-১০-৩

৪) **রবার্টসনের ভূমিসমীক্ষা :** গ্যাসট্রেলের ভূমিসমীক্ষার পর বাঁকুড়ায় বিস্তৃত সমীক্ষা হয়েছিল প্রায় ছয় দশক পরে রবার্টসনের নেতৃত্বে। ১৯১৭-২৪ খ্রিঃ ভূমি সমীক্ষার সময় রবার্টসন বেশ কিছু ধরনের ভূমি স্বত্বের সন্ধান পান।[৮৭] যেমন—(১) খরপোশ ও বাবুয়ান স্বত্ব ঃ ১৮০০ সালের ৮ নং রেগুলেশন অনুসারে জমিদারি জ্যেষ্ঠ বংশধরের কাছে হস্তান্তরিত হলে দ্বিতীয় পুত্র (হিকিম), তৃতীয় পুত্র (বড় ঠাকুর) ও অন্যান্য পুত্ররা (বাবু) কিছু জমি রাখার অধিকারী ছিলেন। এই জমিগুলি হিকিম, ঠাকুরান, বাবুয়ান/খরপোশ নামে পরিচিত হত। প্রথমদিকে এই জমি হস্তান্তরযোগ্য ও বংশধর না থাকলে মুল জমিদারিতে সংযুক্ত হত। পরবর্তীকালে এই দুই শর্ত শিথিল হয়। খাতড়া, সাহারজোড়া মহলে এইসব স্বত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে।

(২) **পাটনি স্বত্ব :** দশসালা বন্দোবস্তোত্তর বিষ্ণুপুর দশটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং চারটি বড় অংশ বর্ধমানরাজ কিনে পত্তনি প্রথা চালু করেন। এই অংশগুলিতে ছাড়াও পাঞ্চেতরাজের মহিষাড়া (শালতোড়া, মেজিয়া) পরগণায় এই প্রথা চালু হয়েছিল। পত্তনিদারদের আদায়ের ভালো অংশ জমিদারকে দিতে হত। এদের অধিকাংশই ছিল অনাবাসী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বর্ধমানরাজের ২৮৮টি পাটনি তালুকের ৫৪টি হাতবদল ঘটে গিয়েছিল। শতাংশের হিসাব প্রায় ২০ শতাংশ।

(৩) **সিকমি স্বত্ব :** বেআইনী লাখেরাজ সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সময় বিক্ষিপ্ত নিষ্কর দাবি করে অনেক জোতের সন্ধান পাওয়া যায়, যার না ছিল কোন বৈধ কাগজ, না কোন রাজস্ব জমা। এইসব জোতের থেকে (সিকমি জোত নামে পরিচিত) পার্শ্ববর্তী অধিগৃহীত লাখেরাজি জমির আদায়কারীকে রাজস্ব আদায় করতে বলা হয় ৫০ শতাংশ হারে (লাখেরাজি জমির হারের)। এর ১০ শতাংশ আদায়কারী পেত আদায়ের মূল্য হিসাবে। এই স্বত্ব ছিল স্থায়ী, হস্তান্তরযোগ্য এবং চিরকালীন নির্দিষ্ট হারে।

(৪) **লাঙল চাষ স্বত্ব :** রাইপুর ও সিমলাপালের উচ্চভূমিতে মূলত সাঁওতালরা যে বছর যে পরিমাণ জমি চাষ করত সেই পরিমাণ জমিতে সেই বছর সে পরিমাণ

কর নির্ধারিত হত। তালাডাংরার দক্ষিণ-পূর্বে আবার সাঁওতাল-কৃষকের লাঙলের সংখ্যার উপর এই রাজস্ব নির্দিষ্ট হত এবং তারা সাধ্যমতো জমিতে চাষ করতে পারত। লাঙল প্রতি রাজস্ব ছিল ৮ আনা থেকে ১ টাকা। এ ধরনের জমির উর্বরতা ছিল নগণ্য। প্রথম বছর এ জমিতে গাঁজা ও পরের বছর কুড্রুর চাষ হত। একবার চাষের পর ৩-৪ বছর জমি পতিত রাখা হত। বড়জোড়ার বিলে ধান চাষের ক্ষেত্রে একই শর্তে (উঠবন্দি) রাজস্ব নির্ধারিত হত।

(৫) জলশাসন স্বত্ব : ইন্দপুর, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়ার পতিত উচ্চভূমিতে নিজ খরচে জলাশয় খননের ও সেচদানের শর্তে, সনদের মাধ্যমে এ ধরনের স্বত্ব প্রদান করা হত চার ভাবে। (ক) নিজ খরচে জলাশয় খনন করে নিষ্কর নিজ জমি ও সন্নিহিত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা। (খ) প্রথম তিন বছর নিষ্কর, ৪র্থ বছরে স্থানীয় হারের চেয়ে ২-৪ আনা হারে ছাড় সমেত রাজস্ব (গ) মোট জমির একাংশ নিজ দখলে রেখে বাকি অংশ তৃতীয় ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলে টাকায় ৪ আনা হারে কর ছাড়। (ঘ) মোট জমির একাংশ নিজ দখলে রেখে বাকি অংশ তৃতীয় ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলে টাকায় ২-৪ আনা হারে কর ছাড় বা এই হারে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে আদায়ের অধিকার।

(৬) রায়তি স্বত্ব : মোকরারি (নির্দিষ্ট হারে), দখলি (নগদে বা শস্যে রাজস্ব), বেদখলি শর্তে (নগদে বা শস্যে রাজস্ব) রায়তি স্বত্ব দেওয়া হত।

(৭) নিষ্কর স্বত্ব (দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, বৈষ্ণবোত্তর, পীরোত্তর) : দেবতা ও দেব মন্দিরের সেবায় প্রয়োজনীয় অর্থ আসত এ ধরনের জোত থেকে। মল্ল সময়ে ধর্মীয় কারণে বা ক্ষত্রিয়ত্ব জাহির করতে ৯০ শতাংশ বেশি ব্রাহ্মণকে বসানো হয়েছিল নিষ্কর বা অল্প রাজস্বের জমিতে। জঙ্গলমহলে ব্রহ্মোত্তর বা মহাত্রাণ ভূমিদানে অল্প রাজস্বের পেছনে যুক্তি ছিল অব্রাহ্মণদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদের দান নেওয়ার অপারগতা বা দুর্গম রাজাবাসে বছরে একদিন অন্তত রাজস্ব প্রদানের কারণে ব্রাহ্মণ পদধূলি নিশ্চিত করা। রাজস্বের পরিমাণ হত প্রথা মোতাবেক। সরকারি খতিয়ানে এদের মোকরারি রায়ত হিসাবে দেখানো হত। সনদ ও ছাড় (অনুমোদন সনদ) এ লেখা হত, 'নির্দিষ্ট পঞ্চক আদায় পূর্বক পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে হক হক দরবস্ত মৌজা অথবা মাপ ভোগ দখল করিতে থাকহ'। হাম্বিরের সময় এই দান শুরু হলেও (শ্রীনিবাস, নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদেরকে), তা প্রবল হয়ে ওঠে চৈতন্য সিংহের আমলে। ছাতনা রাজও এমন ভূমিদান করেছেন।

(৮) সেবা বিনিময় স্বত্ব : বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে মল্লরাজত্বে এমন নিষ্কর বা পঞ্চকি জমি ছড়িয়ে ছিল পরগণা জুড়ে যা আরজি মহল নামে পরিচিত। দশসালা

বন্দোবস্তের সময় এমন জমি দাঁড়ায় ১৫০০০০ বিঘা। ১৭৮৯ সালে কিটিং-এর প্রতিনিধি হেসেলরিজ এমন ২১৭৬৩ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করেন। কিটিং প্রেরিত সেজোয়াল জীবনলাল এমন অনেক জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন। বাকি জমি অধিগৃহীত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়। বিষ্ণুপুর জমিদারির এমন বিভিন্ন সেবাজোতের বিবরণ ও পরিমাণ নিম্নরূপ। (ক) মহালবেরা ঃ রাজার খাসমহলের পাহারাদার। জমি প্রদত্ত হয়েছিল ৪১৭২৩ বিঘা। (খ) সেনাপতি মহল ঃ মুখ্য সেনা ও পুলিশের খোরাকির জন্য জন প্রতি ২৮ বিঘা হিসাবে মোট জমি ১৪১১৮ বিঘা। ২৮ বিঘার পঞ্চকি ছিল ৪ টাকা রাজস্বে। (গ) শাগিসদাপাশা মহল ঃ রাজার গৃহ ভৃত্যদের দেখভালের জন্য ১৩০৭৯ বিঘা জমি বরাদ্দ ছিল। (ঘ) বক্সিমহল ঃ ঘাটোয়াল, পাইক, দারোগাদের দেওয়া হয়েছিল ৫৬৮১৭ বিঘা জমি। (ঙ) ছড়িদারি মহল ঃ রাজার বাহক, পিয়নদের জন্য বরাদ্দ জমি ছিল ৩১২২ বিঘা। (চ) সিসেনরা মহল ঃ ৫১২ বিঘা জমি দেওয়া হয়েছিল বরকন্দাজদের। (ছ) কাহারন মহল ঃ রাজমহলের পাল্কি বাহকদের জন্য ছিল ১২৪৪ বিঘা জমি। (জ) খাটালি মহল ঃ১০১২ বিঘা জমি দেওয়া হয়েছিল কুলি-মজুরদের। (ঝ) বেতালবি মহল ঃ অন্যান্য সেবামূলক ও ধর্মীয় কাজে।

বাইস গ্রামের জোতমালিকরা ছিল কামানের চালক। ডাক পেলেই কামানসহ দরবারে হাজির হত। পরে এই জোতগুলি (তোপখানামহল) ছত্রীদের অধীন ঘাটে পরিণত হয়।

(৯) মণ্ডলী স্বত্ব : ছাতনা, সুপুর, অম্বিকানগর, রাইপুর, ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর, ভেলাইডিহা, শ্যামসুন্দরপুর পরগণা, যা জঙ্গলমহলের অংশ, তা বাস্তবিকই ছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ (রাইপুর ও ছাতনার কিছু অংশ বাদে)। এই জঙ্গলমহলে জঙ্গল সাফ করে জমি পত্তন করেছিল মূলত সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতিরা, যাদের মণ্ডল বা মুখিয়া সমষ্টিগতভাবে রাজস্ব জমা দিত রাজার কাছে। সমগ্র জোতটি ১২-১৬ রেখতে (এক রেখ সমান একদিনে একটি লাঙলের কর্ষিত জমি) বিভক্ত করে সমাজে বন্টিত করা হত। মণ্ডল রায়ত এক বা একাধিক রেখ নিষ্কর ও কম করের জমি দখলে রাখত (খেম জমি)। জঙ্গলমহলে শ্রীপতি মহাপাত্রের তালুক পত্তনের সময় থেকেই বহু ওড়িয়া বণিকদের আগমন ঘটে। এই বণিকরা ক্রমে মহাজনী ভূমিকা ও ভূম্যধিকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মণ্ডলী প্রথায় মণ্ডল ছিলেন মূলত সহ-রায়ত যা ওড়িয়া-বাঙালি মহাজনদের অধিকারে এসে কার্যত জমিদারিতে পর্যবসিত হয়। গোষ্ঠী সদস্যরা পরিণত হয় মোকরারি রায়তে, এমনকি খেম জমিও মহাজনের হাতে আসে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ম্যাকালপিনের সমীক্ষায় এই বিষয়টি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

উল্লেখ্য, অন্যত্র মণ্ডলীপ্রথা ভেঙে পড়লেও এবং রায়তরা দুর্দশায় নিমজ্জিত হলেও,

দীর্ঘকাল জঙ্গলমহলের আটটি পরগণার রাজকীয় ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮০০ খ্রিঃ ১০ নং রেগুলেশনে বংশানুক্রমিক জমিদারি হস্তান্তরের রক্ষাকবচ থাকার ফলে (ব্যতিক্রম কেবল ১৮৭৮ সালে নয় আনা অংশ নিয়ে সুপুর-খাতড়া সৃষ্টি ও রাজ-ঋণ অনাদায়ে ডিক্রি জারি) এবং ১৮৩৩ সালের ১২ নং রেগুলেশনের রক্ষাকবচের জন্য এই অংশে রাজস্ব-বন্দোবস্ত, অধিগ্রহণের বিষয়গুলি স্থগিত থাকে। ১৮৭৯ সালে এই অংশটি বাঁকুড়া জেলায় অঙ্গীভূত হলে জেলার অন্য অংশের মতো এখানেও রাজস্ব সংস্কার শুরু হয়। এই অংশের জটিলতা মুক্ত কৃষি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে রবার্টসনের মন্তব্য ছিল, 'In the Jungle Mahal then, as befits a jungle area inhabited mainly by aboriginals, the system of land tenure is extremely simple. A single proprietor holds the lands of his estate in one compact block and has under him tenure holders... under-tenue-holders between them and the tenants, but it is more common to find the tenure-holders under the proprietors collecting their rents direct.' এর কারণ ছিল জন অল্পতা ও অরণ্যপ্রাচুর্য।

১০) অধীনস্ত-প্রজা স্বত্ব : সাধারণভাবে যে নগদে বা নির্দিষ্ট শস্যে রাজস্ব দেয়, জমিতে তার স্থায়ী স্বত্ব আছে বলে মানা হত, আর যারা উৎপন্ন ফসলের অংশ রাজস্ব হিসাবে দিত তাদের উঠবন্দি বা ইচ্ছাধীন প্রজা বলা হত। জঙ্গল পরিষ্কার করে সৃষ্ট জোতের ক্ষেত্রে এমন স্বত্ব দেখা যেত, যদিও এইসব জমিতে দর-মোকরারি স্বত্ব ছিল চিরস্থায়ী নির্দিষ্ট জমায়, হস্তান্তরযোগ্য। ভূমি সমীক্ষায় এই জোতগুলিতে মন্তব্যের ঘরে 'দখলি স্বত্ব' লেখা হয়।

১১) ঘাটোয়ালী স্বত্ব : আলাদাভাবে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।[৮৮] ১৯০৫ সালের মধ্যে অধিকাংশ বন্দোবস্ত পরবর্তী ঘাটোয়ালের জমি মহাজনদের হাতে চলে যায়, কারণ পঞ্চকি দিতে অভ্যস্ত ঘাটোয়ালেরা নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি।

১২) ভিট বেগার জোত : এই জোতের বিনিময়ে দাতার কাছে গ্রহীতাকে বেগার শ্রম দিতে হত। এ ধরনের জমি হত সাধারণত থাকার ভিটে। উপজাতি ও অর্ধ উপজাতিরাই এই বন্দোবস্ত নিত। ব্যাপ্তি ছিল সারা জেলাতেই।

১৩) চাকরাণ জমি . জমিদার বা পাড়া-সম্প্রদায়কে সেবা দেওয়ার বিনিময়ে নাপিত, ধোবা প্রভৃতি বৃত্তির মানুষদের ছোট ছোট নিষ্কর জমি দেওয়া হত।

১৪) সাজা রায়তি স্বত্ব (শস্য) : এই ধরনের প্রথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল রায়তকে রাজস্ব হিসাবে দিতে হতে প্রত্যেক বছর, এমনকি ফসল না ফললেও। মহাজনরা নানাভাবে (প্রতারণা, কৌশল দ্বারা) জমি হাতিয়ে নেওয়ার পর সে জমিতে সাজা

শর্তে পূর্বতন রায়তকে জমি চাষ করতে দিত। রাজস্ব হত পূর্বের বহুগুণ।

১৫) ভাগ রায়তি স্বত্ব : রায়তকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক রাজস্ব (কখনও নয় ষোড়শাংশ) হিসাবে দিতে হত। ফসল না হলে ভাগ দেওয়ার দায়ও থাকত না।

১৬) কিষাণি প্রথা : জোতদার কৃষককে শ্রমের মূল্য হিসাবে ১/৩ অংশ ফসল দিত। লাঙল, বীজ, বলদ ছিল মালিকের। খতিয়ানে এদের নাম নথিভুক্ত করা হয়নি।

১৭) মিশ্র নগদ-শস্য প্রথা : পশ্চিম, মধ্য বাঁকুড়ায় উপজাতি-আধা উপজাতিদের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল। সাধারণত নগদ রাজস্বের জমি থেকে রাজস্ব অনাদায়ে রায়ত উচ্ছেদ করে, নগদের সাথে অতিরিক্ত শস্যের দাবি যোগ করে, একই রায়তকে প্রতিষ্ঠা করতে এই প্রথার সৃষ্টি হয়।

১৮) নিস্পি বা একদফা জমা : স্থায়ী, হস্তান্তরযোগ্য, নির্দিষ্ট রাজস্বের পঞ্চকি স্বত্বের মতো। মধ্য বাঁকুড়ার কিছু জমিতে বৈধ কাগজ ছাড়া নিষ্কর জমিতে অর্ধেক রাজস্ব দেওয়ার শর্তে এই স্বত্বের সৃষ্টি হয়।

১৯) ন্যুনখালাসী স্বত্ব : ১৮৪১ সালের জানুয়ারি মাসের সরকারি নির্দেশ মোতাবেক, তাইদাদে (রায়তী দাখিল জমি পরিমাণ সংক্রান্ত দরখাস্ত) কোনো গ্রামের লাখেরাজি জমি ৫০ বিঘার কম হলে, তা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। এই ৫০ বিঘার (ন্যুন) কম জমি ছাড় (খালাস) কে ন্যুনখালাস বলা হত (সূত্র ঃ রবার্টসন সমীক্ষা, পৃঃ ৪১)।

এছাড়া বড়জোড়ার সারালি জোতে মুসামা জমা নামে বিশেষ আবওয়াব চালু ছিল, মারাঠা আক্রমণ থেকে বাঁচতে পালিত রক্ষীবাহিনীর খরচা বাবদ। অকৃষি উচ্চভূমি, ভিটা নিষ্কর হলেও, রাজাকে দিতে হত বিভিন্ন উপহার, যেমন ডিঙলি, ডাঁটা, ঘি, গরুরগাড়ি বোঝাই গোবর সার, লাউ, গুড়, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কিন্তু অনির্দিষ্ট প্রস্থের কাপড়, ফল, সবজি যেগুলি পরবর্তীকালে জবরদস্তি আদায়ে (আবওয়াবে) পরিণত হয়। রানিবাঁধে ইক্ষু চাষের জমিতে এক ধরনের অদ্ভুত রাজস্ব/স্বত্বের সন্ধান মিলেছে যেখানে কৃষক, মালিক এক বছর করে যথাক্রমে ইক্ষু ও রবিচাষ করত, কিন্তু কৃষককেই রাজস্ব মেটাতে হত প্রত্যেক বছর।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন মোতাবেক বাঁকুড়ায় রবার্টসনের সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭-২৪ সালে।[৮৮ক] সমীক্ষায় রায়তদের চারটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়।

(১) নিষ্কর জোত-মালিক : ৮৬৩৮২টি এমন জোতদারের অধীনে ছিল ৭৮৯৬৩ একর জমি। এগুলি মূলত ব্রহ্মোত্তর জমি। তারা ভাড়া করা মুনিষ-মাহিন্দার বা অর্ধেক ফসল ভাগের শর্তে কৃষকদের দ্বারা চাষ করত। ব্রাহ্মণরা ধর্ম মেনে হলকর্ষণ করত না। কেউ করলে তাকে চাষা-বামুন বলা হত। বিষ্ণুপুর মহকুমাতেই এমন নিষ্কর জমি

ছিল ৫১৯৯৩ একর। রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণকে জমি দানের মর্ম যদিও ছিল নিজ তত্ত্বাবধানে কৃষিকাজ, সমীক্ষায় তাদের রায়ত না বলে জোত-মালিক হিসাবে দেখানো হয়েছে। মল্ল আমলে এর ব্যাপকতা এমন ছিল, কোনো ব্রাহ্মণ ভূমিদান না পেলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে মানা হত না। নব্বই ভাগ ব্রাহ্মণই এই দান পেয়েছিল।

(২) নির্দিষ্ট রাজস্বে স্থায়ী জোত-মালিক : জেলায় এমন মালিক ছিল মোটের এক চতুর্থাংশ এবং জঙ্গলমহলে (রাইপুর, ইন্দপুর, সিমলাপাল, ছাতনা, রানিবাঁধ, খাতড়া) এক তৃতীয়াংশ। জেলার পূর্বাংশে জোতের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অনেক জোত-মালিক নিজে চাষ করত। জঙ্গলমহলে জোত বড় এবং ভাড়া করা উপজাতি বা অর্ধ উপজাতিদের দ্বারা চাষ করা হত।

(৩) স্থায়ী জোত মালিক যাঁর রাজস্ব নির্দিষ্ট নয় : জেলার এক দশমাংশই ছিল এমন জোত।

(৪) অস্থায়ী জোত মালিক : এমন অল্পসংখ্যক জোতমালিক শস্যে বা শস্য নগদ মিশিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করত।

১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে ২০ বছরের জমি দখলদারি, রায়তি স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দখলদারির নিরিখে রায়ত ছিল দুই শ্রেণির।

(১) নির্দিষ্ট রাজস্বের রায়ত : সাধারণ রায়তরা দীর্ঘকাল দখল ও নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদানের কোনো লিখিত প্রমাণ সমীক্ষাকালে দেখাতে পারেনি। জেলায় মাত্র ১০ শতাংশ জমিতে রায়তি স্বত্ব লিপিবদ্ধ করা গিয়েছিল। পশ্চিমদিকের জঙ্গলমহলের ছটি থানায় এই হার ছিল ৫.৯ শতাংশ, যারা মূলত মোকরারি রায়ত। উত্তরদিকের শালতোড়া, মেজিয়ায় এই হার ছিল ৬.৯ শতাংশ। মধ্যজেলা গঙ্গাজলঘাটি, তালডাংরা, ওন্দা, বড়জোড়া, বাঁকুড়া থানাগুলিতে ৮.৭ শতাংশ, পূর্বাংশে বিষ্ণুপুর মহকুমায় এই হার ১৮.৯ শতাংশের উপর। পূর্বাংশে বিষ্ণুপুর মহকুমায় এই সংখ্যাধিক্যের কারণ বেশিরভাগ রায়তেরই রাজস্ব রসিদ ও ২০ বছরের বেশি দখলদারি ছিল এবং রায়ত হিসাবে তারা সহজে স্বীকৃত হয়। জেলার মোট ৪৬৮৮৫ রায়তকে খতিয়ানভুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

২) বন্দোবস্তকৃত ও দখলিকৃত রায়ত : বন্দোবস্তকৃত জমিতে রাজস্ব প্রদানের বিভিন্ন ধরণ, এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণ নিম্নে দেখান হল।

ক) পশ্চিম দিকের জঙ্গলমহলের ছটি থানায় —

রাজস্বের ভিত্তিতে জোত শ্রেণি	জোতের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	জমির শতাংশ
নগদ রাজস্বের জোত	৬০৯৪৪	১৫৮২৪৬	৭৩
নির্দিষ্ট শস্য রাজস্বের জোত	৮৩১৯	১৮৭২২	৯
উৎপন্ন ফসলের ভাগে জোত	৮২৯৮	১১৭২৪	৫
নগদ-শস্য মিশ্রিত রাজস্বের জোত	৪২৯১	২৬৬৯২	১৩

খ) উত্তরদিকের শালতোড়া, মেজিয়া থানা —

রাজস্বের ভিত্তিতে জোত শ্রেণি	জোতের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	জমির শতাংশ
নগদ রাজস্বের জোত	২২৮২১	৪৩৯৫৯	৯৬
নির্দিষ্ট শস্য রাজস্বের জোত	৫১৯	৬৪৬	১
উৎপন্ন ফসলের ভাগে জোত	৯১৩	৯০৩	২
নগদ-শস্য মিশ্রিত রাজস্বের জোত	৮২	২৩১	১

গ) মধ্য জেলায় গঙ্গাজলঘাটি, তালডাংরা, ওন্দা, বড়জোড়া, বাঁকুড়া থানাগুলি —

রাজস্বের ভিত্তিতে জোত শ্রেণি	জোতের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	জমির শতাংশ
নগদ রাজস্বের জোত	৬৭৫৪০	১২৯৬২২	৭০
নির্দিষ্ট শস্য রাজস্বের জোত	১৮৩৯৯	২৬৭৭১	১৪
উৎপন্ন ফসলের ভাগে জোত	৭৬৫৯	৮০৩২	৫
নগদ-শস্য মিশ্রিত রাজস্বের জোত	৫৪০৫	২০৪৭৫	১১

ঘ) পূর্বাংশে বিষ্ণুপুর মহকুমা —

রাজস্বের ভিত্তিতে জোত শ্রেণি	জোতের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	জমির শতাংশ
নগদ রাজস্বের জোত	১১৬৭৬২	১২০৬৪	৭৭
নির্দিষ্ট শস্য রাজস্বের জোত	১৮৬৮৫	১৫৪৪৮	১০
উৎপন্ন ফসলের ভাগে জোত	১৫০১১	১১২৫১	৭
নগদ-শস্য মিশ্রিত রাজস্বের জোত	৪৩০৪	৯০৬৯	৬

মোট জেলার হিসাব —

রাজস্বের ভিত্তিতে জোত শ্রেণি	জোতের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	জমির শতাংশ
নগদ রাজস্বের জোত	২৬৮০৬৭	৪৫৩৮৯৩	৭৫
নির্দিষ্ট শস্য রাজস্বের জোত	৪৫৯২২	৬১৫৮৮	১০
উৎপন্ন ফসলের ভাগে জোত	৩১৮৮১	৩১৯১১	৫
নগদ-শস্য মিশ্রিত রাজস্বের জোত	১৪০৮২	৫৬৪৬৯	৯

জেলায় নগদে রাজস্ব দেওয়া রায়ত ছিল মোটের ৭৫ শতাংশ। এটি অন্যান্য জেলা অপেক্ষা কম। কারণ এ জেলায় শস্যে রাজস্ব দেওয়ার প্রবণতা অন্য জেলা অপেক্ষা বেশি। সাজা প্রথার শস্য রাজস্বের ক্ষেত্রে মণে শস্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। ভাগ প্রথায় নেওয়া হত অর্ধাংশ। সাজা প্রথায় রায়ত ছিল মোটের ১১ শতাংশ ও ভাগ প্রথায় ৫ শতাংশ। তুলনায় মেদিনীপুরে সাজা রায়ত ছিল মাত্র ৩.৯ শতাংশ ও ত্রিপুরায় ২ শতাংশ। অর্থাৎ রায়তদের শোষণের পরিমাণ ও কৃষক দুর্গতি অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলায় ছিল বেশি। রবার্টসনের সমীক্ষাকালে প্রায় ১/৪ অংশ রায়তই সাজা শর্তে বাঁধা পড়েছিল। রবার্টসনের হিসাবে জেলার কৃষিজীবী ৮০৫১৭০ জনের ২৭ শতাংশ অর্থাৎ ২১৫২৩৪ জন ছিল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। ব্রিটিশ শাসনে এই ভূমিচ্যুতির অভিমুখ ছিল একমুখী, কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দশকে ভূমি রাজস্ব কমিশনের সমীক্ষায় জেলার ২ একরের কম জমির মালিক ছিলেন ৫৩.৭ শতাংশ রায়ত। ৬৭০টি পরিবারে অনুষ্ঠিত সমীক্ষায় ২-৩ একর জমি ছিল ৮.৯ শতাংশ রায়তের, ৩-৪ একর জমি ছিল ৭.৮ শতাংশ রায়তের, ৪-৫ একর জমি ছিল ৪.৫ শতাংশ রায়তের, ৫-১০ একর জমি ১৪.৮ শতাংশ রায়তের, ১০ একরের বেশি ১০.৩ শতাংশ রায়তের। পরিবার পিছু গড় জমি ছিল ৮.১৭ একর। উল্লেখ্য ১৯২১ সালের সেনসাসে জেলার কৃষিজীবী ভূস্বামী, চাষী (প্রজা), মজুরের ভাগ ছিল যথাক্রমে ৪.১৮ শতাংশ, ৬৮.৩৯ শতাংশ ও ২৭.৪৩ শতাংশ। ১৯১৩ সালের কালেক্টর প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে গত দেড় দশকে ভোগদখল সহ কৃষি জমি হস্তান্তর হয়েছিল ৩৩ শতাংশ জমির। ১৯১৭-২৪ সালে ভোগদখল স্বত্বাধিকারী চাষীর কাছে ছিল ৭৮৫৭৩৬ একর জমি, পত্তনিদার ও খাসজমির মালিকদের দখলীয় পরিমাণ ছিল ৩৯৪০২৩ একর জমি। বিনয় চৌধুরীর মতে জমি হস্তান্তরের আধিক্যই খাসজমির পরিমাণ বাড়িয়েছিল। কৃষির স্থিরতা এলে খাজনা ও জমির দাম বাড়ে। ১৮৮১-৮২ থেকে ১৮৯০-৯১ এর দশকের তুলনায় ১৯০২-০৩ ও ১৯১১-১২ দশকে জমির দামের মূল্যমান ১০.২ থেকে বেড়ে হয়েছিল

২৫.৫২। রবার্টসনের সমীক্ষাকালে বেদখলী রায়তের সংখ্যা ছিল নগণ্য। থাকলেও তা ছিল উচ্চভূমির অনুর্বর জমিতে। আর অধীনস্ত রায়তের সংখ্যা ছিল ৬৬৫১৯, মোটের ৪ শতাংশ। জেলার এই হার মেদিনীপুর (৩.৪২ শতাংশ) ও ত্রিপুরার (২.৮ শতাংশ) চেয়ে বেশি। অর্থাৎ তুলনামূলক রায়ত নির্যাতনের মাত্রাও জেলায় ছিল বেশি। রবার্টসন সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন থানার রাজস্বহার ছিল নিম্নরূপ :[৮৯]

থানা	**গড় রাজস্ব** (একর প্রতি টাঃ আনা পয়সা)	**স্থান**
রাইপুর	০-১৪-০৮	১৫
সিমলাপাল	০-১২-০২	১৮
রানিবাঁধ	০-০৭-১০	২১
খাতড়া	০-১০-০৮	২০
ছাতনা	০-১৩-০৭	১৬
ইন্দপুর	০-১২-১০	১৭
মেজিয়া	২-০২-০৩	৮
শালতোড়া	১-১৪-০৯	১০
গঙ্গাজলঘাটি	২-১০-০৭	৯
বড়জোড়া	১-১১-০০	১১
তালডাংরা	০-১১-১১	১৯
ওন্দা	১-১০-০৬	১২
বাঁকুড়া	১-০৮-০১	১৪
সোনামুখী	২-০৫-০৯	৬
পাত্রসায়ের	৩-০৫-১১	৫
ইন্দাস	৪-০৬-০১	২
কোতুলপুর	৪-১০-০৩	১
শিরোমণিপুর	৪-০২-০৬	৩
জয়পুর	৩-১২-০৬	৪
বিষ্ণুপুর	১-০৮-০৮	১৩
রাধানগর	২-০৩-০৭	৭

সমীক্ষাকালে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকার জোত ও তার রাজস্ব নিম্নরূপ :

জোতের প্রকার	জোতের সংখ্যা	এলাকা (একর)	রাজস্ব (টাঃ আঃ পঃ)
স্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত	২৬	১১৬৭২০৮.১	৩৮৭২০৬/৩/১০
অসার লাখেরাজ ও দাইনি বন্দোবস্ত	৭২৭	১৪২০০৩.৫	৫৫৪০৮/৬/১
ঘাটোয়ালী অধিগৃহীত জমি, দাইমি বন্দোবস্ত	২১৭	১২৩৫২০.৮	৩৭৩২২/৫/২
সিমান্দারি অধিগৃহীত জমি, দাইমি বন্দোবস্ত	৩৫৫	১৩৩৪.২৩	২০৭/১৫/০
সরকার ক্রীত লাখেরাজি ও দাইমি বন্দোবস্ত	১২	১২৯৩.৪	২৬৮/১০/১০
আইমি স্বত্ব ও দাইনি বন্দোবস্ত	৯৮	১৯৫৮.২	৮৩৬/১০/১১
পাইকান জমি ও দাইমি বন্দোবস্ত	৭	৪৫.৫	৮৮/১৫/০
দাইমি বন্দোবস্ত	৫	২৫.৭	১০৭/১১/০
নিশান্দি জমি	১	৪.৫	৮-৬-০
অস্থায়ী জোত	---	---	---
ক) জোত-মালিকের অধীন	৩	১০৭৯.২	৭২৭/১৪/৪
খ) রায়তের অধীন	৩৪	১৩০১.৭	১৭৭৫-১১-০
সরকারি পরিচালিত খাস	৩৭	১৩০১.৭	১৭৭৫/১১/৫

রবার্টসন নির্ণীত রাজস্ব ১৭৯২ এর কিটিং নির্ধারিত রাজস্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। অধিগৃহীত লাখেরাজি জমির ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি কিটিং নিরিখনামা ছিল শালি জমিতে ২ থেকে ৩ টাকা, সুনা জমিতে ৫-৭ টাকা (দো-ফসলী)।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত রাজস্ব পরিমাণের সাথে জোতের সংখ্যার ভিন্নতা নিম্নরূপ :

এক টাকার কম রাজস্বের জোতের সংখ্যা	৩৬
১-১০ টাকার মধ্যে রাজস্বের জোতের সংখ্যা	৫৬৪
১০-১০০ টাকার মধ্যে রাজস্বের জোতের সংখ্যা	৫৮৯
১০০-১০০০ টাকার মধ্যে রাজস্বের জোতের সংখ্যা	২৪০
১০০০-১০০০০ টাকার মধ্যে রাজস্বের জোতের সংখ্যা	১৬
১০০০০-৫০০০০ টাকার মধ্যে রাজস্বের জোতের সংখ্যা	২
১০০০০০ টাকার বেশি রাজস্বের জোতের সংখ্যা	২
মোট জোত —	**১৪৪৯**

সমীক্ষায় প্রাপ্ত জোতের আয়তনের সাথে জোত সংখ্যার ভিন্নতা নিম্নরূপ :

১ একরের কম আয়তনের জোত	৩২
১—১০০ একরের কম আয়তনের জোত	৯৯৬
১০০—৫০০ একরের কম আয়তনের জোত	২৩৭
৫০০—১০০০ একরের কম আয়তনের জোত	৫৪
১০০০—৫০০০ একরের কম আয়তনের জোত	৫৪
৫০০০—১০০০০ একরের কম আয়তনের জোত	৬
১০০০০—৫০০০০ একরের কম আয়তনের জোত	১১
৫০০০০-১০০০০০ একরের কম আয়তনের জোত	৩
১০০০০০ একরের বেশি আয়তনের জোত	৪
মোট জোত —	**১৩৯৭**

সমীক্ষাকালে চাকরান জমি অধিগ্রহণ : বাঁকুড়ার গ্রাম সমাজের নিরাপত্তারক্ষী চৌকিদারদের জমি ১৮৭০ সালের যোড়শবিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হয়, যার রাজস্ব জমা হত চৌকিদারী ইউনিয়ন ফান্ডে। মূল জমিদারির মধ্যে থাকলেও, প্রতি চাকরান জমির স্বতন্ত্র খতিয়ান সংখ্যা দেওয়া হয়।

সমীক্ষাকালে শহর তৈনাতী চৌকিদারী চাকরান জমি : বিষ্ণুপুর শহরের মহল্লাগুলিকে নিরাপদ রাখতে বিভিন্ন নিযুক্ত চৌকিদারদের সেবার বিনিময়ে প্রদত্ত জমিকে বলা হত শহর তৈনাতী চৌকিদারী চাকরান জমি। ১৮৭৯ সালের ৫ই নভেম্বর ১৮৭০ সালের যোড়শ বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করার জন্য কালেকটর, মহকুমাশাসক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে কমিশনার নিযুক্ত করা হয় (৫০ নং ধারায়)। থাকবস্ত মানচিত্র, ইসমানবিশি, মাঠের দখলদারি পরিমাপ করে এ ধরনের চাকরান জমি নির্ধারিত হয়েছিল ১৭৬৮ বিঘা, যার রাজস্ব ধার্য হয় ২১৩০ টাকা। রাজস্ব জমা হত বিষ্ণুপুর পুরসভার তহবিলে।

অস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সরকারি বন্দোবস্তের জোত : দ্বারকেশ্বর, শালি, বদাই, দামোদর নদের চর, অনাদায়ে নিলামযোগ্য লাখেরাজি জমি, সড়ক পার্শ্বস্থ জমি (নয়ানজুলি) এই বন্দোবস্তের আওতায় আসে।[৯০] বর্ধমানের রাজার যুক্তি ছিল এই জোতগুলি সংলগ্ন জমিদারি বা তালুকদারির জমি (চারটির একটি দামোদরে, দুটি দ্বারকেশ্বরের খাটনগরে ও বেহারে, বোদাই নদীর চর-ভাটপাড়া)। এ বিষয়ে তারা চারটি মালিকানা মামলা দাখিল করে। কিন্তু সরকার এই যুক্তি মানতে অস্বীকার করে

ও জমিদারদের এগুলি বন্দোবস্ত নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। বর্ধমানের মতো রাজারা তা অস্বীকার করলে আগ্রহী রায়তদের সাথে এগুলি বন্দোবস্ত করা হয়। আর একটি বিরোধের জায়গা ছিল দ্বারকেশ্বরের অবন্তিকা চরের সাথে চারটি রাজস্ব খেলাপী লাখেরাজি জোতের বন্দোবস্তের সমস্যা, কারণ বর্ধমানরাজ একই সমস্যা তৈরী করেন। অবশেষে বন্দোবস্তের পরিবর্তে মালিকানা দিতে সরকার রাজি হয়, যদিও মালিকানা মূল্য অনাদায়ীই থেকে যায়। ১৮৮৬ সালে এই সমস্যারর সূচনা হলেও সমাধান হতে পেরিয়ে যায় ১৯১১ সাল। সড়ক পার্শ্বস্থ জোতগুলি সড়কের সাথে সংযুক্ত করে, বেদখল জোতগুলি সরকারি জোত হিসাবে রেখে দেওয়া হয়।

সমীক্ষাকালীন চাষযোগ্য ও চাষঅযোগ্য জমির খতিয়ান নিম্নরূপ :

থানা	**মোট এলাকা বর্গমাইল**	**কর্ষিত জমি (%)**	**চাষযোগ্য জমি (%)**	**চাষ অযোগ্য জমি (%)**	**জঙ্গল (%)**
রাইপুর	২২৭	৫৭	২১	২২	১৬
সিমলাপাল	১১৯	৪০	২৫	৩৫	৩১
রানিবাঁধ	১৬৬	৪৪	২৭	২৯	২৯
খাতড়া	১৬৭	৫০	২৬	২৪	১৯.৪
ছাতনা	১৭৩	৪৫	২৫	৩০	১২.৩
ইন্দপুর	১১৬	৪৮	২৬	২৬	১৮.৬
মেজিয়া	৬৩	৩৬	২৯	৩৫	১.১
শালতোড়া	১২১	৪৪	৩৪	২২	৮.২
গঙ্গাজলঘাটি	১৪৪	৪৪	২৯	২৭	২২.৪
বড়জোড়া	১৪৫	৪০	২৩	৩৭	২৪.৬
তালডাংরা	১৩৫	৩৯	৪১	২০	৩০.৪
ওন্দা	১৯৮	৪২	৩২	২৬	২৮.৫
বাঁকুড়া	১৫৭	৪৬	২২	৩২	১৫.৬
সোনামুখী	১০৫	৪৭	৮	৪৫	১৬.২
পাত্রসায়ের	১০৪	৫২	১৩	৩৫	১০.৯
ইন্দাস	৯৮	৭২	৪	২৪	০
কোতুলপুর	৭৩	৭৩	৭	২০	০
শিরোমণিপুর	৫৯	৭১	৬	২৩	৪.১
জয়পুর	৫১	৫০	১১	৩৯	২৪.১

বিষ্ণুপুর	৯৫	২৮	২০	৫২	৩৪
রাধানগর	১২৭	৪১	৮	৫১	৩৬.৪
মোট—	**২৬৪৩**	**৪৭**	**২২**	**৩১**	

সমীক্ষাকালীন প্রাপ্ত ফসলের নাম ও ফলনের হিসাব নিম্নরূপ :

ফসলের নাম	**মোট চাষের জমির কত শতাংশ**
আমন ধান	৫৫.২
আউশ ধান	৩৪.৯
ভূট্টা	০.৮
বার্লি	০.২৫
যব	০.৮
ডাল	০.২৫
অন্য ডাল	৪.৪
তিল তেল বীজ	০.২
সরিষা তেল বীজ	০.৭৯
সীসামম (তেল বীজ)	০.৮
অন্য তেল বীজ	১.১৪
পাট, তুলা, গাঁজা	০.২৮
মশলাপাতি	০.২
ইক্ষু	০.৪
আলু	০.২৬
অন্য শস্য	০.৯
ফল	১.০৫
অন্য শস্যের ফসল	০.২২
গবাদির জন্য ফসল	০.১৬
মোট —	**১০৩.০৭**

(অর্থাৎ একবার সব জমিতে ফসল ফলার পর ৩.০৭ শতাংশ জমিতে দ্বিতীয়বার ফসল ফলে।)

গ্রান্টের অথনৈতিক বিশ্লেষণ অনুসারে ১৭৭০ সালে মোট রাজস্ব হিসাবের ভিত্তিতে (সূত্র ঃ— গ্রান্টের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ) বিষ্ণুপুর জমিদারিকে ১০টি হুদা বা ফার্মে বিভক্ত করে জমাবন্দি করা হয়।

ক্রঃ সঃ	ভাগের নাম	হুদার সংখ্যা	জমাবন্দী
১।	ইন্দাস	২৯	৮৮১৯২
২।	বালসী	৪	২৪০৪৯
৩।	শরোদপুর	২৫	৮২০৬৩
৪।	বৈতাল	১	৪০২৮১
৫।	সেনহাজারী	১	৩৫২১৩
৬।	রসকুণ্ড	১	৪৮৯৯৮
৭।	পারুলিয়া	৪	১৯৮০৪
৮।	বড়হাজারী	১	৩৬৭৮৩
৯।	খাসমহল	৮	৪৩৫৪১
১০।	হাভিল্লাস	৫	৩২৮৫০
	মোট—	৭৯	৪৫১৭৫০

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সমগ্র জেলায় কেমনভাবে রাজস্ব আরোপ করা হয়েছিল তা নিম্নে দেখানো হল :

বিষ্ণুপুর জমিদারি :

ক্রঃ সঃ	জোতের নাম ও মালিক	জোতের আয়তন (একর)	রাজস্বের পরিমাণ (টাঃ/আঃ/পঃ)
১।	বিষ্ণুপুর পরগণা (বর্ধমানরাজ ক্রীত, ১৮০৬)	২০৬৪৭১.৫	১৩৫৯৮৯/৬/৫
২।	বরহাজারী (বর্ধমানরাজ ক্রীত, ১৭৯১০	১৩১৯৪৩.৫	১৯২৬৩৩/৫/৯
৩।	করিসুণ্ডা (বর্ধমানরাজ ক্রীত, ১৮০৬)	১৩১২৯.০	২৩৩৯৫/৫/০
৪।	জঙ্গলমহল (বর্ধমানরাজ ক্রীত, ১৭৯৮)	১২২৩৫৪.৫	৩৪৯৯/৪/৬
৫।	কুচিয়াকোল (বর্ধমানরাজ ক্রীত, ১৭৯৮)	৮৫৪২.৫	৮২৩৭/১০/০
৬।	পাঁচাল (বর্ধমানরাজ ক্রীত, ১৭৯৮)	৪৯৩	৪০৮/৯/৯
৭।	জামতোড়া (বর্ধমানরাজ ক্রীত, ১৭৯৮)	৯৫৭৫.৫	৬৩১০/৯/৬
৮।	মালিয়াড়া (বোর্ড অব রেভেন্যু দ্বারা স্বতন্ত্র তালুক)	৩২০৪৩.৫	৫২০২/৮/৯
৯।	সাহারজোড়া (বোর্ড অব রেভেন্যু দ্বারা স্বতন্ত্র তালুক)	১৬৬২৩	৩১১০/০/৫
১০।	কিসমত সাহারজোড়া	৪৬৬৫	১১৫৬/১০/৩

জঙ্গলমহল :

১১।	ছাতনা	১৪০১৯৪	৭৩১/৭/১০
১২।	লালবাজার (পূর্বতন সুপুর পরগণা থেকে)	২৪৪৬৪	৩২৫/১২/৮
১৩।	মাসিয়াড়া (পূর্বতন সুপুর পরগণা থেকে)	৫৯৫৭	৯১১৫/০
১৪।	কুশ্তি (পূর্বতন সুপুর পরগণা থেকে)	৮৮২৪.৫	২২৫/১১/০
১৫।	ইন্দপুর (পূর্বতন সুপুর পরগণা থেকে)	৪৮৬৩	৪০/১০/০
১৬।	ভেদুয়া (পূর্বতন সুপুর পরগণা থেকে)	৮৯৪১	১১৩/৭/০
১৭।	খাতড়া (পূর্বতন সুপুর পরগণা থেকে)	১৬৭৬০.৫	১৯২/৮/০
১৮।	লোহাট (পূর্বতন সুপুর পরগণা থেকে)	২৯৫৯৩	৫০৫/১১/৬
১৯।	ভেলাইডিহা	২৫৭৮১.৫	৫২৪/২/৩
২০।	ফুলকুসমা	৩৫৭৬৩.৫	২১২/৯/৮
২১।	শ্যামসুন্দরপুর	৮৮১১০	২৪৭/১০/৭
২২।	সিমলাপাল	৪৮৭১২.৫	৭৫৯/১৩/৮
২৩।	অম্বিকানগর	৮৫২৬১	৩৭২/১৪/০
২৪।	রাইপুর	৭৯৩৬২.৫	২৬৫৭/১৩/৯

রবার্টসনের সমীক্ষায় মৌজাভিত্তিক মাপের চমকপ্রদ বিভিন্নতা উঠে এসেছিল।[৬১] কাঠের তৈরী এই পাই মাপক পাত্র তৈরী করত করেঙ্গা গোষ্ঠী (বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটস্থ জগদল্লা সহ বিভিন্ন গ্রামে এখনো এদের বাস আছে)। কখনো কখনো পাই-পাত্র লোহা, তামার আস্তরণে মোড়া হত। বিভিন্ন মাপ পাই ছিল কৃষক শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। কারণ রায়তদের কাছ থেকে শস্য সংগ্রহের সময় বড় মাপের 'পাই' ব্যবহৃত হলেও ফেরত বা বিক্রয়ের সময় কম পরিমাপের 'পাই' ব্যবহৃত হত।

মৌজা সমাচার : মৌজা ভিত্তিক জমির দাম ও বিভিন্ন মাপ

মৌজা ঃ দলদলি, থানা ঃ বিষ্ণুপুর (১৮৪৯ সালের দাম) ১৭৬৫ সালের পাট্টাদলিলের মূল তথ্য ঃ—

ক্রঃ সঃ	জমির প্রকারভেদ	পরিমাণ (বিঘা)	বিঘাপ্রতি দাম (টাঃ/আঃ/পঃ/গঃ/কড়া)
১।	সানিজোন আগুন	১০০ বিঘা ১২ কাঠা	২/১১/১১/৮
২।	সানিজোন দো. এম	৫০ বিঘা	২/২/৮/১
৩।	সোম	৫০ বিঘা	১/৬/৫/০
৪।	সানিডাঙ্গা আগুন	৭৫ বিঘা	১/১/৭/৫
৫।	সানিডাঙ্গা দো. এম	৯০ বিঘা	০/১২/১৬/০
৬।	সানিডাঙ্গা সোম	১৪০ বিঘা	০/৮/৮/১

ক্রঃ সঃ	জমির প্রকারভেদ	পরিমাণ (বিঘা)	বিঘাপ্রতি দাম (টাঃ/আঃ/পঃ/গঃ/কড়া)
৭।	জুনাইফু আসুন	১০ বিঘা	৪/৫/২/১
৮।	নিজসুনা আগুন	৬ বিঘা	৩/১১/১৮/১
৯।	বাস্ত	৬ বিঘা	৯/১২/১৫/২
১০।	উদ্বাস্তু	৮ বিঘা	২/৪/৪/২
১১।	পুষ্করিণী	৪৬ বিঘা ১৫ কাঠা ২ ছটাক	০/৪/০/০
১২।	তিন্যাডাঙ্গা	১৯১/৫/৩	০/১২/০/০
১৩।	আউশডাঙ্গা	১০০ বিঘা	১/০/০/০
১৪।	জঙ্গল	১৪৮২/৫/৩	০/৪/০/০

ফসল পরিমাপের একক ঃ মৌজা ভিত্তিক ভিন্নতা :

সমীক্ষাকালে সংগৃহীত বিভিন্ন মৌজায় বিভিন্ন মাপ চালু ছিল। এমন ১২টি মৌজায় চালু বিভিন্ন পরিমাপ নিম্নে বিবৃত হল।

ক) মৌজা ঃ ফতেপুর, থানা ঃ ইন্দাস, পদ্ধতি ঃ ৭২ তোলা ১০ আনা = ১ পাই, ৮ শলি = ১ মাপ, ১০ পাই = ১ শলি, ৪ পোয়া = ১ পাই, ৪ ছটাক = ১পোয়া, ৫ তোলা = ১ ছটাক, ৪৬ পাই = ১ মণ (চাল), ৬৬ পাই = ১ মণ (ধান)।

খ) মৌজা ঃ মুকুন্দপুর, থানা : বাঁকুড়া, পদ্ধতি ঃ সাজার ওজন
ইমাপ = ১ শলি, ২০ পাই = ১ শলি, ৪ কোনা = ১ পাই।

গ) মৌজা ঃ রঘুনাথপুর, থানা ঃ বাঁকুড়া, পদ্ধতি ঃ সাজার ওজন
৮ শলি= ১ মাপ, ২০ পাই = ১ শলি, ১০০ তোলা = ১ পাই, ১ পাই = ১০০ তোলা (চাল), ১ পাই = ৭০ তোলা (ধান)।

ঘ) মৌজা ঃ ব্রাহ্মণডিহা, থানা ঃ তালডাংরা
২০ পাই = ১ শলি, ৭০ তোলা = ১ পাই (ধান), ৬৫ তোলা = ১ পাই (চাল)।

ঙ) মৌজা ঃ জুগদা, থানা ঃ তালডাংরা, পদ্ধতি ঃ ৮২ তোলা ১০ আনা = ১ পাই, ১ মাপ = ৩/৩ সের, ২০ পাই = ১ শলি।

চ) মৌজা ঃ সালুনি, থানা ঃ ছাতনা
৮ শলি = ১ মাপ, ২০ সের = ১ শলি, ৮০ তোলা = ১ সের।

ছ) মৌজা ঃ বীরসিংহপুর, থানা ঃ সিমলাপাল
৪ মৌটি = ১ চৌটি, ৮ চৌটি = ১ কোনা, ৪ কোনা (১১২ তোলা) = ১পাই, ৮ পাই = ১ কুড়ি, ১৬ কুড়ি (৩ মণ ৮ সের) = ১ আড়া ৩/৮ সের, ২০ আড়া = ১ বিশ।

জ) মৌজা ঃ তেলেগাঁও, থানা ঃ ৩২৬ নং
২০ পাই = ১ শলি। ৮ শলি = ১ মণ

ঝ) মৌজা ঃ গোবিন্দপুর, থানা ঃ বাঁকুড়া, পদ্ধতি ঃ ৯২ তোলা ১০ আনা = ১ পাই (ধান), ১ মাপ = ১ শলি, ২০ সের= ১ শলি, ৬৪ তোলা = ১ সের, ৩৫ পাই = ১ মণ (চাল)।

ঞ) মৌজা ঃ সিয়াড়বাদ, থানা ঃ ওন্দা
৮ শলি = ১ মাপ, ২০ সের = ১ শলি, ৫৫ পাই = ১ মণ (ধান ৮০ তোলা), ৪০ পাই = ১ মণ (চাল তোলা)।

ট) মৌজা ঃ ইসমাইল চক, থানা ঃ শিরোমণিপুর
৪ সের = ১ মান, ৪ মান = ১ কুড়ি, ১৬ কুড়ি = ১ আড়া, ৩৫ তোলা = ১ সের (ধান), ৫১ তোলা = ১ সের (চাল)।

ঠ) মৌজা ঃ বাঁকি, থানা ঃ বাঁকুড়া
৮ শলি = ১ মাপ, ২০ পাই = ১ শলি, ১০০ তোলা = ১ পাই

বাঁকুড়ায় অন্তত দশটি মুখ্য 'পাই' পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যেমন—

১) বাঁকুড়ী পাই ঃ মাপ ছিল ১০৬ তোলার (ধান)।
২) রাজহাটি পাই ঃ
৩) মল্ল পাই ঃ মাপ ছিল ৮০ তোলার।
৪) রাজগ্রামী পাই ঃ
৫) তুঙ্গ পাই ঃ মাপ ছিল ১১২ তোলার, রাইপুর, সিমলাপাল অঞ্চলে দেখা যেত।
৬) ধোবা বা চিন্তামণি পাই ঃ মাপ ছিল ৮০ তোলার।
৭) ছাতনী পাই ঃ মাপ ছিল ৮০ তোলার, ৬৪ তোলার পাইও আছে,অবশ্যই রায়ত শোযণের জন্য দুইটি মাপ।
৮) বিশগণ্ডী পাই ঃ মাপ ছিল ৮০ তোলার,পুরুলিয়া সংলগ্ন অংশে প্রচলিত ছিল।
৯) বগড়ী-কৃষ্ণনগরী পাই ঃ মাপ ছিল ১৬০ তোলার। মল্লরাজের অধীনস্ত বগড়ীতে প্রচলিত ছিল। সবচেয়ে বড় পাই।
১০) মেদিনীপুর পাই ঃ মাপ ছিল ৮০ তোলার। মেদিনীপুর সংলগ্ন অঞ্চলে দেখা যেত।

৫) হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গলে বর্ণিত বাঁকুড়ার কৃষি :

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে ডব্লু. ডব্লু. হান্টার রচিত 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস অব বেঙ্গলে' বাঁকুড়ার তৎকালীন কৃষি চিত্রের কিছুটা আভাস মেলে।[৯২]

তিনি বাঁকুড়ায় দেখা শীতকালীন আমন ধানের (এপ্রিল-মে মাসে বীজতলা, জুলাই-আগস্টে রোপণ, ডিসেম্বরে ফলন) ২১ প্রজাতির ধানের তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যথা— (১) রামসাল, (২) গৌরাঙ্গসাল, (৩) নোনা, (৪) সালঝাঁটি, (৫) বেনামী, (৬) কেয়া, (৭) মুক্তাহার, (৮) লক্ষ্মণভোগ, (৯) ঝকরোয়া, (১০) কালিকাসি-পিটুল, (১১) লাটসাজ, (১২) চাচমোয়া, (১৩) দারপত্তি, (১৪) দানারগুঁড়া, (১৫) পরমান্নসাল, (১৬) হৈমন্তিক, (১৭) নোনাসাল, (১৮) কাত্রামসাল, (১৯) জিঙালাংড়া, (২০) বাঞ্জার, (২১) কালজিরা। হৈমন্তিক আউশ ধানের ছিল মাত্র দুটি প্রজাতি—(১) আদি আউশ, (২) কৈলাশ আউশ। আউশের ক্ষেত্রে সাধারণত বীজ মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হত। মে মাসে বীজ ছড়িয়ে ফলন পাওয়া যেত সেপ্টেম্বরে।

অন্যান্য ফসলের মধ্যে সরিষা বপন হত অক্টোবর-নভেম্বরে আর ফলন হত মার্চ-এপ্রিলে। তিল চাষে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বপন করে ফল পাওয়া যেত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। সরগুজা চাষ জুন-জুলাইয়ে শুরু হয়, ফলন হয় নভেম্বর-ডিসেম্বরে। অড়হর বোনা হত মে-জুনে, ফসল কাটা হত ফেব্রুয়ারিতে। মটর চাষ অক্টোবর-নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চ।

তুলা চাষের শুরু সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, ফলন পাওয়া যেত মার্চ-এপ্রিলে। শন-গাঁজা এপ্রিল-মে তে শুরু হলেও ফলন হত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। নীল চাষ জেলায় আগে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ('শরতের বোনা' নামে পরিচিত) শুরু হলেও বিভিন্ন কারণে (জঙ্গল পরিস্কার করা অন্যতম কারণ) বৃষ্টি হ্রাস পেলে অক্টোবরে ('বসন্তে বোনা' নামে পরিচিত) এর বপন শুরু করা হয়। জেলাশাসকের মতে বৃষ্টির স্বল্পতা ছাড়াও, জমির অনুর্বরতা, ছোট গাছের কারণে নীলের মান ছিল খারাপ। ইক্ষু চাষের সূচনা হত এপ্রিল-মে মাসে, কাটা হত ফেব্রুয়ারি-মার্চে। পান চাষ জুন-জুলাই-এ শুরু করে পাতা তোলা হত ১২ মাসের মাথায়।

উন্নত মানের জমি 'শুনা' ও 'শালি'তে সরু চালের ধান, ইক্ষু, নীল, তৈলবীজের মতো অর্থকরী ফসল হত। শুনা জমিতে পান, তামাক, ওষধি, সব্জির চাষ হত।

ভালো জমিতে রাজস্ব ছিল বিঘা প্রতি ২/৬ টাকা। এমন জমির উৎপাদন ছিল বিঘা প্রতি ১০ মণ। ধানের তৎকালীন দাম মণ প্রতি ১২ আনা অর্থাৎ বিঘা প্রতি পাওয়া যেত ৭-৮ টাকা। এর মধ্যে ১/৩ অংশ ছিল রাজস্ব। ২/৩ অংশ খড় সহ ধানবাবদ কৃষক পেত বিনিয়োগকৃত মূলধন ও শ্রম প্রদান মূল্য বাবদ। দ্বিতীয় শ্রেণির জমিতে বার্ষিক রাজস্ব ছিল ১/৮ টাকা প্রতি বিঘা। ধানি জমিতে কদাচিৎ দ্বিতীয় ফসল হত।

হান্টার ১৮৭১ সালে কালেকটরের প্রতিবেদন উল্লেখ করে বলেছেন, একজন রায়তের দশ একরের জোত থাকলে তার পক্ষে স্বচ্ছল জীবনযাপন করা সম্ভব। তাঁর মতে একজন রায়তের ৫ একরের বা তার কম জোত থাকলে সে অবশ্যই ঋণগ্রস্ত

হয়ে পড়বে। এমন কৃষক ছিল কম যার নিচে উপ-রায়ত, মাহিন্দার ও উর্ধ্বে জোতদার নেই। ১৮৭১ সাল পর্যন্ত আদালতের রায়ে মাত্র ৩৮ জন দখলি স্বত্বে, ২৬ জন মাত্র চিরস্থায়ী সমরাজস্ব শর্তে জমিতে স্বত্ববান হয়েছিলেন। তাঁর হিসাবে কৃষকের স্বচ্ছল জীবনের জন্য মাসিক ৯ টাকার যোগান ছিল আবশ্যক শর্ত। এসময় কৃষি উপকরণের দাম ছিল লাঙল প্রতি ১২ আনা, কোদাল ১/৮ টাকা, হাল-জোয়াল ৬ আনা, কাস্তে ২ আনা, জোড়া যাঁড় ৪০ টাকা। মোট দাম ৪২/১২ টাকা। কৃষি মজুরি ছিল দিন প্রতি ২ আনা। বার্ষিক চুক্তি মজুরি ছিল ৩০-৩৬ টাকা। কৃষক বীজ ও অন্যান্য উপকরণ দিলে ফসলের অর্ধাংশের অধিকারী হত। ১৮৬০ ও ১৮৭৭ সালের জেলাশাসকের প্রতিবেদনে কৃষিপণ্যের মূল্যের তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যায়।

ক্রম	শস্য	১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দাম	১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে দাম
১।	সবচেয়ে ভালো পরিস্কার চাল	১/১ টাকা প্রতি মণ	১/১০ টাকা প্রতি মণ
২।	কুঁড়েহীন উন্নত চায	—	১৩ আনা প্রতি মণ
৩।	সাধারণ চাল	১৫ আনা প্রতি মণ	২৫ টাকা প্রতি মণ
৪।	সাধারণ কুঁড়েহীন চাল	—	১০ আনা প্রতি মণ
৫।	দানা শস্য	১২ আনা প্রতি মণ	১/৪ টাকা প্রতি মণ
৬।	খোসা সমেত বার্লি	২ টাকা প্রতি মণ	২ টাকা প্রতি মণ
৭।	খোসাহীন বার্লি	১/৮ টাকা প্রতি মণ	১/১০ টাকা প্রতি মণ
৮।	ইক্ষু	৪.২৫ আনা প্রতি মণ	১০ আনা প্রতি মণ
৯।	গম	২ টাকা প্রতি মণ	৩ টাকা প্রতি মণ

এই সময়কার জমির মাপের নামতা ছিল—

৪০ কানি = ১ ওয়ানী ৩ কাঠা; ৫০ ওয়ানী = ১ আড়ি ৭.৫ বিঘা; ৪ আড়ি = ১ দ্রুণ = ৩০ বিঘা; ২০ গণ্ডা = ১ ছটাক; ১৬ ছটাক = ১ কাঠা; ২০ কাঠা = ১ বিঘা; ১৬ গণ্ডায় = ১ বিশ্বনসি; ২০ বিশ্ব = ১ বিঘা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রতনলাল ঘোষের ১৭/০৩/১৮৭৩ তাং-এর প্রতিবেদন (যা কালেক্টর ২১/৩/৭৩-এ প্রাদেশিক সরকারের কাছে পাঠান) বাঁকুড়ায় পাঁচ প্রকার জোতের উল্লেখ করেছে— (১) সরকার প্রদত্ত স্বত্ব, (২) মধ্যস্বত্ব, (৩) কৃষকস্বত্ব, (৪) সেবা বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বত্ব, (৫) নিষ্কর স্বত্ব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঁকুড়ায় বিভিন্ন শ্রেণির জমির রাজস্বহার ছিল নিম্নরূপ (জমির মাপ একরে) ঃ কিটিং নির্ধারিত গড় রাজস্ব ছিল সালি জমিতে ২-৩ টাকা ও দো-ফসলী জমিতে ৫-৭ টাকা। জমির শ্রেণিভেদে রাজস্বের হেরফের ছিল নিম্নরূপ ঃ—

জমির প্রকার নাম	১ম শ্রেণির জমিতে (বিঘায় টাঃ/আঃ/পঃ)	২য় শ্রেণির জমিতে (বিঘায় টাঃ/আঃ/পঃ)	৩য় শ্রেণির জমিতে (বিঘায় টাঃ/আঃ/পঃ)	মন্তব্য
সালি জল	২/৬/০	১/১৪/০	১/১০/০	নিচু জল জমি
সালি কানালি	২/২/০	১/১৪/০	১/০/০	নদী-জোড় সন্নিহিত বা উচ্চভূমির মধ্যে
সালি মাঠ	২/২/০	১/১৪/০	১/১০/০	আমন ধানের বড় সমান জোত
সালি কার্পা	২/২/০	২/০/০	১/১০/০	আমন ধানের নিচু জলা জমি
সালি মাটিয়াল	২/০/০	১/৮/০	১/৭/০	আমনের কালোমাটির সমতল জলা জমি
সালি গারাঞ্জি	১/০/০	০/১২/০	০/৮/০	গড়ান ধানি জমি
নিজ সোনা	৩/৪/০	২/১০/০	১/৮/০	আউশ, ডাল/তেলের ২য় ফসলও হয়
সোনা কার্পা	৪/১০/০	৪/৪/০	৪/০/০	১ম শ্রেণি, সরু ধান, ইক্ষু, তুলা, মটর, সরিষা চাষ
সোনা ইক্ষু	৩/৮/০	৩/৪/০	২/১২/০	ইক্ষু ছাড়াও সরু চাল-ধান, তুলা, ডাল
সোনা দো কার্পা	৭/৫/০	৬/৮/০	৫/১২/০	দুইটি ভালো ফসল হয়
সে ডাঙ্গা	৩/৪/০	২/১২/০	২/৯/০	অতি শুষ্ক জমি, ডাল, তেল, সূর্যমুখী
সে কার্পা	৩/১১/০	৩/৪/০	২/১৩/০	তুলা চাষের জমি
উদ্বাস্তু	২/১/০			বাসস্থান সংলগ্ন জমি
বাঁশবেরা	০/১২/০			বাঁশ ঝাড়
পানবোরোজ	১৮/৪/০			পানের চাষের জন্য
তিল ডাঙ্গা	০/৫/০			তিল চাষের জন্য
কলাই ডাঙ্গা	০/১২/০			বিরি কলাই চাষের জন্য
সরিষা ডাঙ্গা	০/১২/০			সরিষা চাষের জন্য
মুসুরি ডাঙ্গা	০/৮/০			মুসুরি ডাল চাষের জন্য
বাগাত	০/৪/০			আম-পেয়ারা-কাঁঠাল বাগান
পুষ্করিণী	০/৪/০			পুকুর
নীল ডাঙ্গা	০/৫/০			নীল চাষের উচ্চ জমি

সারের প্রয়োগ : সাধারণত পুকুরের কালো পাঁক জমিতে ফেলে জমির উর্বরতা বাড়ানো হত। সোনা জমিতে গোবর সার দেওয়া হত। ধানি জমিতে বিঘা প্রতি ৪০ মণ সার দেওয়া হত। ইক্ষু চাষের জন্য ৮০ মণ প্রতি বিঘা। ধানি জমিতে বিঘা প্রতি সারের খরচ ছিল ১২ আনা, ইক্ষু চাষের জমিতে ১/৮ টাকা, বিঘা প্রতি। সেচের উৎস হল কুয়ো, পুকুর, নদী প্রভৃতি। নিচু স্থান থেকে উঁচু স্থানে জল তোলা হত ডোঙার সাহায্যে। ডোঙা হত তালগাছ থেকে। ধানি জমিতে বিঘা প্রতি সেচের গড় খরচ ছিল বিঘা প্রতি ১/৮-২/৮ টাকা। ইক্ষু জমিতে বিঘা প্রতি সেচের খরচ ছিল ৩-৬ টাকা। তখন একটি কুয়ো খননের খরচ ছিল ১০-১৫ টাকা।

হান্টার জেলা বিচারককে লেখা বিষ্ণুপুর রাজবংশের ১৮৪৫ সালের একটি চিঠি উল্লেখ করে পঞ্চকি মহলের তালিকায় রেখেছেন[৯৩]—(১) সেনাপত মহল (সেনাদের), (২) মহলবেরা (দুর্গরক্ষকদের), (৩) ছড়িদার মহল (রাজদণ্ড বাহক), (৪) বক্সি মহল (সান অর্থপ্রদানকারী), (৫) কাষ্ঠভাণ্ডার মহল (জ্বালানী কাঠ সরবরাহকারী) (৬) শাগিদি পেশ মহল (খাবাস, খিদমৎগার, নামজাতাস, গাতাইতের মতো ব্যক্তি সেবক) (৭) ক্রোট মহল (দেওয়ান প্রভৃতি দরবারের লোক), (৮) তোপখানা মহল (কামান চালক), (৯) ডোমমহল (বাদক, গায়ক), (১০) কাহারন মহল (পাল্কি বাহক), (১১) খাটালি মহল (কুলি মজুর), (১২) হাতিলা মহল (বাজার স্থান), (১৩) বেতালবি মহল (ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে)। শেযোক্ত মহলটি ছাড়া সবগুলিই বর্ধমানরাজ সাধারণ জমার জমিতে অঙ্গীভূত করে নেন। হান্টারের বিবরণে মধ্যস্বত্বের তালুক হিসাবে[৯৪] (১) পাটনী তালুক, (২) মোকরারি তালুক, (৩) ইস্তামারীর তালুক (মোকরারি স্বত্বের মতোই, তবে চুক্তির সময় এককালীন জমা বোনাস দিকে হত), (৪) ইজারী তালুকের বিবরণ আছে। রায়তি স্বত্বের জোত হিসাবে (১) সাধারণ জমি/জোত, (২) মেয়াদি জমা, (৩) মোকরারি জমা, (৪) কোর্ফা-দরকোর্ফা জমা, (৫) ভাগ জোত। তিনি কৃষি উপকরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন (১) লাঙল, (২) কাস্তে, (৩) কোদাল ও (৪) মইয়ের। তাঁর সমীক্ষায় কৃষিমজুর ছিল ২৭ শতাংশ (কৃষি সমাজের)।

১৯১৭-২৪ সালের রবার্টসন সমীক্ষা ও ১৯৪৪-৪৫ সালের ঈশাকের সমীক্ষা তুলনা করলে দেখা যায় গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া, শালতোড়া, ইন্দপুর, খাতড়া, তালডাংরা, রানিবাঁধ, রাইপুর ছাড়া অন্য থানাতে চাষ অযোগ্য পতিত জমির প্রায় সবটাই চাষযোগ্যে পরিণত হয়েছে।[৯৫]

থানা	মোট জমি (একর)	জঙ্গল চাষযোগ্য জমি (একর) (১৯৪৪-৪৫)	জঙ্গলের চাষযোগ্য জমির শতাংশ	চাষযোগ্য পতিত (একর) (১৯৪৪-৪৫)	চাষযোগ্য পতিত জমির শতাংশ	জমির শতাংশ (১৯১৭-২৪)		
						কর্ষিত	অকর্ষিতা	চাষ অযোগ্য
বাঁকুড়া	১০০৯৪৭.২৮	৪৮১১.৫৪	০	১২৮৩৩.৯৭	১	৪৬	২২	৩২
ছাতনা	১১০৭২৮.২১	২২.৪৭	০	২৩২০৫.০৯	২	৪৫	২৫	৩০
ওন্দা	১২৪১১৪.৯১	৮৩৪৬.৫৭	৭	১২২২৮.৬৩	১০	৪২	৩২	২৬
গঙ্গাজলঘাটি	১৯৬৯৫.০০	১৪৩৯৩.৩৭	১৬	১৫৩৪৩.৪৯	১৭	৪৪	২৯	২৭
বড়জোড়া	৯৭১৮৯.৭৫	৩৭১৪.৮৩	৪	১০২২৩.৪০	১১	৪০	২৩	৩৭
মেজিয়া	৪০২৪৬.১০	৯১৯.১১	২	৬৯৮৪৫৬	১৭	৩৬	২৯	৩৫
শালতোড়া	৭৭৫৭৬.৯০	১৬৮১.৬১	৪	১৭৮১৯.৯০	২৩	৪৪	৩৪	২২
ইন্দপুর	৭৪১৯৬.৮১	৩২৩৪.৩২	৪	১৫১৪৯.২২	২০	৪৮	২৬	২৬
খাতড়া	১০৬৪৩১.৩৮	১৮৭৮।৮১	২	২০৫৬৮.৪৬	১৯	৫৪	২৬	২৪
তালডাংরা	৮৬৪১৬.৩৩	১০৯.৩৮	০	১১৪৭১.৪৮	২৩	৩৯	৪১	২০
সিমলাপাল	৭৬৪৫৮.৩৮	৫০.৬২	০	৯৩২৪.৭৭	১২	৪০	২৫	৩৫
রানিবাঁধ	১০৫৮৯১.৮৭	১.৬৫	০	১৪৯৯২.৯৬	১৪	৪৪	২৭	২৯
রাইপুর	১৪৫৩৪৫.২৬	৪৭৯.২৩	০	১৯৭১১.২৭	১৪	৫৭	২১	২২
বিষ্ণুপুর	৯৩৭৮৬.৯৯	৫৮৫.০২	০	৮৪১২.০৬	০৯	২৪	২০	৫২
জয়পুর	৬৪৫৪৪.৬৫	৪১.০২	০	৫৩৯৬.৮০	০৮	৫০	১১	৩৯
কোতলপুর	৬১৮৭১.০২	৪৩৮.৩৬	১	৪৩০৬.৩৬	০৭	৭৩	০৭	২০
সোনামুখী	৯৩৯১১.৮৩	৩৯৭.৭৩	০	৭৬৯৫.৩৩	০৮	৪৭	০৮	৪৫
পাত্রসায়ের	৭৯৫০৭.৯৬	১৩০.৪২	০	৭০২৮.১১	০	৫২	১৩	৩৫
ইন্দাস	৬৩০২৩.৫১	২৭৬.৬৫	১	৪৩৩৬.৭১	৭	৭২	০৪	২৪
মোট (একর)	১৬৯৩৮৮৫.০৪	৪১৫১২.৭১		২২৭০৩২.৪৬				

৬) ঈশাকের কৃষি সমীক্ষা ঃ ১৯৪৪-৪৫ সালে বাঁকুড়া ঃ

ঈশাকের কৃষি সমীক্ষায় থানাওয়ারী ফসল ও জমির হিসাব : প্রাকস্বাধীন ঈশাকের কৃষি সমীক্ষা বাঁকুড়ার কৃষি চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। জেলা জুড়ে প্রত্যেক প্লটের জমির ধরণ, ফসলের ধরণের এমন বিস্তৃত ভাষ্য আর কোথাও নেই। তাঁর ইউনিয়ন বোর্ডওয়ারী কৃষি মানচিত্র থেকে থানাওয়ারী হিসাবটি নিম্নে দেওয়া হল (সমস্ত জমি একরে)।[৯৬]

থানা	আমন	আউস	ডাল	গম	বার্লি	মুসুর	মুগ	মাসকলাই	খেসারি	অড়হর	ভূট্টা
বাঁকুড়া	৩৫০৬৮.৩৬	১৬৫২	৬৬.৪১	২৭১.৮৪	৫২.২১	১.৯৮	৭.৯৪	০	৫২.৩৭	০.৪৩	৬.২১
ছাতনা	২৭২৫২.২৩	৪৩০১.৫২	৫৫.৪৭	১০৫.৯০	৮.০৭	৪.১১	০	০	৬৬.৩২	৩০৩.২২	৪০০.৩১
ওন্দা	৪১৩৬৬.৫৬	৭২১৬.১৩	১৯৬.৫৩	১৩৬২.০৭	১৩৬.২৯	৮৯	৪৪৭.৬৪	৫.৯৭	৬৮.২০	১২.৯৩	৭৭.৫২
গঙ্গাজলঘাটি	৪২৬৬৫.০২	৬৫৮.৭৫	১৫.৬৭	৩৯১.৪২	৩২.৪৬	৪৭.৯৮	০	৯৫	৪৪৫.৮১	২০.৫৭	১২৭.০৮
বড়জোড়া	৩৪৬৪৮.৮৫	২০০৫.০৮	১০২.৩৫	৯৯৮.৯১	১৩১.৬৫	২৩৪.৫২	০.১৩	১.১৯	৩০০.৪৬	১০৫.৫৫	৩৭৪.৩০
মেজিয়া	১৪৪৫১.২৫	৮.৩২	১৮	২২৬.৮	৩৪.৯২	৮৮.৬৯	০	০	৩৫৪.২৩	৩৪.৬৩	৪১.৭৩
শালতোড়া	৩৬৪০৬.৬৯	০	৭৮.৩৩	২১৩.৮৯	৬.৬৫	৮৮.৫৪	০	৬.৬১	১৩৭১.৪৩	১৫২.৭৪	৯১৭.৯৯
ইন্দপুর	২৪৩৩৯.০২	১৭৭৫.০১	৩৬.৭৩	৩১২.০১	০.৭৭	৭.৬৬	০.৫৭	০	১০৮.৬৯	০	৫৭১.০৯
খাতড়া	২৩৫৮২.৯০	১৬৪৩৮	১৯৮.৯০	৫৭৩.৩৪	০.৭৬	২১.৯৩	৭.৮৩	০	১১০.৯৮	৩২৯.৪৩	২২০৪.০
তালডাংরা	২০৮৭৬.৭২	৭২২৫.৪৭	৮৩.৬১	৩৯৭.০০	১৩৬	২.৭৯	১০.৯৪	০.৩১	১.০৫	০	২১৪.৪৮
সিমলাপাল	১৬৩৫৫.২৯	৭০৪৬.৯১	১১৭.২৭	৩৮৩.৩৭	০.৫২	৪.৯৩	৪৮.০৮	০.৩২	০.০৭	৯.৮৭	২৭২.৯২
রানিবাঁধ	১৫৩৭২.৩৬	১৬৩৫৯.৬২	২৬৭.৮৭	২৪৯.২৫	০.৭৫	৩.৮৩	৩.৪৮	০	২৮.৪৭	৮৯.৮২	৫৬৪৪.২৫
রাইপুর	৪১৫৬৮.০৯	২৩৫৫৭.১১	৮০০	৭৪৫.৮৯	০.৫৪	৩৬.৪৯	২৩৮.৬৮	০.১৯	২১.১৬	৬৩৭.৯৩	১৫১৭.৫২
বিষ্ণুপুর	২৭৪৪৯.২৯	৪১১৪.০০	১৬২.৮৮	৬৭২.৪২	৫৩.৩৭	৬২.৪৮	২৬৭.০৪	৮৮.৭৬	০	২.১৫	৫৮.৯৭
জয়পুর	২৮৭২১.৭৮	৫৪০৫.৯৩	১১৫.২৭	১৩৪০.৪৪	৩১.০৩	১৩৩.১৭	১৪৮.২৬	৬৫.৮৩	৪.২৯	৭.০১	১০.৪১
কোতলপুর	৩৫৩১৪.৬৫	৬০০৯.০৬	৩০৯.৭৫	৯৫৬.৯৪	৬৮.৬১	১৩৮.২২	২৬৪.৫১	৫১.২৪	৫.৯৮	৪.০৫	০
সোনামুখী	৩৬২৬০.৫৭	২২২৭.৪২	২০৩.৭৯	৫৮৫.১০	১৩৪.২০	২১৩.৪০	৫.৭৭	০.৩২	৩০.২৫	৩.০১	৮.৯৩
পাত্রসায়ের	৩৫২৯২.৯২	৩৪৭৭.৮৮	৯৩.০৭	৬২১.৬১	৩৭৩.৯৩	৩০১	১৫৩.০৫	২১.৭৭	৯৩.৫২	০.৫২	৩.১৩
ইন্দাস	৩৯৩৯৪	২৪৪৩.৯২	৫৩.০৬	৬১৪৫.৭৩	৪৪.৯৪	৪৬৩.৬৭	২৩০.৮	২১.৩	৮	২৩	.২৩
জেলা মোট	৫৭৬৩৮৬.৫৫	১১১৯২১.৮৩	২৯৭০.৯৭	১১০২২.৯৪	১১১৩.৫৩	১৯২৪.৩৯	৫১৮৩৪.৭	২৬৫.৪৮	৩০৭১.৮২	১৭৮৪.০৯১	২৪৫১.০৭

থানা	ইক্ষু	বাদাম	সরিষা	তিল	লঙ্কা	আলু	পেঁয়াজ-রসুন	সবজি	পাট	সূর্যমুখী	পান	তামাক
বাঁকুড়া	১৯০.৩৩	০	১৫.৩২	৯০.৩৭	২৫.৮৮	৭০.০৪	২৪৬.৬৭	১৬৭৬.০৯	৩.৭৩	১১৩.৬৯	৪.৪১	১৩.২৫
ছাতনা	৫০.৫৯	০	৩.১০	১৭.১৯	১০.৯১	১০.০৯	৫৩.৭১	৩৮২৮.৫১	৫.৪২	৩৮.৩৯	০	৩৭.১৭
ওন্দা	৩৪৪.৬৪	০	৩৩৯.৪৩	২৫.০৮	২)।৪৭	১০২.০২	১৬০.৪১	১২০৬.৫৯	৭.২৩	৯৯.১৬	১১১.১৮	২.২২
গঙ্গাজলঘাটি	৩৬.৪১	০	২০.১৬	৪০.২৩	৫.৭৩	১৭.৫৮	৪৫.২০	১৭৬৭.২	১১.৬৭	৬১.১৮	০.৬৬	৫.৬৬
বড়জোড়া	৭৫.০১	৯.৫১	২২.১০	৩১৯.৭৬	৬০.৪৫	১৩৯.৫৩	৩২৪.১৫	২০৭০.৯৫	০	১৫৭.৩৩	১৫.১৮	৯৫.৪২
মেজিয়া	৪১.৩৯	০	১.৬২	১০৬.৪০	৩.১০	২৬.০৫	২০.৩৭	৯৩৬.৬৪	৩.০৫	৪৪.১০	০	২৮.৭৯
শালতোড়া	২৮.৫৯	০.৬৬	২৪.৩৩	২৭.০৯	২.৩৬	৩.১১	৯.৫৩	১১৪১.৪৪	১৪.১৫	৪০.৪২	০	৯.৭৬
ইন্দপুর	৪৮.১২	০	৩৮	৩৫.১৪	২৯.৩১	১৯.২৫	৫৭.৯৬	৬৮২.৮৭	১১.৫২	৩৭.৬২	২.৮৮	৯.৯১
খাতড়া	৮৮.৫২	০	৪২.০২	৭২.১৯	৭৮.৪৬	৭২.৫৯	৯০.৪০	৭৩০৯.০৬	২৬.২৬	৩০.৪০	০.৮৪	৩৪.৮৯
তালডাংরা	১৫১.৫৮	০	১২.০৪	১০.২৩	১৭.৪৫	৬৩.৪৬	৫৬.৯৬	৩৭০.১০	৫.০৯	৪৮.১৭	১২.৩৩	০.৯২
সিমলাপাল	১০৮.৭৬	০	২.৬৬	০	২৪.৮৯	৯০.৭৫	৫৪.৭৫	১২৮৬.৫৪	৭.২২	১৯.৪০	১.০১	৪.৫৪
রানিবাঁধ	২২.৪৬	০	১৭.৩৬	৩.৮৫	১৩.৩২	৪৪।৪২	৫২.৭২	১১০৪১.৭৩	২০.০৬	১৪.৩৩	০	৪৮.৫
রাইপুর	১৯২.৯৫	৯.৮৯	১৩২.০২	৫৭১.৪৭	৪৪.৩৯	১৩০.০২	১৪০.৯৪	১০৭৫০.৫১	৫৬.৬০	৮০.৩৫	০.৬৬	২৪.৮৮
বিষ্ণুপুর	৯১.৪১	০	১৪৩.৫৮	৯.৫২	৮.৫২	১২৫.৩৭	১৭০.৬১	৭৯৪.২৬	০.৫০	৭৬.৮৪	১.৪৩	১.২৫
জয়পুর	১৬১.৯৭	০	২১৪.২৯	২৪.৯৬	১২.৫৭	৩৫৯.০৬	২৩৪.৯৬	৩৫০.৭৮	০	৭৬.৮৪	১১.০	০.৬২
কোতলপুর	১৬৮.৭১	৫.৭১	৬৬.৬২	৪৪.৩৫	১৩.২৪	৬৪৬.৪৮	২২৬.৯৬	১০১০.১৭	০	১৮২.৪৭	২৩.৮	২.৫৬
সোনামুখী	১৭০.৭৭	০	১৫২.৪৪	১৪০.৩৮	৫.৩০	১২৯.৮৪	১২২.৯৩	৩৬১.৭৪	০	৮৬.৯৪	৮.৩০	৬.৯৯
পাত্রসায়ের	২৪২.৯৭	০	৩১৬.৫৪	১৬০.৭৯	১৪.৪১	৩০৫.৪৯	১৬৯.৪৫	৮৯৯.১৪	০	৮৬.৮০	২২.৮৫	০.৫৯
ইন্দাস	১৩০.২৩	০	৪৬.৬০	৩৩.৭৭	০.৭৮	২৭১.৯১	২২৫.৯৮	৫৯১.৩৮	০	১০৬.৯৫	০.৭৮	১.৪
জেলা মোট[৯৭]	২৩৪৪.৫১	২৫.৫৭	১৬২৩.৬১	১৭৩২.৬৮	৩৯২.০৪	২৬২৬.৮৬	২৩৬৪.৩৬	৪৮৫৭৫.৭	১৭৩.১	১৪০১.০৩	২১৭.৮১	৩২৯.৪৭

ঈশাকের সমীক্ষাই ছিল স্বাধীনতা পূর্ব সর্ববৃহৎ মৌজাভিত্তিক কৃষি সমীক্ষা।[৯৮] এর আগে ১৯২৪ সালে কৃষি দপ্তরের যে প্রতিবেদন জেলায় পাওয়া গেছে তার সাথে এই সমীক্ষার ফলাফল নিম্নে তুলনা করা হল।

১৯১৭-২৪ সালের রবার্টসন সমীক্ষা ও ১৯৪৪-৪৫ সালের ঈশাকের সমীক্ষা তুলনা করলে দেখা যায় গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া, শালতোড়া, ইন্দপুর, খাতড়া, তালডাংরা, রানিবাঁধ, রাইপুর ছাড়া অন্য থানাতে চাষ অযোগ্য পতিত জমির প্রায় সবটাই চাষযোগ্যে পরিণত হয়েছে।[৯৯]

	অকৃষিযোগ্য পতিত (একর)	**কৃষিযোগ্য পতিত (একর)**	**বাগিচা (একর)**	**আমন (একর)**	**অন্যান্য একর)**	**জেলার মোট এলাকা (একর)**
১৯৪৪-৪৫ সালের ঈশাকের কৃষিক সমীক্ষা	৩০৬৪৭	২৭৩৯০৮	১৭৫২৭	৫৭৬৩৮৭	৫১৯৫৯৩	১৬৯৩৮৮৬
১৯২৪ সালের কৃষি সমীক্ষা	৫১৪২৯৯	৩৭৫২৪০	১৬০৬৩	৪৩৯৫৭৪	৩৪৮৮৮৪	১৬৯৪০৬০

অর্থাৎ দুই দশকে অকৃষিযোগ্য পতিত জমি কমেছে ২০৭৮২১ একর, কৃষিযোগ্য পতিত জমি কমেছে ১০১৩৩২ একর, বাগিচা বেড়েছে ১৪৬৪ একর, আমন ধানের জমি বেড়েছে ১৩৬৮.১৩ একর, অন্যান্য ফসলের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭০৭০৯ একর। জঙ্গল থেকে কৃষিজমি উদ্ধারের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে গঙ্গাজলঘাটি (১৪ শতাংশ) ছাড়া আর কোনো থানার বিশেষ জমি ছিল না। বিভিন্ন কারণে (সেচের অভাব, অতিফলন জনিত অনুর্বরতা, জঙ্গল-নিকেশ জনিত ভূমিক্ষয় ইত্যাদি) ওন্দা ও রাইপুরের কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল যথেষ্ট।

পূর্বতন বিষ্ণুপুর পরগণার অন্তর্গত ওন্দা থানা এলাকায় ১৯৪৫-৪৬ সালের সমীক্ষায় আমন ও আউশ মিলিয়ে বিপুল ধানের ফলন (৪৮৫৮২.৬৯ একর) উল্লেখিত আছে। উল্লেখ্য, মল্লসময়ে ওন্দা পরগণা 'ধানের গোলা' হিসাবে অভিহিত হত। ১৯৪৪-৪৫ সালেও সেই ট্রাডিশন অব্যাহত ছিল। জঙ্গলমহল থানাগুলির মধ্যে রাইপুরের ফলন ছিল সর্বাধিক (সমীক্ষা মোতাবেক আমন ও আউশ মিলিয়ে ৬৫১২৫.২ একর)। উল্লেখ্য ১৭৬৭ সালে রাইপুরের উর্বর ক্ষেত ও ফসল দেখে কোম্পানী সমরকর্তা ফার্গুসন খুব অবাক হয়েছিলেন। এই ধারা ১৯৪৫ সালেও অব্যাহত ছিল। ইক্ষু, তৈলবীজ, ডালশস্য, পানের মতো অর্থকরী ফসলেও এই দুই থানা ছিল অগ্রগণ্য।

রবার্টসনের হিসাবে জেলার মোট এলাকা ১৬৯৩৮৮৫.০৪ একরের ৪৭ শতাংশে কৃষিকাজ হত। ঈসাকের সমীক্ষার ফলাফলে জেলার আমন এলাকা ছিল মোট ক্ষেতের ৬৮ শতাংশ, আউস ১৩ শতাংশ, গম ১.৫ শতাংশ, ভুট্টা ১.৫ শতাংশ, কলাই ৪ শতাংশ,

মুসুর ২.২ শতাংশ, খেসারি ০.৩৬ শতাংশ, মুগ ০.২ শতাংশ, অড়হর ০.২ শতাংশ, ইক্ষু ২.৭ শতাংশ, সরিষা ০.৩ শতাংশ, সব্জি ৬ শতাংশ, আলু ০.৩ শতাংশ।

ঈসাকের সমীক্ষায় অনিয়ন্ত্রিত বন ধ্বংসের কারণে বৃষ্টিপাত হ্রাস ও পতিত জমি বৃদ্ধি নিয়েও তথ্য আছে।

ভি. পি. আগরওয়াল সঠিকভাবেই লিখেছিলেন, "History shows many instances where countries once fertile and well watered are now impoverised and sterile, where ancient civilizations have disappeared to give place to tracts of rocky outcrop, or barren sand. In many case this is due to the destruction of the forests which once clothed these areas, aggravated by the misuse of land."[৪৬] বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত ১৯৪৪-৪৫ সনের ভূমি সমীক্ষায় এইচ. এস. এস. ঈশাক বাঁকুড়ার পতিত জমির পরিমাণ নির্ধারণ করেন, যা থেকে বাঁকুড়া ভূমিতে বনধ্বংসের কারণে এই অবক্ষয়ের রূপ অস্পষ্ট হয়। ১৯৪৪-৪৫ খ্রি. থানাওয়ারী কর্ষণযোগ্য অকর্ষিত পতিত ভূমির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

থানার নাম	মোট এলাকা (একর)	অকর্ষিত পতিত (একর)		
		ক্ষয়িত বনের পতিত	শুদ্ধ পতিত	মোট পতিত
বিষ্ণুপুর	৬০৮০০	৫৮৫.০২	৮৪১২.০৬	৮৯৯৭.০৮
জয়পুর	৩২৬৪০	৪১.০২	৫৩৯৬.৮০	৫৪৩৭.৮২
কোতুলপুর	৪৬৭২০	৪৩৮.৩৬	৪৩০৬.২৫	৪৭৪৪.৬১
সোনামুখী	৬৭২০০	৩৯৭.৭৩	৭৬৯৫.৩৩	৮০৯৩.০৬
পাত্রসায়ের	৬৬৫৬০	১৩০.৪২	৭০২৮.১১	৭১৫৮.৫৩
ইন্দাস	৬২৭২০	২৭৬.৬৫	৪৩৩৬.৭১	৪৬১৩.৩৬
বাঁকুড়া	১০০৪৮০	৪৮১১.৫৪	১২৮৩৩.৯৭	১৭৬৪৫.৫১
ছাতনা	১১০৭২০	২২.৪৭	২৩২০৫.০৯	২৩২২৭.৫৬
ওন্দা	১২৬৭২০	৮৩৪৬.৫৭	১২২২৮.৬৩	২০৫৭৫.২০
গঙ্গাজলঘাটী	৯২১৬০	১৪৩৯৩.৩৭	১৫৩৪৩.৪৯	২৯৭৩৬.৮৬
বড়জোড়া	৯২৮০০	৩৭১৪.৮৩	১০২২৩.৪০	১৩৯৩৮.২৩
মেজিয়া	৪০৩২০	৯১৯.১১	৬৯৮৪.৫৬	৭৯০৩.৬৭
শালতোড়া	৭৭৪৪০	১৬৮১.৬১	১৭৮১৯.৯০	১৯৫০১.৫১
ইন্দপুর	৭৪২৪০	৩২৩৪.৩২	১৫১৪৯.২২	১৮৩০৩.৫৪
খাতড়া	১০৬৮৮০	১৮৭৮.৮১	২০৫৬৮.৪৬	২২৪৪৭.২৭
তালডাংরা	৮৬৪০০	১০৯.৩৮	১১৪৭১.৪৮	১১৫৮০.৮৬

থানার নাম	মোট এলাকা (একর)	অকর্ষিত পতিত (একর)		
		ক্ষয়িত বনের পতিত	শুদ্ধ পতিত	মোট পতিত
সিমলাপাল	৭৬১৬০	৫০.৬২	৯৩২৪.৭১	৯৩৭৫.৩৩
রানিবাঁধ	১০৬২৪০	১.৬৫	১৪৯৯২.৯৬	১৪৯৯৪.৬১
রাইপুর	১৪৫২৮০	৪৭৯.৩২	১৯৭১১.২৭	২০১৯০.৫৯

উপরোক্ত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যায় ঔপনিবেশিক শাসনের সায়হ্নে বাঁকুড়ায় বিবিধ বননীতি সত্বেও অকর্ষিত পতিত জমি দাঁড়িয়েছে মোট ভূমি ভাগের ১৭.১ শতাংশ। তাছাড়া ছিল কর্ষণ অযোগ্য পতিত ভূমি। তাছাড়া ১৮৩২ খ্রি. উপজাতি অসন্তোষের পর "Scarcely any attempt had been made to cultivate the waste and jungle lands."[৯৮ক] অর্থাৎ এরপর পতিত জমি উদ্ধারের কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি।

অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, কৃষকের দুর্গতি :

বাঁকুড়ায় পৌনঃপুণিক দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল কৃষি ও কৃষকের, কারণ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয় মূলত অনাবৃষ্টি বা অজন্মার বছরে। চাষীর ঘর হত বাড়ন্ত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বড় দুর্ভিক্ষ ছিল ১৮৬৬ সালে (১৮৫১ সালে ফলন কমের কারণে সাধারণ চালের দাম বেড়ে দাঁড়ায় মণ প্রতি ৩/৫ টাকা, ধান মণ প্রতি ২.৯ টাকা)। ১৮৬৫ সালের অনাবৃষ্টিজনিত শস্যের ক্ষতি এই দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে। জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থা ছিল ভয়াবহ। বিষ্ণুপুর সন্নিহিত তাঁতিদের অবস্থা কৃষিশ্রমিকদের চেয়ে শোচনীয় হয়ে পড়ে। তবে কৃষকরাও শিশু-পুত্রের ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে পড়ে। ও'ম্যালী গেজেটিয়ার্স-এ বলেছে, "The agriculture labourers, who live by daily wages, were but a few degree better off; even their laborer, when employed, scarcely yielded enough for their own support and left no surplus for wife and children" দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এর ওপর বিষ্ণুপুরের কলেরা মহামারী বিষ্ণুপুরকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে তোলে। মানুষের মৃতদেহ দাহ করার সামর্থ্যও ছিল না। রাস্তা-ঘাটে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।[৯৯]

অজন্মার কারণে জেলার ক্রমবর্ধমান ধানের দাম ছিল, ১৮৬৬-র জানুয়ারিতে টাকায় ২৫ সের, এপ্রিলে ১১৭$\frac{৭}{৮}$ সের, মে মাসে ১০ সের, জুনে ৭.২৫ সের, জুলাইয়ে ৬$\frac{৯}{১৬}$ সের, আগস্টে ৬ সের, সেপ্টেম্বরে ৫$\frac{১}{৪}$ সের, অক্টোবরে নুতন ফসল উঠলে

অবস্থার উন্নতি হয়, দাম দাঁড়ায় টাকায় ১৫ ১/৪ সের, নভেম্বরে ১৭ সের।

১৮৬৬ সালে বাঁকুড়া থেকে কিছু কৃষি শ্রমিক রাণীগঞ্জে রেলপথের কাজে যোগ দিলেও দিনে মাত্র সর্বাধিক ২ আনা রোজগারের জন্য ফিরে আসে, কারণ এই রোজগারে জীবনধারণ ছিল অসম্ভব। বাঁকুড়া বাজারের চালের দাম আগস্টে দাঁড়ায় টাকায় ৮ সের। ক্রমে বাজারে চাল অমিল হয়ে পড়ে। রাইপুর ডাকাত অধ্যুষিত হয়ে পড়ে। গৃহস্থের চাল লুণ্ঠিত হতে থাকে। মানুষ মহুয়া পাতা ও ফুল খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকে। আগস্টে এখানে চালের দাম টাকায় ৩.৫-৪.৫ সের। হান্টার এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে লিখেছিলেন "Thirty-five poor wretches were dying daily of hunger, and multitude of deserted orphans were roaming the streets and subsisting on worms and snails" (Ref. F.H. Skrine, Life of William Wilson Hunter, pp-114,115) সেপ্টেম্বরের শেষে ভাদুই ফসলের প্রাচুর্য দেখা দিলে এই অবস্থার উন্নতি হয়। চালের দাম কমে হয় টাকায় ১২ সের।[১০০]

১৮৭২ সালে অনাবৃষ্টির কারণে ধানের ফলন অর্ধেকেরও কম হয়। ১৮৭৩ সালে অনিয়মিত বৃষ্টি ঘনত্বের (মে-জুনের বৃষ্টি স্বল্পতা, জুলাই-আগস্টে অতিবৃষ্টি, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অল্পবৃষ্টি) কারণে, আমন-আউশ ধানের ফলন মার খেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কৃষির এই দুর্গতি নিয়ে ও'ম্যালী যথার্থই লিখেছেন, "The greater distress occurred in July owing to the scanty railfall, for cultivation was delayed, the usual demand for field labour failed to arise, prices became dearer, and private charity ceased to support the destitude poor."

১৮৩৩ সালে ও ১৮৮৪ সালে অজন্মার কারণে ১৮৮৫ সালে বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চালের দাম বেড়ে দাঁড়ায় টাকায় ১৬.২৫ সের। ও'ম্যালী লিখেছিলেন, "–difficulty lay in the fact that the failure of the local crops restricted the labour market and forced on the government the necessity of providing employment for those whose circumstances prevented them from migrating in search of work."[১০১]

১৮৯৫-৯৬ সালে বৃষ্টি স্বল্পতার কারণে আমন ধান স্বাভাবিক ফলনের অর্ধাংশের কিছু বেশি উৎপাদিত হয়।[১০২] বিষ্ণুপুর মহকুমায় ১৮৯৪-৯৫ সালে যেখানে ১৮৫০০০ একর জমিতে আমন চাষ হয়েছিল, ১৮৯৫-৯৬ সালে মাত্র ৭০০০০ একর জমিতে ফসল পাওয়া গিয়েছিল। শালী-দামোদর নদীর মধ্যবর্তী ইন্দাস-সোনামুখীতে ফলন ছিল প্রায় শূন্য। সদর মহকুমার অন্যান্য জেলায় আমন ফলন দাঁড়ায় ৫৫ শতাংশের কম, বেশির ভাগ জায়গায় ২৫ শতাংশের কম (শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি,

রাইপুর, সিমলাপাল)। কেবল ইন্দাস কোতুলপুরে ছিল ৬৩ শতাংশ মতো। তালডাংরা ও বড়জোড়ায় ৩৮ শতাংশ, ছাতনায় ৩১ শতাংশ। ভাদুই ফলন ছিল গড়পড়তা, রবি ফলন স্বাভাবিকের ৪৩ শতাংশ। অল্প ফলন ও জেলা থেকে যথেচ্ছ রপ্তানীর কারণে ধানের দাম ক্রমে বাড়তেই থাকে। ১৮৯৪ সালের অক্টোবরে দাম টাকায় ১৮ ৩/৪ সের, ১৯৯৫ সালে সেপ্টেম্বরে ১৬.২৫ সের, অক্টোবরে ১৮ ৩/৪ সের, ১৮৯৬ সালের অক্টোবরে টাকায় ১০-১১ সের যা ১৮৯৭ সালে এপ্রিল পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিল। ১৮৯৭-র মে মাসে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে দাম বেড়ে হয় টাকায় ১০ সের, সোনমুখী-গঙ্গাজলঘাটিতে টাকায় ৮-৯ সের। স্বভাবতই কৃষকরা ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। বৃষ্টির স্বল্পতা ও কৃষি ফলনের ব্যর্থতাজনিত কৃষক দুর্গতি দেখা গিয়েছিল ১৯০৮, ১৯১৬, ১৯১৯, ১৯২৫, ১৯২৮, ১৯৩৭, ১৯৩৯, ১৯৪৩ ও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।[১০৩]

বর্গী আক্রমণে রায়ত দুর্গতি, কৃষক উৎখাত বা Depeasantization :

১৭৪২ সালে ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী বাহিনী শহর বিষ্ণুপুরের দক্ষিণদ্বারে হাজির হয়ে দলমাদল কামান বাহিনীর মুখে পালিয়ে এলেও অরক্ষিত বিষ্ণুপুর পরগণায় লুণ্ঠন ও অত্যাচারের মাধ্যমে কৃষি সমাজের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে এই ধ্বংসলীলা নিয়ে ভাষ্য,[১০৪] "Sacking the villages and towns of the surrounding tracts, and engaging in slaughter and captures, they set fire to granaries, and spread no vestiges of fertility. And when the stores and granaries of Burdwan were exhausted, and the supply of imported grains were also completely cut off, to avert death by starvation, human being ate plantain roots......murderous freebooters drowned in the rivers a large number of the people, after cutting their ears, noses and hands.... burnt them with indescribable tortures." পরগণার বর্ধিষ্ণু মালবেরী রেশম চাষ বন্ধ হয়ে যায় কারণ এই গাছগুলি বর্গী ঘোড়াদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল।[১০৪ক] বর্গী ও ঘোড়ার অবাধ বিচরণের আতঙ্কে রায়তরা দেশত্যাগী হয়। হান্টার সুন্দরভাবে লিখেছিলেন, "Under the Muhammadan system, a family was secure in proportion as it was near the frontier..... The Marathas fell with their heaviest weight upon the border principalities of Birbhum and Bishnupur. Tribute, free quarter, forced services, exaction of a hundred sorts, reduced the once prosperous frontier houses to poverty; and their tenants fled from a country where the peasant had become a mere machine for growing

food for the soldiers.... The Marathas spent their energy in plundering the intervening frontier tracts of Birbhum and Bishnupur, where the dry soil and fine undulating surface afford precisely the riding ground which their cavalry loved.” রাঢ় নিবাসী গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র-পুরাণ ও বর্ধমানরাজের সভাকবি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার রচিত চিত্রচম্পুতে এই আক্রমণের ভয়াবহতা অঙ্কিত আছে। সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল ওন্দার ধরাপাট, রামসাগর, যাদবনগর, পাইকপাড়া, সোনামুখী বর্গীদের হাতে শ্মশান হয়ে পড়ে।[১০৫] রায়তরা ভয়ে বর্গী প্রভাবশূন্য গঙ্গার পূর্ব পাড়ে পলায়ন করেন। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে হদলনারায়ণপুর, জয়পুর, শিলদা, মেজিয়া, রামচন্দ্রপুর, ছাতনা ছিল বর্গী উপদ্রুত। এটা ছিল বাঁকুড়ার প্রথম কৃষক উৎখাত বা Depeasantization.

কৃষক বিদ্রোহে বাঁকুড়া :

দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে কৈবর্ত বিদ্রোহের অভিঘাত বাঁকুড়ায় কতটা অনুভূত হয়েছিল তা বিতর্কিত।[১০৬] কিন্তু কয়েকটি বিষয় এ জেলার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত এই বিদ্রোহ রাজবৃত্তের বাইরে ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁদের ওপর অনাচারের বিরুদ্ধে এ ছিল বরেন্দ্রভূমির তথা বাংলার কৈবর্ত জনসাধারণের সম্মিলিত প্রতিবাদ। দ্বিতীয়তঃ কৈবর্তদের জীবিকা অর্জিত হত চাষ ও মাছ ধরার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় মহীপাল মাছ ধরা, নৌকা ব্যবহার ও সামগ্রিকভাবে প্রজা সমাজের উপর রাজস্ব আগ্রাসন চালালে স্বভাবতই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এরাই। বাঁকুড়া পাল প্রভাবের প্রমাণ মেলায় ও কৈবর্ত বসতির আধিক্য থাকায় এই বিদ্রোহে তাদের সমর্থন অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাঁকুড়ায় ১৮৯১ সালের সেনসাস অনুসারে কৈবর্ত জাতির সংখ্যা ছিল ২২৪৯১। সন্নিহিত আরামবাগ মহকুমায় এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৮৭২ সালের জনগণনায় সন্নিহিত হুগলি জেলার ৪০ শতাংশ, সংখ্যায় ২৮৮৬২১ জন।[১০৭] তৃতীয়তঃ বিদ্রোহের সময় আরম্যনগর-মন্দারণের উদীয়মান শক্তি সেনরা বিদ্রোহের সময় পাল-বিরোধী অবস্থান নিয়েছিল, সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠ কৈবর্ত প্রজাদের চাপে বা ভবিষ্যত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্বপ্ন সফল করার কৌশল হিসাবে। এমনকি মহীপালের কাছ থেকে সে রাজ্য উদ্ধারের প্রচেষ্টাতে, রামপালের আহ্বানে বাঁকুড়ার সামন্ত বীরগুণ ও লক্ষ্মীশূর সাড়া দিলেও, বিজয় সেন অস্বীকার করেছিলেন সম্ভবত পূর্বোক্ত কারণে। এমনকি এরপর তিনি বীরগুণকে ক্ষমতাচ্যুত ও শূরদের নিষ্ক্রিয় করতেও সফল হন। সেই প্রয়াসে কৈবর্ত প্রজাদের সদর্থক ভূমিকা অসম্ভব কিছু নয়।

ঔরঙ্গজেবের অতিরিক্ত রাজস্ব আগ্রাসন, হিন্দুবিদ্বেষী জিজিয়া কর আদায়ের বিরুদ্ধে চেতুয়া-বরদারাজ ও বিষ্ণুপুররাজের জোট যেভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে ঔরঙ্গজেবের শাসন অন্তর্হিত করেছিল তাতে অবশ্যই অত্যাচারিত জনগণের যোগদান ছিল। অবশ্য বর্ধমান অভিযানকালে চেতুয়ারাজের মৃত্যু, ঔরঙ্গজেবের নতুন অভিযান, এ সময় বিষ্ণুপুর রাজের শিবির পরিবর্তন, বিদ্রোহ দমনের সহায়ক হয়।

১৭৬০ সাল থেকে বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকাল থেকে রাজস্ব আরোপ ও আদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত রাজন্যবর্গের পাশাপাশি সাধারণের যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[১০৮] ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে রুদ্র বাউরীর নেতৃত্বে অম্বিকানগর, খাতড়া, সুপুর অঞ্চল বিদ্রোহ কবলিত হয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহীগণ জেলাসদর বিষ্ণুপুর অভিযান করলে ইংরেজ ফৌজদার পরাজিত হয়। জোতদারদের কুঠি লুণ্ঠিত হয়। এদের কার্যকলাপ কর্ণগড়, বলরামপুর, পাঞ্চেতেও বিস্তারলাভ করে। ১৭৮৪ সালে ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে জেরবার ইংরেজ শাসকরা রায়তদের সাথে সমঝোতার নীতি নেয়। কোম্পানী এক শ্রেণির রায়তকে পাট্টা দিয়ে শান্তি ও শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির নীতি নেয়। ১৮ জন সর্দারকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় পাঠালে এই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

রুদ্র বাউরীর বিদ্রোহের সময় কোম্পানী ইঙ্গ-মহীশূর (১৭৮৪ সাল থেকে যুদ্ধ শুরু) বিরোধে ব্যতিব্যস্ত ছিল। স্বভাবতই বিদ্রোহী রায়তদের মধ্যে পাট্টা বিলি করে কোম্পানী শান্তির পথে যায়। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে রুদ্র বাউরীর এই কর্ম ও জীবনের সম্মানে অম্বিকানগরের কাছেই একটি গ্রামের নাম হয়েছিল রুদ্রা। রুদ্র বাউরীর অন্ত্যজ বিদ্রোহের মতোই বর্ধমান, পাঞ্চেত, বিষ্ণুপুর পরগণায় বিস্তীর্ণ অংশে ১৭৮৬ খ্রিঃ - ১৭৮৯ খ্রিঃ সময়কালে পাঞ্চেতের থানেদার জীবন সিং, ভাই বিষ্ণু সিং, ভবানী সিং, ভুবন হাঁড়ি, গৌরি হাঁড়ি, শিব হাঁড়ি, ভবানী সিং, উদিত লালের মতো বর্ণেতর রায়তদের নেতৃত্বে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল।

রাইপুরের দুর্জন সিংহের বিদ্রোহ পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জীবিকা-জমি হারানো সর্দার-পাইকদের বিদ্রোহ সমান্তরালভাবে রাইপুরকে রণাঙ্গণ করে তুলেছিল। ৫ই মার্চ, ১৮০৮ খ্রিঃ কালেক্টর ব্লান্ট বিচার সচিবকে বিষ্ণুপুরে ৩রা মার্চ সংঘটিত চোয়ার আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দেন। ৩০০ জন সশস্ত্র চোয়াড় বিষ্ণুপুর সন্নিহিত জঙ্গলে সমবেত হয়। ২০ জনের একটি ঘাটোয়ালের দল এদের সন্ধানে গেলে মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়, ৪ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। বাকিরা জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে বাঁচে। পরের দিন পুলিশ অনুসন্ধানে গিয়ে এদের খুঁজে পায়নি। কালেকটর ১৮ বছরের মারাত্মক জখম ছেলেটির জন্য ৫০ টাকা, আহতদের ২০ টাকা, মৃতদের পরিবারকে বৃত্তি, চোয়াড়দের ধরার পুরস্কার স্বরূপ ১০০ টাকা সুপারিশ করেন।

তিনি বলেন যে ঘাটোয়ালের এলাকা দিয়ে এরা এসেছে এবং যে জমিদার এদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের নির্দিষ্ট করে শাস্তি দিতে হবে।[১০৯]

৯ ই মার্চ বিচার সচিবকে তিনি জানান এই আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল রাইপুরের (ডোমপাড়ার) সর্দার বৈদ্যনাথ সিংহের লোকেদের দ্বারা। সেনাপত মহলের সর্দারকে গ্রেপ্তার করা হয়, এদেরকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে বিষ্ণুপুর লুণ্ঠনের চক্রান্ত করার অভিযোগে। উল্লেখ্য, ১৭৯৩-৯৪ সালে জেলা কালেকটর অসওয়াল্ড সেনাপত মহলের খাজনা দ্বিগুণ করে নীলামের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রধান কর্মচারীকে অধিকার দেন। তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ করেন, এই চোয়াড়দের দমন করার জন্য মেদিনীপুর থেকে রাইপুরকে বিচ্ছিন্ন করে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে। উল্লেখ্য, এই অসন্তোষের পেছনে দুর্জন সিংহের হাত আছে বলে অনেকে মনে করলেও, বিপরীত মতও আছে। যাই হোক বৈদ্যনাথকে জেলবন্দি করে শাস্তি দেওয়ার ফলে এই বিদ্রোহ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের অন্য দুই নেতা ছিলেন কুইলাপালের তালুকদার বীর সিং ও রাইপুরের খোরশোলের দিগর সর্দার বৃন্দাবন। জেলেই মারা যান বৈদ্যনাথ। উল্লেখ্য, এই একই সময়ে ওন্দার ডোমপাড়া অঞ্চলে সমবেত চুয়াড়দের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্ষমতাচ্যুত মল্লরাজপুত্র মাধব সিংহ। আর রাজপরিবারের অন্য সদস্য নিমাই সিংহ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, গৌরমোহন সিংহ প্রমুখ নিজ নিজ এলাকায় বিদ্রোহী ভূমিকা নেন। এই প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় বর্ধমানরাজ তেজচাঁদের একটি অভিযোগপত্রে (সূত্র ঃ বিচার সচিবকে কালেকটর ব্লান্টের ৯ ই মার্চ, ১৮০৮ সালের পত্র)। এই পত্রে তাঁর অভিযোগ ছিল ১৯০৮ সালের ২৫শে মার্চ পাত্রসায়েরের নামকড়ি হাজরার দল, বাড্ডা থেকে বাঞ্ছারামের নেতৃত্বে ২৫ জন, মনসুরপুর থেকে রামকানাই ঘোষের নেতৃত্বে ৫০ জন, বলরামপুর থেকে ৫০ জন,হামিরপুর থেকে ভীমদিগরের নেতৃত্বে ৫০ জন, সেনাপতমহল থেকে ২৫০ জন মোট হাজার খানেক চুয়াড় পাত্রসায়েরের কোম্পানী কুঠি আক্রমণ করে তাঁর প্রতিনিধি খোসল সিং সহ দুজনকে মারাত্মক আহত করে।[১১০] খোসল নিকটস্থ কোম্পানী কুঠিতে পালিয়ে জীবন বাঁচান। রাজার অভিযোগের অভিমুখ ছিল মল্লরাজ বংশের দিকে। ব্লান্ট এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে জমিদারদের দ্বারা ঘাটোয়াল, পাইকান ও নিরাপত্তাকর্মিদের পঞ্চকি জমি সংক্রান্ত কোম্পানী-নীতি রূপায়ণে অপারগতাকেই অসন্তোষের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন— "Court has been under the necessity of enforcing against the Zamindar the penalty prescribed by Sec. 21st of Regulation XII, 1807 in consequence of his repeated failure to furnish the list of Village Paiks– to

prevent interruption to the tranquility of the Zamindary, it rests with the Zamindar to apply most effectual remedy to the evils complained of, by a temporary relaxation of those demands, the indiscreet enforcement of which in the present temper of the inhabitants of the Pergunnah is likely to be productive of mischief, without any material advantage to himself." উল্লেখ্য মাধব সিংহ বাঁকুড়া শহর আক্রমণের আয়োজন করে গ্রেপ্তার হন। এইসব বিদ্রোহের গ্রেপ্তার হওয়া বিদ্রোহীদের স্থান দিতে সরকারকে ১৮০৯ সালে ২২২৫ টাকায় একটি পাকা জেলখানা নির্মাণ করতে হয়।[১১১]

কালেকটর এইচ. পি. রাসেলের ১০/০৮/১৮৩৩ তাং পত্র থেকে জানা যায় কুইলাপাল, ডোমপাড়া, বরাভূম, পাতকুম ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু (অন্য পাশে ঘাটশিলা, শিলদা, সিংভূম, মানভূম, বরাভূম)। কুইলাপালের সৃষ্টিই হয়েছিল মানভূম, সুপুর, ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুরের জমিদারদের আনুকূল্যে, যাতে করে তাদের তালুকে কৃষি ও কৃষকের উপর কোনো আক্রমণ না হয় অর্থাৎ তারা সুখনিদ্রায় থাকতে পারে (এই স্বত্বটির নাম ছিল সুখনিদী স্বত্ব)। ১৮০৮-১০ সালের বিদ্রোহে তিন নায়ক কুইলাপালের বীরসিংহ, ডোমপাড়ার বৈদ্যানাথ সিং, খোরশোলের বৃন্দাবন সিং মূলত ভূমিজ অন্ত্যজ শ্রেণির কৃষক-রায়তদের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। দুই দশক পরে বীরসিংহের সন্তান বাহাদুর সিংহ, বৈদ্যনাথের ভাইপো রঘুনাথ সিংহ, বৃন্দাবনের ছেলে প্রতাপ সিংহ পূর্বসূরিদের মতোই বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে রাখেন। শাস্তিস্বরূপ এদের জোতজমি জোর করে সন্নিহিত জমিদারির সাথে সংযুক্ত করা হয়। কুইলাপালের আরেক বিদ্রোহীর নাম সুবলা সিং যিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।[১১২]

১৮৩৩ সালে বরাভূমের গঙ্গানারায়ণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান চালান তাতে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল থানাগুলি পুরোপুরি বিদ্রোহীদের কবলে চলে যায়। একই সময়ে রাইপুরে তিন বিদ্রোহীর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই অভিযানে গঙ্গানারায়ণের সহযোগী ছিলেন ফুলকুসমার জমিদার দর্পনারায়ণ ও শ্যামসুন্দরপুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ দেব, তার ভাইপো আইঠুদেব। এরা মালিয়াড়া লুণ্ঠন করে। বাঁকুড়া শহর অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ইংরেজের একটি সামরিক বাহিনী গঙ্গানারায়ণের খোঁজে অগ্রসর হলে তিনি মটগোদার রাজাকাটা নামক আশ্রয় থেকে পাতাকুম হয়ে সিংভূমের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ইংরেজরা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য ফুলকুসমা ও শ্যামসুন্দরপুরের জমিদারকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দেন (রাজাকাটা জঙ্গল নামে পরিচিত)। এর আগে গঙ্গানারায়ণ প্রজন্মের লাল সিং জঙ্গলমহলে আবার একবার বিদ্রোহের ঢেউ তোলেন।[১১৩]

এইসব বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ জোতের মালিক, যারা নিজে বা মুনিষ, মাহিন্দার, উপ-রায়ত দিয়ে জমি চাষ করত। এলাকায় প্রভাবশালী, স্থানীয় মানুষদের সমর্থনপুষ্ট (কারণ স্থানীয় মানুষ ছিল সর্দারদের জোতের উপর নির্ভরশীল) এই ক্ষুদ্র ভূস্বামীরা সাধারণ কৃষকদের আশা, আশঙ্কার প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন। তাই বীর সিংহ, বৈদ্যনাথ সিংহ, বৃন্দাবন সিংহ ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বাহাদুর সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, প্রতাপ সিংহ, অঞ্চল সিংহ এবং সুবলা সিংহ, গঙ্গা, লাল সিংহদের বিদ্রোহে সাধারণ মানুষদের যোগদান ছিল ব্যাপক ও স্বতস্ফূর্ত। এমনকি ১৭৭১ সালে জেলায় সন্ন্যাস আগমনের সময়ও সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।[১১৪] জোতদারদের কুঠি এদেরকে চিনিয়ে দেয়। এই অত্যাচারী জোতদারদের গোলা লুণ্ঠনে তাদেরকে সাহায্য করে। এমনকি ১৭৮৯ সালের পাহাড়ী দস্যুরা যখন বিষ্ণুপুর অবরুদ্ধ করে, স্থানীয় রায়তরা ব্যাপকভাবে তাদের সাহায্য করে শহরের দখল নিতে এবং জোতদার-সরকারি কোষাগার লুণ্ঠনে। এই যূথবদ্ধ রায়তরাই পাহাড়ীয়াদের দ্বারা স্থানীয় রায়তদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তাদের পরের বছর এলাকা ছাড়া করে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনের শুরুতেই রায়তদের প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত হতে থাকে। এমনকি ১৮৩৬ সালে বর্ধমান জমিদারির দাবিদার জনৈক প্রতাপচাঁদ বাঁকুড়া শহরে নিজের দাবির সমর্থনে ৫০০ সশস্ত্র অনুচর সমেত প্রবেশ করলে, তার পেছনে ছিল ক্ষেত্রমোহনের মতে মল্লভূস্বামী ও অনেক রায়তদের সমর্থন।[১১৫] আগেই বলা হয়েছে ১৭৮৬-৮৭ সাল থেকেই রায়তরা কীভাবে জেলা সদরে সমবেত হয়ে জেলাশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে অত্যধিক রাজস্ব মকুবের দাবি করতেন। জেলাশাসক শেরবোর্ন বলেছিলেন, 'জমিতে চাষ না করে জেলা সদর ঘেরাও করা এদের বার্ষিক স্বভাবে পরিণত হয়েছে।' এই সাধারণ রায়তরাই বাঁকুড়ার উজ্জ্বল কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের প্রকৃত কুশীলব।

কৃষক জীবন :

কৃষি সমাজের শীর্ষে ছিলেন রাজা বা রাজানুগৃহীত জোতমালিক। ব্যবসা ও রাষ্ট্রসেবার সুবাদে অনেকে প্রচুর জমির মালিক হয়েছেন। যেমন কোতুলপুরের ভদ্র, পাত্রসায়েরের হাজরা, জয়বেলিয়ার পাত্র, ময়নাপুরের মুখার্জী, ওন্দার বেলিয়ায় চট্টোপাধ্যায়, বিহাজুড়িয়ার রায়, মালিয়াড়ার অধর্য্যু, পাঁচাল গ্রামের ব্রাহ্মণ, পোখন্না গ্রামে রায়, নড়রার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।[১১৬] তাছাড়া ছিল ব্রাহ্মণ-পীরদেরকে দানকরা জমি ও রাষ্ট্রসেবকদের সেবা-বিনিময় জমি। এদের প্রায় পুরো অংশই ছিল অনুৎপাদক শ্রেণি (অর্থাৎ তাঁরা নিজেরা চাষ না করে মুনিষ, মাহিন্দার দ্বারা বা অধস্তন রায়ত

বসিয়ে চাষের কাজ চালাত)। এদের নিচে ছিল তিলি, গোয়ালা, সদগোপ, মাহিষ্য, উগ্র ক্ষত্রিয়, খয়রাবর্গের কৃষকরা। এরা সাধারণত নিজে চাষ করত বা খুব প্রয়োজনে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করত। মুনিষ, মাহিন্দারদের প্রথাগতভাবে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হত। প্রতি বাংলা সনের পৌষ সংক্রান্তি ও শ্রীপঞ্চমীর মধ্যেই জোতদার ও চাষীদের মধ্যে মাসিক বেতন, অন্যান্য প্রাপ্য, কাজের পরিধি সম্পর্কিত পাকা কথা হত। মুনিষ, মাহিন্দারদের বাৎসরিক মজুরি ছিল ৩০-৩৬ টাকা (১৯০৮ সালের ও'ম্যালীর গেজেটিয়ার্স প্রতিবেদন)।[১১৭] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শস্যে মজুরি দেওয়া হত। কৃষক (মুনিষ/মাহিন্দার) বীজ, বলদ, শ্রমের বিনিময়ে পেত অর্ধাংশ। মালিক বীজ, বলদ দিলে কৃষকের জুটত এক তৃতীয়াংশ ফসলের ভাগ। সদগোপ, তাম্বুলি, তিলি, গোয়ালাবর্গের মানুষরা ছিলেন ক্ষুদ্র চাষী। দিনমজুর (মুনিষ) বা বাঁধা ভৃত্য (মাহিন্দার) হিসাবে কাজ করতেন বাউরী, বাগদি, লোহার, কোড়া, খয়রা, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। জমি হাসিলের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয় ঘাটোয়ালেরা শক্তিশালী কৃষি শক্তিতে পরিণত হয়। মেষপালক গোপ বর্ণের মানুষরাও ক্রমে ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়ে কৃষিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয়। ১৮৬৮-৬৯ সালে বাঁকুড়ার জোতের আকার ও সংখ্যা নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর পরগণার কৃষি ব্যবস্থা বর্ধমানরাজের পত্তনি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল।[১১৮] ১৮৭৬ সালে বাঁকুড়ায় এমন পত্তনি তালুকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৩১। এই তালুকদারদের শ্রেণি বিশ্লেষণে দেখা যায় বেশিরভাগ পত্তনিদারই ছিল বাঙালি বা অবাঙালি ব্রাহ্মণ। বাকিরা ছিলেন বৈশ্য, কায়স্থ, সদগোপ, উগ্রক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, মাড়োয়ারী, মুসলমান। এদের বেশিরভাগই নিজের পেশাগত কাজে ব্যস্ত এবং শ্রমবিমুখ। ফলে প্রকৃত মাঠে ফসল ফলাত বাউরী, বাগদি, সাঁওতালরাই। এমনকি মোকরারি রায়তী স্বত্বভোগী সদগোপ, তিলি, তাম্বুলি, গোয়ালা, আগুরি, মাহিষ্যরাও দখলী জমির একাংশ নিজেরা চাষ করলেও বাকি অংশের চাষ হত সেই বাউরী, বাগদি, সাঁওতালদের দ্বারা। বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, দ্বিতীয় ভাগ (পৃঃ ১৪) গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে, রায়তি জমিতে চাষীরা চাষাবাদ করত।[১১৯] এছাড়া জমির ভদ্রলোক মালিকরা খামারে জমির খানিকটা অংশ তাদের তত্বাবধানে রেখে বাকি জমি ভাড়াটে মজুর দিয়ে চাষ করাত। এ প্রথা বহুদিন ধরে চলে আসছে। বাঁকুড়া জেলায় পুরো জমির ২৩ শতাংশ মালিকদের কিংবা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে ছিল এবং ৪৬ শতাংশ রায়ত ও অধস্তন রায়তদের হাতে। বাকি অনাবাদি জমি জঙ্গলের উপর জমিদারদের প্রাথমিক অধিকার বলবৎ ছিল। ফলে জমিতে অধিকারহীন শ্রমিক ও ভাগচাষীর সংখ্যা এ জেলায় ছিল অনেক বেশি। উল্লেখ্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে, পরবর্তীকালে সপ্তম আইনে সাধারণ রায়তদের

সুরক্ষিত করার কোনো উদ্যোগ ছিল না। ক্রমবর্ধমান কৃষক অসন্তোষের মুখে (সিমলাপালে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক অসন্তোষ আদালত পর্যন্ত গড়ায়, গঙ্গাজলঘাটির প্রজারা গিসবর্ন কোম্পানীর প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল) ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে রায়তি সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১২ বছরের দখলদার কৃষককে রায়তি অধিকার দান এড়াতে ১৫ বছর আগের ব্যবস্থায় ভূমি ব্যবসাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। রায়তি জমি অধস্তন রায়তদের ভাড়া দেওয়া হয়েছিল এমন জমি ছিল ৪ শতাংশ।

বৃহৎ জোতমালিক জেলায় নগণ্য হলেও তাদের মধ্যেও আর্থ সামাজিক বিভিন্নতা ছিল। ১৯৩৮-৮০ সালের একটি ভূমি সমীক্ষায় ৬৭৩টি পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে গড় জমি পাওয়া গিয়েছিল ৮.১৭ একর। ২ একরের কম জমি দখলে ছিল ৫৩.৭শতাংশ রায়তের; ২-৩ একর ৮.৯ শতাংশ, ৩-৪ একর ৭.৮ শতাংশ, ৪-৫ একর ৪.৫ শতাংশ, ৫-১০ একর ১৪.৮ শতাংশ এবং ১০ একরের বেশি ১০.৩ শতাংশ রায়তের।

বাঁকুড়া জেলা থেকে রায়তদের অভিবাসন ঘটেছিল তিনটি পর্যায়ে। প্রথমটি অষ্টাদশ শতাব্দীর চারের ও ছয়ের দশকের ভয়াবহ বর্গী হাঙ্গামার সময়। দ্বিতীয়টি ১৭৭০ সালের মর্মন্তুদ মন্বন্তরের পর। তৃতীয়টি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহাজনদের দ্বারা সাঁওতাল নিপীড়নের কারণে। ১৯০৯ খ্রিঃ ম্যাকালপিন প্রতিবেদনে এমন সাঁওতাল বিতারণের বেশি ঘটনা ধরা পড়েছে শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমায়। এখানে ভূমিচ্যুতির ঘটনা ছিল ৫০-৭৫ শতাংশ। ১৮৬৫-৬৬ সাল (বাহাত্তরের মন্বন্তর) থেকে ১৯১৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনীতে আদিবাসী জমি হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া পর্যন্ত এই ভূমিচ্যুতি ছিল ব্যাপক।[১২০] মূলত শুঁড়ি, পোদ্দার, তাম্বুলি মহাজনরাই এই কাজে জড়িত ছিল। এই পর্বে ইংরেজ শাসকরা রায়তদের জমি বিক্রয়ের অধিকার (জমিদারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও) দিলে অক্ষম বা ঋণগ্রস্ত রায়তদের কাছে থেকে জমি ক্রয়ের মহাজনী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ সালের জেলাশাসকের প্রতিবেদনে রায়তদের কাছ থেকে জমি ক্রয়ের মহাজনী তৎপরতা চিত্রিত আছে। এই প্রতিবেদনে জেলায় এমন হস্তান্তর পূর্ববর্তী ১৫ বছরে ৩৩ শতাংশ বলা হয়েছিল। ১৯১৭-২৪ সালের রবার্টসন প্রতিবেদন মোতাবেক এই ভোগদখলী স্বত্বাধিকারী চাষীর কাছে জমি ছিল ৭৮৫৭৩৬ একর, পত্তনিদার-খাস জমির মালিকের কাছে ৩৯৪০১৩ একর।[১২১] হস্তান্তরের ফলে খাস জমির পরিমাণ বেড়েছিল। বাঁকুড়ায় মধ্যস্বত্বাধিকারীরাই ছিল মহাজন। ফলে রায়তরা এদের ঋণজালে একবার ধরা দিলে জমি না হারানো পর্যন্ত মুক্তি ছিল না। বাউরী, বাগদি, হাঁড়ি, ডোম, সাঁওতাল জাতিভুক্ত মাহিন্দার মুনিষদের একসময় জমি থাকলেও, এই ভাবেই ভূমিহীন হতে হয়েছিল। ১৯২১ সালের সেনসাসে

বাঁকুড়ায় ভূস্বামী কৃষি পরিবার, চাষী ও মজুরের অনুপাত ছিল ৪.১৮ : ৬৮.৩৯ : ২৭.৮৩। মদভাটি ও গোলদারি দোকান এই কৃষকদের আরো ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুদির জিনিস, কৃষির প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ, হিসাবে কারচুপি, ওজনে প্রতারণা এদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করল। নিজ জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে দ্বিগুণ ফসলের শর্তে সেই জমিতেই পুনর্বাসিত হত রায়ত। এই সাজা প্রথা, বর্গা প্রথার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল জঙ্গলমহল জেলাগুলিতে।

রবার্টসন কৃষকের দারিদ্র নিয়ে একটি হিসেব পেশ করেছিলেন। তাঁর হিসাবে সদর মহকুমায় ৫৪০০৩৭ একর জমিতে জোতের সংখ্যা ছিল ২১৯৫৬৪, অর্থাৎ প্রত্যেকের ভাগে গড় ২.৪৬ একর এবং বিষ্ণুপুর মহকুমায় এই সংখ্যাগুলি হল যথাক্রমে ২৪৫৬৯৯, ২০৩১৬৭, ১.১৯। জেলায় ৭৮৫৭০ একরে ৪২২৭৩১ জোত, কৃষক প্রতি গড় ১.৮৬ একর। এই সময় গ্রামাঞ্চলে ২১৪৩০২ পরিবার বাস করত বলে পরিবার প্রতি গড় জোত ছিল দুটি। অর্থাৎ রবার্টসনের হিসাবে কৃষক পরিবার প্রতি জমি দাঁড়ায় ১.৮৬২ = ৩.৭২ একর বা ১১.১৬ বিঘা। বৃষ্টিনির্ভর এই জেলায় দোফসলী জমি ছিল ১০ শতাংশেরও কম, জমির ৬১ শতাংশ ছিল ধানি জমি। একর প্রতি উৎপাদন ছিল ১৫.৭ মণ। তাই কৃষক জোত থেকে পেত ২১ মণ ৮ সের চাল (একটি জোতের ১৭.৭৪ মণ ধান থেকে মিলত ১০ মণ ২৪ সের চাল) যা একটি সাড়ে চার জন সদস্য বিশিষ্ট কৃষক পরিবার দু'বেলা গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না (প্রত্যেক দিনের প্রয়োজন ৮ সের)। ১৮৭১ খ্রিঃ কালেকটরের হিসাবে ১৫ বিঘা জমিতেও এমন কৃষক পরিবারের চলবে মাত্র ৮ মাস। মহাজনদের ঋণজালে ভূমিচ্যুতিঅবস্থা আরো খারাপের দিকে নিয়ে যায়। ১৮৭৮ খ্রিঃ কৃষি ঋণের সুদের হার ছিল ১৮-৩৬ শতাংশ। ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্কিং তদন্ত প্রতিবেদন মতে জেলায় বার্ষিক সুদের হার ছিল ১৫-৩৭ শতাংশ। এই আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়ে ১৯১৭-২৪ সালের ভেতর এক চতুর্থাংশ রায়তই সাজা প্রথার কৃষকে পরিণত হয়েছিল। এসময় জেলার মোট জনসংখ্য ১০১৯৯৪১ জনের ২৭ শতাংশ ছিল ক্ষেতমজুর। কম মজুরি আর ঊর্ধ্বমুখী দামের কারণে এদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ক্ষেতমজুরি ছিল বাৎসরিক ৩০-৩৬ টাকা। মুনিষের দৈনিক মজুরি ৪ পাই ধান, কামিনের ৩ পাই। নগদে ১ আনার কিছু বেশি। চালের দাম ছিল ১৯০৫-০৬ সালে টাকায় ১৩.৫ সের, ১৯০৬-০৭ সালে $৯\frac{১}{৮}$ সের, ১৯০৭-০৮ সালে $৭\frac{৩}{৪}$, ১৯০৮-০৯ সালে $৮\frac{১৫}{১৬}$, ১৯২১-২২ সালে $৫\frac{৫}{৮}$ সের। বিভিন্ন সালের ক্ষেতমজুরি ও চলের দাম বিশ্লেষণ করলে মজুরদের দুর্দশা উপলব্ধি করা যাবে।[১২২]

সাল	মুনিষ মজুরি (পুরুষ)	মুনিষ মজুরি (স্ত্রী)	চালের দাম (সের/ছটাক প্রতি টাকা)	ছোলার দাম (সের/ছটাক প্রতি টাকা)
১৮৯৩	৩ আনা	১.৫ আনা	১১/১২	১৩/৮
১৮৫৯	৩ আনা	১.৫ আনা	২০/১০	১৬
১৮৯৭	৩ আনা	১.৫ আনা	১১	১০
১৯০০	৩.৫ আনা	১৩/৪ আনা	১৫	১৫
১৯০২	৩ আনা	১৩/৪ আনা	১৫/৮	১৫
১৯০৫	৩১/৪ আনা	১৩/৪ আনা	১৬	১৪
১৯০৭	৪১/৪ আনা	৯	১২/৮	—
১৯০৯	৪ আনা	১১/২ আনা	১০/৮	৯
১৯১১	৫ আনা	২.৫ আনা	১৩	১৪/৪
১৯১২	৫ আনা	১২	১৩	—

১৯২৯ সালের মন্দা ও ১৯৪৩ সালের পঞ্চাশের মন্বন্তরে জমি কৃষকের হাতছাড়া হয় আরো বেশি।[১২৩] ১৯৪৩ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৫৫১টিতে। এমনকি সর্দার, ঘাটোয়ালদের অধিকাংশের জমি হাতছাড়া হয়। রবার্টসনের সমীক্ষায় অর্ধেক জমি ছিল জমিদারের দখলে, ৪ শতাংশ রায়ত ও অধস্তন রায়ত, ১৬ শতাংশ ফসলে সাজা দেওয়া কৃষকের, ৯ শতাংশ ফসলে ও নগদে সাজা দেয় এমন চাষীদের দখলে। এই অসাম্যের ব্যাপারে তাঁর ভাষা ছিল, "This abnormal disparity in the distribution of land and the large proportion of produce rent tenancies are the direct effects of alienation of lands by the aborginenies, who are now reduced to the status of mere labourers. The state of things is undoubtedly wrong. But it is too late to devise any practicable remedy." প্রাক্ স্বাধীন একটি কৃষিশ্রমিক সমীক্ষায় (১৯৪৬-৪৭) দেখা যায় বাঁকুড়ার কৃষির উপর নির্ভরশীল শ্রমিক দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২০ শতাংশ।[১২৩ক]

কৃষকদের এই দুর্গতি নিরসনে ঔপনিবেশিক শাসকদের তৎপরতা ছিল অকিঞ্চিৎকর। ঋণদানের ক্ষেত্রে তাকাভি ঋণ দুর্ভিক্ষকালীন খয়রাতির সমুতুল্য হয়ে দাঁড়ায়। খরার সময় ক্ষুদ্র চাষী ও রায়তদের অবস্থা ছিল ক্ষেতমজুরদের মতোই শোচনীয়। তাদেরকে সাহায্যার্থে যে ভূমি উন্নয়ন ঋণ ও কৃষি ঋণ দেওয়া হত তাকে বলা হত তাকাভি ঋণ। সরাসরি রায়তদের প্রতি ঋণ ছিল কম। বেশিটাই বিলি হত জমিদার, মহাজনদের মাধ্যমে। ৬ শতাংশ সুদে ২ থেকে ৬ বছরের মধ্যে এ ঋণ পরিশোধ করতে হত। ১৮৭৪ সালে জেলায় এই ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮৮৬৬০ টাকা ও উপকৃতের

সংখ্যা ৭০৯৯। ১৮৮৫ সালে সোনামুখী থানায় ঋণ বিলি হয়েছিল ১৫০০০ টাকা, ১৯০৮ খ্রিঃ ভূমি উন্নয়নে ঋণ ছিল ৮৭৬৭৬ টাকা ও কৃষিঋণ ৭০৪৮৪ টাকা। এই ঋণ ছিল অজন্মার বছরে ত্রাণের অংশ। ১৮৮৫ সালে দুর্ভিক্ষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, "It afforded indirect employment to the laboring population by enabling many to obtain employment on the fields who had hitherto been suffering from want of work." কখনো কখনো বীজধানের সহায়তাও কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। ১৮৭৪ সালের মে মাসে মহিষাড়া পরগণায় আউশ ধানের জন্য সরকারি ভাবে বীজ সাহায্য করা হয়। তবে সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল।

এছাড়া আমলাতান্ত্রিক বাধা বাঁকুড়ার সেচের প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১২৪] কয়েকটি সেচ প্রকল্পের প্রশাসনিক ভূমিকা আলোচনা করলেই সেচের প্রসারে ঔপনিবেশিক নীতি পরিষ্কার হবে। যেমন—

১) শুভঙ্করী দাঁড়া (বড়জোড়া)
২) কুলাই খাল (সিমলাপাল)
৩) পলাশবনী খাল (অম্বিকানগর)
৪) হরিণমুড়ি খাল (রাধানগর)
৫) আমজোড় খাল (তালডাংরা)
৬) বিড়াই খাল (ওন্দা)
৭) ছাগলকুটা খাল (ছাতনা)

১) শুভঙ্করী দাঁড়া (বড়জোড়া) : গোপাল সিংহের মন্ত্রী শুভঙ্করের অত্যাশ্চর্য গণিত বুদ্ধির প্রয়োগে তৈরী হয় দামোদর ও শালী নদীর মধ্যবর্তী আসুরিয়া থেকে রামপুর পর্যন্ত উচ্চভূমির উপর ২০ মাইল দীর্ঘ খাল যা সেচ দিত ৮০ বর্গমাইল জমিতে। তরঙ্গায়িত বাঁকুড়ার এই উচ্চভূমি শস্যশ্যামলা হয়ে উঠলে রাজস্ব নির্ধারিত হয় ১২০০০ টাকা। তাই এই মহলটির নাম হয় বারোহাজারী। দাঁড়ার (খাল) উত্তরের ১০ আনা ও দক্ষিণের ৬ আনা নিয়ে এই সেচসেবিত অঞ্চল। কিন্তু ১৮৮৬ সালে এই ঐতিহাসিক দাঁড়ার সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করেন সুপারিন্টেন্ড ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকেঞ্জি। বলেন ব্যয়বহুল এই প্রকল্পের সাফল্য হবে বিনিয়োগের তুলনায় অতি অল্প। গণচাপে জেলাশাসক ম্যানেষ্টি প্রকল্প ব্যয় ১০৫০০ টাকার মধ্যে ২০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিল থেকে বরাদ্দ করেন। পরে জেলাশাসক বি. দে. জনগণের টাকায় এই প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। ১৯১৩ সালে বিষ্ণুপুরের মহকুমাশাসক, ডিস্ট্রিক্ট ও সুপারিন্টেন্ড ইঞ্জিনিয়ার, পলাশডাঙার কালিনাথ চ্যাটার্জীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯১৫ সালে কালেকটর কুকের উৎসাহে দান সংগ্রহ শুরু হলে রাজ্যপাল দেন ২০০০ টাকা, বর্ধমানরাজ ১০০০ টাকা, কাশিপুররাজ ২০০ টাকা, জনগণ ৩১৮ টাকা।

অনেক টালবাহানার পর ১৯১৬ সালে এই সংস্কার সম্পূর্ণ হয় ৩৩০০০ টাকায়, মূলত ত্রাণ তহবিলের টাকায়। কুকের প্রস্তাব ছিল একটি পূর্ণ লাঙল চাষের এলাকা থেকে মরসুমে ১ টাকা নিয়ে বাঁধের সংস্কার নিয়মিত করা। কিন্তু না সম্ভব হয়েছিল টাকা আদায়, না জল ভাগাভাগি নিয়ে গ্রামগুলির মধ্যে তালমিল। আর প্রকল্পটি নিয়ে সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি করেছিল।

২) কুলাই খাল (সিমলাপাল) ঃ সিমলাপাল রাজের কুলাই খালের সেচসেবিত এলাকা থেকে আদায় হত বিঘা প্রতি ৪-৭ পয়সা (জমির ধরনের উপর)।

৩) পলাশবনী খাল (অম্বিকানগর) ঃ পলাশবনী থেকে কাঁসাই ৫ মাইল খাল খনন হাতে নেওয়া হয় দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিলের টাকায়। কিন্তু সরকার এটি অসম্পূর্ণ রাখায় কৃষকরা এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।

৪) হরিণমুড়ি খাল (রাধানগর) ঃ হরিণমুড়ি খালের প্রকল্প ব্যয় ছিল ৫০০০০ টাকা, শালবাঁধ সোসাইটি এর দায়িত্ব নেয়। সংস্কারে ১৯২৪ সালের মধ্যে ১০০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। নদীর গতিপথে একটি স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে হাত দেওয়া হয়। কাজটি সম্পূর্ণ হলে ৫০০০ বিঘা জমি সেচসেবিত হত। এই কাজেও সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল না।

৫) আমজোড় খাল (তালডাংরা) ঃ আমজোড় গুরুসদয় সোসাইটি এই কাজটি শুরু করে। ১৬০০০ টাকার এই প্রকল্পের সেচের লক্ষ্যমাত্রা এলাকা ছিল ২১০০ বিঘা। নদীর ওপর একটি স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে হাত দেওয়া হয়। ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে লর্ড লিটন এই প্রকল্পের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৬) বিড়াই খাল (ওন্দা) ঃ ১৯০১ সালের ৪৬০০ টাকা ব্যয়ে বিড়াই খাল সমীক্ষায় ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার যথারীতি ৭০ বর্গমাইল জলভরণ এলাকা সেচের জল যোগানের পক্ষে অপ্রতুল মত দিয়ে প্রকল্পটাই বাতিলের পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁর সাথে সহমত প্রকাশ করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা বলে, “There is no justification for an expenditure of this amount from the general revenues on work which would be of no practical use. It will, however, be arranged to have observations made of flow of water in the stream to ascertain definitely what area could be irrigated at a time of drought.” দীর্ঘ ২৩ বছর পর ১৯২৩-২৪ সালে জেলাশাসক বি. ডি. হাজরার উদ্যোগে এই প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৭) ছাগলকুটা খাল (ছাতনা) ঃ ছাতনা-বাঁকুড়া থানা জুড়ে এ প্রকল্প শেষ হতে দেশমুক্তির সময় হয়ে যায়।

৮) **রুক্মিণী খাল (তালডাংরা)** ঃ ৭৭০০ টাকার এই প্রকল্পে সেচের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২০০ বিঘা। ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে লর্ড লিটন এই প্রকল্পের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৯) **মোলবাঁধ সেচ প্রকল্প** ঃ এ সেচ প্রকল্পটিও শেষ হতে দেশমুক্তির সময় হয়ে যায়। এছাড়া রাইপুরের যমুনাবাঁধ ও পাত্রসায়েরের দান্না দিঘি ১৭২৪ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হলে ১০০০ বিঘা করে জমি সেচের আওতায় আসে। পুকুর সংস্কারের আর যে কয়টি প্রকল্প ১৯০৯ সালের মধ্যে শেষ হয়েছিল বা চলছিল তা হল গঙ্গাজলঘাটির জোলাজোড়, শালতোড়ার কুন্তল বাঁধ, চারুরি বাঁধ, বৈষ্ণব বাঁধ, শিবগঙ্গা বাঁধ, কৃষ্ণপুর বাঁধ, উদ্ধবপুর বাঁধ, বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণপুর বাঁধ ও যমুনা বাঁধ, শ্যামসুন্দরপুর ও মটগোদা বাঁধ। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর জেলা ইঞ্জিনিয়ার তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরী ৫৪টি প্রকল্প (৩০টি জেলা পরিকল্পনা কমিটি অনুমোদিত) মহাত্মা গান্ধির মাধ্যমে সরকারের কাছে জমা পড়লেও মাত্র দুটি প্রকল্পের কাজ (ছাগলকুটা ও মোলবাঁধ) ছাড়া আর কোনো প্রকল্পই রূপায়িত হয়নি। জেলাব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রকল্পগুলির প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকদের সদর্থক ভূমিকা থাকলে কৃষি সমাজের দুর্গতি কমানো সম্ভব হত। সেচের সম্প্রসারণ ও অভাবী বিক্রি বন্ধ করতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে সদর মহকুমায় ২৪টি সেচ সমবায় (সিমলাপাল-৮, গঙ্গাজলঘাটি-৬, রাইপুর-৫, ছাতনা-১টি) এবং বিষ্ণুপুরে (পাত্রসায়ের) ১টি গঠিত হয়। ১৯২৪-২৫ সালে গঙ্গাজলঘাটিতে ৫টি ও ছাতনায় ১টি ধর্মগোলা সমিতি গঠিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুর মহকুমার পাত্রসায়েরে ধর্মগোলা হয়েছিল ২টি, সোনামুখীতে ২টি। বস্তুত এ সময় সমবায়ের প্রচেষ্টায় সেচের প্রসারে জোয়ার এসেছিল। নতুন সমবায় গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয় সিমলাপালে ১১টি, গঙ্গাজলঘাটিতে ৯টি, ছাতনায় ৫টি, বাঁকুড়া সদরে ৩টি, পাত্রসায়ের থানায় ১টি, সোনামুখীতে ২টি। গঙ্গাজলঘাটির আরো দুটি পুরাতন সমিতি পুনর্গঠিত হয়। ১৯২৫-২৬ সালে বাঁকুড়া জেলার মোট সেচ সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭০টি। যাদের সদস্য সংখ্যা ৭০৭৩ জন। ১৯২৬-২৭ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫৬ ও ৭০৫৬। সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন এই দুই অর্থবর্ষে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ১৬৯৩২৬ টাকা ও ১৭২০১৯ টাকা। সমবায় সমিতিগুলির গৃহীত সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল ১২০টি, সামান্য অগ্রগতি ছিল ১৪টির, নামমাত্র অগ্রগতি হয়েছিল ৮টি প্রকল্পে। স্পষ্টতই সেচ প্রসারে সিমলাপাল এবং ধর্মগোলা গঠনে গঙ্গাজলঘাটি থানার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

১৯২২ সালে বাঁকুড়া শহরে ২৯ একরের কৃষি খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২-২৩ সালে জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে ৫০ সদস্যক জেলা কৃষি ও হিতসাধনী

সমিতি গঠিত হয়।[১২৫] গঠিত হয় ছয় ডিরেক্টরের অধীনে জল সরবরাহ ও অর্থদান ব্যাঙ্ক। এই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক উদাসীনতা জর্জরিত ছিল বাঁকুড়ার কৃষক জীবন। জেলার আত্মপ্রকাশের কালে অনটন ও দুর্দশায় নিমজ্জিত কৃষক পরিবারের আয় ছিল ১৬৮ টাকা, ব্যয় ১৫৬ টাকা। এর মধ্যে খাওয়া ১২০ টাকা, জামাকাপড় ১৫ টাকা, খাজনা ১৫ টাকা, দেয় ও মজুরি ৫টাকা, কৃষি যন্ত্রাদি, সামাজিক ব্যয় ১০ টাকা। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেও, বিবাহের মতো সামাজিক অনুষ্ঠান, রোগের কারণ, অজন্মার বছরে কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ত।

এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় বাঁকুড়ার কৃষি সমাজের সৃষ্টি, বিবর্তনের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আদি মানবের অবস্থান যেমন বাংলার এই অংশে প্রথম, তেমনি কৃষি জীবনের আদি ও প্রত্ন-নিদর্শন জেলার কৃষি ব্যবস্থার প্রাচীনত্বকে প্রমাণিত করে। দীর্ঘকাল ধরে জেলার কৃষির বিবর্তন দুইটি ধারায় বাহিত হয়েছিল। একটি ধারা শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া, সোনামুখী, ইন্দাস, বাঁকুড়া, পাত্রসায়ের, কোতুলপুর, জয়পুর, বিষ্ণুপুর থানাকেন্দ্রিক। অন্যটি ছাতনা, অম্বিকানগর, সুপুর, খাতড়া, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, ফুলকুসমা পরগণাকেন্দ্রিক। অখণ্ড বাঁকুড়ার আত্মপ্রকাশের আগে পর্যন্ত এই দুই স্বতন্ত্র স্রোতের অস্তিত্ব ছিল। এমনকি একত্রীকরণের পরও, পূর্বতন বিষ্ণুপুর পরগণায় বর্ধমানরাজের পত্তনি তালুক ব্যবস্থা বাকি অংশের থেকে ছিল স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। দ্বিতীয় শ্রেণির জঙ্গল ও উপজাতি অধ্যুষিত পরগণাগুলিতে শোষণের ধারা, জমিদারির বিকাশ ও পতন ছিল প্রথম শ্রেণিভুক্ত থানাঞ্চলগুলির চেয়ে আলাদা। দক্ষিণে যেমন ওড়িয়া রীতির প্রাবল্য ছিল, উত্তরে ছিল সন্নিহিত জেলাগত উচ্চবর্ণীয়দের আধিপত্য। দুই ক্ষেত্রেই জেলার উপজাতি, অর্ধ-উপজাতি ও অন্ত্যজ মানুষদের অধিকারচ্যুত হতে হয়েছিল। উত্তরে যেমন ছিল মারাঠা উপদ্রব, পাহাড়ী-সন্ন্যাস হাঙ্গামা, দক্ষিণে ছিল চোয়ার বিদ্রোহের, গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামার অভিঘাত। উত্তরে যেমন কৃষক অভিবাসনের বড় ঘটনা ছিল বর্গী হাঙ্গামা ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণে, দক্ষিণের অভিবাসন ছিল উপজাতিদের উপর মহাজনী শোষণ ও নিগ্রহের কারণে। তবে এই দুই ধারা মিলে গিয়ে মহাপ্লাবন তৈরী করেছিল ব্রিটিশ শাসনে কৃষক শোষণের নীতির বিরুদ্ধে।

১৭৮১ সালে রুদ্র বাউরীর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ শুরু হয় তা কোম্পানীর বাধা সত্ত্বেও বিস্তার লাভ করেছিল বলরামপুর, কর্ণগড়, বিষ্ণুপুর পরগণায়। এর প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল দুর্জন সিংহের বিদ্রোহ। ১৭৭৯ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বরের প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রতিবেদনে দেখা যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিদ্রোহ কবলিত হয়ে পড়েছে।

কোম্পানী দুর্জনের কাকা অর্জুন সিংহকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আহ্বান জানালে তিনি বিদ্রোহীদের ক্ষমা প্রদর্শনের পরামর্শ দেন (প্রতিবেদন নভেম্বর '৭৯)।[১২৬] জীবিকা উচ্ছন্ন কৃষকের দল বর্গী ও সন্ন্যাসীদের অনুকরণে লুণ্ঠনের আশ্রয় নেন। ১৮/০৪/১৭৭৭ বর্ধমান কাউন্সিলের জি. পি. পি.-র পত্রে দেখা যায় এই পাট্টা, লিজের নতুন ব্যবস্থা কৃষকদের ইচ্ছা ও স্বার্থ পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। বি. এস. দাসের এই প্রেক্ষিতে যথার্থ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য ছিল, [১২৭] "Families ruined by famine, dispossessed by revenue agent, were thrown into the countryside as roving bands living by plunder, and extorting blackmail from the surrounding villages. This example was shown to them by the Maratha bargies and the band of so called sannayasis in the early serventies of the century." জুন, ১৭৮১ সালের কোম্পানী প্রতিবেদনে দেখা যায় বিষ্ণুপুরের সেজোয়াল রামমোহন রায় রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এই কৃষক বিনাশের কালপর্বে কোম্পানীর কাছে নতুন কৃষক পত্তন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।[১২৮] ১৭৭২ সালে রামকান্ত বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অতি আচারের ফলে পাঞ্চেতের কিছু রায়তকে কৃষিকাজে ফিরিয়ে আনা গিয়েছিল। পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে বিষ্ণুপুর-পাঞ্চেতের দেওয়ান (সুপারভাইজার/কালেকটর হিগিনসের অধীন) নিযুক্ত করে বিষ্ণুপুর পরগণায় রায়তদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুর পরগণায় এই কাজে সাফল্য ছিল নগণ্য। এইচ. কুপল্যাণ্ড লিখেছিলেন, "In 1772 there was difficulty in obtaining a farmer for Panchet, none of the farmers offering to renew their leases apprehending a decrease of revenue, as there had been wholesome desertion of the land by the ryots in consequence of the oppression of the superior farmers. Farmers were eventually obtained, apparently owning to the exertion of one Ramakanta Biswas who was accordingly appointly Dewan."[১২৯]

বাঁকুড়ার মতো কঠিন ভূমিবৈশিষ্ট্য সমন্বিত জেলায় যেখানে ফসল ফলনোই দুরূহ কাজ, রাজস্ব আদায়ে কোম্পানীর জুলুম রায়তদের ক্ষেত বিমুখ করে তোলে। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের ছোটোনাগপুর মালভূমির ক্ষয়িত পূর্বাঞ্চলের মালভূমি হল বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ। গ্রানাইট নিস পাথরের অভ্যন্তর ও ফেরোগেনাস, ল্যাটেরাইটের তরঙ্গায়িত আস্তরণ এই অংশে কৃষিকাজ অনেক কঠিন করে তুলেছে। শুধু পূর্বাংশের ক্ষুদ্র পাললিক অঞ্চল এই সংকটের বাইরে।[১৩০] ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পৌষে লোকমত (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ দাশের একটি নিবন্ধে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছিল, [১৩১] 'যে সমস্ত কারণে এখানে ফসল নষ্ট হয় জলাভাবই তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বার্ষিক

বারিপাত এখানে কম নহে। বৎসরে গড়ে ৫৭'' বৃষ্টি হয়। হুগলি জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এখানের চেয়ে কম কিন্তু জমি সমতল ও অধিকতর উর্ব্বর বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম জলের সাহায্যে চাষের কাজ হয়, বৃষ্টির জল দ্রুত প্রবাহিত হইয়া যায় না ফলে মাটি অধিক দিন ভিজা থাকে। জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা সেখানে সহজ বলিয়া একই জমিতে পর পর দুই তিনটি ফসল পাইবার অসুবিধা নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে এখানে জল ধরিয়া রাখা শক্ত। ডাঙ্গা জমি ও জঙ্গলের জল জোরে প্রবাহিত হইয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতের পথে দ্রুত নিকাশ হইয়া নদীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। জল নিকাশের এই স্বাভাবিক পথগুলিকে স্থানীয় কথায় 'জোড়' বলে। উল্লেখ্য, ১৯০৮ সালে প্রকাশিত জেলা গেজেটিয়ার্সে মাসিক বৃষ্টিপাতের খতিয়ানে গড় বৃষ্টিপাত জুনে ১০.৮ ইঞ্চি, জুলাইয়ে ১২.২ ইঞ্চি, আগস্টে ১১.৯ ইঞ্চি, সেপ্টেম্বরে ৮.৭ ইঞ্চি, অক্টোবরে ৩.১ ইঞ্চি। মোট গড় বৃষ্টিপাত ৫৫.২৬ ইঞ্চি। এখানের শুষ্ক আবহাওয়ার গড় মাসিক তাপমাত্রা ডিসেম্বরে ও জানুয়ারিতে ৮০, ফেব্রুয়ারিতে ৮২, মার্চে ৯৩, এপ্রিলে ১০২। গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ৮০।'[১৩২] রাজস্ব অভিঘাত জনিত ভূমিচ্যুতি, প্রতিকূল ভূমিবৈশিষ্ট্য ও আবহাওয়ার বিরূপতা সত্ত্বেও ১৯৩১ সালের সেনসাস প্রতিবেদনে জেলার ১১১১৭২১ জনের ৭৭ শতাংশই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। বাকি ২৩ শতাংশের অধিকাংশই অপরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ১৯৩৬ সালের কৃষি সমীক্ষা মোতাবেক জেলায় পাঁচ সদস্যক পরিবারের দখলে ছিল গড়ে ১২.৭ একর আবাদযোগ্য জমি, যার মধ্যে আবাদ হত ৭ একর জমিতে। বিঘায় ৫ মণ হিসাবে পরিবারে মোট ধান আসত ১০৫ মণ যার অর্ধেকই পেত ঊর্ধ্বতন রায়ত।[১৩৩]

১৭৪২ ও ১৭৬০ সালের বর্গী আক্রমণ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, নতুন ভূমি ব্যবস্থার রাজস্ব আগ্রাসনের ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোত্তর মহাজনী চক্রান্তের ফলে তিনটি পর্যায়ে যে কৃষক উৎখাত হয়েছিল, তাতে ভূমিচ্যুত কৃষক প্রথমেই কৃষিপ্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েনি। বরং ভাগচাষী, আধিয়ার, বর্গাদার, নিম্নতর কৃষকের মর্যাদা নিয়ে ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এদের ভাগচাষী, গ্রামীণ মজুর, চাকরাণ বেগারে বিভক্ত করা যায়। অনুন্নত কৃষির কারণে অভিবাসন ছিল বাঁকুড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাৎসরিক লিজ বা মরসুমি চুক্তির ভাগচাষি বীজ, সার, হাল, বলদ, শ্রম দিয়ে ফসলের অর্ধেক ভাগ পেত। মালিক সার দিলে সমস্ত খড় পেতেন। মালিক বীজ, সার, বলদ দিলে ফসলের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ পেতেন। সাজা প্রথার চাষীকে বছরে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ মালিককে দেওয়ার শর্তে চাষ করতে দেওয়া হত। আর দুই ভূমিহারা শ্রেণি (গ্রামীণ মজুর) জমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— (১) দৈনিক মজুরভুক ও (২) ভাড়াটে মজুর; ১৯০৮ সালের নথিতে---(১) মুনিষ বা মাহিন্দার (২) গতানিয়া মুনিষ। মাহিন্দার

লাঙল-হাল-বলদ-কাড়া শ্রমের বিনিময়ে পেত এক তৃতীয়াংশ ফসল। নগদে নিলে বছরে ৩০-৩৬ টাকা। গতানিয়ে মুনিষ পেত দৈনিক ১-২ সের মুড়ি ও ৩ সের ধান। বছর শেষে দু টাকা ও দু'খানা ধুতি। এ ধরনের মুনিষকে ১ বিঘার কম জমি নিজের চাষের জন্য দেওয়া হত যারা 'বাঁটরিয়া' নামে (জোয়ালের বাঁট কৃষক নিজে ধরত বলে) পরিচিত ছিল। কখনো মজুরকে ঝাড়াই-মাড়াই শেষে তিন মণ আঠাশ সের ধান দেওয়া হত। সেই মজুরদের বলা হত কাকড়া মজুর। আরেক শ্রেণির চাষী হল চাকরাণ বেকার। কোর্ফা রায়তরা ছিল এই শ্রেণির। এদের অবশ্য মালিক ইচ্ছামত উচ্ছেদ করতে পারত। চাকরাণ বেগার ও চাকরাণ ভেট বেগার স্থায়ী বাস্তুভিটা পাওয়ার শর্তে এবং মালিককে বেগার শ্রম ও বিভিন্ন ভেট দেওয়ার শর্তে মালিকের জমিতে কাজ করত। সাঁওতাল-কোড়া-বাগদি- বাউরী-লোহার-খয়ড়া জাতির মানুষই ছিলেন এ ধরনের শ্রমিক। ফলে সমাজের অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। জমিহারা হয়ে এই শ্রেণির মানুষ অপরের জমিতে কাজ করে প্রাপ্ত মজুরিতে জীবন ধারণে সক্ষম ছিল না। এর অনিবার্য ফল ছিল কাজের সন্ধানে দেশান্তর গমন (মূলত হুগলি, বর্ধমানে, কিছুটা মেদিনীপুরে), যা নামাল নামে পরিচিত ছিল। ১৮৬৪ সালের সরকারি নথিতে এই অভিবাসনের তথ্য আছে। ১৮৮১ সলের তুলনায় ১৮৯১ সালে অভিবাসিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬৮০৭৫। ১৯০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় নব্বই হাজারের বেশি। ১৯১১ ও ১৯২১ সালে অভিবাসিতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২১৯০২ ও ১৫১০৬৩। অভিবাসনের অভিমুখ ছিল কৃষিক্ষেত। খনি ও শিল্প নয়। বি. ফোলি এ সম্পর্কে বলেছেন, বাঁকুড়ার কৃষকরা খোলা প্রন্তর, ক্ষেতে কাজ করতেই পছন্দ করত। অস্থায়ী অভিবাসনে নভেম্বর-ডিসেম্বর বা ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেশান্তরী হয়ে জুনের শেষে দেশে ফিরত ধর্মীয় মেলার টানে বা দেশের কৃষিকাজে হাত লাগাতে। এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট ঔপনিবেশিক শাসনে কৃষকের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হচ্ছিল। নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় জমির উপর রায়ত-জমিদারের স্বত্ব, রাজস্বের পরিমাণ ও অধিকার, নির্ণয়ের সূত্র, মেয়াদ নিয়ে হেস্টিংস-বারওয়েল ও ফিলিপ ফ্রান্সিসের তাত্ত্বিক বিতর্ক, পরবর্তীকালের কর্নওয়ালিশ-জেমস গ্রান্ট-জন শোরের বিতর্ক ছিল মাটির গন্ধ বিবর্জিত। হেস্টিংসের সময়ে জমিদারদের নিরঙ্কুশ ভূমি স্বত্ব না দেওয়া হলেও, কর্নওয়ালিশের সময়কালে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়। জমির মালিকানা পান জমিদার। (সূত্র ঃ গ্রান্ট বনাম শোরের বিতর্ক)। রাজস্ব সংগ্রাহক হন জমিদার (সূত্র ঃ কর্নওয়ালিশ বনাম শোরের বিতর্ক)। রাজস্ব নির্ধারিত হয় দশসালা বন্দোবস্তের আগের দুই বছরের গড় থেকে (সূত্র ঃ গ্রান্ট বনাম শোরের বিতর্ক)। বন্দোবস্তের মেয়াদ হয় চিরস্থায়ী (সূত্র : কর্নওয়ালিশ বনাম

শোরের বিতর্ক)। ১৭৯৯সালের সপ্তম আইনে রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারকে সম্পত্তি ক্রোক ও ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করার অধিকার দিলে, রায়তের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পাইকারি রায়ত উচ্ছেদে লাগাম টানার জন্যে ১৮২২ সালে সরকার পঞ্চম আইন প্রবর্তন করেন। কিন্তু রায়ত এই আইনের সাহায্য নিতে ব্যর্থ হন। বরং জমিদারকে যে কোন নিরিখে কৃষকের খাজনা স্থির করার অধিকার, লিজ মেয়াদ ঠিক করার অধিকার রায়তের দুর্দশা বহুগুণিত করে।

কলকাতায় রামমোহন রায় ১৮২৯ সালে বেন্টিঙ্কের কাছে এবং ১৮২৯ সালে পার্লামেন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে যে বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, সেগুলি হল রায়ত-জমিদার বন্দোবস্ত ও পাট্টা, রাজস্ব হ্রাস ও তার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, আবওয়াব (সেস) নিষিদ্ধ করা, খুদকস্ত রায়তদের রক্ষা করার উপায়, রায়তদের সুবিধার্থে দেশীয় বিচারক নিয়োগ।[১৩৪] পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছিল। আলোচিত নিবন্ধে জেলার কৃষির প্রাচীনত্ব, তাম্রযুগে যাযাবর শিকারজীবন থেকে স্থায়ী বসতি ও কৃষি জীবনে উত্তরণ, মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন যুগে কৃষির বিস্তার, ওড়িয়া প্রভাবে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি থেকে পুঁজি সমর্থিত জলা জমি চাষে উত্তরণ, ভৌমরাজত্বে আধা সামন্ততান্ত্রিক মোড়কে বিবিধ স্বত্বের সৃষ্টি, কৈবর্ত বিদ্রোহ ও চেতুয়া-বরদার অসন্তোষের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, মন্বন্তর ও মারাঠা আক্রমণে কৃষক উৎসাদন, ঔপনিবেশিক শাসনে বিবিধ রাজস্ব ব্যবস্থা-পুঁজিবাদ ও আগ্রাসন, দুর্ভিক্ষ ও কৃষক দুর্গতি, রায়ত অসন্তোষ, অভিবাসন, Depeasantization ও Peasantization, Tribalization ও Detribalization, বিভিন্ন কৃষিসমীক্ষা, ফসলভিত্তিক বিবরণ ও প্রয়োজনীয় কৃষি পরিকাঠামো আলোচিত হল। এই আলোচনার নির্যাস হল প্রাক-ঔপনিবেশিক রাঢ় কৃষি জীবন, ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণে ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়েছিল। ১৮৯১ সালে ব্রাহ্মণ ৮৫০০২ জন, ছত্রীক্ষত্রিয় ২০৮৫৫ জন, বৈদ্য-বৈশ্য-কায়স্থ ২৩৯৩৬ জন, মোট ১২৯৭৯৩ জন ছিল উচ্চতর ভূমি স্বত্বভোগী, যারা নিজ হাতে জমি চাষ না করে মজুর দিয়ে ফসল ফলাত। সাঁওতাল, ভূমিজ, কোড়া, বাগদি, হাড়ি, ডোম, লোহার, মাল, বুনা শ্রেণির জমির মজুর ছিল ১১৯৮০৮ জন। নিজ হাতে চাষ করত এমন রায়তি স্বত্ববাণ (সদগোপ, তাম্বুলি, নাপিত, কর্মকার, কুমোর, তেলি,মালাকার, বারুই, মোদক) ছিল ২০৫১৬৪। অর্থাৎ ১২৯৭৯৩ জন উচ্চবর্ণীয় অনুৎপাদক শ্রেণির জীবন অতিবাহিত হত ১১৯৮০৮ জন নিম্নবর্ণীয় মজুরের কায়িক শ্রমের বিনিময়ে। ঔপনিবেশিক শাসকরা সব রায়ত বিদ্রোহকেই আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখে তাকে ডাকাতি, দস্যুতা, চুয়াড় বা পাহাড়ীয়া উপদ্রব হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কখনোই এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করে সমাধানের চেষ্টা করেনি।

তবে ঔপনিবেশিক শাসনে ও শোষণে নিষ্পেষিত হয়েও বাঁকুড়ার কৃষকের মনের আনন্দ ও ঔদার্য বিসর্জিত হয়নি। বড় প্রমাণ স্বাধীনোত্তর পাঁচের ও ছয়ের দশকে বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনের আহ্বানে বাঁকুড়ার রায়তদের সাড়া। সমগ্র রাজ্যে ভূমিদানে বাঁকুড়া জেলার অবদান ছিল সর্বাধিক।[১৩৫] ধন্য বাঁকুড়া। শোষণ ও যন্ত্রণার অতীত ভুলে দানের মহত্ত্বে অগ্রণী হওয়ার জন্যে। অহল্যাভূমি রাঢ়ের আরোপিত অন্ধকার আকাশে এ ছিল রূপালী রেখা।

তথ্যসূত্র :

১। ম্যাক্সমুলার টি. স্যাকরেড বুক অব দ্যা ইস্ট, দ্বাবিংশ খণ্ড, অক্সফোর্ড, ১৮৭৯।

২। শ্যামসুন্দর শুকুলের ক্ষেত্রসমীক্ষা।

৩। চট্টোপাধ্যায় রূপেন্দ্রকুমার, কর চৌধুরী জপশ্রী-সভ্যতার সন্ধানে ডিহর,বিষ্ণুপুর তথ্যগ্রন্থ, বিষ্ণুপুর - ২০০৮, পৃঃ ১৭-২০।

৪। দত্ত. এ. চ্যালকোলিক কালচার অব বেঙ্গল—এ স্টাডি অন সেটলমেন্ট অ্যাণ্ড ট্রানজিসন, দিল্লী, ১৯৮৮।

৫। পুরাতত্ত্ব, সংখ্যা—অষ্টত্রিংশ, কলিকাতা, ২০০৬ খ্রিঃ, পৃষ্ঠা - ৫৪।

৬। অ্যশেচয়ানবেক, এ. মেগাস্থিনিস ইন্ডিকা, বন, ১৮৪৬।

৭। রণধাওয়া, এম. এস. এ হিষ্ট্রি অব এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া, দিল্লি, ১৯৮২।

৮। শুশুনিয়া শিলালিপি। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে, “holds that Puskarana mentioned in Susuniya inscription is the modern Pokarnya or Pakhrna situated in Bankura District of which Candravarma was the king.” পশ্চিমবঙ্গের পুষ্করণ জনপদ, বঙ্গশ্রী, ১৯৩২-৩৩ খ্রিঃ, সং-১, পৃঃ ১৩৫-৩৬।

৯। ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪০৯।

১০। সন্ধ্যাকর নন্দী, রামচরিত ঃ সম্পাদনা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৯১০, কলিকাতা।

১১। দেওপাড়া শিলালিপি, আবিষ্কারক সি. টি. মেটক্যাফে, ১৮৬৫ খ্রিঃ।

১২। পট্টনায়েক এন. আর., ল্যান্ড অ্যান্ড এগ্রিকালচার ইনি মিডিয়াভাল ওড়িশা, ১৯৯৭ খ্রিঃ, পৃঃ-১৪।

১৩। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া-২০০০ খ্রিঃ, পৃঃ ১৪-৬৫।

১৪। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া-২০০০ খ্রিঃ, পৃঃ ৩১৫।

১৫। রবার্টসন এফ. ডব্লু. ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিষ্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ-৫৩।

১৬। মিত্র অশোক (সম্পাদনা), দ্যা ট্রাডিসন অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন অব সাঁওতাল। তথ্যদাতার ভাষা অবিকৃত রাখা আছে।

১৭। বোর্ড অব রেভেন্যু, প্রসেডিংস সংখ্যা ১৩, তাং-১৫/০২/১৯৩৩।

১৮। সেন শুচিব্রত, সাঁওতাল অব জঙ্গলমহল-অ্যান এগর‍্যারিয়ান হিস্ট্রি, ১৭৯৩-১৮৬১, কলিকাতা ১৯৮৪, পৃঃ-১০৩। বার্ট ব্র্যাডলি, দ্যা স্টোরি অফ অ্যান ইন্ডিয়ান আপল্যাণ্ড, লণ্ডনন, ১৯০৫। রায় প্রভাস চন্দ্র, পার্ব্বত্য কাহিনি, ১৯০৭।

১৯। ম্যাকালপিন এম. সি., দ্যা রিপোর্ট অন দ্যা কন্ডিশন অব সাঁওতাল ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৯০৯ খ্রিঃ, পৃঃ-১৭।

২০। রাইনল জি. টি. এফ. এ্যাবে, ফিলোজফিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব দ্যা সেটেলমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড অব দ্যা ইউরোপিয়ান ইন দ্যা ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ, প্রথম খণ্ড (অনুবাদ ও ৩য় প্রকাশ ঃ জে. ও. জাস্টামন্ড, লণ্ডন, ১৭৭৭), পৃঃ-৩৬-৩৭। হলওয়েল জে. জেড., ইণ্টারেস্টিং হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্ট রিলেটিভ টু দ্যা প্রভিন্স অব বেঙ্গল অ্যান্ড দ্যা এম্পায়ার অব হিন্দুস্তান, লন্ডন-১৭৬৫।

২১। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া-২০০০ খ্রিঃ, পৃঃ ৩১৯।

২২। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রি, পৃঃ-৪৭।

২৩। সিনহা সুকুমার ও ব্যানার্জী হিমাদ্রি, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট লেটার ইস্যুড ঃ ১৮০২-৬৯, কলি-১৯৮৯, পৃঃ-দ্বাদশ।

২৪। বাঁকুড়ার খেয়ালী, বাঁকুড়া ২০০৯, সম্পাদনা চক্রবর্তী, গিরীন্দ্রশেখর, পৃঃ-৪৮।

২৫। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রি, পৃঃ-৫৫।

২৬। সুন্দরম লঙ্কা, মুঘল ল্যান্ড রেভেন্যু সিস্টেম, সুরে (ইংল্যান্ড), ১৯২৯, পৃঃ-৩১।

২৭। স্মিথ. এ. ভিনসেন্ট, আকবর দ্যা গ্রেট মোঘল ১৫৪২-১৬০৫, অক্সফোর্ড-১৯১৭,পৃঃ-৩৭৩।

২৮। সুন্দরম, লঙ্কা, মুঘল ল্যান্ড রেভেন্যু সিস্টেম, সুরে (ইংল্যান্ড), ১৯২৯, পৃঃ-৫৩।

২৯। ও'ম্যালী এল. এস. এস., বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯০৮, পৃঃ-২৮।

২৯ক। নীরদবরণ সরকারের 'বর্ধমানরাজ ইতিবৃত্ত' (বর্দ্ধমান-২০০৪) ও যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর 'বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (কলিকাতা, ৯৬-০২) গ্রন্থ থেকে জানা যায় তারকেশ্বরের শিব মন্দিরের মহন্ত, ঔরঙ্গজেবের অনুগত বর্ধমানরাজের বিরোধী জোটের পক্ষে ছিলেন। সুতরাং মোঘলের অনুগত বর্ধমানরাজের জিজিয়া কর আদায়ের বিরুদ্ধে যে প্রজা অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল তাতে এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর যোগদান ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। 'তারকেশ্বরের শিবতত্ত্বে' বর্ধমান বিরোধী মল্ল-চেতুয়া-বরদা শক্তিজোটের বিজয় ও পরাজয় নিয়ে লেখা হয়েছিল, "বিষ্ণুপুর রাজ সহ সখ্যতা স্থাপন। শ্রীগুমণ সিংহ আর ভবানীচরণ। শোভা সিংহ নামে এক বর্দ্দা জমিদার। ইত্যাদি সহিত করে সখ্যতা আচার... বিষ্ণুপুর জমিদার বরদা প্রবেশ। ভবানী প্রদেশ করে স্বয়ং আদেশ। পরে সন্ন্যাসীর দল রাখিতে শাসনে। বর্দ্ধমানভূম চিন্তা করে সেই ক্ষণে।"

৩০। আইখসন সি. ইউ., কালেকশন অব ট্রিটিজ অ্যান্ড সনদ রিলেটিং টু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, (কলি-১৯০৯), পৃঃ-২১৪। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০।

৩০ক। লং. জে., সিলেকশন ফ্রম দ্যা আনপাবলিশ্ড রেকর্ডস অব গভর্ণমেন্ট ফর দ্যা ইয়ার ১৭৪৮-১৮৬৭, কলিকাতা-১৭৭৩ পুণর্মুদ্রণ সং ২৫২। বিষ্ণুপুর সহ বিভিন্ন জমিদারির

ক্লাইভকে পলাশি কালপর্বে লক্ষ টাকা ঘুষের উল্লেখ করেছেন নবকৃষ্ণ রায়, হেনরি স্ট্রেচিকে দেওয়া পত্রে, তাং ২৩/০৩/১৭৭৬, ফিলিপ ফ্রান্সিস পেপার, এফ-৭। ১৭৬০ সালে জমিদারি বাঁচাতে মল্লরাজ মদনমোহন বিগ্রহ বন্ধক রেখে (কলিকাতার গোকুল মিত্রের কাছে) অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৭৬৬ সালে মল্লরাজকে বার্ষিক ৫৫১৪ টাঃ ৯ আঃ ৮ পঃ ভরণপোষণ রাজস্বের বিনিময়ে জমিদারির দখল ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এ সময়কার বাজেয়াপ্ত নিষ্কর জমি কালেক্টর ডসন মল্লরাজকে পরে ফিরিয়ে দেন। বার্ষিক ২২৫০০০ টাকায় জমিদারি ফিরে পান চৈতন্য সিংহ। এটি 'ডসনী ছাড়' নামে খ্যাত।

৩১। ও'ম্যালী এল. এস. এস., বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯০৮, (সং-১৯৯৫) পৃঃ -৪০।

৩২। ম্যাকলেন জে. আর., ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড লোকাল কিংশিপ অব এইটটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল, কেমব্রিজ ১৯৯৩, পৃঃ-২০৭।

৩৩। কনসালটেশন ডেট ২৮/০৪/১৭৭০, হান্টারের এ্যানালস, লণ্ডন, ১৮৬৮, এ্যাপেনডিক্স বি, পৃঃ-৪১৭।

৩৪। রাজস্ব বোর্ডকে কিটিং-এর পত্র, তাং ০৩/০৬/১৭৮৯।

৩৫। রাজস্ব সচিবকে স্টুয়ার্ট-এর পত্র, তাং ১৭/০৪/১৭৭৩ এবং ২০/০৪/১৭৭৩ তারিখে রাজস্ব সবিবের উত্তর।

৩৬। কালেক্টর শেরবোর্নকে লেখা হেসেল রিজের ২৩/০৮/১৭৮৮ তারিখের পত্র।

৩৭। বিশ্বভারতীর বাংলা পাণ্ডুলিপি বিভাগে এই অপ্রকাশিত কাব্য সংরক্ষিত।

৩৮। প্রাদেশিক কাউন্সিলকে লেখা হিগিনসের ২৮/০২/১৭৭১ তারিখের পত্র।

৩৯। হিগিনসকে প্রাদেশিক কাউন্সিলের ১৮/১০/১৯৭১ তারিখের পত্র।

৪০। কর্নওয়ালিশের কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে মিনিউটস, তাং ০৮/০৯/৮৯। দ্যা পার্লামেন্টারি হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড, লণ্ডন ১৮০৬, পৃঃ-১৫৪৮।

৪১। কালেকটরকে অ্যাকাউন্ট জেনারেল, তাং ২৯/১২/১৭৯০, ২৮/০১/১৭৯১।

৪২। বোর্ড অব রেভেন্যুকে কিটিং-এর পত্র, তাং ১৫/০৩/১৭৯০। হান্টার, ডব্লু. ডব্লু, এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল, লণ্ডন ১৮৬৮, পৃঃ-৬৫।

৪৩। কিটিং-কে বর্ধমানের কালেকটর আল. মার্শারের পত্র, তাং ০৭/০৪/১৭৯০।

৪৪। বোর্ড অব রেভেন্যুকে কিটিং-এর পত্র, তাং ১৮/০১/১৭৮৮।

৪৫। উপসচিব বার্লোকে লেখা কিটিং-এর পত্র, তাং ০৭/০৬/১৭৯২।

৪৬। ম্যাকলেন জে. আর., ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড লোকাল কিংশিপ অব এইটটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল, কেমব্রিজ ১৯৯৩, পৃঃ-২১৪।

৪৭। পঞ্চম রিপোর্ট, ১৮১২ ফারমিঙ্গার, খণ্ড-১, পি-সি-সি, ১৭।

৪৮। কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে কোম্পানীর পত্র, তাং ০৩/১১/১৭৭২।

৪৯। সিনহা, এন. কে. ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, দিল্লি ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃঃ-৪৫।

৫০। সিনহা ও বন্দোপাধ্যায়, জেলা থেকে চিঠি ঃ ১৮০১-১৮৬৯, পৃঃ-ত্রয়োদশ।

৫১। মিশ্র বঙ্কুবিহারী, দ্যা সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দ্যা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-১৭৭৩-১৮৩৪, লণ্ডন ১৯৫৯, পৃঃ-১৭৫।

৫২। জেলার কার্যকরী ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে মুর্শিদাবাদের কার্যকরী বিচারক (সিউড়ি প্রাদেশিক আদালত) কে ০২/১১/১৮২২ তাং পত্র।

৫৩। প্রসেডিংস অব বোর্ড অব রেভেন্যু, তাং ০৭/০৬/১৭৮২।

৫৪। বোর্ড অব রেভেন্যুকে কালেকটরের পত্র, তাং ১৬/০৮/১৭৮৭ ও ১৮/০১/১৭৮৮।

৫৫। বোর্ড অব রেভেন্যুকে কালেকটরের পত্র, তাং ২০/০৭/১৭৮৭।

৫৬। প্রসেডিংস অব বোর্ড অব রেভেন্যু, তাং ০৩/০৪/১৭৮৯।

৫৭। বোর্ড অব রেভেন্যুকে কালেকটরের পত্র, তাং ১৫/০৪/১৭৯০।

৫৮। বোর্ড অব রেভেন্যুকে কালেকটরের পত্র, তাং ১৫/০৪/১৭৯০।

৫৯। বোর্ড অব রেভেন্যুকে কালেকটরের পত্র, তাং ০১/০১/১৭৯২।

৬০। বোর্ড সভাপতি জন সোরকে কালেক্টর কিটিং-এর পত্র, তাং ১৩/০২/৮৯, ১৪/০৪/৯০, ২৫/১০/৯০।

৬১। জন ডিনকে আয়ার্ল্যাণ্ডের পত্র, তাং ০৯/০৬/৯৭ ও কালেকটরকে সিবুলারের পত্র তাং ১৬/০২/৯৮।

৬২। চৈতন্য সিংহ উচ্চবংশীয় ডমন সিংহ ঠাকুরকে ১৯টি গ্রাম ও নিমাই সিংহকে প্রচুর জমিজমা দান করেন।

৬৩। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়, বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার্স, কলিকাতা ১৯৬৮, পৃঃ-৩৭৫।

৬৪। বোর্ডকে লেখা আর কানিংহামের পত্র, তাং ০৫/১১/১৮০০, ০৫/১২/১৮০০।

৬৫। রায় রজতকান্ত, পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, অক্সফোর্ড ১৯৯৪।

৬৬। ঈশাক এইচ. এস. এম. ও চারুচন্দ্র সেন, প্লট টু প্লট এনুমারেসন ইন বেঙ্গল, ১৯৪৪-৪৫, কলি-১৯৪৬, পৃঃ-১৭৮ দেখা যায় ওন্দায় তখনও জেলার সর্বাধিক শস্য উৎপাদিত হত। মল্লসমকালীন ওন্দার কৃষি ফলনের ধারা অব্যাহত ছিল ব্রিটিশ শাসনেও।

৬৭। ঈশাক এইচ. এস. এম., চারু চন্দ্র সেন, প্লট টু প্লট এনুমারেসন ইন বেঙ্গল, ১৯৪৪-৪৫, কলি-১৯৪৬, পৃঃ-১৭৭।

৬৮। মুখার্জী এন. জি., তসর সিল্ক ইণ্ডাস্ট্রি ইন বেঙ্গল অ্যান্ড সেন্ট্রাল প্রভিন্স, বীরভূম জেলাশাসকের পত্রাবলী, তাং ২২/০৫/১৮৫৪, ০৯/০৬/১৮৫৪।

৬৯। বোর্ড অব ট্রেড প্রসেডিংস, তাং ১৩/০৬/৯৭।

৭০। বেগলার জে. ডি. এবং ক্যানিংহাম, এ. টুর থ্রু দ্যা বেঙ্গল প্রভিন্সেস, খণ্ড-৮, কলিকাতা-১৮৭৮।

৭১। ও'ম্যালী, এল. এস. এস., বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯০৮ (সং-১৯৯৫), পৃঃ ১৪০-১৪১।

৭২। গ্যাসট্রেল জে. ই., জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড স্ট্যাটিক্যাল স্কেচ অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৮৭৮।

৭৩। ব্লাকউড জে. আর., এ সার্ভে অ্যান্ড সেনসাস অব দ্যা ক্যাটল অব বেঙ্গল, কলিকাতা-১৮৬৩।

৭৪। ম্যাকালপিন এম. সি., রিপোর্ট অন দ্যা কন্ডিশন অব দ্যা সাঁওতাল ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অ্যাণ্ড নর্থ বালাসোর, কলিকাতা-১৯০৯।

৭৫। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়, বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার্স, কলিকাতা-১৯৬৮, পৃঃ-৩০।

৭৬। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়, বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার্স, কলকাতা-১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৩০, উল্লেখিত এমন মেলার তালিকায় বাঁকুড়া থানার এক্তেশ্বর, কেঞ্জাকুড়া, উড়িয়ামা, কানকাটা, দশের

বাঁধ, ভগবানপুর, জামবেদিয়া, মানকানালি শুনুকপাহাড়ী, আঁচুড়ী, জগদল্লা, বাঁশি, কুষ্টিয়া, পুরন্দরপুর, কালপাথর, নড়রা, বড়জোড়া থানার প্রতাপপুর, গড়বেতা, গৌরবেরা, পোখন্না, কৃষ্ণনগর, জগন্নাথপুর, বেলিয়াতোড়, ছাতনা থানার জিড়রা, আড়া, কামারকুলি, ঝাঁটিপাহাড়ী, ছাতনারাজ দরবার, কুলগেরা, মানতেমেনো, ছাতনা, কামারতেলি, শুশুনিয়া, গঙ্গাজলঘাটি থানায় বড়শোল, ফুলজাম, কেশিয়াড়া, পিরাবনী, ভক্তাবাঁধ, ভুঁইফোড়, তালঝিটকা, ইন্দপুর থানায় হাতগ্রাম, বড়বাঁধ, ডাঙ্গারামপুর, পুয়ারা, ইন্দপুর, আটবাইচণ্ডী, ব্রজরাজপুর, নীলাবনী, খাতড়া থানার নন্দা, ধনরঙ্গী, বামনী, দেউলী, ভোগরা, ভোজদা, সিমলা, খাতড়া, মেট্যালা, পরকুল, মেজিয়া থানায় নামো মেজিয়া, পালের বাঁধ, অর্ধগ্রাম, মেজিয়া, রামচন্দ্রপুর, ভাড়া, তেঘড়িয়া, ওন্দা থানায় মাইহা, আলাটি, খামারবেড়িয়া, তপোবন, সান্তোর, হরিহরপুর, লোদনা, ভিলা, নতুনগ্রাম, পিরোরা, আসানসোল, হাতবাড়ি, ধান্না, রাইড়ি, ছোটা-কুর্পা, গোলকুণ্ডা, নন্দারবাড়ি, ভুলানপুর, কৈবাটি, ছাগুকিয়া, বহড়ামুড়ি, গোপালপুর, চন্দ্রকোনা, কৃষ্ণনগর, কৈবাড়ি, বহুলাড়া, ওন্দা, তেলিবেড়িয়া, রামসাগর, গোড়াশোল, নাকাইজুড়ি, অগরদা, পুরুষোত্তমপুর, ঝাটিবনী, জাটাবাড়ি, যাদবনগর, জামদাহাড়া, রাইপুর থানায় মটগোদা, ভাগড়া, রানিবাঁধ থানায় বড্ডি, নারকোলি, ঘোলকুড়ি, পরেশনাথ, সিমলা, মাসুতপুর, রুন্দড়া, বুধখিল্লা, রানিবাঁধ, বাঁশডিহা, রাউতোড়া, শালতোড়া থানায় বেহাড়ী, ঢেকিয়া, পাবড়া, তিলুড়ি, সিমলাপাল থানায় সিমলাপাল, দুবরাজপুর, ভেলাইডিহা, ভূত শহর, নেকড়াতপল, তালডাংরা থানায় সাবড়াকোণ, ইন্দাস থানায় বেহার, কল্যাগ্রাম, গোপালনগর, সাসপুর, কেনেটি, গুরুধাম সেবাশ্রম, সানপুরা, আব্দুলপুর, জয়পুর থানার ব্রজশোল, দক্ষিণবার, ময়নাপুর, হেতিয়া, বৈতাল, কুচিয়াকোল, কুচিয়াকোল-মোহনপুর, গোকুলনগর, গেলিয়া, কোতুলপুর থানার বালিথা, নাপুকুড়, মির্জাপুর, সাপুরা, কোতুলপুর, মদনমোহনপুর, ছাত্র, শিবর, পাত্রসায়ের থানার দেউলপাড়া, নারায়নপুর, সালখাড়া, পাত্রসায়ের, কৃষ্ণনগর, দান্না, মহেশপুর, বালসী, বীরসিংহপুর, জামকুড়ি, নারিচা, কুশদ্বীপ, শেহাপুর, সোনামুখী থানার সোনামুখী, পাঁচাল, নফরডাঙ্গা, রাধামোহনপুর, পালসাড়া, রামপুর, খয়েরবনী, দড়িয়াপুর, নারায়ণসুন্দরী, ধনসিমলা, বিষ্ণুপুর থানার চুয়ামশিনা, ভড়া, ডিহর, জন্তা রাধানগর, অযোধ্যা, দ্বারিকা, তুর্কি-সীতারামপুর, পানসেলি, বাসদেবপুর, জিয়াবন্দি, পিয়ারডোবা, চাঁচড়, কেলিয়া, শহর বিষ্ণুপুর।

৭৭। হান্টার ডব্লু. ডব্লু., স্ট্যাটিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গল, খণ্ড-৪, লণ্ডন, ১৮৭৫, পৃঃ-২৭৭।

৭৮। মার্কেটিং ইন এগ্রিকালচার প্রডিউস ইন বেঙ্গল ১৯২৬, কলিকাতা-১৯২৮, পৃঃ-৬।

৭৯। বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয়, বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার্স, কলিকাতা ১৯৬৮, পৃঃ-৩০৭।

৮০। পালিত হেমেন্দ্রনাথ, শুভঙ্করী রাঢ় বঙ্গের গণিত পদাবলী, (সম্পাদনা অশোক পালিত) বর্ধমান ২০০১, পৃঃ ৫৮-৮৬।

৮১। রেনেল জেমস, মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্থান, লণ্ডন ১৭৮৮ এবং রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইন্যাল রিপোর্ট অন দ্যা সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা ১৯২৬, পৃঃ ৭২।

৮২। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ-৪৯।

৮৩। গ্যাসট্রেল. জে. ই., জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল স্কেচ অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৮৬৩, পৃঃ-১৭।
৮৪। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ-৪৯-৫০।
৮৫। গ্যাসট্রেল. জে. ই., জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড স্টাটিসটিক্যাল স্কেচ অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৮৬৩, পৃঃ-৫।
৮৬। গ্যাসট্রেল. জে. ই., জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড স্টাটিসটিক্যাল স্কেচ অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৮৬৩, পৃঃ ৪-১০।
৮৭। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ ৬১-৬৫।
৮৮। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ-৪৩।
৮৮ক। ১৮৫৯ সালের রেন্ট অ্যাক্টে রায়ত উচ্ছেদে নিয়ন্ত্রণ আনার প্রয়াস নেওয়া হলেও বাঁকুড়ার রায়তরা খুব একটা স্বস্তি পায়নি। কারণ রাজস্ব প্রদানকারী রায়তী স্বত্ববান বা ১২ বছরের দখলদারি প্রমাণ করে এই আইনের সুবিধা নেওয়া ছিল তাদের কাছে কঠিন।
৮৯। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ ৬৯।
৯০। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ ৮৬-৮৭।
৯১। শ্যামসুন্দর শুকুলের পরিবারে সংরক্ষিত নথি।
৯২। হান্টার ডব্লু. ডব্লু., স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গল, খণ্ড-৪, লণ্ডন, ১৮৭৫ পৃঃ-২৪৫।
৯৩। হান্টার ডব্লু. ডব্লু., স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গল, খণ্ড-৪, পৃঃ-২৫৪।
৯৪। হান্টার ডব্লু. ডব্লু., স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গল, খণ্ড-৪, পৃঃ-২৫৬ ও ২৬০।
৯৫। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ ১৪।
৯৬। ঈশাক এইচ. এস. এম ও চারুচন্দ্র সেন, প্লট টু প্লট এনুমারেসন ইন বেঙ্গল, ১৯৪৪-৪৫, কলি-১৯৪৬, পৃঃ-১৭৬।
৯৭। ঈশাক এইচ. এস. এম. ও চারুচন্দ্র সেন, প্লট টু প্লট এনুমারেসন ইন বেঙ্গল, ১৯৪৪-৪৫, কলি-১৯৪৬, পৃঃ-১৭৭।
৯৮। ঈশাক এইচ. এস. এম. ও চারুচন্দ্র সেন, প্লট টু প্লট এনুমারেসন ইন বেঙ্গল, ১৯৪৪-৪৫, কলি-১৯৪৬, খণ্ড-১ম,পৃঃ-৭,৩৪-৩৮,৭৯।
৯৮ক। সেন শুচিব্রত, দ্যা সাঁওতাল অব জঙ্গলমহল, কলি-১৯৮৪, পৃঃ-৯৫।
৯৯। ও'ম্যালী এল. এস. এস., বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯০৮ (সং-১৯৯৫), পৃঃ ১০৮।
১০০। হান্টার ডব্লু. ডব্লু., স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গল, খণ্ড-৪, পৃঃ-২১৭।
১০১। ও'ম্যালী এল. এস. এস., বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯০৮ (সং-১৯৯৫), পৃঃ ১১০।

১০২। ও'ম্যালী এল. এস. এস., বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯০৮ (সং-১৯৯৫), পৃঃ ১১১।

১০৩। ও'ম্যালী এল. এস. এস., বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯০৮ (সং-১৯৯৫), পৃঃ ১১২।

১০৪। গুলাম হুসেন সেলিম, রিয়াজ-উস-সালাতিন, অনুবাদ ঃ মৌলভী আব্দুস সালাম, পৃঃ ৩৪০-৩৬১, ঢাকা, ১৮৯৩ (বই রচিত হয়েছিল ১৭৮৮)।

১০৪ক।হলওয়েল জে. জেড, ইন্টারেস্টিং ইভেন্টস, লণ্ডন, ১৭৭২, পৃঃ ১২১-১২২ এ মন্তব্য, "They committed the most horrid devastation and cruelties, fed their horses....with Mulbery Plantations.....A general face of ruin succeeded..... and husbandmen fled."

১০৫। মহারাষ্ট্রপুরাণ, গঙ্গারাম, অনুবাদ-ডিমক-গুপ্তা, পৃঃ-৪। বর্ধমান সভাকবি বাণেশ্বরের রচিত চিত্রচম্পু। রতন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা' অনুসারে ধরাপাট, যাদবনগর, পাইকপাড়া, রামসাগর বর্গীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।

১০৬। সন্ধাকর নন্দী, রামচরিত ঃ সম্পাদনা হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী, ১৯১০, কলিকাতা।

১০৭। ও'ম্যালী এল. এস. এস., এবং মনমোহন চক্রবর্তী, হুগলি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯১২ (সং-২০১২)।

১০৮। পাণিগ্রাহী তারকেশ্বর, দ্যা ব্রিটিশ রুল অ্যাণ্ড দ্যা ইকনমি অব রুরাল বেঙ্গল, দিল্লী, ১৯৮২, পৃঃ-৬২।

১০৯। বিচার সচিবকে বিষ্ণুপুর কমিশনার উইলিয়াম ব্লান্টের পত্র, তাং ০৯/০৩/১৮০৮।

১১০। ফোর্ট উইলিয়ামের নিজামত আদালতের রেজিস্টারকে ম্যাজিস্ট্রেট ব্লান্টের পত্র, তাং ২০/০৫/১৮০৭।

১১১। পোড়েল সুদীপ্ত, বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসন, বাঁকুড়া ২০০৮, পৃঃ-৪১।

১১২। সিনহা সুকুমার ও ব্যানার্জী হিমাদ্রি, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট লেটার ইস্যুড ঃ ১৮০২-৬৯, কলি ১৯৮৯, পৃঃ-১৮৫।

১১৩। দাশ বিনোদ শঙ্কর, চেঞ্জিং প্রফাইল অব ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল, দিল্লি ১৯৮৪, পৃঃ-৮৯।

১১৪। চার্লস স্টুয়ার্টের মেদিনীপুরের রেসিডেন্টকে ১৭/০৩/১৭৭৩ তারিখের পত্র। চন্দ্র অসিতনাথ, দ্যা সন্ন্যাসী রেবেলিয়ন, রত্না প্রকাশন ঃ ১৯৭৭, পৃঃ-৭৮।

১১৫। চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবচন্দ্র, জাল প্রতাপ, কলিকাতা ১৮৯০, পৃঃ ২৮-২৯। মূল অংশটি হল, 'এই সময় সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল, কোথাও বাস না করিয়া সরকারী সার্কিট হাউসের নিকট একটি তেঁতুল তলায় গিয়া থাকিল..... মেজেষ্টার সাহেব এই পথে হাওয়া খাইতে আসিলেই সাক্ষাৎ হইবে। .... প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিয়াছেন, এই বার্তা বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হইয়াছিল। রাজা ক্ষেত্র সিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন এ কথাও লোকে শুনিয়াছিল, সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহ চিত্তে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল। .... মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব...... তংক্ষণাৎ দারগা, জমাদ্দার, বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা অনেকে পালাইল, তথাপি প্রায় একশত জন ধরা পড়িল। .... বলা বাহুল্য

গভর্ণমেন্ট রিপোর্টে গেল যে একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে, সে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত ধরা পড়িয়াছে।'

১১৬। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া-২০০০ খ্রিঃ, পৃঃ-৩১২।

১১৭। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া-২০০০ খ্রিঃ, পৃঃ-১২৮।

১১৮। ভট্টাচার্য হরশঙ্কর, জমিনদার ও পাটনিদার, বর্ধমান ১৯৮৫।

১১৯। বসু সুগত, বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, দিল্লি ১৯৯৫, পৃঃ ১৪।

১২০। ম্যাকালপিন এম. সি., রিপোর্ট অন দ্যা কণ্ডিশন অব দ্যা সাঁওতাল ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, কলিকাতা-১৯০৯, পৃঃ-২৭।

১২১। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ ১৭-২০।

১২২। স্ক্রাইন. টি. এইচ. বি., মেমোর‍্যান্ডাম অন দ্যা মেটেরিয়াল কন্ডিশন অব দ্যা লোয়ার অর্ডার ইন বেঙ্গল, ১৮৮১-১৮৯১, কলিকাতা, ১৮৯২।

১২৩। চৌধুরী বিনয়ভূষণ, বাংলা ও বিহারের কৃষক উৎখাতের ইতিহাস ১৮৮৫-১৯৪৭, কলিকাতা, ২০০৮। এই ঘটনাকে তিনি 'Depeasantization' বলেছেন।

১২৩ক।ফাইনাল রিপোর্ট ইন্টু দ্যা কন্ডিশন অব এগ্রিকালচারাল লেবারার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৪৬-৮৭, আই. এস. আই. কলি-১৯৫৩, পৃঃ-৩। কৃষির উপর মুখ্য নির্ভরশীল ছিল ৭.৬৪ শতাংশ ও গৌণ নির্ভরশীল ১২.২৫ শতাংশ । ১৯২৫ সালের মজুরি সমীক্ষা ও ১৯৩৯-৪০ ভূমিরাজস্ব কমিশনের তদন্তের পর এটি বড় একটি সমীক্ষা।

১২৪। রবার্টসন এফ. ডব্লু., ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া, ১৯১৭-২৪, কলিকাতা-১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ ২২।

১২৫। পোড়েল সুদীপ্ত, বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসন, বাঁকুড়া ২০০৮, পৃঃ ৬০-৬১।

১২৬। দাস. বি. এস., সিভিল রেবেলিয়ান ইন ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল, কলিকাতা ১৮৭৩, পৃঃ-৭৮।

১২৭। দাস. বি. এস., সিভিল রেবেলিয়ান ইন ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল, কলিকাতা ১৮৭৩, পৃঃ-৭৭।

১২৮। দাস. বি. এস., সিভিল রেবেলিয়ান ইন ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল, কলিকাতা ১৮৭৩, পৃঃ-৭৬।

১২৯। কুপল্যান্ড. এইচ., মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলিকাতা, ১৯১১, পৃঃ-৫৬।

১৩০। পালিত সুধীর, বাঁকুড়া জেলার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার, রিসার্চ প্রজেক্ট, আর. আর. এস. ঝাড়গ্রাম, এস. আর. খণ্ড-১, বি.সি.কে.ভি., ১৯৮৯।

১৩১। বাঁকুড়ার খেয়ালী, ২০০৭, পৃঃ-৬৩।

১৩২। ও'ম্যালী এল. এস. এস., বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা ১৯০৮, (সং-১৯৯৫), পৃঃ ১৯-২০।

১৩৩। কর রামানুজ, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, কলকাতা, ১৯২৫।

১৩৪। সরকার সুশোভন, রামমোহন অন ইন্ডিয়ান ইকনমি, কলি-১৯৬৩। রামমোহন সমীক্ষা (পরিশিষ্ট), দিলীপ কুমার বিশ্বাস।

১৩৫। সরকার বিক্রম, ভারতে ভূমি সংস্কার, দিল্লি ১৯৮৯। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভূদান আন্দোলনে বাঁকুড়ার ১২৪৮ জন রায়ত দান করেছিলেন ২৬১.১৬ একর, যা মোট জমির ৪৬ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে মেদিনীপুরের জমিদান ছিল ১৮২.১২ একর।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প ও বাণিজ্য জীবন

বাঁকুড়া ভূমিতে বাণিজ্য লক্ষ্মীর আবাহনে বহুমাত্রিক তৎপরতা অঙ্কিত আছে বহু শতাব্দীর বিস্তৃত ক্যানভাসে। বিচিত্র তার রঙের খেলা। আদি ঐতিহাসিক যুগে নদীনির্ভর বাণিজ্য ভাবনারা উৎস মুখ প্রোথিত অনৈতিহাসিক কালের নদীকেন্দ্রিক বসতি বিস্তার ও সভ্যতার সৃষ্টির মধ্যে। সেই সৃষ্টিসুখের উল্লাস বদ্ধ ছিল অগণিত জঙ্গল জনপদের সীমানার মধ্যে। দশম শতকে জৈন শ্রাবক ও ওড়িয়া সংস্কৃতির আগমনে মুক্ত হল সেই বাঁধন। গড়ে উঠতে থাকে সড়ক, বাজার, শকট, সমৃদ্ধি ও সৃষ্টি। দ্বারকেশ্বর-কংসাবতী প্রভৃতি নদীধারে গড়ে ওঠা অসংখ্য দেবদেউল সেই সমৃদ্ধির বার্তা হয়ে আজও হাজার বছর পরে প্রায় অক্ষত আছে। ভৌমরাজ শাসনের অবসানে ব্রিটিশ আগমনে ঘটল পুঁজিবাদী শোষণের সূত্রপাত। সেই শোষণের চিহ্ন রয়ে গেছে রাঢ় বাঁকুড়ার অগণিত ভগ্ন নীলকুঠি, লুণ্ঠিত বন ও বনজ সম্পদের ক্ষুদ্রাবশেষে, বাঁকুড়ার দারিদ্রে।

বাঁকুড়ার সড়ক সংবাদ :

কোনো অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক। আলোচ্য ভৌগোলিক ক্ষেত্রে পুরাকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের অস্তিত্ব ছিল। ব্যবহারিক নিরিখে সড়কগুলিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা বাণিজ্য সড়ক, পুণ্যার্থী সড়ক ও সমর সড়ক।

মৌর্য গুপ্ত সময়ে সড়ক

মৌর্য সময়েই বঙ্গের তাম্রলিপ্ত বন্দর একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের পাটলিপুত্র সহ অন্যান্য মুখ্য বাণিজ্য শহরের সাথে এর সংযোগকারী সড়কের অবস্থান ছিল এই রাঢ় ভূমি দিয়ে। সিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ অনুসারে সিংহল রাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সঙ্গীরা বোধিদ্রুমের শাখা নিয়ে পাটলিপুত্র থেকে যখন সিংহল ফিরে যাচ্ছিলেন, সম্রাট অশোক স্বয়ং বিশাল সেনা সহ তাঁদের তাম্রলিপ্ত বন্দরে বিদায় জানান। গয়া থেকে ছোটনাগপুরের পাহাড় অতিক্রম করে তাম্রলিপ্ত আসতে তাঁর সাতদিন সময় লেগেছিল।[১] যাত্রাপথ ছিল পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, রাজমহল, ঝড়িয়া, রঘুনাথপুর, ছাতনা, ঘাটাল, তাম্রলিপ্ত। এই সড়কটিই ছিল তৎকালে মুখ্য বাণিজ্যপথ। চিন দেশীয় পর্যটক ফা-হিয়েন ৪০০-৪১১ খ্রিস্টাব্দকালে, বারাণসী থেকে গঙ্গা অতিক্রম করে চম্পা নগরীতে প্রবেশ করে পূর্বদিকে ৫০ যোজন পথ হেঁটে তাম্রলিপ্ত বন্দরে পৌঁছেছিলেন। পূর্বোক্ত পথে তাঁর পদভ্রমণ অসম্ভব কিছু না। অপর দুই চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ (৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ) ও ইসিং (৬৭৩-৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে) তাম্রলিপ্ত বন্দর সংযোগী উক্ত সড়ক ব্যবহার করে থাকতে পারেন। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে হিউয়েন সাঙ্ বারাণসী, বৈশালী, পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর) পরিভ্রমণের পর কজঙ্গলে (সম্ভবত বর্তমান রাজমহল) এসেছিলেন। কজঙ্গল থেকে সিউড়ি, রানীগঞ্জ, পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর হয়ে তাম্রলিপ্ত পৌঁছান।[২]

অর্থাৎ খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই বাঁকুড়ায় বাণিজ্যিক সড়কের সুস্পষ্টতা ছিল। এই সড়কের অবস্থান ছিল মূলত বর্তমান বাঁকুড়ার উত্তর ও পশ্চিম অংশে। পরে দক্ষিণ বাঁকুড়ায়—পুরুলিয়া-ইন্দপুর সড়কটি গড়ে উঠেছিল যা বাঁকুড়া-রাজগ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

চৈতন্য মহাবীরের যাত্রাপথ

মৌর্য সময়ে রাঢ়ভূমিতে (জনশ্রুতি দক্ষিণ বাঁকুড়ায়) জৈন আচারঙ্গ সূত্রানুসারে মহাবীরের আগমন ঘটেছিল। তিনি পথবিহীন গভীর জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তৃত অঞ্চলের ভেতর দিয়ে পর্যটন করেছিলেন। এ ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীচৈতন্যের ওড়িষা থেকে বেনারস হয়ে মথুরা যাত্রাপথ ছিল মানভূমের উপর দিয়ে।[৩] এ সড়কটি বর্তমান পাকবিড়রা-বুধপুরগামী সড়ক বলে অনুমিত। আরেকটি জনশ্রুতি মতে শ্রীচৈতন্যদেব পথভ্রমে দক্ষিণ বাঁকুড়ায় প্রবেশ করেছিলেন। মহাবীর ও শ্রীচৈতন্য কাহিনি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ বাঁকুড়ায় সড়ক ব্যবস্থায়

সুস্পষ্টতা আসেনি।

বৌদ্ধ মহাবীরের সময়ে জনস্বল্পতা ও সীমিত সড়ক বাণিজ্যের কারণে সড়ক ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। এমনকি পথিকদের আগাছা সাফ করতে করতে এগোতে হত।[৩ক] মেগাস্থিনিসের বিবরণ, বৌদ্ধজাতক কাহিনি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে মৌর্য সমকালীন সড়কের বিবরণ পাওয়া যায়। এই সময়কার তক্ষশীলা থেকে তাম্রলিপ্ত সড়কের নাম ছিল 'উত্তরাপথ' এবং তা ছাতনা, বিষ্ণুপুর স্পর্শ করে বিস্তৃত ছিল। অশোকের অনুসৃত পূর্বোক্ত পথটিই ছিল 'উত্তরাপথ'।

বাদশাহ সমকালীন সড়ক

শেরশাহ সুরির (১৪৮৬-১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে মুখ্য সড়কটি মুলতান থেকে বঙ্গের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও পর্যন্ত প্রসারিত হয়। যা সড়ক-ই আজম বা বাদশাহী সড়ক নামে খ্যাত। বাঁকুড়া জেলায় এই সড়কটি আসানসোল-রানীগঞ্জ থেকে মেজিয়া হয়ে বাঁকুড়া শহরকে (কেশিয়াকোল-লালবাজার-লখ্যাতড়া) স্পর্শ করেছে। সড়কটি বিষ্ণুপুর-গড়মন্দারণ-উচালন হয়ে বর্ধমানে মিশেছে, যা মুর্শিদাবাদ হয়ে সোনারগাঁও পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। মোঘল আমলে সড়কটি পূর্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে কাবুল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

প্রাচীন সড়কটি ইন্দোরের মহীয়সী রানী অহল্যাবাঈ হোলকারের (১৭২৫-১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে পুরীগামী পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে পরিমার্জিত রূপ লাভ করে। পাটলিপুত্র (পাটনা) থেকে এ রাস্তা রাজগীর, ঝরিয়া, তেলকূপী, পুরুলিয়া (রঘুনাথপুর) হয়ে কেঞ্জাকুড়া, উরিয়ামা, ছাতনা, সানাবাঁধ, কানকাটা, পাটপুর, মাচানতলা হয়ে বিষ্ণুপুর, কোতলপুর ও এরপর গড়বেতা-চন্দ্রকোণা-মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পুণ্যার্থীদের পথটি ছিল খড়্গাপুর, গোপীবল্লভপুর হয়ে ওড়িযাগামী। আরেকটি পথ ছিল দাঁতন হয়ে বালেশ্বরের দিকে। মাণিকলাল সিংহ উল্লেখিত বুদ্ধগয়া থেকে তাম্রলিপ্ত রাজপথ বর্ণনায় জনপদগুলি হল বুদ্ধগয়া, দুলমী (সুবর্ণরেখা), বরাবাজার, মানবাজার, বুধপুর, পাকবিড়রা, দেউলভিড়া-ইন্দপুর, ধলডাং, এক্তেশ্বর (দ্বারকেশ্বর), রাণীগঞ্জ মোড়, রাজহাট, বহুলাড়া, ধরাপাট, জয়কৃষ্ণপুর, অবন্তিকা, গহীরহাটী, কাঁকিলা, ঠাকুরপুর, লয়ের, জন্তা, রাউতড়া, ডিহর, বিষড্যা, মুনিনগর, নাড়িচা, ইংজুড়ি, নারাঙ্গী ইত্যাদি।[৪]

ব্রিটিশ শাসনে সড়ক

বিষ্ণুপুর ও পুরীগামী পুণ্যার্থীরা রানীগঞ্জ-মেজিয়া-সানবান্দা-তপোবন-কোটালপুর-কালীসেন-বিষ্ণুপুর রাস্তাটি ব্যবহার করলে এ রাস্তাটি পিলগ্রিম রোড হিসাবে পরিচিত

হয়। প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর যোগাযোগ ছিল বাঁকুড়া-রাজাহাট-বহুলাড়া-ধরাপাট-ডিহর-রামসাগর পথে এবং বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর যোগাযোগ হত বিষ্ণুপুর-পানুয়া-চাতরা-ময়নাপুর-সলদা-জয়পুর-কোতলপুর-মন্দারণ হয়ে। ব্রিটিশ শাসনকালে আঁচুড়ি-ভেদুয়াশোল-কালীসেন সড়ক, বাঁকুড়া-ওন্দা-রামসাগর এবং জয়পুরগামী সড়কগুলি নির্মিত হলে হাওড়া-বিষ্ণুপুর-রঘুনাথপুর সংক্ষিপ্ততম যোগাযোগ স্থাপিত হয় যা ও'ম্যালী মিলিটারি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বলে অভিহিত করেছিলেন। এছাড়া ১৯০৮ সালে ও'ম্যালী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কথা বলেছিলেন। যেমন—(১) বাঁকুড়া-রঘুনাথপুর-দানপুর-মহেশানা-পুরুলিয়া, (২) বাঁকুড়া-ছাতনা-কুশথোল-মেজিয়া, (৩) বাঁকুড়া-ইন্দপুর-খাতড়া, (৪) বাঁকুড়া-তালডাংরা-রাইপুর, (৫) বেলিয়াতোড়-সোনামুখী-বর্ধমান, (৬) বিষ্ণুপুর-সোনামুখী-রাঙামেট্যা-পানাগড়, (৭) বিষ্ণুপুর-কোতলপুর-হাওড়া, (৮) বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, (৯) কোতলপুর-ইন্দাস-রোল-বর্ধমান, (১০) গঙ্গাজলঘাটী-কুশথোল-শালতোড়া, (১১) মেজিয়া-শালতোড়া-মুরুল।

বাঁকুড়ার নৌপথ

বাঁকুড়ার অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধির সাথে সড়ক বাণিজ্যের পরিধিও বাড়তে থাকে যদিও প্রাথমিক অবস্থায় নদী-বাণিজ্যের পরিপূরক হিসাবে সড়ক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত (ভূম রাজ্যসমূহের স্থিতিকাল) বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বাঁকুড়ায় নৌবাণিজ্যের সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য থেকে দামোদর নদের, রূপরামের ধর্মমঙ্গল থেকে দ্বারকেশ্বর নদের, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে শিলাবতী নদীর নাব্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজগ্রাম-ঘাটাল বন্দর নৌবাণিজ্যের ইতিহাস স্বীকৃত নাম। হান্টারের হিসাবে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে নৌবাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ১১৯৯ জন, যা ১৮৮১ সনে কমে আসে। এসময় নৌবাসী ছিলেন মাত্র ১২৯ জন।

চৈনিক পর্যটক ও রাঢ়

বাঁকুড়ার সড়ক পর্যটকদের বিবরণে তৎকালীন অর্থনৈতিক চালচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রের পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছেন বলে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নেই।[৫] তিনি পাটলিপুত্রের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন ইণ্ডিকা গ্রন্থে। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্, ইসিং প্রত্যেকেই পাটলিপুত্র-তাম্রলিপ্ত ভ্রমণ করেছিলেন রাঢ় বাঁকুড়া অঞ্চলের মধ্য দিয়েই। তাঁদের যাত্রাকাল ছিল যথাক্রমে ৩৯৯-৪১৪ খ্রিস্টাব্দ, ৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬৭৩-৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ। ফা-হিয়েন রাঢ়ভূমি অতিক্রম করেছিলেন ৪১১-৪১২ খ্রিস্টাব্দে এবং পরবর্তী দু'বছর বঙ্গের প্রাচীনতম পোতাশ্রয় ও বন্দর তমলুকে

বৌদ্ধশাস্ত্রীয় পুঁথিমালার অনুলিখন ও চিত্রাঙ্কন কার্যে অতিবাহিত করেন। তাঁর বর্ণনায় তাম্রলিপ্ত ছিল সমৃদ্ধ নগরী, মুখ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। তিনি বাণিজ্য পোতেই স্বদেশ যাত্রা করেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে (Record of the Buddhistic Kingdoms) রাঢ়ভূমির কোনো বিস্তৃত আর্থ-সামাজিক ভাষ্য নেই।[৬] তাছাড়া রাঢ়ে কোনো উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ কেন্দ্রও ছিল না। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে[৭] (Si-Yu-hi এবং Life of Hiuen Tsang) সমতটের মতো অঞ্চল ছাড়া বাকি বঙ্গে উর্বর ক্ষেত্র ও ফল-ফুল-শস্য ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। তাঁর কাছে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল নির্ভীক কিন্তু অসংস্কৃত। আলোচ্য ভূখণ্ডটি তৎকালীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত বা প্রভাবিত ছিল। বাংলায় তাঁর ভ্রমণ ছিল নির্বিঘ্ন যা সমকালের শান্তি-শৃঙ্খলাকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে ইসিং ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্ত প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে ডাকাত দুষ্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।[৮] নিশ্চিতভাবেই তখন বাংলা ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতাগ্রস্ত। যা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি ও সামাজিক শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করেছিল। ২৭০-২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অশোকের পাটলিপুত্র থেকে রাঢ়ের উপর দিয়ে তাম্রলিপ্ত ভ্রমণ ছিল অবাধ ও সসৈন্য। এ ঘটনা যেমন রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে মৌর্য প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়, তেমন পথ নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে আবশ্যক ছিল বলে মনে হয়। অবশ্য এ ঘটনার ছয় ও আট শতক পরে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের রাঢ় পরিভ্রমণ ছিল একক ও নির্বিঘ্ন অর্থাৎ তৎকালীন আর্থ-সামাজিক স্থিতি ও নিয়ন্ত্রিত অপরাধিত্ব ছিল লক্ষণীয়।

শ্রীনিবাসের মল্লভূম যাত্রা

গুপ্তোত্তর পাঁচশত বর্ষ (পাল-সেন-ভৌমরাজের সময়কাল পর্যন্ত) রাঢ়ের রাষ্ট্রসমাচার ছিল প্রায় তমসাচ্ছন্ন। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বিরের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী ভৌমরাজ্য গড়ে ওঠে ১৫৭৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সময়ে বৃন্দাবন আগত শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বিষ্ণুপুর রাজ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠা ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব ভাবাধারা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর ছাড়া বাংলার প্রত্যেক গৃহকোণ প্লাবিত ও রসসিক্ত করেছিল।[৯] শ্রীনিবাস কর্তৃক রাঢ়ে বৈষ্ণব ভাবধারার প্রবর্তন বাকি বাংলাকে রাঢ়ভূমির সাথে আর্থ-সামাজিকভাবে আত্তীকৃত হতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। শ্রীনিবাসের আগমনের (আগমনকাল ১৫৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস, কারণ শ্রীনিবাস মল্লরাজপদে স্বীকৃত হন ৩রা আষাঢ়, অবশ্য রজতকান্ত রায় এই সময়কাল ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ বলেছেন। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী এই সময়কালটি ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমান করেছিলেন।)

পূর্বে বিষ্ণুপুর ভৌমরাজ্য ছিল বিচ্ছিন্ন আধা উপজাতীয় ভূখন্ড, যেখানে পথদস্যুতা ছিল রাষ্ট্র সমর্থিত ও রাষ্ট্রের ধনবৃদ্ধির সহায়ক।[১০] শ্রীনিবাসের বৈষ্ণব গ্রন্থরাজ সমৃদ্ধ গোশকটদ্বয় বিষ্ণুপুরের অনতিদূরে গোপালপুরে রাত্রিবাসকালে রাজপ্রেরিত দস্যুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। ভক্তিরত্নাকর-এ ঘটনা বিবৃত হয়েছে (পৃঃ ৩৪১) নিম্নরূপে,

"সর্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন,
নীলাচলে যায় সঙ্গে লিয়া বহুধন;
রাজা বীর হাম্বিরের দস্যুগণ যতনে
গণিয়া দেখিল গাড়ি পূর্ণ নানা রতনে।"

১১৩৫ খ্রিঃ কিছু আগে পরে দক্ষিণ বাঁকুড়ার ওড়িয়া আগমন ও অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ সহ বিভিন্ন ওড়িয়া অধিপতির আধিপত্য ইতিহাস স্বীকৃতি। এদের সমরাভিযান পরিচালিত হয়েছিল মেদিনীপুর-মন্দারণ-চেতুয়াবরদা-বৈতল পথে।

মল্লভূমে জগমোহন ও রাইনল

পূর্বেই উল্লেখিত যে উত্তরভারত ও নীলাচলের সংযোগকারী সড়ক এবং উত্তর ভারত তাম্রলিপ্ত সংযোগকারী প্রাচীন সড়ক বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরকে (ডিহর) স্পর্শ করেছিল এবং পর্যটক, বণিক এবং পূণ্যার্থীরা এই পথ ব্যবহার করতেন। সুতরাং রত্নবাহক শকট লুণ্ঠনে রাষ্ট্রীয় তৎপরতা তৎকালীন ভৌম রাজ্যগুলির আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতিকেই নির্দেশ করে। শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র কবিরাজের মতো অসংখ্য শিষ্য, বোষ্টম, গোস্বামীরা মল্লরাজ্যে এই নতুন ভাবধারায় জনসাধারণের মনন ও চিন্তায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজা হাম্বির, রাজপরিবার, সমাজের উচ্চগোষ্ঠীর মানুষেরা এই ভাবধারা গ্রহণ করায়, এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় বাঁকুড়ায় বৈষ্ণব 'বৈরাগ্যদের' সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার ২ শতাংশ। অতএব বলা যায় মল্লসময়ে মল্লভূমের সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি বৃহত্তর বঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। মল্লরাজ গোপাল সিংহের (১৭১৩-১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে আগত কর্ণাট দেশীয় পর্যটক জগমোহন (রমেশচন্দ্র মজুমদারের হিসাবে সংশ্লিষ্ট পুঁথি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে) ও ফরাসি পর্যটক এ্যাবে রাইনলের বিবরণীতে তার ছায়াপাত আছে। রাইনলের ভাষায় মল্লভূমে প্রবেশ করলে, "would see the rise of a Government which being founded only on happy prejudices, on a simplicity and purity of manners, on the wildness of the people and the integrity of the chiefs.... the Government of Bishnupur,the off-spring of a just attention to order and law of nature, has been established

and maintained" অর্থাৎ মল্লভূমে তথা রাঢ়ভূমিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাধারা প্রবর্তনের দুশ বছরেই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্থিতি ও শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়েছিল। নাগরিকদের বিনীত, মার্জিত ও সরল ব্যবহার, রাজন্যবর্গের সততা তাঁর বিবরণীতে ঠাঁই পেয়েছে।[১১] হাম্বীরের সময়ে যে বিঘ্নিত পথ নিরাপত্তার পটভূমিতে শ্রীনিবাস কাহিনি বর্ণিত হয়েছিল, দুই শতাব্দী পর রাইনল ঘাটোয়ালী প্রথায় সেই পথ নিরাপত্তার সপ্রশংস বিবরণ দিয়েছেন।[১২] সড়কের এক একটি অংশের দায়িত্বে থাকতেন একেকজন ঘাটোয়াল। পর্যটক ও বণিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতেন সংশ্লিষ্ট ঘাটোয়াল। তিনিই প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র দিতেন নামমাত্র করের বিনিময়ে। পরবর্তী ঘাটোয়াল একইভাবে পথ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতেন। বিদেশি বণিক ও পর্যটক রাজধানীতে প্রথম তিনদিন নিখরচায় থাকা-খাওয়া সহ রাষ্ট্রীয় আতিথ্য পেতেন। এ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার কৌশল। নাগরিকরা ছিল সরল সাদাসিধা ও রাজা ছিলেন সৎ-ন্যায়পরায়ণ। কৃষক-ব্যবসায়ীদের উপর চাপ না থাকলেও বার্ষিক সত্তর-আশি লক্ষ টাকা আয় হত ও মোঘলের নজরানা মিটিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হত।[১৩]

কর্ণাট দেশীয় পণ্ডিত জগমোহনও একইভাবে ছাতনা-বাঁকুড়া-রামসাগর-সোনামুখী-বিষ্ণুপুর-জয়পুর-কোতলপুর পরিভ্রমণ করে শান্তি ও সমৃদ্ধি লক্ষ করেছিলেন।[১৪] তিনি সোনামুখীতে তন্তুবায় ও গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীবের গ্রাম বালিয়া-চট্টগ্রামে কায়স্থদের দেখেছিলেন। তিনি এখানে বেত্রবতী, শিলাবতী, কজ্জলা, কালিন্দি নদী, বিষ্ণুপুর প্রস্তর মন্দির, রাসমঞ্চ, নাপুড়াখ্য শিবমন্দির, গামিদ্যার বাসুলি মন্দির, যমুনা বাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, লালবাঁধ, শ্যামবাঁধ, ছত্রিনা-কানন চিহ্নিত করেছেন। বাঁকুড়া তাঁর কাছে 'বনের নিকট বঙ্গাল গ্রাম'। বিষ্ণুভক্ত রাজা কার্তিক-পৌষে রাসলীলা করত। দ্বারিকেশি পর্যন্ত মল্লভূমি(?) ছিল ধর্মবর্জিত।

তবে ওই শতাব্দীর চার ও পাঁচের দশকে বর্গী আক্রমণ দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি বিনষ্ট করেছিল। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে ব্রিটিশ আগমন কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে সার্বিক বিপর্যয় ডেকে আনে। রমেশচন্দ্র দত্ত, হলওয়েল গ্রান্ট, হরচন্দ্র ঘোষ সহ বিভিন্ন প্রশাসকের প্রতিবেদনে তা ধরা পড়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

ফার্গুসনের সমরযাত্রা

দক্ষিণ বাঁকুড়ায় কোনো সড়ক-পর্যটকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে ১৭৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের ইংরেজ রেসিডেন্ট গ্রাহাম, লেঃ জন এনসাইন ফার্গুসনের নেতৃত্বে বাঁকুড়ার বিদ্রোহী ভৌমরাজদের বিরুদ্ধে যে সমরাভিযান পাঠান তাতে

তৎকালীন দক্ষিণ বাঁকুড়ার অর্থনৈতিক অবস্থান কিছুটা অনুমান করা যায়। ফার্গুসনকে লেখা গ্রাহামের ৩০/০১/৬৭ তারিখের পত্রাঙ্কে দেখা যায় জঙ্গলমহলের ভৌগোলিক দুর্গমতার কারণে ভৌমরাজরা প্রায় স্বাধীন অবস্থান নিয়েছেন এবং আঞ্চলিক বণিক ও বাণিজ্য, ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে পড়েছিল। গ্রাহামের ভাষায়, "...the continuance of this independence and is also thought to obstruct commercial intercourse,.... to proceed against these Zamindars, with a view to reduce them to a proper subjection to our Government on payment of just revenue, to enforce their obedience to the authority of the resident of Midnapore, and to encourage, if possible, the merchants of western districts to open again their wanted communicates with these province." অর্থাৎ এই সমরাভিযানের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। এক, জমিদারদের কাছে যথাযথ ভূমিরাজস্ব আদায়; দুই, ব্রিটিশ স্বার্থে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার। কিন্তু ইংরেজ আরোপিত রাজস্ব, এলাকার কৃষি অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফুলকুসমা, রাইপুর, ভেলাইডিহি পরগণাগুলি, আরোপিত অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। ছাতনা, সিমলাপাল, সুপুর, অম্বিকানগর, শ্যামসুন্দরপুরের রাজস্ব প্রদান সামরিক আস্ফালনে নিশ্চিত করা গেলেও তা ছিল অত্যধিক এবং প্রজার স্বার্থের প্রতিকূল। অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে আরোপিত ফুলকুসমায় বাৎসরিক রাজস্ব ৫০০ টাকা ও রাইপুরের ক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা তৎকালীন ভূমি উর্বরতা ও কৃষি উৎপাদনের সমানুপাতী ছিল না। ব্রিটিশের এই অবৈজ্ঞানিক ও দমনমূলক রাজস্বনীতির ফলে কয়েক দশকেই বাঁকুড়ার ভৌমশাসকরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়েন।

বাঁকুড়ায় এই দীর্ঘ সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন সস্ত্রীক ফার্গুসন, এলাকা বিষয়ে অভিজ্ঞ কার্তিক রাম (মেদিনীপুর ধারিন্দার পাইক কর্মচারী), চন্দন ঘোষ (রাজস্ব অভিজ্ঞ) এবং অন্যূন ২০০০ পাইকের সাথে লড়াই করার মতো সেনা। তাঁর সামরিক যাত্রাপথ ছিল মেদিনীপুর-কর্ণগড়-ঝাড়গ্রাম-বলরামপুর-ছাতনা-বাঁকুড়া-ইন্দপুর-সুপুর-রাইপুর। তাঁর সামরিক শিবিরগুলি ছিল ধারওয়ার, বলরামপুর, ছাতনা, সুপুর ইত্যাদি স্থানে এবং অভিযানকাল ছিল ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত। ফার্গুসন রাইপুরে অবস্থানকালে স্থানীয় বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষিক্ষেত্র দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তখন রাইপুরের সেচের মুখ্য উৎস ছিল যমুনাবাঁধ (শিখরসায়র?)।

হান্টারের বাঁকুড়া ভ্রমণ

এক শতাব্দী পরে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বীরভূম জেলার উচ্চ পদাধিকারী উইলিয়াম উইলসন হান্টার বাঁকুড়ার উপর দিয়ে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুর যাত্রা করেছিলেন। তাঁর বিবরণে সমকালীন আর্থ সামাজিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া

যায়। এ সময় ব্রিটিশ শাসনের শতবর্ষপূর্তি হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট সুগম ছিল না। এই যাত্রাপথের বিশদ বিবরণ আছে ফ্রান্সিস হেনরী স্কাইনের 'লাইফ অব স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার' গ্রন্থে। 'হান্টার, জেলাচর্চা ও বাঁকুড়া প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধে সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'যাত্রাপথ ছিল কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল। এখনকার নীরস রেল ভ্রমণের তুলনায় তা ছিল অনেক বিচিত্র ঘটনায় ভরা। হান্টার সপরিবারে তার নিজস্ব দুই ঘোড়ায় টানা ভিক্টোরিয়ায় এই পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। পরিবর্তনের জন্য তৃতীয় একটি ঘোড়া সঙ্গে থাকত। বাড়তি ঘোড়াটিকে সবসময় পরবর্তী বিশ্রামের জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেটা ছিল আগস্ট মাস এবং বছরের বারোটা মাসের মধ্যে আগস্ট মাসটাই এ ধরনের যাত্রার পক্ষে সবথেকে অনুপযুক্ত।

হান্টার যখন দামোদরের তীরে পৌঁছালেন, নদীতে তখন তীব্র স্রোত। পারাপারের উপায় বলতে একটা টলমলে ফেরিবোট। দুপাশে ঘোড়া দুটিকে রেখে ঠেসাঠেসি করে হান্টারের ভিক্টোরিয়াকে সেই ফেরিবোটে তোলা হল। ফেরিবোট ছাড়া হল সকাল আটটায়। তা যখন উল্টোদিকের পাড়ে ধাক্কা দিল তখন রাত দশটা পার হয়ে গেছে। কোনোরকমে বাঁশের ঠেকনা দিয়ে ঘোড়াগুলোকে কাদা পার করে ডাঙায় তোলা হল। হান্টার পরিবার তখন বিধ্বস্ত। নদীর উঁচু বাঁশের পথ দিয়ে তাঁরা অতিথিশালার দিকে চললেন। বেশিদূর যেতে হল না। দেখা গেল সামনেই জলের তোড়ে রাস্তা কেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে। গাড়িটিকে বাঁধ থেকে নামিয়ে গর্ত পার করে কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে আবার বাঁধের পাড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ছিল না।' এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বর্ষার দু'মাস এবং বর্ষার পরও ১-২ মাস কার্যত পথঘাট অগম্য হয়ে পড়ত এবং অর্থনেতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষত সড়ক বাণিজ্য বিঘ্নিত হত।

হান্টার সেপ্টেম্বরে বিষ্ণুপুরে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলেন তা প্রায় ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তরের প্রতিচ্ছবি। তিনি লিখলেন, "আমি দেখলাম, বিষ্ণুপুর এক কালের বাংলার সব থেকে জনবহুল নগরী, দরিদ্রের নগরীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দুই-তিন হাজার মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে। কিন্তু ত্রাণ পর্যাপ্ত নয়; কলেরার ব্যাপক প্রকোপও শুরু হয়েছে। প্রতিদিন অন্তত পঁয়ত্রিশ জন অনাহারে মারা যাচ্ছে। পথে পথে ঘুরছে অগুন্তি অনাথ শিশু, পোকামাকড় ছাড়া যাদের অন্য কোন খাদ্য নেই।" বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এক শতাব্দী পরেও বাঁকুড়াবাসীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন ঘটেনি। ঔপনিবেশিক শাসনে সাধারণ মানুষ ছিল দারিদ্রকবলিত। ও'ম্যালীর মতে (জেলা গেজেটিয়ার্স, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা ১৯৯৫, পৃঃ ১০৯) এ সময় তন্তুবায়দের দুরবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। কাজের বিনিময়ে ত্রাণপ্রকল্পে তারা ক্ষেতমজুরদের সমতুল আয়ে অসমর্থ

হয়। তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার ছিল না। তাদের দুর্দশা দূর করতে গড়বেতার মহকুমা শাসকের (তখন বিষ্ণুপুর গড়বেতা মহকুমায় ছিল) কোনো সক্রিয়তা ছিল না। জেলা প্রশাসন ছিল নিষ্ক্রিয়। তবে জেলা জজ ডব্লু. টি. টাকার ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু ত্রাণ সাহায্য করেন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ছিল জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে।

যদুনাথের 'তীর্থভ্রমণ' ও বাঁকুড়া

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার এক তীর্থ ভ্রমণকারী যদুনাথ সর্বাধিকারী কোতলপুর, বালসী, পাত্রাসায়ের, সোনামুখী হয়ে বর্ধমান জেলা দিয়ে পশ্চিমভারতে তীর্থে গিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণগ্রন্থ 'তীর্থ ভ্রমণ'-এ এই যাত্রাপথের বিবরণ থেকে তৎকালীন পূর্ব বাঁকুড়ার আর্থ সামাজিক অবস্থান অনুমান করা যায়। ১৮ই ফাল্গুন হুগলির কালীপুর থেকে ৭ ক্রোশ অতিক্রম করে কোতলপুরে পৌঁছে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ".... এই স্থানে রাস্তার দোকানে থাকা হইল। ইহার পশ্চিমদিকে মুনসেফের কাছারি, উত্তরদিকে বাজার। এখানে অনেক মহাজন লোকের বসতি আছে। তাবৎ দ্রব্যাদি ভাল পাওয়া যায়। পানের বুরজ অনেক আছে, ভদ্রলোকের বসতি অনেক আছে, উত্তম স্থান, নগর কহা যায়.... মুনসেফের কাছারির এবং হাট বাজার নগরের বসতি সকল দেখা যায়। মেঠাই ও কদমা ইত্যাদির দোকান ভাল ভাল আছে....।" স্পষ্টতই কাছারিকে কেন্দ্র করে বাজার, দোকান, মহাজনী ব্যবসা, বাণিজ্যিক পান চাষ কোতলপুরে সমৃদ্ধি এনেছিল। চারক্রোশ দূরের বালসী গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "তেলি চাষা ময়রা নাপিত অধিক আছে। ব্রাহ্মণ প্রায় একশত ঘর বাজারে ও বালসী গ্রামে আছে, লেখাপড়া কেহই উত্তম জানে না, কৃষিকর্মে কাল হরণ করে। কৃষিকর্মে শস্যাদি এত জন্মায় যে তাহাতে সংসারযাত্রা এবং নিত্যনৈমিত্তিক বিক্রয়াদি নির্বাহ করিয়া ধন সঞ্চয় করে। প্রায় অনেকে রামায়ণ ইত্যাদি পাঁচালী গানের সম্প্রদায় করিয়া দেশে দেশে যাইয়া উপার্জন করে। যৎকালে কৃষিকর্ম না থাকে এই দুই কর্মে অক্ষম ব্রাহ্মণ তেঁহ বিদেশে যাইয়া পাচক কর্মে নিযুক্ত হইয়া ধনসঞ্চয় করে। এতে প্রায় কেহ অন্নবস্ত্রের জন্য বিব্রত নহে। এমত প্রায় এতদ্দেশের সকল স্থান।" অর্থাৎ এসময় বালসী গ্রামে কৃষকদের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। কৃষিতে মানবসম্পদের প্রয়োজনে ও কৃষিতে লাভ যথেষ্ট হওয়ার কারণে বেশি পড়াশোনাতে এলাকাবাসী ছিল অনাগ্রহী। যখন কৃষিতে লোক প্রয়োজন হত না সে সময় শ্রমিক কর্মিরা পাচকের কাজে বা পালাগান করে অর্থ উপার্জন করত। যদুনাথবাবু তাঁর ভ্রমণপথের পার্শ্বের গ্রামগুলিতে কোথাও অন্নবস্ত্রের অভাব লক্ষ্য করেননি। তবে তিনি মহাজনী তৎপরতা ও পূজারী ব্রাহ্মণদের অসততার কথা উল্লেখ করেছেন। বালসী গ্রামে শ্রীঁলক্ষ্মীনারায়ণ শিলা দর্শন

প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "দর্শন পাওয়া দুষ্কর, পয়সা লইয়া কৃত্রিম শিলা দর্শন করায়, পূজারি যে ব্রাহ্মণ আছে অতি দুর্বৃত্ত, এই যে অন্য শিলা বিদেশী লোককে দেখায়।"

পদব্রজে আরো ২ ক্রোশ দূরে ২০ শে ফাল্গুন পাত্রসায়ের পৌঁছে তিনি দেখলেন, "বৃহৎ গ্রাম, বাজার এবং ধনাঢ্যগণ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাম্বুল, তেলি ইত্যাদি মহাজনগণ সকল আছে। কৃষিকর্মে এবং বাণিজ্য করিয়া সকলে সুখী আছে। অন্নক্লেশ প্রায় নাই, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আপন আপন শ্রমে গুজরান করে। যাহার কৃষিকর্মের সংযোগ নাই, তাহারা বনের কাষ্ঠ এবং পাত্র ও বল্কলে দিন নির্বাহ করিতেছে। ভিক্ষোপযোগী কেহ নাই।" এই বিবরণে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাত্রসায়ের কৃষি বাণিজ্যে সমৃদ্ধ জনপদ হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উপার্জনে সচেষ্ট ছিল। সমৃদ্ধির কারণে ভিক্ষাজীবী ছিল না। ভূমিহীন অন্ত্যজ শ্রেণি বনের কাঠ পাতা সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত।

সোনামুখী প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "পাত্রসায়ের হইতে ৫ ক্রোশ সোনামুখী গ্রাম, বনের মধ্যে, এই ছয় ক্রোশ প্রায় শালবনে যাইতে হয়; হিংস্র জন্তুগণ আছে, ভল্লুকের ভয় অতিশয়। এই সোনামুখী গ্রামে গদাধর শিরোমণির বাসস্থান। যিনি বর্দ্ধমানের রাজবাটীর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। তাহাতে ধনোপার্জ্জনের দ্বারায় অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া বনমধ্যে নগর বসাইয়াছেন। বাজার হাট শ্রেণীমত বসান হয়। মুনসেফের কাছারি, পুলিশের থানা এবং বাঙ্গালা ইঙ্গরাজি ও ফরাসী শিক্ষা করিবার বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। অনেক মনুষ্যের বাস আছে। ... এই মত বন মধ্যে নগর দেখিয়া ভ্রমণ করিয়া বাজারের উত্তরদিকে এক দোকানে অবস্থিতি হইল। এখানকার মুড়কি উত্তম।" উল্লেখ্য তাঁর ভ্রমণকালে সোনামুখীর তাঁতি ও তাঁতশিল্প গভীর সংকটগ্রস্ত ছিল। কিন্তু যদুনাথবাবুর বিবরণে তা ধরা পড়েনি। এর কারণ ছিল যদুনাথ সর্বাধিকারীর তীব্র রাজানুগত্য। ব্রিটিশের সমালোচনা ও বিরোধী আন্দোলনের যিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক।[১৫] সম্ভবত এই কারণেই সোনামুখীর আর্থিক দুর্দশা সম্পর্কে তিনি ছিলেন নীরব।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসের শেষভাগে হান্টার সাহেবের 'দামোদর অতিক্রম' ইতিমধ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফাল্গুন সোনামুখী-শ্রীরামপুরঘাট অতিক্রম করার বিবরণে যদুনাথবাবু লিখেছেন, "এই স্থানে নদীর ২ ক্রোশ পাথর, মালুকাময় ভূমি, প্রাতে ছয় দণ্ডের মধ্যে পার না হইলে, রৌদ্র-বালি গরম হইলে কোনক্রমে যাওয়া যায় না। নদীতে অতি অল্প জল, দুই পারে থাকে, মধ্যস্থলে বালির চড়া আছে। একে বালিতে চলা, তাহাতে রৌদ্র হইলে যেমত ভাব হয়। এই নদীর বালির চড়া পার হইয়া পশ্চিমপারে পহুছিলে শ্রীরামপুর, ঘাটের উপরে

তিনখানা দোকান আছে, এবং গ্রামের বসতি ও আম্রবাগান, কিছু অন্তরে পুষ্করিনী ও পুষ্পোদ্যান আছে। দোকানে জলপান দ্রব্য, চাউল, ডাল ইত্যাদি আহারের দ্রব্য সকল পাওয়া যায়।" অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বাঁকুড়া-বর্ধমান সড়ক যোগাযোগ ছিল নদী   বিঘ্নিত।

বেগলারের বাঁকুড়া সমীক্ষা

১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে মানভূম-পুরুলিয়ার কাঁসাই নদী বরাবর সমীক্ষায় কর্নেল ডাল্টন কাঁসাই নদী সম্পর্কে বলেছিলেন, "The Cassai is rich in archaeological remains."[১৬] ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ কানিংহামের নির্দেশে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার জে. ডি. বেগলার পুরুলিয়ার পর বাঁকুড়ার ছাতনা, এক্তেশ্বর, সোনাতোপল, বহুলাড়া, বিষ্ণুপুরের পুরাকীর্তিগুলির পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেন। তাঁর যাত্রা ছিল পুরাতন তীর্থপথ বরাবর। হাতির পিঠে। বেগলার পাটলিপুত্র-ওড়িষা প্রাচীন পথ চিহ্নিত করেছিলেন মুঙ্গের, রাজগীর, ঝরিয়া, তেলকুপি, রঘুনাথপুর, ছাতনা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, তমলুক, দাঁতন, ওড্র হয়ে। বেগলার সাহেব ডাল্টনের Descriptive Ethnology of Bengal ও নিজের পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হন। তা হল শশাঙ্কোত্তর সময়ে (একাদশ বা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত) স্থানীয় রাজতন্ত্র উপজাতীয় বৃত্তে সমর্পিত হয়েছিল যারা ব্রাহ্মণ্যবাদী দেবত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে এসময়কালে মন্দির ও অন্য স্থাপত্য নির্মিত হয়নি। শিল্প-বাণিজ্যের ধারাও স্তব্ধ হয়ে স্থানীয় বদ্ধ অর্থনীতিতে রুদ্ধ হয়। J.D. Beglar তাঁর Report on a Tour through the Bengal Provinces (P.:192-93)- এ লিখেছেন, ".... nor a single temple or sculpture appears to have been executed; the Banjara's record is indeed, the very earliest record of the revival of trade in the country coupling this with the fact that the fertile country of king Sasangka appears to have been occupied by the votaries of Brahmanical or Jaina or other Aryan deities, but is now occupied by non-aryan tribes who reject Brahmanical as well as jain dieties, the conclusion seems irresistible, that the sudden collapse of all trade and industry was due to the irruption of the kdarian tribes...."

১৭৮০-৮৩ খ্রিস্টাব্দে মানচিত্র প্রস্তুতিতে জেমস রেনেল, ১৮৩৯-৫৬ খ্রিস্টাব্দে জে. ই. গ্যাসট্রেল ভূমি সমীক্ষার কারণে, ১৯১৭-২৪ খ্রিস্টাব্দে এফ. ডব্লু. রবার্টসন ভূমি বন্দোবস্তের কারণে, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এম. সি. ম্যাকালপিন সাঁওতাল উপজাতিদের অবস্থা নির্ণয়ে সমীক্ষা, ১৮৮১-৯১ খ্রিস্টাব্দে টি. এইচ. বি. স্ক্রাইনের অন্ত্যজ শ্রেণির

আর্থ সামাজিক সমীক্ষার, ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে এইচ. এস. এস. ঈসাকের কৃষি সমীক্ষার কারণে বাঁকুড়ার পথে প্রান্তরে ঘুরে বিস্তৃত প্রতিবেদন সংগ্রহ করেছিলেন। যা থেকে সমকালীন বাঁকুড়ার আর্থ সামাজিক অবস্থান অনুধাবন করা যায়।

মোগল আফগান সমরযাত্রা

গুপ্ত সময়কাল থেকে ইংরাজ শাসন পর্ব পর্যন্ত অন্যূন কুড়িটি সমরাভিযান[১৭] বাঁকুড়া ও সন্নিহিত ভূখণ্ড দিয়ে পরিচালিত হয়েছিল যা এই অঞ্চলের সড়ক বিস্তৃতির প্রমাণ দেয়। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,[১৮] "...it is not easy to reconstruct an accurate picture of the state of communications in this part of the country for lack of historically correct information, the movement of large armies in and through this region suggests that there were servable routes accross the rugged Chotanagpur region." শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটি বড় সমরযাত্রা ও সংঘর্ষের উল্লেখ করেছেন। ১২৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে রেনেল চিহ্নিত কাটাসিন বা কাটাসঙ্গের (বিষ্ণুপুরের ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে) যুদ্ধে লিপ্ত হন লখনৌতির তুর্কিশাসক মালিক তুঘান খাঁ ও জাজনগরের চতুর্থ অনঙ্গভীমের পুত্র প্রথম নরসিংহদেব। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ভাগলপুর বর্ধমান-জাহানাবাদ (আরামবাগ) পথে ওড়িয়া আফগানবীর কুতলু খাঁ লোহানীর (যাঁর সেনা শিবির ছিল বর্তমান কোতলপুরে) বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মানসিংহপুত্র জগৎ সিং একদল সেনা সহ রাইপুরের আফগান দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। তৃতীয় সমর অভিযান ছিল ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের মীরকাশিম-ইংরেজ বিরোধ সংক্রান্ত। এই সমরযাত্রা সম্পর্কে ওল্ডহাম লিখেছেন,[১৯] "About October 1763, during Major Adam's Campaign against Quasim Ali, after the battle of Udhuanala, ...Major Carnac was detached from the main army to proceed along the frontier, meaning the frontier of the hilly country overrun by the Marathas....Captain Williams tells us (in his book Bengal Native Infantry, P-24 Ed.) that Carnac.....ordered all the Company's troops to proceed, by what is now called the New Road, and join the army under major Adams at Sant where they arrived about the end of December...." শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গেজেটিয়ার্সে এই সেনা সন্নিবেশের স্থান হিসাবে বাঁকুড়া-ছাতনার কোনো স্থানকে চিহ্নিত করেছেন কারণ, "Williams does not tell us the locality the Major was campaigining at that time, but says he had not marched 'more than six days' meaning apparently beyond Burdwan at the direction of Ramgarh. If that be the case,

Carnac would have been somewhere in the Bankura Chhatna region and his troops were to move on through Raghunathpur, Chas, Gumia and Hazaribagh along the line of the new road."[২০]

ফকির আগমন, কিটিং-এর অভিযান

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উত্তর পটভূমিতে জীবিকা উচ্ছিন্ন তিন হাজার ফকির সন্ন্যাসী ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরে এসে সমবেত হয়েছিলেন উত্তর ও পশ্চিমের সন্নিহিত জেলাগুলি থেকে। তাঁরা বাঁকুড়ার জঙ্গলে অনেকদিন ছিলেন। ইংরেজকে আক্রমণও করেছিলেন। ক্যাপ্টেন ফোবর্সের নেতৃত্বে কোম্পানী সেনাদল এই সন্ন্যাসীদের বিষ্ণুপুর-রাইপুর-ফুলকুসমা-শিলদা-আলমপুর- গোপীবল্লভপুর-এর পথে ওড়িশা সীমান্তে বিতাড়িত করে।[২১] ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের লেখা বিবরণে জানা যায় ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শত শত সশস্ত্র পাহাড়িয়া লুণ্ঠনকারী (একেকটি দলে তিন-চারশো লুঠেরা থাকত) বীরভূমের পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে পার্বত্য ঘাটগুলি দখল করে সিউড়ি-ইলামবাজার হয়ে অজয়ের দক্ষিণে বিষ্ণুপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বীরভূম-বাঁকুড়ার কালেক্টর কিটিং সাহেব সিউড়ি থেকে বিষ্ণুপুর অভিমুখে সেনা সন্নিবেশ করেন এবং প্রায় এক বছরের চেষ্টায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে এই বিদ্রোহ নির্মূল করেন।[২২] একই সময় রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিং-এর বিদ্রোহ দমনে কিটিং সমর শহর বাঁকুড়া থেকে পাতাকোলা ঘাট হয়ে রাইপুরের দিকে সমরাভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে দুর্জন পুত্র ফতে সিং ১৫০০ চুয়াড় নিয়ে রাইপুরের কোম্পানীকুঠি আক্রমণ ও ভস্মীভূত করলে লেঃ নানের নেতৃত্বে ফতে সিংহকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় নয়াঘর-সরাকল-কুইলাপাল-ধাইন্দকা পথে অনুসরণ করা হয়।

রেনেল ও ভ্যালেনটাইন ম্যাপ

উপরোক্ত বাণিজ্য, পর্যটক ও সমর পথের বিবরণ থেকে বাঁকুড়ার অতীত পথঘাট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কারণ বাঁকুড়ার সড়কসমূহ প্রথম রেনেলের মানচিত্রে প্রকাশিত হয় ১৭৬৪-৭৬ খ্রিস্টাব্দে। এর পূর্বে একমাত্র অসম্পূর্ণ মানচিত্র ছিল ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফ্রাঙ্কোসিস ভ্যালেন্টাইনের মানচিত্র (সূত্র ঃ চুঁচুড়ার ডাচ গভর্ণরের ১৬৫৮-৬৪ সনের লিখিত বিবরণ)। এই মানচিত্রে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ-পলাশি অগ্রদ্বীপ-বর্ধমান-মেদিনীপুর-কটক সড়কটি বাঁকুড়া জেলার অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল।

সগড়াট পথ ও গোশকট পরিবহন

মৌর্যগুপ্ত পূর্ব বাঁকুড়া ছিল "Rugged" এবং "Pathless" যদিও মৌর্য সময়ে তাম্রলিপ্ত-পাটলিপুত্র মুখ্য বাণিজ্য সড়ক বাঁকুড়ার উপর দিয়ে বাহিত ছিল। তৎকালে

সামগ্রিকভাবে বাঁকুড়ার পথঘাট ছিল দুর্গম। পথিকদের আগাছা এড়িয়ে বা কেটে এগিয়ে যেতে হত। পর্যটকদের মূলত পদব্রজে এগিয়ে যেতে হত। বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঘোড়া, মুনিষ, গো এবং গোশকটের ব্যবহার ছিল। 'বাঁকুড়া জেলার সেকালের পথঘাট' প্রবন্ধে অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাঁকুড়ায় 'সগড়াট' বলতে বোঝায় গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাবার তড়া (মাঠ), বন-খেতের আল পেরিয়ে মেঠো দুর্গম পথকে। এই পথে যে গাড়ি চলত তার নাম 'সগড়গাড়ি' ..... আরাবিহীন কাঠের পাটা জুড়ে চাকা দেওয়া ছিল 'সগড়গাড়ি'। এ থেকে বোঝা যায় ঊনিশ শতকের আগে বাঁকুড়া জেলার পথঘাট বলতে তেমন কোনও পাকা রাস্তা ছিল না। সবই মাটির-ধুলো-বালির ওপর দিয়ে চরণ-গড়ানোর রাস্তা।" গরুর গাড়ির চাকার ফেলে যাওয়া চিহ্নকে বলা হত 'আইট'। এই আইট অনুসরণ করে পরের গাড়ি যেত। এভাবেই তৈরী হত পথের দাবি। 'সগড়াট' ছিল দশ-বারো ফুট চওড়া। হান্টারের হিসাবে ১৮৭০ এর দশকে বাঁকুড়ার গোশকট চালকের সংখ্যা ছিল ২২৪।[২৩] আর পালকি বাহক ১০২২ জন, কাহারা (বিশেষ পালকিবাহক) ১২৪, ডুলিয়া ১০৭। অভিজাত শ্রেণি ও প্রশাসকরা ঘোড়া ব্যবহার করতেন।[২৪] বাঁকুড়া থেকে সারেঙ্গা যেতে তালডাংরা ও সিমলাপালে; বিষ্ণুপুর যেতে ওন্দায়; মেজিয়া যেতে গঙ্গাজলঘাটিতে ঘোড়া বদল করতে হত। বেগলার বাঁকুড়ার পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছিলেন হাতির পিঠে। ডাকাত শ্রেণি দ্রুত ছোটার জন্য 'রণপা' ব্যবহার করত। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর বাঁকুড়া পুরসভায় অনুমোদিত যানবিধি উল্লেখ করে গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঁকুড়া জেলার পরিবহন ব্যবস্থা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "..... নিয়মকানুন থেকে জানা যায় ইট, পাথর, বাঁশ কাঠ বহনের জন্য গোরু বা মোষের গাড়ি ব্যবহৃত হোত। জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রি ছাড়া অন্যান্য দিনে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মালবোঝাই গোরুর গাড়ি বা মোষের গাড়িতে দুটো লণ্ঠন জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে হোত। খালি গাড়িতে একটি লণ্ঠনই চলত। এ নিয়ম পালকির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। চোদ্দ বছরের কম বয়সী কেউ গাড়ি চালক হতে পারতো না। মোষের গাড়ির ক্ষেত্রে চালকের একজন সহকারী সঙ্গে রাখা আবশ্যিক ছিল। গাড়িতে ১২ ফুটের বেশি লম্বা বাঁশ বা কাঠ বহন করতে হলে সঙ্গে আরও একজন লোক রাখতে হোত। নিয়মভঙ্গের শাস্তি ছিল বিশ টাকা জরিমানা।" অবশ্য বর্ষার সময় কেবলমাত্র কুলির পিঠে বা একক মহিষপৃষ্ঠে মাল পরিবাহিত হত। 'বাঁকুড়ার শ্রমিক ঃ সেকাল-একাল' প্রবন্ধে রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখেছেন, "সুদূর অতীতকাল থেকে অন্যান্য স্থানের মতো বাঁকুড়াতেও মালপত্র বহনের জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষ কাঁধে বা মাথায় চাপিয়ে মোট বা বোঝা বহন করত। এ পরিবহন ব্যবস্থার প্রচলন বিশ শতকেও অব্যাহত ছিল।

সুদীর্ঘকাল ধরে এ পরিবহন ব্যবস্থা হল ব্যবসা-বাণিজ্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। যে যুগে ব্যবসাবাণিজ্য প্রধানত নদীপথে চললেও নদীঘাট বা নদীবন্দর পর্যন্ত ও এসব স্থানে মালপত্র নিয়ে আসা ও ঐসব স্থান থেকে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত বলদ ও দিনমজুর।"

সত্তরের সড়ক সংকট

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় ইংরাজ শাসনের সূচনাপর্বে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তর, চুয়ার-পাহাড়িয়া-সন্ন্যাসী উপদ্রব, নয়া ভূমিনীতির ফলে রায়তদের দুরবস্থা ও দেশান্তর সড়ক ব্যবস্থায় বিপর্যয় আনে। চারিদিক বনজঙ্গল ও বন্যপশু পরিবৃত হয়ে পড়ে। সমর সড়ক খ্যাত বাঁকুড়ায় সেনাগমন ও সেনা সন্নিবেশ করার স্থান সংকট দেখা দেয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের এই করুণ দৃশ্যপট সম্পর্কে হান্টার লিখেছিলেন, ".....through but an extensive wood, all the way a perfect wilderness, sometimes a small village presented itself in the midst of these jungles, with a little cultivated ground around it. These woods abound with tigers and bears, which infested the camp every night, but did no other damage then carrying off a child and killing some of the gentleman's hackery bullocks." এক দশক পরে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে পরিস্থিতির আরো গুরুতর হয়ে সিউড়ি-বিষ্ণুপুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হান্টারের ভাষায়, "...as to shut off all communication between the two most important towns (Suri and Bishnupur) and to cause the mails to be carried by a circuit of fifty miles through another district."[২৫] বাঁকুড়ার পথঘাট বনমুক্ত ও শ্বাপদ ভয়শূন্য বাণিজ্য সড়কে পরিণত করতে সময় লেগেছিল আরো কয়েক বছর।

প্রস্তর, তাম্র, লৌহশিল্প ও খনিজসম্পদ :

বাঁকুড়ার খনিজ সম্পদ

বাঁকুড়া ভূমিতে কৃষি বাণিজ্যের সূত্রপাত ও বিকাশের ধারা অনুধাবন করতে হলে আদি মানবের আগমন ও বসতি স্থাপনের ধারা আলোচনার প্রয়োজন আছে। ওল্ডহামের মতে প্লিস্টোসিন যুগে রাঢ়ভূমি ছিল উপকূলীয় আবহে আবর্তিত। উপকূল থেকে বর্তমান বাঁকুড়া উচ্চভূমিতে বিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় বাঁকুড়ার প্রাপ্তি বিভিন্ন খনিজ, বনসম্পদ। যেমন দলমভিজা, হরিহরগঞ্জ, ঝরিয়াকোচা, বাগজোবরা, কড়িপাথর, লাউদোহা, নাকরাকোন্দা, রাঙামাটি, শ্রীকৃষ্ণপুরের ল্যাটেরাইটের নিচে সঞ্চিত ১৪২.৪৭০ মিলিয়ন টন চিনামাটি; শালতোড়া, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়ায় ১১৪.২৭ মিলিয়ন টন কয়লা;

গুনিয়াদা, হরিরামপুর, শালুকপাহাড়ীতে চুনাপাথর-ডলোমাইট ২.১৫৪ টন; থান-ছেঁদাপাথর, চেরাডুঙরী, পড়াপাহাড়, ধজুড়ি, ঘাটশোলে উলফ্রামাইট-টাংস্টেন ৪ মিলিয়ন টন। এছাড়া কুইলাপাল গ্রানাইট স্তরে সোনা (শিলাই নদীস্তরে মিশ্রিত দেখা যেত); পড়াপাহাড়ে লোহা; পীরাবনী, কাদুরিয়ায় অভ্র; মটগোদা, মউলা, কুলডিহা, পাঁচপাথরে ট্যাল্ক-স্টিটাইট; নিচুভুয়েনপুর, গৌবাংডি, পাবিয়ানে ভার্মি-কিউ-লাইট উল্লেখযোগ্য খনিজ।[২৬] এছাড়া রূপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় তিলুড়ি-পাথরডিতে ম্যাগনেটাইট; বাড়িয়াথারা-সারিতারিতে (রানিবাঁধ) গার্নেট স্ফটিক কিয়নাইট; নীলগিরি-নারায়ণগড়-সারংগড়-মুকুটমণিপুরে তামা; ওহিন্দা, চৈতনডিহা, বাকোচায় গ্যালেনা সঞ্চয়ের কথা বলেছেন। মাণিকলাল সিংহের মতে মেজিয়ার কয়লাস্তর গণ্ডোয়ানা যুগের। ধারওয়ান শিলাস্তর প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "বাঁকুড়া জেলার ভেলাইডিহা ধারওয়ান ভূমির পূর্ব সীমানায় অবস্থিত।....ধারওয়ান শিলার উল্লেখযোগ্য প্রান্তিক পাহাড় শুশুনিয়া। উহার মধ্য হইতে বর্ধমান পেভিং স্টোন বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ধারওয়ান শিলার কোয়ার্জ শিলার মধ্যে স্বর্ণ বিদ্যমান, কিন্তু উহারা পরিমাণ এত স্বল্প যে উত্তোলন খরচ পোষায় না। ধাধকার নিকটবর্তী গুরুম নদীর বালুকার সঙ্গে মিশ্রিতভাবে স্বর্ণরেণু,.....ইহার সঙ্গে প্লাটিনামের টুকরোও পাওয়া যায়। .....ইহার মধ্যে ব্লাঙ্কচার্ট, জেসপার, চুনাপাথরও পরিলক্ষিত হয়। পুরুলিয়া জেলার...... শালবনী গ্রামে সিলিকেট, এ্যালুমিনা ও পটাশ পাওয়া যায়। নিকটবর্তী কয়েকটি জায়গায় খাঁটি এ্যালুমিনা ও পটাশ পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার অম্বিকানগরের উত্তরে, উত্তর-পূর্বে বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমানায় হেমটাইটের সন্ধান মিলে। অম্বিকানগরের নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে বলরামপুর এবং বালুচরের চ্যুতির মধ্যে পর্যাপ্ত হেমাটাইট আকরিকভাবে বিদ্যমান। ইহার সন্নিকটে তামাখনি হইতে তাম্র উত্তোলনের প্রাচীন খনি পরিলক্ষিত হয়। উহার মধ্যে মালাকাইট এবং এজ্যুরাইট সন্নিকটবর্তী পাহাড়গুলিতে দেখা যায়।"[২৭] বাঁকুড়া পরিচয়ে (১ম খণ্ড, পৃঃ-১৫) বিবৃত হয়েছে, 'বাঁকুড়া জেলার উত্তরাংশে মালিয়াড়ার দিকে শিলার দৃঢ় অবস্থানভূমি বর্তমান। শৈল শ্রেণীর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ঢাল অথবা বন্ধনী যেগুলি কালো শিলা সৃষ্টির আকর লৌহ, অ্যালুমিনিয়ম; ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, গ্রানাইট শিলায় বর্তমান।' অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন খনিজের যথেষ্ট সম্ভার আছে।

প্রস্তরযুগে শুশুনিয়া কংসাবতীর প্রস্তর কর্মশালা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই খনিজের ভূমিকা বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। তবে তামা ও লোহা নিষ্কাশন প্রাচীনকালেই বাঁকুড়া ভূমিতে অর্থনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। এক্ষেত্রে প্রাচীন যুগ থেকে তাম্রপ্রস্তর যুগে উত্তরণ, সময়কাল,

বসতি ও খনিসমূহের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়ে প্রস্তরযুগের অস্তিত্বের কথা বলেছেন[২৮] এবং পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত শুশুনিয়ায় মানবাবস্থিতির সময়কাল ২২৫০০০-১০০০০০ বছর পূর্বেকার বলেছেন।[২৯] বাঁকুড়ার পার্বত্য অঞ্চল ও নদী উপত্যকাসমূহ ছিল এদের বিচরণ ভূমি। নবপ্রস্তর যুগের আনুমানিক বিস্তার ছিল ১০০০-১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। পুরাতন যুগের অসংগঠিত শিকার কর্মের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহের প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে শুশুনিয়া, মুকুটমণিপুর, কাঁকড়াদাড়া, রানিবাঁধ, বিহারীনাথ অঞ্চলে। দ্বারকেশ্বর-কুমারী-কংসাবতী-ভৈরববাঁকি-তারাফেণী-গন্ধেশ্বরী- শালি-দামোদর নদনদীর তীরবর্তী প্রত্নস্থলে (অম্বিকানগর, হাতিখেদা, ভেদুয়া, বড্ডি, পুড্ডি, চিয়াদা, পরেশনাথ, সারংগড়, মুকুটমণিপুর, বসন্তপুর, কাজলকুড়া, অজিতা, ভূতশহর, ধলডাঙ্গা, দামোদরপুর, মাঞ্জুরিয়া, উপরশোল, কৃষ্ণনগর, নুনিয়াবাইদ, চিকচিকা, ভাগাবাঁধ, ভাতুড়ি, বাঁশি, মোলবোন, বরকোনা, বসন্তপুর, কালিয়াপাথর প্রভৃতি)। প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার ও আনুষঙ্গিক প্রত্নোপাদান, শিকারজীবী যাযাবর পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষের কৃষিভিত্তিক সমাজ ও পশুপালনের ইঙ্গিত দেয়।[৩০] ক্রমশ এ প্রক্রিয়া বেগবতী হয়। রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'এই সময় পশুপালন শিকারকেন্দ্রিক অর্থনীতি নির্ভর মানুষ পরবর্তীকালে সুসংগঠিত কৃষিজীবী নরগোষ্ঠীর সংস্রবে এসেছিলেন.....শেযোক্ত শ্রেণীর মানবগোষ্ঠী মৃৎপাত্রের ব্যবহার সহ ধাতুর প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ....নদীর উপল তট চত্বর থকে কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে এই অঞ্চলে ঐতিহাসিক যুগের প্রাক্কালে একটি কৃষিভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠেছিল। যুগপৎ তামা ও লোহার সহাবস্থান দেখা গেলেও, এই সংস্কৃতির স্রষ্টারা কৃষিকাজ সম্পাদনের জন্য প্রধানতঃ প্রস্তর নির্মিত কোদাল, লাঙল, ব্লেড, ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। ধাতুর ব্যবহার শুরু হলেও তা প্রধানতঃ অলঙ্কার নির্মাণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। স্বল্প কয়েকটি ধাতব হাতিয়ার পাওয়া গেলেও সমসাময়িক অর্থনীতিতে তার কোন প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না।' এই ভাষ্য থেকে মনে হয় নবপ্রস্তর ও তাম্রশ্মীয় যুগে বাঁকুড়া ভূমিতে তামার ব্যপক ব্যবহার ছিল না। সুতরাং সন্নিহিত তামাখনিগুলোতেও এসময় ব্যাপক উৎখনন বা ধাতু নিষ্কাশন হয়নি। পাশাপাশি প্রস্তরায়ুধ ও উপকরণ ব্যবহারের বলিষ্ঠ ধারা অব্যাহত ছিল। কৃষিজীবী ও শিকারজীবী গোষ্ঠীর সমান্তরাল অস্তিত্বের আভাসও তিনি দিয়েছেন। এই প্রস্তর সামগ্রী প্রস্তুতির মূল শিল্পকেন্দ্র ছিল কংসাবতী কুমারীর সংযোগস্থল এবং শুশুনিয়া-বিহারীনাথ পার্বত্য অঞ্চল। হলোসীনযুগের দুটি নরকঙ্কালের অবশেষও আবিস্কৃত হয়েছে শুশুনিয়া ও কংসাবতীর তীরে। এই স্থান থেকেই মূলত নবপ্রস্তর যুগের উল্লিখিত প্রত্নস্থলে প্রস্তর

উপকরণ পরিবাহিত হত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতাত্ত্বিক ডঃ অশোক কুমার ঘোষ যথাযথই বলেছেন, 'বাঁকুড়া, ঝিলিমিলি থেকে প্রাপ্ত শল্কচ্ছেদী অস্ত্র, ছুরিকা, ছিলকা, খনন আয়ুধ—এগুলি তৈরীর কোন উপাদান সংশ্লিষ্ট স্থানে নেই।' অর্থাৎ নবাশ্মীয় আয়ুধ ও উপকরণ মূলত উক্ত দুটি কর্মশালা থেকেই পরিবাহিত হত। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের শুশুনিয়া উৎখনন প্রতিবেদন) শক্ত ধাতুর সাহায্য ব্যতীত নির্মিত আয়ুধগুলির সূক্ষ্মতা, কারুকৃতি ও সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং এর নির্মাতাদের মস্তিষ্ক ধারণ ক্ষমতা (১৩৫০ ঘনসেমি. প্রায়) 'হোমোসেপিয়েন্স' মানব শ্রেণির সমতুল বলেছেন।

তাম্র আকর

প্রস্তর যুগের Stone Industry-র পর তামা ও লৌহ নিষ্কাশন বাঁকুড়া ভূমিতে সুদীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। প্রত্ন নিদর্শন হিসাবে তামার উপকরণ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। ভক্তবাঁধে শ্যামসুন্দর শুকুল এবং কুশদ্বীপে সুধীরকুমার দুয়ারী তাম্রায়ুধের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাছাড়া মাণিকলাল সিংহের বিবরণে (সুবর্ণরেখা হতে ময়ুরাক্ষী, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৮৩) জয়পাণ্ডা-শিলাই সঙ্গমস্থিত ভূতশহর গ্রামে তাম্রাশ্মীয় নিদর্শন পাওয়া যায়। নীলগিরি-নারায়ণগড়-সারঙগড়-মুকুটমণিপুর ও অম্বিকানগর সন্নিহিত অঞ্চলে তামার সঞ্চয় চিহ্নিত হয়েছিল এবং মিলেছে প্রাচীন সময়ে তামা উত্তোলন ও নিষ্কাশনের স্মৃতি চিহ্ন। এক্ষেত্রে প্রাচীন খনিতত্ত্ব বিশারদ ও উত্তোলক কারা সে নিয়ে সংশয় আছে। তাম্রাশ্মীয় যুগে এর কিছু অংশের উত্তোলন হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মূল উত্তোলন ঘটেছিল ২০০০ বছর পূর্বে জৈন শ্রাবক বা সরাকদের দ্বারা।[৩১] উল্লেখ্য বাঁকুড়ায় সরাকদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কাল ছিল নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। বস্ত্রশিল্প সহ বিভিন্ন শিল্পে, বাণিজ্যে ও মহাজনী কারবারে সরাকরা বিনিয়োগ করেছিলেন। এগুলি ও খনিশিল্প থেকে অর্জিত অর্থের একাংশ এরা বাঁকুড়ায় জৈন ধর্মের প্রসারে এবং জৈন মন্দির স্থাপত্যে ব্যয় করে। এদের অর্থানুকূল্যে ও স্থানীয় রাজন্যশক্তির সহায়তায় বাঁকুড়ায় বহু জৈন মন্দির ও মঠ গড়ে ওঠে। বহুলাড়া, ধরাপাট, সোনাতাপল, বিহারীনাথ, পরেশনাথ, সারংগড়, হাড়মাসড়া, অম্বিকানগর সহ বহু স্থানে এমন মন্দির ও মঠ গড়ে ওঠে। এগুলি নির্মাণের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণও ছিল ভালো কারণ মূর্তির জন্য প্রয়োজনীয় পাথর-ল্যাটেরাইট ও মন্দিরের প্রয়োজনীয় উপকরণ দূরবর্তী স্থান থেকে বাহিত হয়েছিল। রাজনৈতিক সুস্থিতি, অনুকূল বাণিজ্যিক পরিবেশের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। ১১২৫ খ্রিস্টাব্দে কুমার পালের দুর্বলতার সুযোগে জৈন গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের দক্ষিণ বাঁকুড়া বিজয় এই প্রক্রিয়ার অনুকূল হয়েছিল। তবে মাণিকলাল সিংহ, ই. এ. মুরেকে উদ্ধৃত করে বাঁকুড়ায় নবপ্রস্তর যুগে যথেষ্ট তামা ও

তার উত্তোলনের তথ্য দিয়েছেন। মিঃ মুরে মেদিনীপুর, ময়ুরভঞ্জ সহ প্রস্তরযুগ সীমায়িত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধাতু নিস্কাষণ সম্পর্কীয় অসংখ্য কার্যকলাপের ধ্বংসাবশেষে, খনিজ শিল্পে পরিত্যক্ত স্তুপীকৃত ধাতুমল, রাশিকৃত ধাতুর খাদ, খনিগর্ভ হতে ধাতু উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত প্রস্তর নির্মিত বহু শত যন্ত্রপাতি, ধাতু পেটাবার জন্য নেহাই, শানপাথর, ধাতু পেষণ যাঁতা, হাতুড়ি, মুগুর, অমসৃণ বাটালি এবং ভাঙা ছেনি ইত্যাদি প্রস্তর আয়ুধ খনি সংলগ্ন অঞ্চলে বা খনির সুড়ঙ্গে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। তাছাড়া সংলগ্ন গ্রামগুলিতে প্রাপ্ত বেলে ও হাঁসা পাথরের তৈরী ধাতু ঢালাইয়ের ভাঙা ছাঁচ, নব্যপ্রস্তরযুগীয় ধাতু কাটবার হাতিয়ার, ধাতুমলে প্রাপ্ত আগ্নেয়শিলা নির্মিত হাতিয়ার তামা নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার প্রমাণ দেয়। অর্থাৎ বলা যায় বাঁকুড়ায় দুই পর্বে তামা নিষ্কাশন ও প্রক্রিয়াকরণ ঘটে। একটি নব্যপ্রস্তর যুগের অন্তভাগে, অন্যটি নবম-দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন সরাকদের দ্বারা।

লৌহশিল্প

একইভাবে বাঁকুড়া ভূমিতে আরেকটি শক্তশালী আকরশিল্প ছিল লৌহশিল্প। তাম্রাশ্মীয় যুগান্তে লোহা ব্যবহার প্রসঙ্গে মাণিকলাল সিংহ লিখেছেন, ‘আকারগতভাবে নব্যপ্রস্তরায়ুধের সঙ্গে তাম্রায়ুধগুলির যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে লোহার তৈজসপত্র এবং আয়ুধ নির্মাণের কাজ একই নরগোষ্ঠীর দ্বারাই সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, শিলাই প্রভৃতি নদী উপত্যকাগুলির প্রাচীন বসতি কেন্দ্রগুলিতে রহিয়াছে। .....আদিম পদ্ধতিতে লৌহ নিষ্কাশন এবং তৈজসপত্র নির্মানের কাজ একদা লোহার উপজাতির মানুষই একচেটিয়াভাবে করত। পরবর্তীকালে রাঢ়ের কর্মকারগণ লোহারদের এই বৃত্তি আত্মসাৎ করেছেন এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সাহায্যে এই শিল্পে প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। .....তাম্র আবিষ্কারের পর প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ বন্ধ হইয়াছিল কিন্তু প্রস্তর খোদাই করিয়া পাথরের থালা, বাটি, খুরি, রেকাবী, প্রদীপ নির্মাণের কাজ অব্যাহত ছিল। তাম্র অপেক্ষা আরো অধিক শক্তিশালী ধাতু লৌহ আবিষ্কারের পর তাম্রায়ুধের পরিবর্তে লৌহ আয়ুধের প্রচলন ও প্রসার ঘটিয়াছিল। কিন্তু তামা দিয়া বা তামার সঙ্গে টিন, রাং ইত্যাদি নিকৃষ্ট ধাতু মিশাইয়া তৈজসপত্র, গহনা নির্মাণের কাজ অব্যাহত রহিয়াছে।[৩২] লৌহযুগের নিশ্চিত সময়সীমা বলা না গেলেও নীহাররঞ্জন রায়, রাঢ়ে লোহা ব্যবহারের সময় ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলেছেন।[৩৩] ভৈরববাঁকি নদীসংলগ্ন প্রত্নক্ষেত্রে মসৃণ প্রস্তর আয়ুধের সঙ্গে লৌহযুগের লোহা, লোহা-আকর পাওয়া গেছে।[৩৪] বাঁকুড়া ভূমিতে এই আকরের প্রাথমিক উৎস ছিল পড়াপাহাড়। ভবিষ্যপুরাণের যুগের রাঢ়ে লৌহ আকর সম্পর্কে ভাষ্য ছিল, ‘লৌহধাতোং ক্বচিৎ আকরো ভবিতা’ অর্থাৎ এদেশের কোথাও কোথাও লোহার আকর (খনি) আছে।

বাঁকুড়া ভূমিতে নবপ্রস্তর যুগের বিস্তার ছিল ১৩৫০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ ও তাম্র-লৌহ যুগকাল ছিল ১২০০-৬০০ খৃঃ পূঃ।[৩৫]

লোহার ও অসুর সম্প্রদায়

লোহা বিগলন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিল মূলত জেলার আদি জনজাতি 'অসুর সম্প্রদায়', যারা মুণ্ডাদের জ্ঞাতিতে আবদ্ধ ছিল।[৩৬] পশ্চিমরাঢ় গবেষণা সাময়িকী (এপ্রিল ২০০০) গ্রন্থের বিবরণ (পৃঃ ৫৬) অনুসারে অসুররা 'আদি অস্ট্রাল বা প্রটো অস্ট্রালয়েড দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আদি অস্ট্রালয়েড যুগে ব্যবহৃত বহু আয়ুধ বা পাথরের অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত শুশুনিয়ার পাদদেশে ও দ্বারকেশ্বর, দামোদর, কাঁসাই, কুমারী প্রভৃতি নদনদী অববাহিকার সানুদেশ থেকে। অনেকেরা মতে সে যুগে এখানে প্রবল পরাক্রান্ত অসুর অভিধাধারী এক শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর বাস ছিল। এই অসুরদেরকেই বলেছে চণ্ডাল আবার কেউ কেউ বলেছে চুয়াড়। তবে রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, একদা পশ্চিমরাঢ়ে বসাবাসকারী অসুরেরা ছিল একটা স্বকীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির অধিকারী। এই কায়িক শক্তিধর অসুরেরা ছিল খুবই শক্তিশালী এবং লৌহধাতু নিষ্কাশন, গালাই ঢালাই কাজে পারদর্শী ও স্থাপত্য কাজে অতীব নিপুণ। এরা নাকি একরাত্রে একটা বিশাল অট্টালিকা, সৌধ ও মন্দির নির্মান করতে পারতো। ..... এই সংস্কৃতিবান অসুর জাতির আদি অবস্থান ছিল ভারতের উত্তর প্রান্তসীমায়। সেখানে মুণ্ডরীয় বা মুণ্ডাদের অনুপ্রবেশের চাপে অসুরেরা বিব্রত হয়ে ছোটনাগপুর মালভূমি অতিক্রম করে দামোদর নদ অববাহিকায় অবস্থিত শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, ছাতনা, বড়জোড়া ইত্যাদি অঞ্চলে অসুর উপাধিধারী জনগোষ্ঠী চিহ্নিত গ্রাম...।'[৩৭]

জেলা বাঁকুড়ার অসুর সংস্কৃতির সাথে দূরতম বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত গ্রাম বা গ্রাম নামগুলি হল অসুরাল, আসরাবাইদ, হাট আশুরিয়া, বন আশুরিয়া, আসুরি মাধবপুর, অসুরগেড়্যা, হেত্যাসুর, অসুরদা, অসুরগেড়্যা, মুড়াগ্রাম, হাপানিয়া, গিধুড়িয়া, ভৈরবস্থান, মৌলবনা, চাঁদড়া, জিড়রা, তিলুড়ী, থুমকোড়, কামারকুলি প্রভৃতি। বাঁকুড়া পরিচয়ে (খণ্ড ১, পৃঃ-৫০) কোল গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের আকরিক লোহা গালাই পদ্ধতির অবহিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্যদিকে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ODBI (পৃঃ ৪২-৬৭), হারানচন্দ্র চাকলাদার লিখিত Pre historic Culture in Bengal, Neolithic Culture, Man in India (Vol.-XI, 1941, P.-208, XXIII-1372, P.-236) ও অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গেজেটিয়ারের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় এই আদিম মানুষরা ছিল অস্ট্রিক-কোল-মুণ্ডা সম্প্রদায়জাত। সুতরাং আর্য আগ্রাসনে

বা অন্তর্বিরোধের কারণে মধ্যভারত থেকে বাঁকুড়ায় এদের আগমন ঘটে প্রস্তরযুগ ও লৌহযুগের অন্তর্বর্তী সময়ে।

উল্লেখ্য, লৌহ বিগলন প্রক্রিয়ার অন্যতম মুখ্য উপাদান শালবৃক্ষজাত কাঠ-কয়লা এবং বিগলন ঘটে তার প্রজ্জ্বলনে। বাঁকুড়ায় লোহা বিগলনের প্রয়োজনে বাঁকুড়া ভূমিতে আদিকাল থেকে ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত শালবনের অবক্ষয় ঘটেছিল। Anthropological Survey of India-তে প্রকাশিত The Tribal Community in Bihar, Part-III প্রতিবেদনে অসুর সংস্কৃতিতে শালকাঠ ব্যবহারে লোহা বিগলন সম্পর্কে বলা হয়েছে; 'The Asurs have traditionally been irons melters....Iron melting requires charcoal of green Sal wood which is good quality timber. ...destroys well grown forest.' এমনকি মুণ্ডারিজ-ভূমিজ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে লোহা বিগলনে শালকাঠের ব্যবহারে বনভূমির ক্ষতি প্রসঙ্গে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জেলা গেজেটিয়ার্সে ও'ম্যালী বলেছেন, '.... but in the central portion of the district nothing but stunted jungle now remains, all else having been cleared away by wood and charcoal burner.' অর্থাৎ অসুর-মুণ্ডা বা কোল-ভূমিজ ও পরবর্তীকালে লোহাররা জেলা বাঁকুড়ার লোহা শিল্প প্রবাহের অন্যতম বাহক। সেনসাস প্রতিবেদনগুলিতেও লোহারদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রামানুজ কর লোহা-বাসনশিল্প সম্পর্কে বলেছেন, 'পিয়ারডোবা স্টেশন হইতে কলকাতায় জ্বালানী কাঠ ও পাতা রপ্তানী হয়। বাসনের কারখানায় পোদ্দারের কাছে, অনেক কাঠ কয়লা আবশ্যক হয়।' অর্থাৎ স্বাধীনতার দুই দশক আগেও লোহা-বাসন শিল্পের গতি অব্যাহত ছিল।

বাণিজ্য-জনপদের উদ্ভব, বিকাশ ও শিল্পের হাল-হকিকত :

প্রস্তরযুগে জনপদ

প্রস্তরযুগে প্রস্তরায়ুধ নির্মাণের মুখ্য দুই কেন্দ্র চিহ্নিত হয়েছে শুশুনিয়া-বিহারীনাথের পার্বত্যভূমি ও তারাফেণী-ভৈরববাঁকি কাঁসাই-কুমারীর মিলনস্থল। এই দুই স্থলেই মানব অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এখনো পর্যন্ত। উভয়স্থানেই প্রস্তরায়ুধের উপকরণের প্রাচুর্য ও দক্ষ শ্রমশক্তির সন্নিবেশ প্রস্তরায়ুধের নির্মানকেন্দ্র হিসাবে পূর্ণতা দান করেছিল। দুই সন্নিহিত প্রত্নস্থলগুলিতে আবিষ্কৃত আয়ুধ ও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। তাম্র-প্রস্তরযুগে প্রথম বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের জনপদের সংবাদ মেলে দামোদর তীরবর্তী পোখন্না ও কংসাবতী তীরবর্তী ডিহরে। আর দক্ষিণে কংসাবতী কুমারী তীরে তুলসীপুর এবং তারাফেনী নদী তীরবর্তী কুমারডাঙ্গায় তাম্রাশ্মীয় যুগের উন্নত

যুগভিত্তিক মানব অবস্থিতি

নদী বা উচ্চভূমি	পুরা প্রত্নযুগীয় স্থল	ক্ষুদ্রাশ্মীয় প্রত্ন স্থল	নবাশ্মীয় প্রত্ন স্থল
দামোদর		ইটুড়ি, বিহারীনাথ, কুস্থলিয়া, বেলডাঙ্গা, মরোহর, বড়জোড়া, দেজুরি	
দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী অড়কোষা (শুশুনিয়া পাহাড়)	ধলডাঙ্গা, দামোদরপুর মাজুরিয়া, উপরশোল, ভাগাবাঁধ, চিকচিকা, নয়াবাঁধ	জামথোল, পঞ্চশিমুলিয়া, পারুলিয়া, পাহাড়বেদিয়া, বদলার ঘাট, শোয়াবসা, গিধুরিয়া, ধানকোড়ারজোড়, দামোদরপুর, মানজুড়িয়া, ধলডাঙ্গা, ভাতুড়ি, ভাগাবাঁধ, কৃষ্ণনগর, দেউলভিড়া,	চন্দ্রা, বাঁকাজোড়, ধানকোড়া, বিসিন্দা, বনআসুরিয়া, ডিহড়
শালী (বিহারীনাথ-কোড়া পাহাড়)	গোপীনাথপুর	অমরকানন, কোড়া ১ ও ২, বেলিয়াতোড়, কুশদ্বীপ, সোনামুখী	কুশদ্বীপ
শিলাবতী (গুনিয়াদা পাহাড়)	গুনিয়াদা পাহাড়	গুনিয়াদা, আমঘাটা, গোপালপুর, জুনবেদিয়া, মাকড়াসিনিতলা, সতীরঘাট, দেউলগড়া, হরিণভিড়া, বনদেউলি (কদম), জোয়ারদা গোবিন্দপুর, পতিরডাঙ্গা, নামোকেচন্দা, বেঞ্চমনী, আড়ালডি, বিবড়দা,	আড়ালডিহি, সুলগি
কুমারী-কাঁসাই	হাতিখেদা, পুড্ডি, চিয়াদা, অম্বিকানগর, কাঁকড়াদাড়া, গোড়াবাড়ী, পরেশনাথ, কাজলকুড়া	অম্বিকানগর, ছিটগিরি, গোড়াবাড়ি, হাতিখেদা, মুকুন্দপুর, নবচিয়াদা, পরেশনাথ, কেচন্দাঘাট	চিয়াদা, বুরকুটিয়া, পরেশনাথ
ভৈরববাঁকী তারাফেনী (রানিবাঁধ-ছেঁদাপাথর)	কাত্রো১,২ ধানজোড়া, গড়পাহাড়, ফুলকুসমা	সিন্দ্রিয়াম, পাটগাড়া, কৃষ্ণনগর, বাবুরডাঙ্গা, চাপাপাল, ঢেকিকাটা, যুগলডাঙ্গা, গড়কুলিয়া, কুমারআড়, নেপুড়া, জুনবানি, হুয়ানখানা, কাত্রো ১,২, ডেঙ্গাআম, ধোবাকাদা, তুরুবাঁধ, মদনকাটা, বাঁশীনালা, পালি, নেকড়াপচা, ঘোড়াগাড়ি, ভৈরববাঁকি জলাধার, গড়পাহাড়, কুচিয়াপাল, লেপাম, রসপাল, রামচন্দ্রপুর, কীর্তনডাঙ্গা, মগড়া, লাউসোল, গিরোলবনী, গোপালপুর, বড়গাড়ি, গুড়পাড়া, ঠাকুরবাড়ি, বড়ডাঙ্গা, ফুলকুসমা, সাগরচাকা, জেমরাজপুর	রামচন্দ্রপুর, রসপাল, ঠাকুরবাড়ি, ফুলকুসমা,

জনপদের সন্ধান মিলেছে।

বাঁকুড়ার প্রাগৈতিহাসিক সময়ের পারম্পর্য নির্মিত হয়েছে প্রত্নস্থল ও প্রত্নসামগ্রীর বিশ্লেষণে। এই ভূমিখণ্ডে পুরাতন প্রস্তরযুগ ছিল খ্রিস্টপূর্বাব্দ (১৩৫০-১০০০) নাগাদ (হলোসীন পর্ব), তাম্রাশ্মীয় যুগ ১০০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ও লৌহযুগ ৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। পুরা প্রস্তরযুগীয় মানুষের অবস্থান ছিল মূলত শুশুনিয়া-বিহারীনাথ এবং গুনিয়াদা-রানিবাঁধ- কুমারী-কাঁসাই উচ্চভূমিতে।[৩৮] যারা ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগে (মধ্য ও নব প্রস্তর) দামোদর, কুমারী, কাঁসাই, শিলাই, অড়কোষা, শালী, দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী নদী উপত্যকা বরাবর বিচরণ করত। পূর্বপৃষ্ঠায় প্রদত্ত সারণি থেকে যুগভিত্তিক মানবস্থান অনুধাবন করা যাবে।

আদি প্রস্তরযুগের আয়ুধ ছিল এ্যাশেউলীয় হাত কুঠার, বর্শাফলক, ডিম্বাকার-বৃত্তাকার আয়ুধ এবং মধ্য-নব্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধ ছিল বিভিন্ন কোণের কুঠার, হাতকুঠার, ফলা, বাটালি, ছেদক, চাঁছনি, কর্তরী, পয়েন্টস্ ইত্যাদি। আয়ুধের উপাদান ছিল মূল কোয়ার্টজ বা কষ্টিপাথর, গ্রানাইট উপরত্ন (এ্যাগেট) পাথর ইত্যাদি। নব্যপ্রস্তর যুগীয় সছিদ্র পাষাণচক্র ছিল কৃষিদণ্ডের ওজন বৃদ্ধি, পূজা উপাসনা, মূষলাস্ত্রের উপকরণ।

শিকার জীবন থেকে কৃষিজীবন

ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগে, আদিপ্রস্তর যুগের শিকার-সংগ্রহ-সঞ্চয় নির্ভর যাযাবরী জীবনধারা পশুপালন-কৃষিভিত্তিক সমাজ অর্থনীতিতে উত্তরণের আভাস দেয়। এবং এই বিবর্তনই আদিম মানুষকে উপত্যকামুখী করে। তবে প্রস্তরায়ুধ ও উপকরণ নির্ভরতা এবং দুইটি উল্লেখিত পার্বত্যভূমিতে তার নির্মাণস্থল থাকার কারণে এই উপত্যকার অবস্থিতি ছিল পার্বত্যভূমির অনতিদূরে। 'বাঁকুড়া পরিচয়'-এ এই সন্ধিক্ষণ বিষয়ে (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪) বিবরণ আছে, 'এই ধরণের যাযাবর নরগোষ্ঠী বর্ষায় ব্যবহার করেছে পাহাড়ের পদমূল এবং শীতে দামোদর-অজয়-দ্বারকেশ্বরের প্লাবনভূমি। গ্রীষ্মে তারা আরহণ করেছে উচ্চস্থানে, পর্যায়ক্রমিক স্থান বদল ঘটেছে ঋতুবৈচিত্র্যের মধ্যে এমনকি বাগমুণ্ডি, অযোধ্যা পাহাড় (পুরুলিয়া); বেলপাহাড়ী, কাঁকড়াঝোড় (মেদিনীপুর) এবং রানিবাঁধ, বিহারীনাথ, শুশুনিয়া (বাঁকুড়া) ইত্যাদির পাদমূল আরামপ্রদ বাসস্থান তৈরি করতে পারে, জুলাই এবং ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের জলধারাও সহজেই উপলব্ধ ঘটা সম্ভব। শরৎ-হেমন্তে প্লাবন ভূমিতে গজিয়ে ওঠে নানা ধরণের খাদ্যযোগ্য স্থল এবং জলজ বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ। ....শীতে নিম্নভূমির অবস্থানে পাখি শিকার চলতে পারে। ক্ষুদ্রাশ্ম ব্যবহারকারী গোষ্ঠী স্বচ্ছন্দে জলজ প্রাণীর শিকারে নিয়োজিত হতে পারে।'

তাম্রাশ্মীয় জনপদ ও অর্থনীতি

নবাশ্মীয় পর্বে যেমন কৃষি অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল, তাম্রাশ্মীয় যুগে উদ্বৃত্ত ফসল-শিল্প ও সমৃদ্ধ বাণিজ্যের আভাস মেলে। মল্লভূমি ঃ জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা (গৌরপদ সেন, পৃঃ ২০) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাম্রশ্মীয় সংস্কৃতির যে সমস্ত প্রত্নসম্ভার ডিহর, পোখন্না এবং সেগুলির কাছাকাছি বিভিন্ন স্থান থেকে আবিস্কৃত হয়েছে এবং দক্ষিণ বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই পর্বে এ সমস্ত অঞ্চলের জীবনযাত্রা অনেক পরিণত। ধাতুর ব্যবহার, পাথরের আয়ুধও একবারে লুপ্ত হয়নি, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প ও প্রধানতঃ বিনিময়-নির্ভর সীমিত ব্যবসা-বাণিজ্য এ সবই অনুধাবন করা যায়। আরো লক্ষণীয়, আদি পর্বের গ্রামভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থারও বিস্তার ঘটেছে ও স্থায়ী বসত নির্মাণের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। সরলরেখায় বিন্যস্ত অনেকগুলি গৃহতল, মাটির বড় বড় তাল, যেগুলির উপর ছাপ লেগে রয়েছে লাল খাগড়ার এবং মেঝে তৈরি হয়েছে নুড়ি পাথর কাঁকর ও মসৃণ মাটি দিয়ে পিটিয়ে বা দুরমুশ করে। কয়েকটি বড় লম্বাকৃতি স্থানে খুঁটি পোঁতার চিহ্ন, গর্ত, যেগুলির এমন বিস্তৃতি যে মনে হবে ওই স্থানগুলি ছিল পশুশালা। চুল্লীর অবশেষ থেকে কর্মশালার অস্তিত্ব নজরে পড়ে। তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির প্রধান চিহ্ন যে কৃষ্ণ লোহিত মৃৎপাত্র তার প্রাপ্তি এই অঞ্চলে অর্থাৎ দামোদর-দ্বারকেশ্বর-কংসাবতী-শিলাবতী উপত্যকায় বহু ও বিচিত্র। বিস্তৃততর কৃষিকর্মের সাথে একান্ত গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনের নিরিখে গড়ে ওঠা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের অনুসঙ্গ এখানের জীবনযাত্রায় নতুন মাত্রা যেমন একদিকে এনেছে, তেমনি গ্রামীণ সমাজের গড়নেও বিস্তৃত হয়েছে তার প্রভাব। রাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি ও কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রসহ তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির প্রত্ন আবিষ্কার ঘটেছে এবং এই তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির নাড়ির যোগ গাঙ্গেয় ভারত, মধ্যভারত বা রাজস্থানের তাম্রসংস্কৃতির সাথে নয়, বরং তা ওড়িষামুখী। কিন্তু আরও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হল লোহার ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। লোহার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী উত্তরণ সম্ভব ও সহজ হল। কৃষি, কুটিরশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বত্র নতুন গতির সঞ্চার ঘটল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রামের বসত-স্থান-বৃদ্ধি, গ্রামের গড়নে নিত্য প্রয়োজনভিত্তিক পরিবর্তন, গ্রামের সমাজে তার প্রতিফলন, অনেকগুলি ছোট গ্রামের মধ্যে বাস্তব প্রয়োজন একটি-দুটি বড় গ্রামের আত্মপ্রকাশ, সামাজিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ও সীমিত হলেও গ্রামের শাসন শৃঙ্খলার স্বার্থে গ্রামীণ সংগঠনে শাসনাধিষ্ঠানের আবির্ভাব লগ্ন সূচিত হল, নগরায়ন এল অনেক পরে তারই হাত ধরে।' স্পষ্টতই তাম্রাশ্মীয় যুগে অন্তত পাঁচটি উন্নত অর্থনৈতিক জনপদের (ডিহর, পোখন্না, তুলসীপুর, কুমারডাঙ্গা, সড়ানডিহি) অস্তিত্ব ছিল।

লৌহযুগেও জনপদগুলির সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। অধ্যাপক রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এইসব জনপদে তাম্রাশ্মীয় যুগে (১০০০-৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) কৃষি, পশুপালন, শিকার, জঙ্গল সাফ করে কৃষি ও বসতি পত্তন শুরু হয়েছিল এবং লৌহযুগে (৫০০-২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) নিবিড় ও বিস্তৃত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সূচিত হয়েছিল। সমস্ত জনপদগুলিতেই তাম্রাশ্মীয় যুগের কালো, লাল, এমনকি ধূসর মৃৎপাত্রাবশেষ বহু সংখ্যায় পাওয়া গেছে। আর মিলেছে লৌহযুগে ব্যবহৃত লৌহ উপকরণের অবশেষ (iron slag)। পুরা-প্রস্তরযুগের মানুষের অদৃষ্টবাদ-পূর্বপুরুষপূজা নবপোলীয় তাম্রাশ্মীয় যুগে উর্বরতাবাদ, মাতৃপূজা, পার্বণ ও সামাজিক সংস্কৃতি এই অর্থনৈতিক উত্তরণকে সমর্থন করে।

উল্লেখিত জনপদগুলির মধ্যে ডিহড় ও পোখন্না বাণিজ্যিক উৎকর্ষতা লাভ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেন্দ্র দুটির সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব তার সময়ের বিস্তৃতি ও প্রাপ্ত কৃষি ও শিল্পোকরণ, তৎকালীন নদী ও সড়কপথ, বন্দর ইত্যাদির বিশ্লেষণে।

ডিহর বাণিজ্য সংবাদ

ডিহরে প্রাপ্ত তাম্রাশ্মীয় ও তাম্রোত্তর যুগ পর্বের প্রত্ন দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করে তার বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটের ধারণা পাওয়া যায়। যেমন কালো, লাল, খয়েরি রঙের মাটির পাত্র, খেলনা সমূহ। এদের বেশ কিছুতে উন্নত শিল্পবোধের প্রকাশ হিসাবে আছে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, মাছ, সূর্য, জল-ঢেউয়ের মতো প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রায়ণ। আর ছিল পশুপাখির হাড়ের অলঙ্কার, কচ্ছপ কুমীরের খোলের শৌখিন জিনিসপত্র, তামার জিনিসপত্র, গোল হাতলের লৌহাস্ত্র, পঞ্চাশটি পলবিশিষ্ট ক্রিস্টাল মাল্যদানা, ছাব্বিশটি পলকাটা উচ্চ শিল্পমানের অনিক্সের মাল্যদানা, তামা ও রূপার মুদ্রা (২৯-২১০ গ্রেন ওজনের কাকিনী, চৌকপিন, কর্ষাপন এবং সূর্য, চক্র, চৈত্য, দ্রুম ইত্যাদি চিহ্ন বিশিষ্ট) ক্রিস্টাল, এ্যাগেট, জেসপার, অনিক্স, কার্লেনিয়ান, সেপিস্টোন, চ্যালসিডোনি, এ্যাকোয়াসেরিন, গার্নেট নির্মিত মাল্যদানা, পাথরের জলপাত্র, জালের কাঠি, তকলি, মাতৃকা ও যক্ষীমূর্তি। চুড়ি, বালা, কংকন, আংটি, তামার ব্রেসলেট, বজ্রচিহ্নের উজ্জ্বল ধাতব ব্রেসলেট (লামা রমণীদের পরিধেয়), শাঁখের শিল্পদ্রব্য, ধ্যানমগ্ন যোগী, উপবিষ্টা নারী, মুসলমানী কৌলাল, শেরশাহ ও ইসলাম শাহের মুদ্রা। এই প্রত্নসামগ্রী থেকে বিশেষত বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা ও বিভিন্ন পাথরের মাল্যদানা, গহনা থেকে এই স্থানের সঙ্গে উন্নত অন্যান্য বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের যোগাযোগ স্পষ্ট, যেহেতু এসব দ্রব্যাদি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নয়। মাণিকলাল সিংহের অনুমান মালবের সঙ্গে ডিহরের যোগাযোগ ছিল কারণ ডিহর সংলগ্ন গ্রামসমূহ যেমন জন্তা, অবন্তিকা, পুষ্কর্ণা মালবদেশীয় জনপদের নাম। ডিহরের প্রাচীনতম স্তরে উৎখনন চালালে এই

মধ্যভারত-বাঁকুড়ার যোগাযোগের আরো প্রত্ননিদর্শন মেলার সম্ভাবনা আছে।

প্রাগৈতিহাসিক বাণিজ্যধারা মূলত অনুমান নির্ভর হলেও আদি ইতিহাস পর্বে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চুতর্থ শতক থেকে বাণিজ্য ধারার আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মতে বাংলা ছিল রেশমসহ বিভিন্ন জিনিসে সমৃদ্ধ। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রিক-ল্যাটিন অজ্ঞাত লেখক রচিত 'পেরিপ্লাস অব দ্যা ইরিথ্রিয়ান সি' মোতাবেক পাটলিপুত্র থেকে গঙ্গা বন্দরের বাণিজ্য দ্রব্যাদি ছিল কার্পাস-মসলিন ও বিভিন্ন মণি-মুক্তো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উত্তর রাঢ়ের বজ্রভূমিতে হীরক উত্তোলনের সংবাদ আছে। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত অশোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাম্রলিপ্ত ছিল তৎকালে প্রখ্যাত বাণিজ্য-বন্দর নগরী।[৩৯] ডিহরে আবিষ্কৃত পাঁচশতাধিক মৌর্য-শুঙ্গ মুদ্রা, পাটলিপুত্র-ডিহর-তাম্রলিপ্ত বাণিজ্যধারাকে প্রমাণিত করে। সম্রাট অশোকের পাটলিপুত্র থেকে স্থলপথে তাম্রলিপ্ত ভ্রমণ খুব সম্ভব ডিহরের উপর দিয়ে। বর্ষাঋতুতে নদী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাম্রলিপ্ত ও ডিহর ছিল একই নদীধারার (দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ) কূলবর্তী। তাছাড়া অন্য এক বিশিষ্ট নদীবন্দর ঘাটাল ছিল একই নদী তীরবর্তী। অধ্যাপক গৌরপদ সেন ডিহরের সাথে সপ্তগ্রাম-হুগলি নদীবন্দরের বাণিজ্যের কথাও বলেছেন। উল্লেখ্য ডিহরে প্রাপ্ত বাটখারা উপরত্ন, বিভিন্ন মূল্যবান পাথরের মাল্যদানা-গহনা যেমন আদি ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক বাণিজ্যে রত্নরাজির অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তেমনিই ডিহরে প্রাপ্ত তকলির সঙ্গে বয়ন সূত্র তৎকালীন বস্ত্র বাণিজ্যের ধারণাকে সমর্থন করে। রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ডিহরের বাণিজ্য সম্ভাবনার সমর্থনে মত প্রকাশ করে উৎখননে প্রাপ্ত একলপ্তে অনেক মৌর্যশুঙ্গ মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু কৌম সভ্যতার বিনিময় প্রক্রিয়াই ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এই মুদ্রাগুলি বাইরের কোনো বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্থানীয় শ্রমিক বা বিক্রেতাদের শ্রম বা দ্রব্যমূল্যের বিনিময় হতে পারে। মুদ্রা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন না থাকায় উৎখনিত অঞ্চলে সুষমভাবে মুদ্রাপ্রাপ্তি ঘটেনি। প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর সাদৃশ্য থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় ডিহরের সাথে পোখন্না, ভরতপুর, সরাকডিহি-সালুগা, তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড়, বাণগড়, মহাস্থানগড়ের যোগাযোগ ছিল।

যেকোনো সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রের সন্নিহিত অঞ্চলে থাকে উন্নত কৃষি-শিল্প। ডিহরও তার ব্যতায় ছিল না। ডিহরে প্রাপ্ত প্রত্নছাই, কণাবশেষের বিশ্লেষণে প্রতীয়মান যে 'জারা' প্রজাতির (ওরাইজা স্যাটিভা) ধান ডিহর-পোখন্না অঞ্চলে প্রচুর ফলত। ডিহর অঞ্চলে প্রাপ্ত Ring well -এর প্রাচুর্য থেকে কুয়োগুলির বহুসংখ্যায় উপস্থিতি ও তার গৃহস্থালী-শিল্প-কৃষিতে ব্যবহার সম্পর্কে অনুমান করা যায়। উৎখননে প্রাপ্ত

রক্তাভ-ধূসর পাষাণচক্র, ধূসর-কৃষ্ণ পেষণী, রক্তাভ-ধূসর পেষণ চক্র কৃষিকাজে ধান থেকে চাল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের সাক্ষ্য দেয়। জল ও শস্য সংরক্ষণের কৌলাল মিলেছে অনেক। ডিহরে আবিষ্কৃত চুন-সুরকির মসৃণ মেঝে সম্ভবত লৌহজাত দ্রব্যাদি তৈরির কর্মশালার বা কোনো উন্নত গৃহ (পুরাতন যুগের ইট ও মাকাড়া পাথর খণ্ডের সন্ধান মিলেছে) বা পশু আস্তানা। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে এখানকারা মৃৎশিল্প বিশেষত হাতি ও বিভিন্ন পশুর মৃৎনির্মাণ ছিল বাংলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মৃৎপাত্র তৈরী হত হাত ও ঘুর্ণিচক্রের সাহায্যে। পাত্রগুলি ছিল পাতলা (.৫ সেমির কম), মাঝারি (.৬-.৮ সেমি) ও মোটা (.৮ সেমির বেশি)। উপাদান ছিল কৃষ্ণলোহিত কৌলালের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কাদামাটি বা ধূসর কৌলালের ক্ষেত্রে আরো সূক্ষ্ম মাটি। কৃষ্ণ কৌলাল যেখানে বিশুদ্ধ কাদামাটির, লোহিত কৌলাল বালি মিশ্রিত কাদামাটি নির্মিত। ডিহরের সমৃদ্ধি নিয়ে ডঃ গৌরপদ সেন লিখেছেন, 'এখানে কৃষ্ণ লোহিত কৌলালের সংস্কৃতি দীর্ঘ ও ধারাবাহিক। ...... এখানো অর্থনীতির প্রধান উপজীবিকা পশুপালন, মৎস্যশিকার বা পশু-পক্ষী শিকারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান কৃষি ও মৃৎ এবং ধাতুশিল্পে উন্নীত হয়। কালক্রমে কৃষি ও শিল্পে উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিয়োজিত হয় অন্তর্বাণিজ্যে, যা কিছুকাল অন্তত ঘাটালের বন্দর পর্যন্ত যেত। সুতরাং পশুপালন ও শিকার নয়, কৃষি ও বাণিজ্যে ডিহর ছিল এই অঞ্চলের এক যুগের প্রাণকেন্দ্র। মল্লরাজত্বের পূর্ব ইতিহাস ডিহর-শুশুনিয়া-পোখন্নার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত।'

ডিহরের মতোই সমকালীন সমৃদ্ধ বাণিজ্য ও প্রশাসনিক জনপদ ছিল পোখন্না। পোখন্না পরিমণ্ডলে উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী হল লাল-কালো মাটির পাত্র, কালো, লাল, ধূসর, বাদামী বিভিন্ন মৃৎপাত্র, হাড়ের তৈরি তীরের ফলা,বর্শা, হাড় ও পাথরের পুঁথি, তামার জিনিস, লোহার বাটালী, উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-চিক্কন মৃৎপাত্র, কুষাণ শৈলীর মৃন্ময় খেলনা ও পাত্র, রৌপ্যমুদ্রা, তামার মুদ্রা, কষ্টি পাথরের বিষ্ণু মূর্তি, ক্লোরাইট পাথরের সূর্যমূর্তি (পাল সেন আমলের)। অর্থাৎ পোখন্না পরিমণ্ডলের সমৃদ্ধি বজায় ছিল সেনযুগ পর্যন্ত। নদী বাণিজ্য চলত দামোদর-রূপনারায়ণ (দামোদর-রূপনারায়ণ সংযোগী নদী মাধ্যমে)-তাম্রলিপ্ত পথে। স্থলবাণিজ্য চলত ডিহরের অনুসৃত পথে।

পোখন্না বার্তা

ডিহরের মতো পোখন্নাতেও কৃষি সমৃদ্ধির পরিচয় মেলে তার দামোদর বিধৌত উর্বর পলি অববাহিকায়। তাম্রাশ্মীয় পর্বে চাল, কলাই, সরিষার ব্যাপক ফলনের প্রমাণ মিলেছিল।[৪০] সেই কৃষি সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল লোকগানের মধ্য দিয়ে সন্নিহিত অঞ্চলে 'মিথ' হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেমন 'চার মাস বর্ষা পোখরনা যায়/পোখরনা গিয়ে দেখি দুয়ারে মরাই/ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে/বড় মরাইয়ে পা দিয়ে/রাই এসো গো ঝলমলিয়ে।'[৪১]

অর্থাৎ অন্যত্র শস্য নিঃশেষিত হলেও পোখন্নাতে তখন মরাই ভর্তি ধান থাকত। 'বাঁকুড়া পরিচয়ে'র ভাষায়, 'কৃষি সম্পদের বর্ণনা শরীরে, লোকবাহিত এই অভিভবের বাস্তব ভিত্তি প্রজাবর্গের সমৃদ্ধ জীবনে ছিল বলেই নৌ-বাণিজ্য ও স্থল বাণিজ্যের ব্যাপ্তি ঘটা সম্ভব হয়েছিল। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দে ভৈরবডাঙ্গার নবপোলীয়, তাম্রাশ্মীয় যুগের সূত্রপাত রাষ্ট্রিক রূপান্তরের এবং তার পরিব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত বেগবান থেকেছে।'[৪২] পুস্করণ অধিপতি চন্দ্রবর্মার ধোসোগ্রাম দান এই উদ্বৃত্ত অর্থনীতিরই প্রমাণ। মৌর্য-শুঙ্গ বাণিজ্যবৃত্তে পোখন্নার অবস্থানের প্রমাণস্বরূপ পোখন্নার প্রাপ্ত একটি যক্ষিণী মূর্তির উল্লেখ করা যায়। স্টেলা ক্রামরিশের মতে এটি মৌর্য ঘরানার এবং তমলুকে প্রাপ্ত সমকালীন বিভঙ্গ ও কৌশলের অনুসারী[৪৩]। এন. আর. রায়ের মতে এটি শুঙ্গ আমলের কারণ মূর্তিটি, 'exhibits definite Sunga characteristics so familiar to us from the Bharhut railings. With its lower part broken, it represents a standing female figure (6") perhaps a Yakshini, with a head dress fashiones exactly on the Bharhut model. Her right hand lifts a portion of the skirt in an angel, and the left, resting in akimbo, holds a suko bird. Her heavy neck ornament arranged in two stages and composed in heavy square units modeled as if in separate plastic volumes, her rounded and stiff pair of breasts similarly modeled and arrangement of the folds and hanging of the upper and lower garments, all unmistakably reveal her intimate relationship with the Sunga idiom of art."[৪৪] এস. এস. বিশ্বাস ও এস. সরস্বতী কিছু অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে এটিকে মৌর্য-শুঙ্গ সন্ধিক্ষণের শিল্পকর্ম বলেছেন।[৪৫] এছাড়া কষ্টি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি ও ক্লোরাইট পাথরের সূর্যমূর্তি থেকে পোখন্নার বাণিজ্যিক অস্তিত্ব পাল-সেন সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ধারণা করা যায়। অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বাণিজ্যিক অবনমন ঘটলেও ডিহর-পোখন্নার সমৃদ্ধি পাল-সেন সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে হয়। দ্বারকেশ্বরের গতিপথের পরিবর্তন ডিহরের বাণিজ্য ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করেছিল। উল্লেখ্য তুলসীপুর ও কুমারডাঙ্গায় তাম্রাশ্মীয়-লৌহযুগের কার্মকাণ্ডের প্রমাণ মিললেও; দুর্গমতা, মুখ্য বাণিজ্যপথের সাথে সংযোগহীনতা ইত্যাদি কারণে আদি ঐতিহাসিক যুগ থেকে পোখন্নার আর কোনো বাণিজ্য সংবাদ পাওয়া যায় না।

পাল-সেন যুগোত্তর বাঁকুড়ায় ভৌম রাজ শাসনে দুটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রের সন্ধান মেলে বীরসিংহপুর-রাজহাটী এবং রাজগ্রামে। ওন্দা থানার রাজহাট-বীরসিংহপুরে বাণিজ্য সমৃদ্ধ শুরু হয় সম্ভবত দশম বা একাদশ শতাব্দীতে[৪৬]। রাজগ্রামের পত্তন ঘটেছিল আরো পাঁচশো বছর পরে। অনেকের মতে বীরসিংহপুরের পত্তন করেছিলেন মল্লরাজ বীরসিংহ।

বীরসিংহপুর রাজহাট কথা

সপ্তম শতকে শশাঙ্ক, নবম শতকে দেবপাল, একাদশ শতকে রাজেন্দ্রচোলের (ছান্দার বা মন্দারণের রণশূর ও দণ্ডভুক্তির ধর্মপালকে পরাজিত করে) দক্ষিণবঙ্গ বিজয়ের সংবাদ থাকলেও বাঁকুড়া ভূমিতে তাঁদের আধিপত্য সংশয়াতীত নয়। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দশম-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঁকুড়া খণ্ডে স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন দলপতিরা বিভিন্ন অংশ শাসন করতেন।[৪৭] উল্লেখ্য এই অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী (মতান্তরে ষোড়শ শতক) পর্যন্ত সমগ্র বাঁকুড়া জুড়ে বিশেষত দ্বারকেশ্বর নদীর তীর বরাবর মন্দির সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই মন্দির নির্মাণ কাজে বণিক শ্রেণির ভূমিকা এবং সুস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে অনুকূল বেগ এনেছিল। বহুসংখ্যক শ্রমিকের প্রচেষ্টায় দীর্ঘ সময়ে মন্দিরোপকরণ উৎপাদনস্থল থেকে বাহিত হয়ে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। স্বভাবতই এর অনুষঙ্গ ছিল সন্নিহিত অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য। দ্বারকেশ্বর তীর বরাবর এক্তেশ্বর, বহুলাড়া, সোনাতাপল, ধরাপাট, ডিহর, দেউলভিড়ার মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল। অন্যগুলি হল দেউলি, রাউতাড়া, লাঢ়, রাধানগর, সালদা, জয়পুর, ময়ানপুর, কেন্দুয়া, ছিটগিরি, লোয়াদি, পরেশনাথ, বিহারীনাথ প্রভৃতি। বাঁকুড়ায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে (মহাবীরের রাঢ় পরিভ্রমণকাল) পাল-সেন যুগ পর্যন্ত জৈন প্রভাব অব্যাহত ছিল ও জৈন শ্রাবক ও সরাকরা দশম শতাব্দীর আগে ও পরে বাঁকুড়া বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এদের বিনিয়োগের পাশাপাশি তন্তুবায়, তাম্বুলি, শঙ্খবণিক প্রভৃতি শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ এই সময়কালের একটি বিশিষ্ট আর্থ সামাজিক ঘটনা। রাজহাট-বীরসিংহপুর ছিল এই সৃষ্ট বাণিজ্যধারার সুতিকাগার। উক্ত সামাজিক শ্রেণিগুলিকে বলা হত রাজহাটী শ্রেণি ও বাঁকুড়া জুড়ে চালু হল বাণিজ্য পরিমাপ 'রাজহাটী পাই'। অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক এক ক্ষেত্রসমীক্ষায় রাজহাট-বীরসিংহপুর গ্রামের অতীত সমৃদ্ধির ছায়াপাত আছে। তিনি লিখেছেন, 'এক্তেশ্বর মন্দিরের অল্প দূরেই রাজহাট-বীরসিংহপুর (নদীপথে)। বীরসিংহ এক্তেশ্বর মন্দির সংস্কার করেছিলেন বলে জনশ্রুতি শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন বীরসিংহ রাজহাটে একটি নতুন রাজধানী করেছিলেন। আমার ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রচুর মন্দির খুঁজে পেয়েছি যেগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক বড়ো বড়ো নাটমন্দির, দুর্গামণ্ডপ ও দোতলা-তিনতলা প্রাসাদোপম বাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে। চারদিকে ঝোপঝাড়, হাতে গোনা মুনষ্যবসতি। প্রথমে ঢুকলে গা ছম্ ছম্ করে। বিস্ময় জাগায় এত বড়ো সমৃদ্ধ জনপদ কী ঘটনার জেরে এমন জনশূন্য হয়ে গেল। কয়েকশত ইমারতের ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে দ্বারকেশ্বর বিজনতীরে। গ্রামটি প্রায় ফাঁকা। শোনা যায়, একদা এখানে কয়েকশ ঘর তাঁতি ছিল। তাঁদের জীবিকা ছিল রেশমের কাপড়

বোনা এবং ১৬২ ঘর তাম্বুলি (তামলি) ছিলেন। এঁরা সবাই গ্রাম ছেড়ে দেশান্তরী হন কোন ঘটনার কারণে। শোনা যায়, মহামারির আতঙ্কে তাঁরা ঘর-বাড়ি-সম্পত্তি সবকিছু ছেড়ে চলে যান গ্রাম ফাঁকা করে। ১৬২ ঘর তাম্বুলি ছাতনা ও খাতড়া থানায় ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা এখনও 'রাজহাটি তামলি' বলে পরিচিত।'[৪৮] অষ্টাদশ শতকে তাম্রলিপ্তের গুরুত্ব হ্রাসের পর ও ক্রমহ্রাসমান নব্যতার কারণে স্থলবাণিজ্যের পরিধি অনেক বেড়েছিল। মেদিনীপুরের লবণ উৎপাদক অঞ্চলগুলির সাথে রাজহাটি-বীরসিংহপুরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। শঙ্খ বণিকদের কাঁচামালও আসত জেলায়। এখানে উৎপাদিত তাম্বুল, রেশম, তসর ইত্যাদি সন্নিহিত জেলা ও দূরবর্তী স্থানে রপ্তানী হত। অন্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গড়বেতা-চন্দ্রকোণা ঘাটাল-ক্ষীরপাইয়ের মতো অঞ্চলগুলি এসময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ. কে. বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'Birsinghapur-Rajhat was also an important centre of tussar-silk export and salt import.' প্রায় পাঁচশত বছর ধরে এই রাজহাটী-বীরসিংহপুর প্রাচীন বাণিজ্য পথের উপর অবস্থান করে বাঁকুড়ার বাণিজ্য গরিমা বৃদ্ধি করেছিল।

রাজগ্রাম সমাচার

মন্বন্তরের অভিঘাত বা আশঙ্কায় রাজহাট-বীরসিংহপুর পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্বেই ছাতনা ভৌমরাজ্য প্রতিষ্ঠা লগ্নে রাজগ্রাম বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটে। আদিতে রাজগ্রাম ছিল বন ও বনপশু উপদ্রুত। স্থানীয় নিষাদ জেলে, ডোম, খয়রা, বাগদি, বাউরি সম্প্রদায় বনজ সম্পদের (অধিকাংশই দক্ষিণ বাঁকুড়ার) বাণিজ্যে জড়িত ছিল। বাউরী-বাগদি সম্প্রদায় ঘুটিং পুড়িয়ে চুন প্রস্তুত করত ও তা রপ্তানী করত। কৃষ্ণদাস চট্টরাজ ও পরবর্তীকালে বালসী, ওন্দা, মানকানালী, সোনামুখী, লোদনা প্রভৃতি স্থানের মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, অধিকারী, চৌধুরী, লায়েক প্রভৃতি পদবিধারী উচ্চবর্ণীয়রা রাজগ্রামে বসতি স্থাপন ও বাণিজ্যে অংশ নেওয়ার ফলে নিম্নবর্ণীয়দের হাত থেকে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ উচ্চবর্ণের কাছে আসে। রাজগ্রামের পাঁচটি মহল্লার প্রাচীনতম শ্রীরামপুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষ্ণদাস চট্টরাজের নবম পুরুষ শ্রীরাম চট্টরাজ কর্তৃক (অন্য চারটি হল ইলামবাজার, মন্দিরগড়্যা, বাগছালা, শিমূলডাঙ্গা)। অবস্থানগত সুবিধার কারণে রাজগ্রাম রাজহাটী-বীরসিংহপুরের তুলনায় বেশি আদৃত হয়েছিল এবং সম্ভবত তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল তুলনায়। রাজগ্রামে আসত দক্ষিণ বাঁকুড়ার সুপুর, রানিবাঁধ, পুরুলিয়ার মানবাজার জঙ্গল থেকে সংগৃহীত লাক্ষা, তসরটুয়া, মোল, হরিতকি, বহেড়া, তেঁতুল, লতা-শিকড়াদির ঔষধ। পূর্ব বাঁকুড়ার কোতলপুর, সোনামুখী, বর্ধমান-খণ্ডঘোষ অঞ্চল থেকে কলাই, ডাল, আলু, তাঁত কাপড়, গামছা, পেতল, কাঁসা, রেশমী কাপড় (কিছুটা সিউড়ি-বীরভূম থেকে)। মেদিনীপুর-চন্দ্রকোনা থেকে

কোরা ধুতি-শাড়ি, নুন। রাজগ্রামমুখী সড়কগুলি ছিল — (১) মানবাজার-ইন্দপুর-রাজগ্রাম সগড়াট রাস্তা (২) রঘুনাথপুর, ছাতনা-কেঞ্জাকুড়া-রাজগ্রাম (৩) সিউড়ি-বর্ধমান-শ্রীরামপুর-সোনামুখী- বাঁকুড়া-রাজগ্রাম (৪) খণ্ডঘোষ-বাদশাহী সড়ক-বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া (রাজগ্রাম)। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজহাট থেকে চৈতন্য কুণ্ডু তাম্বুল-নুনের ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাজগ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং রাজগ্রামের বাণিজ্যধারার সমৃদ্ধির সূচনা ঘটান যা রাজহাট পুঁজির স্থানান্তর সূচিত করে। একইভাবে রাজহাট সন্নিহিত কুণ্ডু তন্তুবায় সমাজ রাজগ্রামে বিনিয়োগ ও বসতি শুরু করে। রাজগ্রামে বাণিজ্যে অংশীদারিত্বের পাশাপাশি কুণ্ডু-দত্তরা তেজারতি-মহাজনী ব্যবসা, জমিদারি বিনিয়োগে নিজ পুঁজি বহুগুণিত করে নেয়। এই দুই সম্প্রদায় লাক্ষা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছায়। দক্ষিণ বাঁকুড়া থেকে সংগৃহীত লাক্ষা সরাসরি আসত কুণ্ডুদের গোলাতে। এই গালা উটের গাড়ি বোঝাই হয়ে ওড়িষা, বিহার, প্রভৃতি রাজ্যে পাড়ি দিত। কুণ্ডুদের রাজগ্রামের বৃহৎ গালাকুঠিতে বহু শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। দক্ষিণ বাঁকুড়া ছাড়াও এখানে লাক্ষা আমদানী হত মানভূম-সিংভূম থেকে। শুধু পুরুলিয়া জেলাতেই লাক্ষা সংগ্রহের জন্য কুণ্ডুদের ২২-২৩টি গদি ছিল।[৪৯] দত্তরাও একইভাবে লাক্ষা রপ্তানিতে অংশ নিত। চাইবাসাতে ছিল তাদের বাণিজ্যকুঠি। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বেও ছিল লাক্ষা ব্যবসার অব্যাহত রমরমা। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে জেলাশাসক হার্টের হিসাবে বাঁকুড়ায় লাক্ষা সংগ্রহের কুঠির সংখ্যা ছিল ২২২৩। দত্তদের বিনিয়োগে রাজগ্রামে বস্ত্রশিল্প প্রখ্যাতি লাভ করে। অদ্যাবধি রাজগ্রামে তাঁতবস্ত্রের অনুশীলন সেই অতীত গৌরবকে মনে করায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ছাতনারাজের আনুকূল্যে রাজগ্রামের শ্রীরামপুরের পার্শ্বস্থ বনাঞ্চল পরিষ্কার করে বাজার ও বেনারস আগত মোদক, নন্দী, বরাট, দাস ও লক্ষণ পদবীযুক্ত তন্তুজীবি সম্প্রদায়ের (কামাখ্যা তন্ত্রধারী) বসতি গড়ে উঠলে রাজগ্রামের বাণিজ্যে নতুন ধারা যুক্ত হয়। ভৌমরাজ্য বিকাশের উত্তর ও অন্তিম পর্বে সোনামুখী ও বিষ্ণুপুরের বাণিজ্য মানচিত্রে বস্ত্রবয়ন শিল্প উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে ছিল। রামানুজ কর লিখেছিলেন, "এ জেলার জঙ্গলে তসর জন্মে। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, গুপিনাথপুর, রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া ও বীরসিংহপুর গ্রামে তসরের ধুতি, শাড়ি ও চাদর তৈয়ার হয়। এ জেলার পুনিশোল প্রভৃতি গ্রামে রেশমের আবাদ হয়। বিষ্ণুপুরের রেশমের উৎকৃষ্ট ধুতি, শাড়ি, চাদর, জামার কাপড় তৈয়ার হয়। ইহা মুর্শিদাবাদের রেশম বস্ত্রের চেয়ে কোন অংশে হীন নহে।"[৫০]

প্রাক্ ব্রিটিশ পর্বে ও মল্লরাজত্বে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে সোনামুখী নামক জনপদ। এই জনপদটির উদ্ভবকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। বহুল প্রচলিত বিশ্বাস হল এই গ্রামনামের উদ্ভব গ্রামদেবী 'স্বর্ণমুখী' থেকে যা ১৫৬৪-৭৬

খ্রিস্টাব্দকাল সীমায় বাংলার শাসক সুলেমান করনানীর সেনাপতি 'কালাপাহাড়' কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন বীর হাম্বিরের (১৫৯৬-১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ) সভাপণ্ডিত মনোহর দাসের নিবাস ছিল এই সোনামুখী। সোনামুখীর তন্তুবায় সমাজের মনোহর দাসের প্রতি ভক্তি-আনুগত্য মনোহর পরবর্তী সময়ে বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রসারের ইঙ্গিত দেয়। গোপাল সিংহের (১৭১২-১৭৪৮ খ্রিঃ) আমলে আগত পণ্ডিত জগমোহন সোনামুখীকে "তন্তুবায় প্রধান" গ্রাম বলেছেন। বস্ত্রশিল্প চরম উৎকর্ষতা লাভ করে মহামতি জন চীপের সময়কালে। মহামতি চীপ বাঁকুড়ার বাণিজ্য ইতিহাসে একটি গৌরবজ্জ্বল নাম।

সোনামুখী বাণিজ্য কেন্দ্র ও জন চীপ

সোনামুখীতে প্রাক্ ব্রিটিশ সময়কালে বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধির টানেই ফরাসি বণিকদের আগমন ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচ-ছয় দশকে ফরাসি বণিকরা স্থানীয় গোমস্তাদের মাধ্যমে সোনামুখীতে বিনিয়োগ করত। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম-বাঁকুড়া যুক্ত জেলার সুপুরে জনৈক ফরাসি বিনিয়োগকারী লি সিগনউর এক গোঁসাইয়ের (আনন্দচাঁদ) কাছ থেকে কয়েক বিঘা জমি কিনে একটি বড় বস্ত্র কারখানা স্থাপন করেন। দালাল মারফৎ তাঁতিদের প্রতি তাঁর বার্ষিক অগ্রিম ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমান ক্ষমতা ভোগ করতেন, খেলাপী তাঁতীদের বিরুদ্ধে পিওন নিয়োগ করতেন, কারখানায় পাহারাদার রাখতেন ও ফ্রান্সের পতাকা উড্ডীন রাখতেন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এলাকা ত্যাগ করলে আর কোনো ফরাসি বণিক এ অঞ্চলে পা রাখেনি।[৫১] পলাশি যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ সমগ্র বাংলা জুড়েই সুরক্ষিত হতে থাকে। সোনামুখীতেও ব্রিটিশ বণিকদের আগমন ঘটে ও বিনা শুল্কে তারা বাণিজ্যের অধিকার করায়ত্ত করে। মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুধাবন করতে না পেরে সোনামুখী বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে শুল্ক আদায়ে জোর করেন। ইংরেজ বণিকরা বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে এনে প্রতিবাদ জানান। ১৭৭৪-৮৪ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে সোনামুখীতে ব্রিটিশ বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার্থে নিযুক্ত কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট ছিলেন জে. বি. স্মিথ। অবশ্য পঞ্চাশের দশক থেকেই ইংরেজ বণিকদের সোনামুখীতে আগমন ঘটেছিল এবং ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বণিকরা সোনামুখী ত্যাগ করলে ইংরেজের একাধিপত্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধাবসানের পর ফ্রেঞ্চ রেসিডেন্ট জে. সি. এ. চ্যামবন সুপুর ও অধীনস্থ ছটি বাণিজ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ইংরেজের তুলনায় লাভজনক শর্তে বাণিজ্য শুরু করলে ইঙ্গ-ফরাসি বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা শুরু হয়। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জেলাশাসক জি. আর. ফোলে ও ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে শেরবোর্ন ফরাসিদের বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় নিরন্তর বাধা প্রয়োগ করলে, তাঁরা

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত বাণিজ্যিক স্বার্থ ও সম্পত্তি সোনামুখীর ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জন চীপের হাতে সমর্পণে বাধ্য হয়ে আবার এলাকা ছাড়া হন।[৫২] ১৭৮৩-৮৪ অর্থবর্ষে চীপসাহেব সোনামুখী রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর বস্তুত ব্রিটিশ বিপণন ও বাণিজ্য স্বার্থ এলাকায় অপ্রতিহত হয়ে পড়ে। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে সোনামুখী মুখ্য বাণিজ্য কেন্দ্র ও কারখানার অধীন ছিল বিষ্ণুপুর-বীরভূম-বর্ধমান-রাজশাহীতে বিস্তৃত ৩১টি বাণিজ্যকেন্দ্র ও কারখানা (বোর্ড অব ট্রেড প্রসেডিংস তাং ১০/০৮/১৭৯০ ও ৬/০৪/১৭৮৪)। সোনামুখী থেকে আগাম দেওয়ার জন্য অর্থ এইসব অঞ্চলে সেনা প্রহরায় পাঠানো হত। এইসব কেন্দ্রে মূলত তাঁতবস্ত্র, চিনি, গালা, নীল, গাঁজা ইত্যাদির উৎপাদন ও বিপণন অনুষ্ঠিত হত। জন চীপের সোনামুখী অধীনস্থ কুঠিগুলি ছিল অসুরিয়া, দেসুরিয়া, নারায়ণপুর, রামপুর, তামুলি, কৃষ্ণনগর, ধাড়িমপুর, হদল, পারুলিয়া। ডাঃ জি. এন. চীপের (স্বাস্থ্য ও শিক্ষাদরদী চীপ জেলার চিকিৎসক নিযুক্ত হন ১৮২১ খ্রিঃ ১১ আগস্ট) বাঁকুড়া কুঠির অধীনস্ত প্রধান কুঠিগুলি হল অযোধ্যা, আমডাংরা, চম্পাতলা, জয়পুর, কোতলপুর, গোপালনগর, ঘাটনগর, বরা, জামুরিয়া, কাঁকলা, পাত্রসায়ের। অপ্রধান কুঠিগুলো হল সাঁতুড়ি, দীঘা, কুপায়, রোল, ওন্দা, চামট্যা, নিকুঞ্জপুর, সারেঙ্গা, দেউলি, সালুকা, সুরুল, লোকপুর। ১৭৯০ খ্রিঃ ১২ অক্টোবরের বোর্ড অব রেভেন্যুকে লেখা জেলাশাসকের পত্রে সোনামুখী কারখানা ও তার অধীনস্ত রাজারহাট, বামেনডেন কারখানা; পাত্রসায়ের কারখানা ও অধীনস্ত গোপালনগর, রায়বাঘিনী কারখানার উল্লেখ আছে। বীরভূমের সুরুলের অধীনস্ত কারখানাগুলি ছিল ইলামবাজার, গড়গড়িয়া, ঈশ্বরপুর, আলুন্দা, হরিপুর, দুবরাজপুর, হজরতপুর ও ডেলাতে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বরের বোর্ড অব রেভেন্যু প্রতিবেদনে ২৭টি কারখানার তালিকা নিম্নরূপ :

সুরুল ও অধীনস্ত - ১৩	সাত্তাপুর - ১
সোনারাণ্ডি - ৩	সোনামুখী ও অধীনস্ত - ২
কাঞ্চননগর - ১	পাত্রসায়ের - ২
বিষ্ণুপুর - ১	কালনা + লেলট - ২ + ২

সোনামুখীর তাঁতি ও তাঁতবস্ত্র

জন চীপ ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু (১৮২৮ খ্রিঃ) সোনামুখী বাণিজ্য কেন্দ্রের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট হিসাবে বাঁকুড়া বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিল্প বাণিজ্যের প্রাণপুরুষ হয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাঁত বস্ত্রের অগ্রিম (দাদন) দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গোমস্তা মাধ্যম পরিহার করে সরাসরি তাঁতিদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। এ সময় ব্রিটিশ বাণিজ্য কুঠির সন্নিকটে সংহত তাঁতিপাড়া ও ধোবিপাড়ার

(ডাইয়ের কাজে জড়িত) উদ্ভব ঘটে। জন চীপের হিসাবে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সোনামুখী সন্নিহিত অঞ্চলে ৩০০০ তাঁতি ঘর গড়ে ওঠে এবং ৪০০০ তাঁতি এই শিল্পে সংযুক্ত হয়। কানাই রুইদাস ও ব্রজমোহন তন্তুবায় ছিলেন দুজন নেতৃস্থানীয় তাঁতি। শ্রীরামপুরের এক দিনেমার বণিকের ভাষায়, জেলাটি "almost solely inhabited by weavers." তাঁতযন্ত্রে তাঁতি কাপড় বোনা, ধোবির ডাইং-এর কাজ ছাড়াও তুলা (কার্পাস) থেকে সুতা বুনত। 'কাটনি'—চরকায় এই কাজটি করত মূলত তাঁতি পরিবারের মহিলা ও অপ্রাপ্তবয়স্করা। জন চীপের সময়ে নথিভুক্ত কোম্পানী তন্তুবায়দের আওরাঙ বা কুঠিতে বছরে একবার উপস্থিত হয়ে বস্ত্রের দাম, গুণমান, ওজন-আকৃতি ও প্রদেয় কাপড়ের পরিমাণ সম্পর্কে মুচলেকা দিতে হত। পরিবারের আকার বা সামর্থ্য অনুসারে কাপড়ের অর্ডার দেওয়া হত যা বছরে ১৪-র বেশি হত না।[৫৩] এক চতুর্থাংশ দাদন দেওয়া হত ফেব্রুয়ারিতে, দ্বিতীয় এক-চতুর্থাংশ এপ্রিল-মে তে, পরবর্তী এক চতুর্থাংশ জুলাইয়ে এবং বাকি এক চতুর্থাংশ অর্ধেক মাল জমা দেওয়ার পর। বাংলার বন্দরগুলি থেকে যেহেতু রপ্তানী দ্রব্য বোঝাই জাহাজগুলোর বেশিরভাগ ১০ নভেম্বর থেকে ১০ মার্চের মধ্যে রওনা দিত, এই সময়ের যথেষ্ট আগেই উৎপাদিত দ্রব্য আরঙয়ে জমা দিতে হত। স্থল পরিবহনের মূল মাধ্যম ছিল বোঝাবহনকারী কুলি, ষাঁড় ও গরুর গাড়ি। বস্ত্রশিল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন কর্মির উপার্জন ছিল নিম্নরূপ ঃ

একজন কাটনী মাসে সাত সের সুতা কাটতে পারতেন (দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির সুতা)। তুলার ক্রয়মূল্য টাকা প্রতি ২$^{১}/_{২}$ সের ধরে সমতুল দ্বিতীয় শ্রেণির সুতা বিক্রয়ে রোজগার হত ১ টাকা ৯ আনা যা তৃতীয় শ্রেণীর সুতার ক্ষেত্রে ১ টাকা ৯ আনা ৯ গণ্ডা। প্রথম শ্রেণির সুতার ক্ষেত্রে কাটনি প্রতি মাসে উৎপাদন হত ৪$^{১}/_{৪}$ সের যা থেকে উপার্জন ছিল ১ টাকা ১২ আনা।

তন্তুবায়দের ক্ষেত্রে একটি কাপড় বুনতে সময় লাগত ৫$^{১}/_{২}$ - ৬ দিন অর্থাৎ মাসে ৪$^{১}/_{২}$ — ৫টি কাপড় তৈরী হত। কাপড় প্রতি ১০-১২ আনা মজুরি মূল্য ধরে তাদের মাসিক রোজগার ছিল ৩ সিক্কা টাকা। ১৭৮৯ সালের শ্রীরামপুর দিনেমার কুঠি মালিকের প্রতিবেদনেও এর সমর্থন মেলে। তারা এই অল্প উপার্জনেও দালাল শ্রেণিকে আদায় দিতে বাধ্য হতেন।[৫৪] কাপড়ের সাইজ ছিল ৭৫ x ২$^{১}/_{৪}$ ফুট।

ধোবাদের ক্ষেত্রে কাপড় প্রতি কাচা ও সাদা করার (ব্লীচ) মজুরি ছিল ১$^{১}/_{২}$ আনা। গোমস্তাদের মাসিক মজুরি ছিল ১৫—২০ টাকা ও কমিশন। গোমস্তার সহযোগী মুহুরী, ক্যাশিয়ার, পিওন বা তাগাদাদারের মাসিক রোজগার ছিল যথাক্রমে ১২, ১০, ৩ টাকা। দালালদের দালালি ছিল ক্রয়ের উপর ৩$^{১}/_{৮}$ শতাংশ। একজন কর্মঠ গোমস্তার দল দশমাস ধরে ৩০০০-৪০০০ কাপড় সংগ্রহ করত এবং ১২০০০-১৬০০০ টাকার ব্যবসা করত।

তাঁতশিল্পে সংকট

উপরোক্ত মজুরি ধরে আওরঙে ২০টি কাপড় পিছু মূল্য ধার্য্য হত ৭৭ টাকা ১১ আনা। আওরঙ (কুঠি) থেকে মুখ্য বন্দর পর্যন্ত পরিবহন খরচ, প্যাকিং, শুল্ক (১৭৮৮ খ্রিঃ পর্যন্ত), প্রহরা, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বাবদ ২ $^1/_2$ —৫% অতিরিক্ত ও ২০-৩০ শতাংশ লাভ রেখে বন্দরে ২০ বস্ত্রপিছু দাম ধার্য্য হত ৯৫ টাকা। নৌ বা সমুদ্র বাণিজ্যের খরচ বাদ দিলেও বস্ত্র রপ্তানিতে কোম্পানীর বিপুল মুনাফা হত কারণ ইংলণ্ডে একেকটির মূল্য ছিল ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২২ টাকা ১২ আনা। যার মধ্যে সোনামুখীর প্রস্তুতকারক তাঁতির অংশ মাত্র ১০ - ১২ আনা!!

১৭৮৯ খ্রিঃ দিনেমার মুখ্য কুঠিয়ালের প্রতিবেদন মোতাবেক ইউরোপে বীরভূম-বিষ্ণুপুর জেলা থেকে ইংরেজ কর্তৃক প্রেরিত কাপড় ছিল ৮০০০০টি যা মোট বাণিজ্যের ৫০% এবং মোট উৎপাদনের ২০%। এর ৫০% উৎপাদন ছিল বিষ্ণুপুরে। অবশ্য ১৭৯২ খ্রিঃ মোট ক্রীত বস্ত্র কমে দাঁড়ায় ৪২,৩০০টি এবং বিনিয়োগ ২২০২২৪ সিক্কা টাকা।[৫৫] ১৭৯০ খ্রিঃ স্থানীয় অপ্রতুল উৎপাদন ও উৎপাদন কেন্দ্রে চাহিদার কারণে মুর্শিদাবাদ, পাটনা, মির্জাপুর থেকে জেলায় কার্পাস আমদানি ছিল ১৭০০০ মণ (৪২৫০ মণ স্বচ্ছ সুতি তুলা)।[৫৬] জেলা প্রশাসন, জমিদার শ্রেণির উৎসাহ বা ভীতিও সব রায়তকে তুলাচাষে বাধ্য করা বা এই ঘাটতি পূরণ করায় সহায়ক হয়নি। চীপ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্য আবহাওয়া বা মাটির উর্বরতাহীনতাকে দায়ী করেছেন।[৫৭] একই জমিতে একটানা তুলা চাষের ক্ষেত্রে উর্বরতা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় গোবরসারও জেলায় অমিল ছিল।

বিভিন্ন কারণে অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে সোনামুখী সহ বাংলার সুতিবস্ত্র শিল্পে অবনমন শুরু হয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব এবং ম্যাঞ্চেস্টারের সস্তা শৌখিন বস্ত্রের উৎপাদন ও ভারতে তার রপ্তানী। বস্তুত ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দেই কোর্ট অব ডাইরেক্টর এই সংকটের ইঙ্গিত দিয়েছিল। সোনামুখীতে সুতিবস্ত্রে কোম্পানীর বিনিয়োগ ক্রমশই কমছিল ও স্থানীয় কাঁচামালের অভাব তাঁতিদের কর্মহীনতার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। বোর্ড অব রেভেন্যুকে চীপ তাঁতিদের দুরবস্থা নিয়ে লেখেন, "for more than half their time is lost in going from haut to haut, with a few cowries worth of thread which when sold enables them to buy a small percel of cotton, merely enough to work up for the next haut.....but if a sale does not offer for their thread, they cannot buy cotton and their labour is at a stand." (১৮/০৫/১৭৯৮ তারিখে লিখিত পত্রাংশ)। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে যেখানে মুর্শিদাবাদ-পাটনা থেকে ২০০০০ মণ তুলা আসার কথা সেখানে পাওয়া গিয়েছিল এক চতুর্থাংশের কিছু বেশি। এর ফলে কোম্পানীকে

প্রতিশ্রুত কাপড়ও তারা দিতে পারছিল না। এর উপর ছিল তাঁতিপাড়ায় তাগাদাদারদের অত্যাচার, তাদের প্রতি আতিথ্য ও উৎকোচ প্রদানের খরচ। তাছাড়া কোম্পানী অসম্পূর্ণ মান ও মাত্রার কারণে কাপড় বাতিল ও ফেরত করত। এমন কাপড় প্রতি (খেলাপী) এক টাকা জরিমানাও করত। কম মজুরিতে উচ্চমানের কাপড় প্রস্তুতির তাগাদা এবং সাধ্য অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা তাঁতিদের কোম্পানী-কুঠি বিমুখ করে তোলে। তাছাড়া ছিল দেশি বা অন্যদেশীয় বণিকদের বেশি মজুরির প্রলোভন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে সোনামুখীর চার তন্তুবায় বিজয়রাম দত্ত, নারায়ণ নন্দী, জরুরি ভুঁই ও ভবানীচরণ ভুঁই এক অভিযোগপত্রে সরকারকে জানায় যে কোম্পানীর গঙ্গানারায়ণ সরকার ও তার ভাই তাগাদাদার হরিনারায়ণ তাঁতিদের ৭০০০০ বস্ত্রের দাদন দিয়ে জুলুম করছেন। এরপর সোনামুখী, ঢাকা ও হরিপালের তাঁতিরা একযোগে কোম্পানীর নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান।[৫৮] ১৭৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে এই অসন্তোষ চরমে পৌঁছায় এবং চীপের মুচলেকা-হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করে তাঁতিরা কোম্পানীকে বয়কট করে। চীপ তাঁতিদের কোম্পানীর কাজ থেকে বরখাস্ত করেও অবস্থা সামলে দিতে পারলেন না। এদিকে ১৭৯৮-১৭৯৯ খ্রিঃ ট্রেজারী পুরোপুরি শূন্য হয়ে পড়ে। চীপ কোম্পানীকে জানান, “a cessation of advances altogether puts a stop to the receipt of cloths as the weavers can not continue their labour unless supplied.”[৫৯]

বাংলার তাঁতবস্ত্র ইংলন্ডের গুদামে অবিক্রিত পড়ে থাকছে এই অজুহাতে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সোনামুখী থেকে কোম্পানী বস্ত্র সংগ্রহ কমে দাঁড়ায় ৯৭১৫০ সিক্কা টাকায় ১৫০০০টি।[৬০] বস্তুত ১৮২০ সাল নাগাদ তাঁতবস্ত্রে কোম্পানীর বিনিয়োগ পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। এর পরবর্তী অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে দেশি বণিক ও বিনিয়োগকারীদের বদান্যতায়। ১৯২৫ সালে বাঁকুড়ার ৬৩০০০ বিঘা জমিতে তুলা চাষ হত বলে রামানুজ কর অভিমত দেন।[৬১]

তাঁতবস্ত্র শিল্পে অবনতির ক্রান্তিকালে রেশম শিল্পের সমৃদ্ধি সূচিত হয়। নেপোলিয়ান কর্তৃক ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইটালিয়ান রেশম ইংলন্ডে রপ্তানী পুরোপুরি বন্ধ হলে ভারতীয় রেশমের কদর ও চাহিদা ভীষণ বেড়ে যায়। রেশম শিল্পে কোম্পানীর বিনিয়োগ ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬৫০০০ সিক্কা টাকা ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে বেড়ে হয় ৩৮০০০০ সিক্কা টাকা। যা ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় ৭৫০০০০ সিক্কা টাকা। ১৮২৯ সালে রেশম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭৬০ মণ। (উল্লেখ্য, সুলভ সস্তা ইটালিয় রেশমের কারণে কোম্পানী ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে রেশমে বিনিয়োগ বন্ধই করে দিয়েছিল ও ব্যক্তি মালিকানাধীন রেশম

শিল্পকে উৎসাহিত করেছিল।) তুঁত চাষী ও গুটিপালকদের দাদন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোম্পানীর সহায়ক ছিল গ্রামের মণ্ডল শ্রেণি যারা পাইকার হিসাবেও পরিচিতি পায়।[৬২] পরে সন্ন্যাসী-মাড়োয়ারি সমাজের আগমন ও রেশম বস্ত্র ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ রেশমগুটির যেমন দাম বাড়ায়, চাহিদার তুলনায় তুঁতচাষের স্বল্পতা গুটির গুণমানও নামিয়ে দেয় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে।[৬৩] ১৯২৫ সালে প্রকাশিত রামানুজ করের 'বাঁকুড়া জেলার বিবরণ'-এ রেশম বাণিজ্যে মাড়োয়ারি নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ আছে। পুনিশোল গ্রামে রেশমের আবাদ হত এবং বিষ্ণুপুর, সোনামুখীর উৎকৃষ্ট রেশমবস্ত্র তাঁর মতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হত। তাঁর মতে বাঁকুড়ার রেশম বস্ত্রের গুণমান মুর্শিদাবাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। এ সময় রেশমশিল্পীর সংখ্যা ছিল ৩২৪। রেশম-তসরের অগ্রগতির সাথে তাঁতবস্ত্রের সংকটও ঘনীভূত হতে থাকে।

তাঁতবস্ত্রশিল্পে সোনামুখীর সমৃদ্ধি সন্নিহিত অঞ্চলে তুলাচাষের প্রসার ঘটিয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুর-বীরভূম জেলায় তুলাচাষ হয়েছিল ৪০০০০ মণ। বিঘাতে উৎপাদন ছিল ২ $^{১}/_{২}$ থেকে ৩ মণ, যা নির্ভর করত জমির উর্বরতার উপর। চাষের পরিমাণ ছিল অন্যূন ১৩০০ বিঘা। এ সময় জেলাশাসক কিটিং-এর হিসাবে কার্পাস-চাষ জমির ভূমি রাজস্ব ছিল (১ম, ২য়, ৩য় মানের) যথাক্রমে ৪ টাকা, ৩ টাকা, ২ $^{১}/_{২}$ টাকা প্রতি বিঘা। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে স্থানীয় তন্তুবায়দের কাঁচা মালের চাহিদা মেটাতে ৪০০০০ মণের অতিরিক্ত ২০০০০ মণ পাটনাই তুলা মুর্শিদাবাদের মাধ্যমে এ জেলায় আমদানি করতে হয়েছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁতশিল্পের বার্ধক্যবেলায় জেলায় তাঁত উৎপাদন ছিল, 'as to be barely sufficient for the private consumption of the cultivators'[৬৪]

মোঘল দরবারে বাঁকুড়া সহ বাংলার রেশমবস্ত্রের কদরের কারণে এ সময়ে জেলায় তুঁত চাষ ও রেশম শিল্প বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশ বাণিজ্যের মুখ্য পণ্য ছিল রেশম। কোম্পানীর উৎসাহে সুরুল ও সন্নিহিত এলাকায় ১৭৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে জেমস ফ্রুসাড কর্তৃক ২৫০০ বিঘা জমিতে তুঁতচাষ ছিল কোম্পানীর রেশম প্রীতির উদাহরণ। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে এই রেশম চাষের দায়িত্ব আসে জন চীপের হাতে। অতিরিক্ত ভূমি রাজস্ব ছিল ফ্রুসাড ও জেলাশাসক কিটিং-এর অবিরত বিরোধের কারণ। যদিও কোম্পানী এই ভার অনেকটাই লাঘব করেছিল।[৬৫] জন চীপের মতে রেশম চাষে এক শ্রেণির কৃষকের অনাগ্রহের কারণ ছিল অতিরিক্ত ভূমিকর যার জন্য, 'next to impossible to induce the ryots to increase the cultivation.' জন চীপের পরবর্তী সোনামুখী কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট কলিন শেক্সপীয়ার ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তুঁত

চাষের যে হিসাব দিয়েছিলেন তা হল বিঘা প্রতি বাৎসরিক ব্যয় ৯ টাকা ১২ আনা (যার মধ্যে ভূমিরাজস্ব ৪ টাকা ৪ আনা, সার ১ টাকা ৮ আনা, বছরে ৪০ দিনের মজুরি ৪ টাকা) এবং আয় ১৪ টাকা[৬৬] (বছরে বিঘায় ১৪ বোঝা পাতা ১ টাকা হারে ১৪ টাকা)। সুতরাং বিঘা প্রতি বাৎসরিক আয় হত ৪ টাকা ৪ আনা। যদি কৃষক তুঁত গাছ ছাড়াও রেশমগুটি পর্যন্ত পরিচর্যা নিজেই করত তবে এই আয় গিয়ে দাঁড়াত ৩৪ টাকা ৪ আনা।[৬৭] বছরে পাঁচবার পর্যন্ত উৎপাদন হত। এসব সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রার কম রেশমচাষে বোর্ড অব ট্রেড ১৮৩১ খ্রিঃ বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করে, যদিও এই চাষ, 'pay more to the persons engaged in these pursuits than they derive from any other source or occupation.'[৬৮] ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইন মোতাবেক রেশম শিল্পে ব্রিটিশ বিনিয়োগ বন্ধ হলেও ব্যক্তি উদ্যোগে রেশম উৎপাদন অব্যাহত থাকে।

তসর শিল্প

তসর বস্ত্র উৎপাদনে বাঁকুড়া জেলার ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল কারণ এই তসর চাষ হয় মূলত শাল গাছে যা বাঁকুড়া জেলার সম্পদ। তাছাড়া অন্য তিন ধরনের গাছ আসান-কুল, সিধা, অর্জুন গাছেও তসর চাষ হয়। আসান ও সিধা গাছের বাহুল্য এ অঞ্চলে নেই। শালগাছের তসর সর্বোৎকৃষ্ট। পরবর্তীকালে অর্জুন গাছ চাষের প্রসার ঘটে কারণ ব্রিটিশ সময়কালেই শাল জঙ্গলের ব্যাপক সঙ্কোচন ঘটে।[৬৯] ১৯২৫ সালে রামানুজ কর তসর চাষ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এ জেলার জঙ্গলে তসর জন্মে। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, গুপিনাথপুর, রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া ও বীরসিংহপুর গ্রামে তসরের ধুতি, শাড়ি ও চাদর তৈয়ার হয়।' শালবন থেকে তসরগুটি সংগ্রহ ছিল উপজাতি ও অর্ধ-উপজাতীয় মানুষদের অন্যতম আয়ের উৎস। বাঁকুড়ার তসরের উৎকর্ষতার প্রমাণ মেলে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টকে লেখা জেলা শাসকের ২২/০৫/১৮৫৪ ও ০৯/০৬/১৮৫৪ তারিখের পত্রাঙ্কে যেখানে বলা ছিল, "the Tusser prepared in this District is generally allowed to be very inferior to that at Bancoorah." তসরের ভাগ্য পূর্বে বর্ণিত রেশম শিল্পের মতোই ওঠানামা করত। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন 'The state of the Tusser Silk Industry in Bengal and Central Provinces'-এ N.G. Mukherjee বাঁকুড়ার তসরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন ও ঢাকা-ময়মনসিংহে এর কদরের কথা বলেছেন। তিনি তসরশিল্পে যুক্ত পরিবারের সংখ্যা বলেছেন সোনামুখীতে ১০০০, বিষ্ণুপুরে ৫০০-৭০০, গোপীনাথপুরে ৪০০, রাজগ্রামে ৪০০, রাজহাটীতে ৪০০ এবং মোট জড়িত মানুষ ১০০০০। সেখানে ১৯৫৯ সালে তসর তাঁত কমে দাঁড়ায় ৬৫টি ও কর্মসংস্থান ছিল

মাত্র ২৩১ জনের। এ সময় মালবেরী চাষের জমি দাঁড়ায় ১৮০ একরে ও একর প্রতি পাতা উৎপাদন ছিল ৬০০০।

১৯২১-২২ সালে জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত প্রশাসনিকভাবে ও কৃষি সমিতির মাধ্যমে রেশম-তসর শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ওন্দায় ২০ বিঘা ও পুনিশোলে কয়েক বিঘা জমিতে রেশম চাষের ব্যবস্থা হয়। ওন্দায় তিনজন রেশম বিভাগীয় কর্মী নিয়োগ করা হয়। পুনিশোলের দুজন 'সমিতি'র ব্যয়ে রেশম বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ পান। শিরোমণিপুরে (বর্তমান কোতলপুর) মল্লযুগের রেশম গৌরব ফিরিয়ে আনতে সন্নিহিত ১৮টি গ্রামে 'কোতলপুর সমিতির' মাধ্যমে রেশম চাষের ব্যবস্থা করা হয়।[৭০] মড়ার, চিঙ্গানী, কুলপুকুর প্রভৃতি গ্রামগুলিতে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করা হয়। বস্ত্রবয়ন শিল্পের উন্নতিতে তার একদশক আগে ১৯১০ খ্রিঃ বিষ্ণুপুরের বণিক রামসুন্দর চক্রবর্তী, সোনামুখীর রসরাজ বিশ্বাস ও কুচিয়াকোলে জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ সিংহের আর্থিক বদান্যতায় বিষ্ণুপুরের বয়নশিল্প শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও বস্ত্রবয়ন শিল্প বিশেষত তাঁতবস্ত্র শিল্পের উত্থান ও পতন দুই শতাব্দী ধরে তাঁতিদের স্বচ্ছলতা ও দৈন্যে পতিত করেছিল যা নিম্নের সংখ্যাতত্ত্বে বোঝা যাবে। সোনামুখী তাঁত বস্ত্র শিল্পে বার্ষিক কোম্পানী বিনিয়োগ ও উৎপাদনের তুলনামূলক আলোচনায় উত্থান-পতনের সেই লেখাচিত্র সংযুক্ত করা হল নিম্নের সারণিতে, যা থেকে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

অর্থবর্ষ	কোম্পানী বিনিয়োগ (সিঃ টাকা-আনা-পাই)	উৎপাদিত বস্ত্র (মণ) (ক্যালিকো + ক্যালিকো মসৃণ)	বস্ত্রের ক্রয়মূল্য (ক্যালিকো + ক্যালিকো মসৃণ)
১৭৫৭	১০১২২০-০-০		
১৮০৭		৩৫৬০০ + ৬৯০০	১৮৮২১১ + ৫২৫৭৬
১৮১০		২৯৫০০ + ৯৩০১	১৫৬০৯১ + ৫২৯৬২
১৮১২	২২৫১৮৩-০-০		
১৮১৩	২৪০৫৩৬-০-০	৩৫০০০ + ২৩৫০	২০০৬৩২ + ২১৫১৭
১৮১৪	১৭২৬৫২-৮-০	৩৫০০০ + ৩৮৫০	২০২৭৩৮ + ২৮৬৯২
১৮১৫	১৭৭২৩৮-৮-০	৪১২২০ + ২৩০০	২২১৪২৫ + ২৩৫১৮
১৮১৬	৬৭৭১৩-৮-০		
১৮১৭	১৯২৮১৪-৪-১১		
১৮১৮	১৬০৭০-০-০		

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে ১৮১৪ খ্রিঃ থেকেই বিনিয়োগের অধোগতি স্পষ্টতর হয়েছে। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান বণিকদের আগমন ঘটে, যারা বিপুল বিনিয়োগে সোনামুখী থেকে মোটা কাপড় কিনেছিল। এসময় কম শ্রমে মোটা কাপড় তৈরীতে উৎসাহ দেওয়া ও ভালো দামে তা কেনার ফলে সোনামুখীতে মিহিবস্ত্র নির্মাণ ধাক্কা খায় যা পরবর্তীকালে সোনামুখীর সুতিবস্ত্র শিল্পের পক্ষে বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়ায়। এ বছর ব্রিটিশ বিনিয়োগ ছিল গড় বিনিয়োগের মাত্র এক তৃতীয়াংশ। পরবর্তী বছর (১৮১৭ খ্রিঃ) গড় বিনিয়োগের বেশি বিনিয়োগ করেও সৃষ্ট রুগ্নতা থেকে এই শিল্পকে রক্ষা করা গেল না। ১৮১৮ খ্রিঃ বিনিয়োগ কমে দাঁড়ায় গড় বিনিয়োগের এক দশমাংশ যা ১৮২০ খ্রিঃ মধ্যে একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়। অথচ প্রারম্ভিক পর্যায়ে 'খ' শ্রেণিভুক্ত শান্তিপুর-হরিপাল-কাশিমমাজার-সোনামুখীতে কোম্পানীর গড় বিনিয়োগ ছিল ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা যা এই শিল্পে মোট বিনিয়োগের ৩১ শতাংশ। বিভিন্ন বছরে তুলার দামের ওঠানামাও এ শিল্পের ভাগ্যকে প্রভাবিত করেছিল। মণপ্রতি তুলার দাম ছিল ১৭৯২ খ্রিঃ ১৩ সিক্কা টাকা ৮ আনা, ১৭৯৮ খ্রিঃ ১০ সিক্কা টাকা ১২ আনা, ১৭৯৯ খ্রিঃ ২১ সিক্কা টাকা ৮ আনা, ১৮০০ খ্রিঃ ২০ সিক্কা টাকা, ১৮০১ খ্রিঃ ২৩ সিক্কা টাকা ৮ আনা, ১৮১৮ খ্রিঃ ১৭ সিক্কা টাকা ১২ আনা।

তাঁতশিল্পের উত্থান ও পতন

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক ছয় দশকেই সোনামুখীর ঐতিহ্যশালী বস্ত্রশিল্পের অন্তরাগ রচিত হয়েছিল যা বয়নশিল্পীদের অবর্ণনীয় দুর্দশায় পতিত করেছিল। ১৮৭৬ খ্রিঃ হান্টারের বিবরণীতে সেই করুণ চিত্র প্রতিফলিত। ১৮২০ খ্রিঃ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল অনুপস্থিত। মহাজনের সরবরাহকৃত কাঁচামালের দাম ও সুদ সহ দাদন, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য থেকে বিযুক্ত হলে তাঁতিদের জীবন ধারণের রসদটুকুও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। ১৮৭১ খ্রিঃ তাঁতশিল্পে জড়িত ছিলেন ৬৬৮৫ জন। ১৮৮৮ খ্রিঃ এক সরকারি হিসাবে একটি ছয়জনের তাঁতি পরিবারের বাৎসরিক আয় ছিল তাঁত থেকে ৬০ টাকা ও গড়ে তিন বিঘা জমি থেকে ২০ টাকা, মোট ৮০ টাকা। তৎকালীন জীবন যাত্রার মানের নিরিখে তা যথেষ্ট বলে বিবৃত হয়েছে। গ্রামে গঞ্জে ইউরোপীয় কাপড়ের চেয়ে মোটা কাপড়ের চাহিদা তাঁতিদের জীবিকার পক্ষে ছিল স্বস্তিদায়ক। ১৮০৬ খ্রিঃ ফোলির শ্রম প্রতিবেদনে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের তাঁতিদের দারিদ্র ও কারখানামুখী প্রভাবিত শ্রমবৃত্তির কথা বিবৃত আছে। ১৮০৯ খ্রিঃ ও'ম্যালী গ্রামাঞ্চলেও কুটির শিল্পের বস্ত্রের পরিবর্তে ইউরোপীয় কলের কাপড়ের চল তাঁতিদের চরম দুর্দশার দিকে ঠেলে দিয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯১৭-২৪ খ্রিঃ রবার্টসনের ভূমিসমীক্ষায় দেখা যায় জেলার

৭১৮৯ জন তাঁতির মুখ্য জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষি এবং উপজীবিকা তাঁত। এই দুর্দশা অব্যাহত থাকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। তাঁতির সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪৮০০। ১৯১৮ সালের ১৯ জুনে প্রতিষ্ঠিত বাঁকুড়ার কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল উইভিং ইউনিয়ন লিমিটেড নামক সমবায় সমিতি তাঁতের আংশিক যান্ত্রিকীকরণ ঘটায়। ১৯২০-২১ সালে উৎপাদিত বস্ত্রমূল্য দাঁড়ায় ১২৫৪৯৫ টাকা। তাঁতিদের রোজগারও বেড়ে দাঁড়ায় ৭ টাকা থেকে ১০-১৫ টাকা। ১৯২১-২২ খ্রিঃ পূর্বোক্ত সমবায় সমিতির লাভ ছিল ৫২২৪৩ টাকা। ১৯২২-২৩ খ্রিঃ সমিতির লাভ কমে দাঁড়ায় মাত্র ১৫০০ টাকা। এর অধীনে সমবায় ছিল ৫৪টি যা বাংলার মোট সমবায়ের (১৪২) প্রায় অর্ধেক। ১৯২০ সালে তাঁতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮০০।

১৯৪০ খ্রিঃ তাঁতশিল্পের ভাগ্যাকাশ প্রসন্নোজ্জ্বল হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে। এ সময় বিদেশি বস্ত্র দেশীয় বাজারে দুষ্প্রাপ্য হলে তাঁতজাত দেশি বস্ত্র মহার্ঘ হয়। এ সময় তাঁতশিল্পীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০৩৭ যা স্বাধীনোত্তর প্রথম জনগণনায় (১৯৫১ খ্রিঃ) দাঁড়ায় ২১৬৪৩ ও হস্তচালিত তাঁত ৮২৩৮ টি। এত বিঘ্ন (বিশেষত মারাঠা, ও পরবর্তীকালের পাহাড়িয়া হাঙ্গামা ও ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তরের দুঃস্বপ্ন স্মৃতি) অতিক্রম করে একটি শিল্পের তিন শতাব্দী টিকে থাকা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

বাঁকুড়ায় নীল বাণিজ্য

নীলচাষ ঠিক কোন সময় বাঁকুড়ায় শুরু হয় তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে জন চীপের সময়কালেই (১৭৮৩-১৮২৮ খ্রিঃ) এই নীল চাষের বাণিজ্যিক পত্তন ঘটে। একাজে তাঁর যোগ্য সহযোগী ছিলেন ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ড থেকে আগত বণিক ডেভিড এরস্কিন। ক্রমে এরস্কিন নীল, চিনি ও গালার একজন মুখ্য উৎপাদকে পরিণত হন। মাত্র চার দশকেই জঙ্গলমহলের ২১২৫ বিঘা ও অন্যত্র ১৪৫২৫ বিঘা জমি এরস্কিন নীল চাষের আওতায় আনেন।[৭১] নীল চাষের এই সম্প্রসারণের মূল কারণগুলি ছিল — (১) ১৭৪৭ খ্রিঃ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান নীলকরদের নীল চাষ ছেড়ে কফি ও চিনি উৎপাদনে মনোনিবেশ (২) সেন্ট ডোমিনিগোয় নীল ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ (৩) আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে সেখানে নীলোৎপাদন হ্রাস। কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের ভাষায় (প্রতিবেদন তাং ০৩/০৫/১৭৯২) এই নীলোৎপাদন, 'had already surpassed the American and French & there is no doubt but by perseverence and attention of the planters it will effectually rival the spanish' ১৮৩০ খ্রিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন অনুসারে এরস্কিন ৯৮৯০ রায়তকে বার্ষিক দাদন দিতেন ৪১৫০০ সিক্কা টাকা। দাদনের পরিমাণ ছিল বিঘা প্রতি ১ থেকে ৪ টাকা। জমিদার নিযুক্ত তাগাদাদারদের 'আগাম' ফেরত দিতে হত ২৫% সুদে। একইভাবে সাধারণ

রায়তকে সুদ সহ পুরানো বাকি বা অপরিশোধিত উৎপাদন মূল্য বা দাদন ফেরত দিতে বাধ্য করা হত নতুবা দেওয়ানী মামলায় ফাঁসানো হত। তবে এরস্কিনদের মতো নীলকররা ছিলেন 'considerate and humane''[৭২] এবং ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের ভাষ্য ছিল, 'as far as the Records of the court can serve as a guide, the rectitude of his transactions with, and the mild treatment of, the natives around him are sufficiently apparent from the circumstances of his having been concerned directly or by his people in only twenty one civil suits and 2 criminal actions, both of a trivial nature within the last nineteen years, in all of which he appears as the complainant.' নীলকরদের এই ভূমিকা ও প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকার জন্যেই বাঁকুড়ায় নীল বিদ্রোহের (১৮৬০-৬২ খ্রিঃ) অভিঘাত অনুভূত হয়নি। এছাড়াও এরস্কিন ছিলেন গঙ্গাজলঘাটির লাটবাইস গ্রামের তালুকদার। বৈকুণ্ঠপুর মৌজা ছিল কোম্পানীর খাস দখলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকেই এরস্কিনের বাণিজ্যভাগ্য অস্তমিত হয় এবং নীল বিদ্রোহোত্তর কালে জি. ও. বি. স্কেলের গিসবর্ন কোম্পানি নীল ব্যবসায় মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকা নেয়।

নীলোৎপাদন ছাড়াও স্কেলের ছিল তেজারতি ও মহাজনী কারবার। এদের মূল কুঠি ছিল বাঁকুড়া শহরের লোকপুরে। রাইপুরের ভেলাইডিহা পরগণাভুক্ত গোপালপুরে ৫০০ বিঘা পরিমিত জমি ছিল কোম্পানীর মালিকাধীন। উল্লেখ্য, স্কেলের আগমনের আগে নীলচাষ ছিল নিজ আবাদী জমিতে বা রায়তী আবাদী জমিতে। নীল বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ঠিকা বন্দোবস্তের মাধ্যমে মূল মালিক মধ্যস্বত্ত্বভোগীর মাধ্যমে বিনা ব্যয়ে বিনা ঝুঁকিতে নীল চাষ করে অর্থোপার্জন করত। ১৮৮০ সালে এই ঠিকা বন্দোবস্ত ভিত্তিক ব্যবস্থায় নীলের উৎপাদন মূল্য ছিল মণ প্রতি ১০০ টাকা ও মণ প্রতি লাভ রাখা হত ১৫০-২০০ টাকা। এর উপর ছিল দাদনের উপর সুদ, চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারের মুনাফার কমিশন ও অতিরিক্ত উৎপাদনের লভ্যাংশ।[৭৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই স্কেলের নীল ব্যবসার যবনিকাপাত ঘটে। লোকপুরে কুঠি কেনেন ঋষিবর মুখোপাধ্যায় এবং ভেলাইডিহার সম্পত্তি কেনেন জমিদার হরচন্দ্র সিংহচৌধুরীর পুত্র চৈতন্যচন্দ্র। অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী 'বাঁকুড়ার জমিদারি মহাজনী ব্যবসায়ে নীলভূমিকা' প্রবন্ধে বন্দোবস্ত প্রথায় নীল চাষের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন যা থেকে তৎকালীন নীল বাণিজ্যধারার অভিমুখ উপলব্ধি করা যায়। নিম্নে তা বিবৃত হল—'হাড়মাসড়ার পদ্মলোচন রায়ের পুত্র নদেরচাঁদ রায় ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে গিসবর্ণ কোম্পানির কাছ থেকে রাইপুর থানার গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত নীলকুঠির নীলোৎপাদনের দু'বছর মেয়াদী ঠিকা বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। সেকালে নীল আবাদের প্রচলিত ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে প্রতি ইংরেজী বছরের অক্টোবর মাস থেকে পরবর্তী

বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নীলচাষের বর্ষ গণ্য হতো। উৎপাদন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দাদন বা অগ্রিম দিতে কোম্পানী রাজি ছিল। প্রতি বছর পুরো পনেরো মণ নীল উৎপাদনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে এবং উৎপন্ন নীল নিজ ব্যয়ে বাক্সবন্দী করে ও ওজন করে কোম্পানীর কলকাতা মোকামের গুদামে পৌঁছে দিতে নদেরচাঁদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। নীল সরবরাহের বাক্স তৈরির খরচও তাঁকেই বহন করতে হতো। নীলের দাম বাবদ নদেরচাঁদে প্রাপ্য ছিল মণ প্রতি একশ চল্লিশ টাকা। ওজন দেওয়ার সময় নীলের রঙ খারাপ হলে ও এজন্য প্রতি মণ নীল একশ পঞ্চাশ টাকার কম করে বিক্রি হলে কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ করে দিতেও তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন। নীলকুঠির জমিজমার খাজনা ও চৌকিদারি কর আদায় দেওয়ার দায়িত্বও ছিল তাঁর। কুঠির ঘরবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতিও ছিল তাঁর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এজন্য আর্থিক ব্যয়ের বোঝা তাঁকেই বহন করতে হতো। অবশ্য মেরামতির ব্যয় পঞ্চাশ টাকার বেশি হলে অতিরিক্ত ব্যয় বাবদ অর্থের দায় কোম্পানী মেটাতো। পনের মণের বেশি নীল উৎপন্ন হলে অতিরিক্ত নীল নদেরচাঁদ কোম্পানির কাছেই মণ প্রতি একশ পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রয় করতে বাধ্য ছিলেন। অর্থাৎ চুক্তির অতিরিক্ত উৎপাদিত নীল অন্য কারোর কাছে বিক্রির স্বাধীনতা তাঁর ছিল না। শুধু তাই নয়; অতিরিক্ত উৎপাদিত নীল বিক্রিলব্ধ মুনাফার অর্থ থেকে কমিশন হিসাবে শতকরা দশটাকা তাঁকে দিতে হতো কোম্পানিকে। চুক্তির বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হলো নীল মণ প্রতি একশ চল্লিশ টাকার কম দরে বিক্রি হলে যে ক্ষতি হতো নদেরচাঁদকে তো সে ক্ষতিপূরণ করতেই হতো, এমনকি, একশ পঞ্চাশ থেকে একশ আশি টাকা দরে বিক্রি হলে তাঁর যে লাভ হতো তার অর্ধেকাংশ ছিল কোম্পানির পাওনা। তাছাড়া কোম্পানীর কাছ থেকে তিনি যে দাদন গ্রহণ করতেন সেজন্যও তাঁকে বার্ষিক শতকরা দশ টাকা হারে সুদ দিতে হতো। তবে পনের মণের কম নীল উৎপন্ন হলে দাদনের বার্ষিক শতকরা সুদ বৃদ্ধি পেয়ে হতো বার টাকা এবং কম উৎপাদনের পরিমাণের উপর মণ প্রতি চল্লিশ টাকা বার্ষিক শতকরা বার টাকা সুদসহ কোম্পানীকে দিতে হতো। তবে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও নীলোৎপাদন পনের মণের কম হলে নদের চাঁদ এসব দায় থেকে অব্যাহতি পেতেন। কোম্পানী কুঠির কাজকর্ম আইনসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য শীলমোহর, চেক ইত্যাদি সরবরাহ করত।' যাই হোক ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দেই বীরভূমের জেলাশাসক নীলচাষে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগের কথা বলেছেন এবং এই শতাব্দীর শেষার্ধে কৃত্রিম ডাই আবিষ্কারের কারণে নীলচাষের সমাপ্তি ঘটে। বাঁকুড়ার যেসব গ্রামে নীলকুঠির সন্ধান পাওয়া গেছে তা হল সোনামুখী, পাত্রসায়ের, লোকপুর, আসুরিয়া, দেসুরিয়া, নারায়ণপুর, রামপুর, তামুলি, কৃষ্ণনগর, গোপালপুর ধাড়িমপুর, হাটকৃষ্ণনগর, হদল, পারুলিয়া, হামিরপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি।

লাক্ষা শিল্প

ভৌমরাজ্য বিকাশের কালে লাক্ষা ছিল বাঁকুড়ার বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য। রাজগ্রামকেন্দ্রিক লাক্ষা ব্যবসা ইতিমধ্যেই বিবৃত হয়েছে। বাঁকুড়ার লাক্ষা চাষের সম্ভাবনা নিয়ে রামানুজ কর লিখেছিলেন, 'বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে কোন কোন গ্রামে লাক্ষার চাষ হয়। লাক্ষার চাষ লাভজনক। পলাশ, কুসুম, কুল, সিধা ও অড়হর গাছে লাক্ষার আবাদ হয়। চেষ্টা করলে এ জেলায় বৎসরে কোটি টাকার লাক্ষা জন্মান যাইতে পারে। বাঁকুড়ার পশ্চিমে মানভূমে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাক্ষার আবাদ হয়। এর কারণ বাঁকুড়া অপেক্ষা মানভূমে কৃষক শ্রেণীর অবস্থা অনেক স্বচ্ছল। মানভূমে প্রত্যেক গ্রামে লাক্ষার আবাদ হয়। গত বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈশাখী লা জন্মিলে লায়ের বাজার নামিয়া যায়, সে সময়ে বাজার দরে বিক্রয় করিলে চাষীদের যথেষ্ট ক্ষতি হইত। চাষীদের অবস্থা স্বচ্ছল থাকায় তারা কম দরে লা বিক্রয় করে না। কার্ত্তিক মাসে নূতন নূতন লা জন্মিলে লায়ের বাজার উঠিয়া যায় এজন্য সে সময়ে কৃষকেরা উচ্চমূল্যে লা বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। বাঁকুড়া জেলায় গ্রামে গ্রামে ও জঙ্গলে যে সকল বৃক্ষ অনাবাদী পড়িয়া আছে তাহাতে লায়ের আবাদ করিতে পারিলে জেলার অবস্থা অন্যরূপ হইবে। এ জেলার অর্থকৃচ্ছতা দূর হইবে।'[৭৪] ১৯২৫ খ্রিঃ রামানুজ করের এই মূল্যায়নের বহু পূর্বে অষ্টাদশ শতকের অন্তভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাঁকুড়ায় লাক্ষা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ শুরু করেছিল। কারণ এই লাক্ষা ব্রিটেনে রপ্তানি হত এবং ঔষধ প্রস্তুতি; খেলনা, পাত্র, গহনা নির্মাণে ব্যবহৃত হত।[৭৫] বাঁকুড়ায় উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা ছিল সোনামুখীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ৫০০ মণ কুঠি প্রক্রিয়াজাত লাক্ষার জন্য কোম্পানির বিনিয়োগ ছিল ১০০০০ টাকা।[৭৬] অবশ্য ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টকে বাদ দিয়ে লাক্ষা বণিক স্টিফেনের সঙ্গে কোম্পানী লাক্ষা সংগ্রহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।[৭৭] চীপের মতে এই সিদ্ধান্ত ছিল বাঁকুড়ার লাক্ষাকেন্দ্রিক অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের পক্ষে বড় আঘাত।[৭৮] তিনি কোম্পানীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন সোনামুখী কুঠির পক্ষে প্রতি মণ ২০ সিক্কা টাকা দরে ৮০০ মণ লাক্ষা সংগ্রহ সম্ভব। অবশ্য বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছিল লাক্ষায় মনোনিবেশ না করে অন্যান্য দ্রব্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। কোম্পানীর এই মনোভাবের ফলে লাক্ষা শিল্পের সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ১৮৯০ খ্রিঃ যেখানে ই. ডব্লু. কলিন তাঁর শিল্প প্রতিবেদনে সোনামুখীর ৭৫টি কারখানায় ৫০০০ শ্রমিক কর্মরত বলেছেন, ও'ম্যালীর হিসাবে ১৯০১ সালে ৩৫টি, ১৯০৫ সালে ২৪টি, ১৯০৬ সালে ২৬টি লাক্ষা কারখানা চালু ছিল যার উৎপাদন ছিল ৪১৬০ মণ। ১৯২১ সালের এক ক্ষুদ্রশিল্প সমীক্ষায় দেখা যায় খাতড়ায় কয়েকটি ও সোনামুখীতে ৮টি কারখানা মাত্র চালু আছে যাতে মাত্র কয়েক ডজন লোক নিয়োজিত আছেন।

ইক্ষুশিল্প

বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে চিনি-গুড় শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রামানুজ কর লিখেছিলেন, 'পূর্বে বাঁকুড়া জেলার প্রতি গ্রামে ইক্ষু চাষ হইত। এ জেলার উৎপন্ন গুড় হইতেই চিনি প্রস্তুত হইত। বাহির হইতে গুড় ও চিনি আমদানী হইত না, কিন্তু এখন গয়া ও ভিজগ পট্টম জেলা হইতে ভেলী ও চাকী গুড় আমদানী হইয়া শহর ও গ্রামে গ্রামে চালান হইতেছে। কলিকাতা হইতে জাভা চিনি আমদানী হয়। বৎসরে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার গুড় ও চিনি আমদানী হয়। এখন এ জেলা হইতে ইক্ষু চাষ উঠিয়া গিয়াছে। জলাভাবই ইহার প্রধান কারণ। চৈত্র মাসে ইক্ষু রোপণ করা হয়। পানীয় জলই পাওয়া যায় না, ইক্ষু চাষ করিবে কোথা হইতে? যদি জেলার জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধার হয় তবে আবার ইক্ষু চাষ হইতে পারে।' অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মধ্য সীমায় ইক্ষুচাষ নানা কারণে হতাশাজনক স্থানে পৌঁছেছিল। ব্রিটিশ বাণিজ্যে যেহেতু তাঁতবস্ত্র ও চিনি মুখ্য অংশ ছিল, বাঁকুড়াতেও চিনি শিল্পে ব্রিটিশ বিনিয়োগ ছিল। ১৭৯২ খ্রিঃ জেলাশাসক কিটিং কোম্পানীকে জানান বীরভূম-বাঁকুড়া (তৎকালীন বিষ্ণুপুর) যুক্ত জেলায় ইতিমধ্যে ১১৪০০ বিঘা জমিতে ইক্ষুচাষ হচ্ছে।[৭৯]

ওই একই পত্রে কিটিং অভিমত প্রকাশ করেন ইক্ষুচাষে সরকারি বলপ্রয়োগ থাকলে কৃষকের মনে সরকারি খবরদারি ও ইক্ষু ব্যবসায় ব্রিটিশ একাধিপত্য কায়েম নিয়ে অবিশ্বাস ও সন্দেহ জন্ম দিতে পারে। যা হবে ইক্ষু চাষের প্রসারের ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর। বাঁকুড়ায় ঘন ঘন খরা ও ইক্ষু চাষের অত্যাধিক খরচ, চাষে অত্যধিক জল ও সারের প্রয়োজনীয়তা (ধানচাষে যেখানে একর প্রতি ৪৫ গো-গাড়ি গোবরসার লাগে, ইক্ষুতে তারা পাঁচগুণ সার লাগে) এই চাষের প্রসারে বাধা দেয়।[৮০] চীপের মতে কৃষকদের সরাসরি দাদন না দিয়ে পাইকার বা চিনি-গুড় ভাঁটিগুলিকে অর্থ দেওয়ার কোম্পানীর নির্দেশ ইক্ষুচাষের প্রসারের পক্ষে প্রতিকূল ভূমিকা নিয়েছিল। গুড়ের ভালো দাম কৃষকদের পক্ষে ছিল স্বস্তিদায়ক। ১৮০২ খ্রিঃ এক সরকারি নথিতে দেখা যায় সরকার চিনি কিনে নেওয়ায় ইক্ষু চাষ যথেষ্ট বেড়েছে এমনকি কিছু ধানচাষী তাঁদের জমিতে আখ চাষ শুরু করেছেন।[৮১] ১৮৩০ খ্রিঃ ইংলন্ডে বিখ্যাত অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এদেশেও চিনিশিল্পে মন্দা দেখা দেয়। বাঁকুড়ায় ১০-২০% জমিতে ইক্ষু চাষ কমে যায়। ১৮৪০ খ্রিঃ থেকে জেলায় 'বিদেশি চিনি'র আমদানি নিষিদ্ধ হলে চিনি শিল্প আবার ধীর গতিতে সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। বিঘাপ্রতি উৎপাদন হার, রাজস্ব-প্রাপ্তি নিম্নে দেওয়া হল (১৭৯২-৯৩ খ্রিঃ)[৮২]

জমির শ্রেণি	বিঘা প্রতি রাজস্ব	বিঘা প্রতি উৎপাদন	বিঘা প্রতি ইক্ষুমূল্য
ভালো জমি	৪ টাকা ৬ আনা ১৪ গণ্ডা ২ কড়ি (সর্বাধিক)	৪ মণ ২৬ সের ১১ ছটাক	৭ টাকা ৮ আনা ১৫ গণ্ডা
মাঝারি মানের জমি		৩ মণ ১০ সের	প্রায় ২ টাকা
খারাপ জমি	১ টাকা ১৪ গণ্ডা ৩ কড়ি (সর্বনিম্ন)	২ মণ ১৩ সের ৫ ছটাক	৩ টাকা ১২ আনা ৯ গণ্ডা

স্পষ্টতই ইক্ষু জমিতে সরকারি রাজস্ব ইক্ষুমূল্যের ২৭-৫৯% ছিল অত্যধিক এবং চাষের বিস্তারের পক্ষে নিরুৎসাহজনক। যদিও পাইকস্ত রায়তদের ক্ষেত্রে ২০-২৫% রাজস্ব ছাড় ১৮৩৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৭৮৫ খ্রিঃ থেকে ইংলন্ডে চিনি অগ্নিমূল্য হয়, কারণ চা-পানের ব্যাপক প্রচলন এবং চিনি উৎপাদক ডোমিনিগোতে নিগ্রো বিদ্রোহ। এই চাহিদা মেটাতে বাংলার চিনি মুখ্য ভূমিকা নেয়। ১৭৯২ খ্রিঃ বীরভূম-বিষ্ণুপুরে চিনি উৎপাদন হয়েছিল ১৮৭৯৮ মণ ১৬ সের। এর মধ্যে ৭৬৯৯ মণ ২৪ সের স্থানীয় ব্যবহারের জন্য রেখে বাকি সবটাই কলকাতার মাধ্যমে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়।[৮৩] জন চীপের সুরুলে ছিল তাঁতবস্ত্রের বৃহৎ কুঠি ও চিনির ছোট কুঠি। চীপ ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করে চিনিশিল্পের আধুনিকীকরণ করেন। চিনিতে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ ছিল সোনামুখী রেসিডেন্সির। এরপরে ছিল দেশীয় ব্যাপারী, পাইকার ও রাধানগর রেসিডেন্সি। চিনিতে সোনামুখীর ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ছিল ১৭৯২ খ্রিঃ ৭৯৫৮৪ টাঃ, ১৮০০ খ্রিঃ ১৫৭৩৪৪ টাঃ (শোধিত চিনি ৮৪০০০ টা, ৭৩৩৪৪ টাকার অশোধিত চিনি), ১৮০৩ খ্রিঃ ১৫০০০৩ টাঃ (২২৫০০ মণ শোধিত চিনি), ১৮০৬ খ্রিঃ ৫৪৫০০ টাকা। চিনির ভাঁটিগুলোতে নিযুক্ত হত এদেশীয়রা। ভাঁটি পিছু মোট কর্মচারি ছিল ১২ (গোমস্তা, রক্ষী, মুখ্য বয়লার-১, সহকারী বয়লার-৪, ওজনদার-১, শ্রমিক-৪)। ১৮০৯ খ্রিঃ সোনামুখী রেসিডেন্সির বিনিয়োগ কমে দাঁড়ায় ৬০০০০ টাকা। ২৩/১১/১৮১০ তারিখে জারি কোম্পানীর নির্দেশে ১৮১১ খ্রিঃ থেকে সোনামুখী রেসিডেন্সিতে সরকারি বিনিয়োগ বন্ধ হলে বাঁকুড়ার চিনি অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে। তবে ১৮১৩ খ্রিঃ চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে বাণিজ্যে কোম্পানী একাধিপত্যের অবসান ঘটলে দেশীয় বিনিয়োগের সাহায্যে চিনি শিল্পে পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। ১৮৩৩ খ্রিঃ ক্রীতদাস প্রথার অবসানে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার চিনি শিল্পের সংকট বাংলার চিনি শিল্পের সুযোগ খুলে দেয়।

তাম্বুল ও তামাক

ভৌমরাজ শাসনের প্রারম্ভে রাজহাটী-বীরসিংহপুর এবং রাজগ্রামের বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে তাম্বুলিদের ভূমিকা ছিল প্রোজ্জ্বল এবং পান-সুপারি ছিল বাণিজ্যের বড় হিস্যা। বাঁকুড়ায় 'পানের বোরজ' ছিল অনেক এবং তা চাষ করত 'বারুই' শ্রেণির কৃষকেরা। পানের ব্যবহারও ছিল ব্যাপক। যেহেতু জেলায় সুপারি চাষের তেমন চল ছিল না, মুর্শিদাবাদ থেকে সুপারি আমদানি ছিল অনধিক ১০০০ মণ এবং জেলায় পানের উৎপাদন ছিল কয়েক কোটি পাতা। জেলায় তামাক চাষ প্রায় হতই না। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম-বিষ্ণুপুর জেলার সমাহর্তা কিটিং এক প্রতিবেদনে বলেন, এই উৎপাদন ছিল, 'very small quantity.....which is expended by the proprietors of the soil.'[৮৪] বাৎসরিক কয়েক টন প্রয়োজনে রংপুর-মুর্শিদাবাদ থেকে আমদানি করা হত কারণ এ জেলার মাটি ছিল তামাক চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত।

আফিম চাষও ছিল যৎসামান্য। ১৮৭৪ খ্রিঃ বিষ্ণুপুরের শ্রীপতিচরণ কর কাশীপুর রাজার পরামর্শে ও উৎসাহে সুগন্ধী তামাকের প্রচলন করেন যা 'অম্বরী তামাক' বলে প্রচলিত। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ও'ম্যালী লিখেছেন, 'there are two tobacco manufactors on the town of Bishnupur from which a scented tobacco is exported to almost every part of Bengal. The process of preparation is kept hidden and the price varies from Rs.5/- to Rs.200/- per manual.' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিড়ি-সিগারেটের চল বাড়লে ১৯৪০ সালের পর অম্বরী তামাকের প্রচলন বিঘ্নিত ও বিনষ্ট হয়। ১৯২১ সালে জেলায় তামাক, গাঁজা, আফিমের ব্যবসায় জড়িত ছিল মাত্র ১৬৯ জন।

লৌহশিল্প

বাঁকুড়া ভূমিতে লোহার ব্যবহার শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৭০০-র পরে (তথ্য-নীহার রঞ্জন রায়)। যেমন কোল অধিবসতিতে লৌহ আকরের প্রাচুর্য ও জনগোষ্ঠীর লোহাগালাই পদ্ধতির জ্ঞান, তেমনি মুণ্ডা উপজাতি ও তাদের জ্ঞাতিত্বে আবদ্ধ 'অসুর' মানুষ লৌহ বিগলন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন। একটি মতানুসারে দামোদর উপত্যকা বরাবর এই জাতির আগমন ও বসতি স্থাপন হয়েছিল শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, ছাতনা, বড়জোড়া প্রভৃতি থানায়। The tribal community in Bihar, Prt III (Anipological Survery of India) প্রতিবেদন অনুসারে, 'The asurs are traditionally been iron smelters....smelting requires charcoal of green sal wood which is a good quality timber.' প্রাচীনকাল থেকেই এই উপজাতিরা, অর্ধ উপজাতিভুক্তেরা খনন করে লৌহ আকর উত্তোলন করে কোটশালে কাঁচা লোহা

নিষ্কাশন করত। সাধারণত লোহার সম্প্রদায় কাঁচা লোহা থেকে ডুকিশাল বা কামারশালে খাঁটি লোহা নিষ্কাশন করত। ১৮৮৫ খ্রিঃ একটি সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় ১২৫-১৩০ মণ আকর থেকে কাঠ কয়লার সাহায্যে ৩-৪ দিন টানা বিগলনে ২৫-৩০ মণ পিগ লোহা (কাঁচা) নিস্কাষিত হত কোটশালে আর কামারশালে ১-২ দিন টানা বিগলনে তা দাঁড়াত ১৯-২০ মণ শুদ্ধ লোহায়। বাঁকুড়ায় লৌহ আকরের অপ্রতুলতার কারণে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি বহুল ব্যবহৃত ছিল। প্রক্রিয়াটিতে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ছিল ২৩০০°সেন্টিগ্রেড। আকর আসত সন্নিহিত জেলা ও ঝাড়খণ্ড থেকে। এই শিল্পে প্রায়োজনীয় বিপুল পরিমাণ শালকাঠ সংগ্রহে নির্বিচার শাল জঙ্গল নিধনের ফলে বাঁকুড়ার শালগাছের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। ১৯০৮ খ্রিঃ ও'ম্যালী জেলা গেজেটিয়ার্সে লিখেছেন, 'all charcoal burners....dig up and burn down the roots and stumps for their charcoal kilns....no restriction placed....upon indiscriminate clearance.' ১৯৩৮ খ্রিঃ গঠিত বেঙ্গল ফরেস্ট কমিটিও বাঁকুড়ার বন ধ্বংসের পেছনে চারকোল বার্নারদের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। বীর হাম্বিরকে দিল্লীর মোঘল বাদশা কামান ও অন্যান্য অস্ত্র তৈরীর অনুমতি দিলে ভৌমশাসনের প্রারম্ভে রাজধানী বিষ্ণুপুরে লোহার সম্প্রদায়ের বসতি বিস্তার ঘটে। বাঁকুড়া জেলা জুড়েই এই সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে ওঠে।

বিষ্ণুপুরে বস্ত্রশিল্প

মল্লরাজধানী হওয়ার সুবাদে লোহা ছাড়া তাঁত, রেশম, তসর, শঙ্খ, পটচিত্র, মৃৎশিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্রশিল্প শহর বিষ্ণুপুরে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (গেজেটিয়ার্স পৃঃ ২৭৩) বিষ্ণুপুরের ধূপছায়া নাম্নী খয়েরী বস্ত্র, পুষ্পশোভিত শাড়ি, নক্‌শি রেশমের সুখ্যাতি উল্লেখ করেছেন। ও'ম্যালী তাঁর গেজেটিয়ার্সে লিখেছেন (১৯০৮ খ্রিঃ), "though the fabrics are not equal to the Berhampore silk in fineness and evenness of texure, they are in considerable demand in the district, and also outside it." যদিও প্রাক স্বাধীনতাকালে বিষ্ণুপুরের রেশম শিল্পের উৎকর্ষতা বহরমপুরকেও ছাড়িয়ে যায়। বাঁকুড়ার ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত সেনসাস হ্যাণ্ডবুকে বলা হল, 'But latterly Vishnupur silk is supposed to have surpassed the woven cloth of Murshidabad." এইভাবেই বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

শঙ্খশিল্প

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জেমস হর্ণেলের প্রতিবেদনে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ায় শঙ্খ শিল্পের ব্যাপক প্রচলন প্রতিফলিত হয়েছে। জেলায় বিভিন্ন নক্‌শি শাঁখ, অলংকার নির্মিত হত।

স্বাধীনোত্তরকালে জেলায় স্বল্পসংখ্যক মানুষ এই শিল্পে জড়িত ছিলেন। এ. বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁসা-তামার বাসনশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, কেঞ্জাকুড়া, অযোধ্যা, লক্ষ্মীসাগর, মদনমোহনপুর, মায়ানগরের উল্লেখ করেছেন। তবে ১৯৪৪ সালে বিষ্ণুপুর ব্রেজিয়ার সমবায় সমিতির আনুকূল্যে এই শিল্পে যে জোয়ার এসেছিল ১৯৬৫ সালের মধ্যেই তা অন্তর্হিত হয়। পরবর্তী চারের দশকের এই অবস্থা সম্পর্কে 'হস্তশিল্প বিপণন প্রতিবেদনে' [৮৫] বলা হয়েছিল, 'It received a loan of Rs.9000/- from the coopereative Bank to finance its (Coopereative Braziers' Society) activities. The annual production of the members is 1100 maunds, valued as Rs.200000 approximately. The society has succeeded in stabilising the earnings of the workers. But though the majority of the metal workers of Vishnupur belong to the society, many of them are forced to borrow from the mahajans during the slack season and the mahajans forced them to leave the society and work for them' এভাবেই বিষ্ণুপুরের ধাতুশিল্পের বিসর্জনের ডাক আসে।

মৃৎশিল্প

আর একটি ঐতিহ্যশালী শিল্প হল মৃৎশিল্প যার উৎসমূল আছে ডিহড় ও পোখন্নাতে, তাম্রাশ্মীয় যুগে। বিপুল সংখ্যক মানুষের রোজগারের উৎস ছিল এই মৃৎশিল্প। তবে স্বাধীনোত্তরকালের এক সমীক্ষায় সদর মহকুমায় এমন মৃৎশিল্পকেন্দ্রের সংখ্যা নির্ণীত হয়েছিল ২১১টি।[৮৬] এই শিল্পের মূল কাঁচামাল 'মাটি' সংগৃহীত হত প্রায় নিখরচায়। দেখা গেছে ৯৪.০৫ শতাংশ মাটি সংগৃহীত হয় বিনামূল্যে, ১.০৩ শতাংশ ভাড়া জমি থেকে, ৪.৯২ শতাংশ অন্যান্য উৎস থেকে। কারিগররা প্রয়োজনীয় বালি সংগ্রহ করত নিখরচায়। ভিন্ন মৃৎপাত্র, অলংকার, খেলনা, শৌখিন জিনিস তৈরী হত। তালডাংরার পাঁচমুড়া, সোনামুখী-বিষ্ণুপুরে মাটির হাতি, ঘোড়া, বাস প্রভৃতি দ্রব্যের খ্যাতি দেশজুড়ে। এখনও অনেক শিল্পীর জীবিকা এই মৃৎশিল্প। এছাড়া সমগ্র মল্লরাজত্বব্যাপী মন্দির স্থাপত্যে বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের ভূমিকা, উৎকর্ষতা মন্দির নির্মাণকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিল। সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও এই ক্ষেত্রে বিপুল রাজ বিনিয়োগ এক শ্রেণির শিল্পী ও শ্রমিকদের জীবিকার পক্ষে নিশ্চিত সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল।

বাণিজ্য ও সমবায় সমিতি মাড়োয়ারি সম্প্রদায় :

রাজবৃত্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প বাণিজ্যের বাইরে দেশীয় ব্যাপারী ও বণিকদের দ্বারা বাণিজ্যের একটি বলিষ্ঠ অংশ পরিচালিত হত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঁকুড়ার শিল্প কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর

প্রথমভাগে দেশীয় শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হল,[৮৭] 'ধান্যই এ জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। মহুয়া ও হরিতকী সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়। পূর্বে এ জেলায় যথেষ্ট কার্পাস চাষ হইত; পল্লীর ঘরে ঘরে চরকা দৃষ্ট হইত; এখন আর উহার চাষ হয় না। চাল, ধান, হরিতকী, মহুয়া, পিতল-কাঁসার বাসন, চামড়া ও জুতা, তাঁতের পাট তসর ও সুতার কাপড় রপ্তানী হয়।.....এ জেলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে চাষ হয়। শতকরা ৮৩ ভাগ জমিতে হৈমন্তিক ধান্য এবং ১৭ ভাগ জমিতে আশু ধান্য জন্মে। সদর মহকুমার পশ্চিমাংশে এবং বিষ্ণুপুর মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ জঙ্গল ও কঙ্করময়। এ জেলায় অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৪ জন কৃষিজীবী, ৫ জন শহরবাসী। অধিবাসীদের শতকরা দশ জন মজুরির জন্য বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, হাওড়া ও ২৪ পরগণা যায়। ১৯১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দে জেলা হইতে ৭০১ জন মজুর আসামের চা বাগানে গিয়াছে। প্রতি বৎসর এই পরিমাণ মজুর আসামের চা বাগানে গিয়াছে।' উল্লেখ্য অনেক শ্রমিক বর্ধমানের লৌহ ও খনি শিল্পে বাঁকুড়া থেকে অভিবাসী হত। এসময়কার আমদানি রপ্তানীর আরো চিত্র ধরা পড়ে। রামানুজ করের বিবরণে,[৮৮] 'চাল, ধান, হরিতকী, মহুয়া, পিতল, কাঁসার বাসন, চামড়া ও জুতা, তাঁতের পাট তসর ও সুতার কাপড় রপ্তানী হয়। আম, বেগুন, কুল, পটল, পান, কাপড়, সুতা, তামাক, গুড়, ঘি, তৈল, গুঁজা, সরিষা, পেয়ালা, পোস্ত, খৈল, মুট, বিরি, অড়হর, মুসুরি, লঙ্কা, লবণ, পেঁয়াজ, গম,যব ময়দা, লোহা, রাং, তামা, পিতল, দস্তা, সীসা, কাগজ, গাঁজা, আফিম, মদ, সিদ্ধি, চরস, ঔষধ, চা, মনোহরী ও স্টেশনারী দ্রব্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য আমদানি হয়। এ জেলায় এত কাঁচের চুড়ি বিক্রি হয় যে একটি কাঁচের কারখানা বেশ চলে। মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর, পাঁচরোল, বাস্কী হইতে প্রতিবর্ষে লক্ষ টাকার পান আসে। বাঁকুড়া জেলার লোকের পান খাইবার সাধ খুব বেশী হইলেও ইহার কোন উপকরণই এ জেলায় জন্মে না। পূর্বে সোনামুখী, চন্দ্রকোণা, বহড়ামুড়ি প্রভৃতি স্থানে বরোজ ছিল, এখনও কয়েকটি বরোজ আছে। যখন রেল হয় নাই তখন এ জেলায় উৎপন্ন পানেই সঙ্কুলান হইত। এ জেলায় পানের বরোজ খুলিলে লোকসানের কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্বে এ জেলায় তামাকের চাষ হইত, এখন পূর্ণিয়া হইতে আমদানি হয়। বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাক ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, বাঁকুড়াবাসীর ধূমপানের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে। পূর্ণিয়া হইতে তামাক, বালিয়া হইতে গুড়, রাণীগঞ্জ, ঝান্দো, চক্রধরপুর, নাগপুর, গণ্ডিয়া হইতে হাজার হাজার টাকার বিড়ি বাঁকুড়া জেলায় আসিতেছে। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীরা এ জেলারা বাহিরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া যত টাকা পায় তাহার প্রায় চারিগুণ টাকা দিয়া বাহির হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনে। এ জেলাবাসীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। এ জন্যই এ জেলায়

দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হইয়াছে। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যদি এ জেলায় জন্মাইতে পারা যায় তবে আবার সুদিন আসিবে। অন্য স্থান হইতে প্রতি বর্ষে প্রায় ২০ হাজার টাকার আম, ১০০০০ টাকার পটল এবং প্রায় ৩০০০০ টাকার অন্যান্য শাকসব্জী আমদানি হয় এবং চেষ্টা করিলে বাঁকুড়া জেলায় এই সকল দ্রব্য জন্মাইতে পারা যায়। আমাদের রোগীর পথ্য আদাও পাটনা হইতে আসে, পূর্বে প্রত্যেক গৃহস্থের উঠানে আদা জন্মিত। এ জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তরকারি উৎপন্ন হইলে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে বিক্রয় করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা ঝরিয়া ও আসানসোলে বিক্রী হইবে।' উল্লেখ্য কোম্পানী পোষিত বাণিজ্যধারায় বাইরে উৎপাদন ও বিপণনে বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের। ১৮৮০ খ্রিঃ নাগাদ বাঁকুড়া শহরে মাড়োয়ারিদের আগমন ঘটে। রাজস্থানের বিকানীর থেকে প্রথম আসেন মহেশ্বরী সম্প্রদায়ের অনন্তরাম ও শুকদেব রাঠী। ১৮৯০ খ্রিঃ আসে আগরওয়াল ও বাজোরিয়া পরিবার। বাজোরিয়ারা ছিল বার্মা শেল কোম্পানীর একমাত্র ডিলার এবং পেট্রোলিয়ামের লাইসেন্সধারী। মোহনলাল গোয়েঙ্কা প্রথম বাঁকুড়ায় সুতাকল ও গেঞ্জিকল স্থাপন করেন। নরমল ও সুরেখ বাজোরিয়া ছিলেন কেরোসিনের খুচরা বিক্রেতা (হকার)। স্পষ্টতই মাড়োয়ারিদের হাত ধরেই সমর শহর বাঁকুড়ার বাণিজ্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প বাণিজ্যে অর্থের যোগান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৭৫৫ খ্রিঃ থেকে কোম্পানী সোনামুখী কুঠির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ শুরু করেছিল। ১৮৮০ খ্রিঃ মাড়োয়ারি আগমন ঘটলে ব্যক্তি বিনিয়োগের যুগ শুরু হয় বাঁকুড়ায়। এর আগে ভৌমরাজত্বে মঙ্গলবাক্যের বিবরণে দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য অভিযানের কথা বিবৃত আছে। তবে দেশের লোকের সমবেত উদ্যোগে সমবায় গড়ে তোলার ঘটনা জানা যায়। ১৯০৭ সালের সংশোধিত সমবায় আইন (১৯০৪ খ্রিঃ প্রথম সমবায় আইন হয়) পাশ হবার পর বাঁকুড়ায় প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণদানের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৩০টি এ ধরনের সমিতি গড়ে ওঠে। যেমন—(১) লোহারডিহি তন্তুবায় সমিতি (১৯১৭) (২) গয়রা অর্জুনপুর তন্তুবায় সমবায় সমিতি (১৯১৮) (৩) গঙ্গাজলঘাটি কন্যামারী তন্তুবায় সমবায় সমিতি (৪) ভূতশহর তন্তুবায় সমিতি (১৯১৯) (৫) বাগনেজ তন্তুবায় সমিতি (১৯১৮) (৬) ফুলবেড়িয়া তন্তুবায় সমিতি (১৯১৮) (৭) সাহাপুর তন্তুবায় সমিতি (১৯১৮) (৮) কুমারডাঙ্গা তন্তুবায় সমিতি (১৯১৮) (৯) বনশোল তন্তুবায় সমিতি (১৯১৮) (১০) পাঁইসাবাদ তন্তুবায় সমিতি (১৯১৯) (১১) ছাতনা তন্তুবায় সমিতি (১৯১৯) (১২) শুশুনিয়া তন্তুবায় সমিতি (১৯২৩)। ১৯৪৪ সালে গঠিত হয়েছিল কেঞ্জাকুড়া কো-অপারেটিভ উইভার্স সোসাইটি ও রাজগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটি। রামানুজ

করের হিসাবে ১৯১৭-১৮ সালে তিনটি, ১৯১৮-১৯ সালে ১৭টি, ১৯১৯-২০ সালে ৫৮টি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল। ১৯১৮ সালে বাঁকুড়া জেলা শিল্প-সমবায় সমিতি গঠিত হয় কালেকটর ভাস সাহেবের উদ্যোগে। ১৯২২ সালে কালেক্টর গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে জল সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এমন ৬৬টি সমিতির মধ্যে বাঁকুড়ায় ছিল ৪৮টি, বিষ্ণুপুরে ১৮টি। রামানুজ কর ২টি চর্মকার সমবায় সমিতি, ১টি শঙ্খবণিক সমবায় সমিতির কথা বলেছিলেন। ১৯১৯ সালে বিবড়দায় একটি যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। দ্বিতীয়টি ১৯২১-এ স্থাপিত হয় কামার পুষ্করিণীতে। বাঁকুড়ায় ও বিষ্ণুপুরে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ১৯২২ সালে। সমবায়গুলি মহাজনী ব্যক্তিঋণের (অনেক সময় শোষণ) স্থলে প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন যোগানে অনেকটাই সফল হয়।

বাঁকুড়ায় ওড়িয়া ও মারাঠা আধিপত্য ও বাণিজ চিত্র

বাঁকুড়ার আর্যায়ণের ধারা পুষ্ট হয়েছিল মূলত জৈন ধর্মের হাত ধরে। মৌর্যযুগ থেকেই মহাবীর সহ জৈন তীর্থঙ্করদের রাঢ় ভ্রমণে এই প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে। জোসেফ ডেভিড বেগলারের প্রতিবেদনে দেখা যায় খ্রিষ্ঠপূর্ব দুই-তিন শতক থেকেই বাঁকুড়ায় জৈন বসতির বিকাশ ঘটেছিল। এর পরবর্তী সময়ে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সাত-আটশো বছর জৈন বণিক ও মহাজন শ্রেষ্ঠীরা বাঁকুড়ায় জৈন ভাবধারা, বসতি ও বাণিজ্যের প্রসারে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সমকালীন স্থলবাণিজ্যের তুলনায় নদী বাণিজ্যের বাধ্যবাধকতা বাঁকুড়ার নদীতীর বরাবর জৈন মন্দিরগুলি গড়ে ওঠার পেছনে বড় কারণ। এই বণিকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও বাঁকুড়ার রাজনৈতিক-সামাজিক আনুকূল্যে আর্থিক বিনিয়োগের ফলেই এই মন্দিরগুলি গড়ে ওঠে। ১১২৫ খ্রিস্টাব্দে পালবংশীয় কুমার পালকে পরাজিত করে জৈনধর্মাবলম্বী অনন্ত বর্মণ চোড়গঙ্গ দক্ষিণ বাঁকুড়ার রানিবাঁধ-খাতড়া অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর প্রভাব প্রসারিত করলে জৈনায়ন ও বাঁকুড়ায় ওড়িয়া বসতি স্থাপনের ধারা পুষ্ট হয়। ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে নকুড়তুঙ্গ—শ্রীপতি মহাপাত্র তুঙ্গভূমে (রাইপুর-সিমলাপাল) আধিপত্য কায়েম করলে বাঁকুড়ায় উৎকল ব্রাহ্মণদের ব্যাপক আগমন ঘটে। ওড়িয়াদের আগমন বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক চালচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কৃষিক্ষেত্রে উপজাতীয় খুপরি বা ঝুমজাতীয় চাষের পরিবর্তে ওড়িয়া প্রভাবে শুরু হয় জলাভূমি আবাদ চাষ।[৮৯] উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও সঞ্চয়ের ধারণা বেশি করে চালু হয়। একপ্রকার কৃষিতে পুঁজির প্রবেশ ঘটে ও মহাজনী ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। কর্মবিভাজন ভিত্তিক সামাজিক স্তরীকরণ প্রকটিত হয়। কৌম সর্দারতন্ত্রের ক্ষত্রীয়করণ ঘটে ও ওড়িশাগত বর্ণ শ্রেণির সামাজিক উত্তরণও লক্ষিত হয়। দক্ষিণ বাঁকুড়ার বেশ কিছু স্থানে, বিশেষত মন্দির বা মন্দির সন্নিহিত এলাকায়, একত্রিত পুরী-কুষাণ মুদ্রা

পাওয়া গেছে। কুষাণোত্তর সময়ে ওড়িশায় কুষাণ প্রভাবিত অঞ্চলে এই মুদ্রা অনুসৃত হত। বাঁকুড়ায় এদের আগমনের সাথে মুদ্রাও আসে যা একপ্রকার পুঁজির আগমন হিসাবে গণ্য হতে পারে। নিরাপদে গচ্ছিত রাখার জন্যই মন্দির বা সংলগ্ন স্থানে এগুলি রাখা হতে পারে। কারো কারো মতে এগুলি মন্দির নির্ভর মানুষজনের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এদের সঙ্গে যোগ হয়েছিল বাঙালি মহাজনরা। যারা উপজাতীয়দের কাছে 'দিকু' বলে পরিচিত হয়েছিল। বাৎসরিক সুদের হার ছিল ২৫শতাংশ থেকে শতাধিক পর্যন্ত। ৫-৬ মাসেই পরিশোধের চরম সীমা থাকত নতুবা সুদ আসলের সাথে যুক্ত হয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হত। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নিরক্ষর সরল আদিবাসীদের প্রতি প্রতারণা। ম্যাকালপিনের প্রতিবেদনে (১৯০৭) সাঁওতালদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা ও জমি হারানোর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে, যার কারণ ছিল এই মহাজনী শোষণ। যাই হোক বাঁকুড়ায় কৃষি-বাণিজ্যের আধুনিকীকরণ ও পুঁজির সাহায্যে নয়া সামন্তবাদের সূচনা করে জেলার আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে নতুন ধারা আনয়ন করেছিল এই নবাগতরা।

বর্গী হাঙ্গামা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়

ওড়িশা আগত মানুষেরা যেমন বাঁকুড়া ভূমির পুনর্গঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল, তেমন বিপরীতে মহারাষ্ট্র থেকে অষ্টাদশ শতকের চার ও পাঁচের দশকে ক্রমাগত সামরিক অভিযান বাঁকুড়া তথা রাঢ় বাংলাকে আর্থ-সামাজিক ভাবে হীনবীর্য করে তোলে। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বীরভূম-বাঁকুড়ায় বর্গী হাঙ্গামা ব্যবসা বাণিজ্যে দুরপনেয় ক্ষত সৃষ্টি করে এবং তাঁতিরা দেশত্যাগী হয়। একটি ইংরেজ-কারখানা নথিতে বলা হয়েছিল বর্গী আক্রমণ 'has put a stop to all business, the merchants and weavers flying wherever they can' বর্গীরা সোনা রূপার মতো মহার্ঘ সামগ্রীর সন্ধানে গ্রামে গ্রামে হানা দেয়। মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং পুরুষদের আহত ও নিহত করে গ্রাম-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। যদুনাথ সরকার (বাঙ্গালার ইতিহাস) গঙ্গারামকে উদ্ধৃত করে বর্গী হিংস্রতার বিবরণে লিখেছেন,[৯০] 'When suddenly the bargis came up and encircled them in the plain......snached away gold and silver of some people they cut off hand, of some the nose, some they killed.... outright.....the bargis after thus committing all sinful acts set the women free..... bargis entered the villages. They set fire to the houses, large and small, temples and dwelling places. After burning the villages they roamed about on all sides plundering'নবাব দরবারের হিসাবে (১৭৪৬ খ্রিঃ ডিসেম্বরের হিসাব) সাড়ে চার বছরে প্রদেশের দেয় চৌথের দশগুণ ক্ষতিসাধন করেছিল এই হাঙ্গামা। ভাস্কর

পণ্ডিত সোনামুখীতে কালীপূজা করার জন্য অবস্থান করেছিলেন এবং এসময় অবশ্যই সোনামুখী ও সন্নিহিত অঞ্চলের তাঁত শিল্পের ক্ষতিসাধিত হয়েছিল তাঁর বর্গীদল দ্বারা। এদের ঝটিতি আক্রমণের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল তাদের বাহন ঘোড়াগুলি যা রাঢ় অঞ্চলের শুষ্ক ভূমির উপর ও ছোট জোড় পেরিয়ে অনায়াসে চলতে পারত। এর মূল অভিযান সড়কের দুই পার্শ্বস্থ ১০-২০ মাইলের অন্তর্গত বসতিতে সহজেই পৌঁছে যেত। এদের একদিনে একশো যোজন অতিক্রমের ক্ষমতা ছিল। এদের অত্যাচারে কোনো কোনো গ্রামে ৩০-৫০ মানুষও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। যদুনাথ সরকার ১৭৪৪ খ্রিঃ নভেম্বরের বর্গী অবস্থান বর্ণনায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে উদ্ধৃত করে বলেছেন,[৯১] 'expert in robbing the property of everyone and in committing every sinful act....caused the extirpation of the people of the Bengal villages like an ominous comet'এরা তাঁতিগৃহ, কুঠি ধ্বংস ছাড়াও মালবেরী ক্ষেতগুলি ঘোড়ার খাদ্যে পরিণত করে ধ্বংস করতে থাকে। এ সম্পর্কে জে. জেড. হলওয়েল লিখেছেন, [৯২] "They committed the most horrid devastation and cruelties, fed their horses ad cattle with Mulberry Plantations and thereby irreparably injured the silk manufacturers. A general face of ruin succeeded. Many of the inhabitants, weavers and husbandmen fled. The aranges were in a great degree deserted....The manufactures of the arangs received so injurious a blow at this period, that they have ever since lost their original purity and estimation.... and probably will never recover them again."হলওয়েলের আরো অভিযোগ ছিল বিষ্ণুপুর ও বীরভূমরাজ সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে না তোলাতেই উৎসাহিত বর্গীরা দেশের এত ক্ষতিসাধন করতে পেরেছিল। দ্রুতগামী ঘোড়ায় ঝটিতি নৃশংস লুঠতরাজের ভয়ে শিখরভূম, বীরভূম, রামগড়, তুঙ্গভূম, বরাভূমের নৃপতিরা আত্মগোপন করেন। বিষ্ণুপুরের ধরাপাট, রামসাগর, পাইকপাড়া, যাদবনগর প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদ লুণ্ঠিত হয়।[৯৩] নগর বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে মারাঠা শিবিরকে ছত্রভঙ্গ করতে প্রভাতে শুভঙ্করের নেতৃত্বে সংকীর্তনের জমায়েত থেকে কামান সহযোগে অভিযান চালানো হয় বলে কথিত। এই আঘাতে মারঠারা তখনকার মতো মল্লভূম ত্যাগ করলেও ১৭৬০ খ্রিঃ মার্চ মাসে শিউভট্টের নেতৃত্বে আবার হাজির হয়। চৈতন্য সিংহের সময়কালে কোম্পনী ও নবাবী সেনা মারাঠাদের আবার মল্লভূম ছাড়া করে। কিন্তু মল্লভূম তথা বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে এই অভিযান ছিল বড় আঘাত। যদিও কোম্পানী চিন থেকে রেশমকীট ও ইটালিয়ান রেশমশিল্প প্রণালী চালু করে এর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করে, ১৭৭০ খ্রিঃ প্রশাসক হিগিনসের সময় ভয়ঙ্করতম মন্বন্তরে এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু তাঁতশিল্পের পক্ষে ছিল বড় আঘাত।

পাহাড়ী উপদ্রব ও সন্ন্যাসী প্রভাব

মন্বন্তর উত্তর অখণ্ড শান্তি ও উদ্যোগ যেখানে বাঁকুড়ার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পূর্বশর্ত, মাত্র দুই দশকের মধ্যে নতুন এক হাঙ্গামা যা 'পাহাড়ীয়াদের উপদ্রব' হিসাবে চিহ্নিত, বাঁকুড়ার আর্থিক বিকাশকে আরেকবার বিঘ্নিত করে। ১৮৮৯ খ্রিঃ জুনে বীরভূমের পশ্চিমের পার্বত্য এলাকা থেকে আগত পাহাড়ীয়ারা শিল্পশহর ইলামবাজার, সাকারোকোড়া, রাজনগর লুণ্ঠন করে ও ১৭৯০ খ্রিঃ প্রথমভাগে বিষ্ণুপুর দখল করে। বর্ষার পর পাহাড়ী উপদ্রবে অতিষ্ঠ জনতা গণপ্রতিরোধের মাধ্যমে পাহাড়ীয়াদের বিনাশ করে। যদিও তার আগেই যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। মন্বন্তরের অব্যবহিত পরেই ১৭৭৩ খ্রিঃ মার্চে ৩০০০ জনের সন্ন্যাসী দল (যারা মূলত জীবিকা উচ্ছিন্ন বণিক) বিষ্ণুপুর আক্রমণ করলে কোম্পানী তাদের রায়পুর ফুলকুসমা-শিলদা-আলমপুর-গোপীবল্লভপুর পথে বিতাড়িত করে। উভয়ক্ষেত্রেই এদের স্বাগত জানিয়েছিল কোম্পানীর ভূমিনীতির ফলে উচ্ছিন্ন সেবা-জোতমালিক (Service Tenure Holder)-রা যারা স্বচ্ছল ধনী জোতদারদের সম্পদ লুণ্ঠনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। পাহাড়ী দস্যুদের দ্বারা যুক্ত জেলার ২ মাসে রাজস্ব ও সম্পদের ক্ষতি দাঁড়িয়েছিল ৬৬৬৬৬ : ১০ : ১০ : সিক্কা টাকা (৭০০০০)। এর থেকে দুই বছরকালের পাহাড়ী উপদ্রবের ক্ষতির হিসাব অনুমান করা যায়।

ব্যক্তি উদ্যোগে বাঁকুড়ার বাণিজ্য :

ভৌমরাজ্যে বণিক ও বাণিজ্য

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বাণিজ্য বিকাশের যে ধারা ইতিমধ্যে উল্লেখিত হল তার বাইরে ব্যক্তি উদ্যোগের ক্যানভাস ছিল বিস্তৃততর ও ব্যাপক। মৌর্য-গুপ্ত সময়ে পোখন্না-ডিহরের বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে বণিকসভা বা গিল্ডের ভূমিকা ছিল মুখ্য। দশম শতাব্দীর আগে ও পরে বাঁকুড়ার বাণিজ্য ছিল মুখ্যত জৈন সরাক বা শ্রাবকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদের কর্মকাণ্ড ছিল অনেকটাই রাজবৃত্তের বাইরে। উত্তর বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে কিছু সংক্ষিপ্ত সরাক বসতি সেই অতীত গরিমার ভগ্নাবশেষ। ভৌম রাজশাসনে বাঁকুড়ায় বাণিজ্য উদ্যোগের সমাচার মেলে এ যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির বণিক চরিত্রগুলিতে। অনেক ক্ষেত্রে এরাই ছিল কেন্দ্রীয় চরিত্র, যা সমকালীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বাণিজ্য তৎপরতাকেই প্রতিফলিত করেছিল। জনশ্রুতি মতে পাত্রসায়ের থানার বেলুট-চন্দ্রদ্বীপ মনসামঙ্গল কাব্যের মুখ্য চরিত্র চাঁদ সদাগরের স্মৃতি বিজড়িত। মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের অধিষ্ঠান ছিল বাঁকুড়া ভূমিতে। ফকিররামের সত্যপীরের পাঁচালির লক্ষপতি শঙ্খপতি বণিকের সিংহল দেশ যাত্রাও ছিল খুব সম্ভব বাঁকুড়ার

নদীপথ ভেঙে।[৯৪] বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবন্ত খাঁ, রাঢ় গন্ধবণিক চন্দ্রকান্ত রায়, লাউগ্রামের (কোতুলপুর) রামদত্ত ছিলেন মল্ল সমকালীন বণিক।[৯৫] ২০০৪-২০০৫ অর্থবর্ষে ইন্দাসের শাসপুর-খোসবাগ অঞ্চলে দামোদর সংযোগী খাল পুনঃ খননকালে শিকল সহ একটি নৌ মাস্তুল প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায় যা মল্ল সমকালীন বলে অনুমিত এবং এ সমস্তই সোনামুখী-পাত্রসায়ের-ইন্দাস অঞ্চলে তৎকালীন নৌ-বাণিজ্য সমৃদ্ধির প্রমাণ।[৯৬]

ছাতনায় শঙ্খ রায় ও মল্লভূমের হাম্বিরের রাজত্বকালে সড়কপথে বণিকদের যাত্রা ও স্থিতি, বীরসিংহপুর রাজহাটী, রাজগ্রামের মতো বাণিজ্যকেন্দ্রের বিকাশ রাঢ়ে ব্যক্তি বাণিজ্য উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই দুই কেন্দ্রে দত্ত ও কুণ্ডু পদাধিকারী তন্তুবায় ও তাম্বলি বণিক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যেই আলোচিত। এমনকি দক্ষিণ বাঁকুড়ার ধবলভূমে (অম্বিকানগর) ধবলরাজ চিন্তামনি কৃষি-বাণিজ্যের উৎসাহদানে 'পাই' পরিমাপ এককের প্রচলন করেন যা 'চিন্তামনি পাই' নামে খ্যাত। একইভাবে মল্লরাজ বীরসিংহ প্রতিষ্ঠিত বীরসিংহপুর রাজহাটীতে "রাজহাটী পাই" প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়েছিল। (৪ ছটাকে ১ পোয়া, ৪ পোয়ায় ১ সের, ৪০ সেরে ১ মণ। পোয়া পরিমাপক ধাতব বা কাষ্ঠ পাত্র হল পাই।) মল্লরাজত্বে রাজস্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বাণিজ্যে শুল্ক। শুল্ক ছিল পণ্যবাহী গোশকটের বলদ সংখ্যা পিছু। সর্বোচ্চ কর ছিল ছ কাহন কড়ি বা দেড় কোম্পানী টাকা। রাষ্ট্রের বনজ সম্পদ (যেমন মধু, মোম, লাক্ষা, ধুনা, কাঠকয়লা, ইক্ষু, বনৌষধি ইত্যাদি) আহরণের দায়িত্বও ছিল নিলাম ডাকের সর্বোচ্চ দরদাতার। মল্লরাজদের বণিক বান্ধব নীতিতে (সড়ক নিরাপত্তা, প্রারম্ভিক তিনদিবস নিখরচায় রাষ্ট্রীয় আতিথ্য, নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যশুল্ক, বাণিজ্যকেন্দ্র গঠন) আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই মল্লভূমে এসে স্থায়ী বাণিজ্যে অংশ নেয়। এমন দুই বণিক হলেন হাম্বিরের সময়ে বর্ধমান আগত কোতলপুরের তুলা-তেল-লবণ বণিক সদারাম ভদ্র এবং গোপাল সিংহের সময়ে আসনচুয়া- বিহারমুড়িয়া গ্রামে শস্য ব্যবসায়ী নারায়ণ রায়। উল্লেখ্য, গোপাল সিংহের সময়ে কোতলপুর (জগমোহনের বর্ণনায় 'কুতুহল নামক পুরী') একটি সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত। এ সময়ের আরো কয়েকটি ব্যবসা-বণিক আলোড়িত জনপদ হল কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, রাজগ্রাম, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়ের। শ্রীচৈতন্যদেবে প্রশিষ্য মনোহর দাস মল্ল সময়ের প্রারম্ভে সোনামুখীর তন্তুবায়দের মধ্যে সংহতি ও কর্মচাঞ্চল্য সঞ্চারিত করেছিলেন। শুভঙ্করীআর্যার মাধ্যমে গোপাল সিংহের সমকালীন (১৭১১-১৭৫৭ খ্রিঃ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আভাস মেলে। স্থানীয়ভাবে চাল-ডাল-আটা-সরিষা-কলাই-তেল-গুড়-মুগ-মটর-মুসুর-বিরি-খেসারি-ছোলা ডাল-সরিষা, তিল, তিসি তেল-আখ ও আখজাত দ্রব্য-পান-তুলা-কাপড়ের উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ের পরিচয় মেলে। গোপালন ও গোদুগ্ধজাত ঘি, দই-এর উৎপাদন ও কেনাবেচা হত। বড় বড় পুকুরে মাছ

উৎপাদনের কথা আছে আর্যায়। বিষ্ণুপুরের সান্তড়ী তরফের গৌরমোহনপুরের বিষ্ণুরাম কুণ্ডুর বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল এমন একটি জলাশয়। এক টাকায় তিনটি মাছ পাওয়া যেত (ওজনে নয়)। পশুপাখির ক্রয়বিক্রয় ছিল যথেষ্ট। সারসের দাম ছিল ২ টাকা। তাছাড়া শুয়াপাখি আট আনা, পায়রা চার আনা, ময়না বারো আনা। সারি ছিল মূল্যবান পাখি। সারির দামের সিকিভাগে বিক্রয় হত শুক, শুকের সিকি দামে ময়না, ময়না'র সিকি দামে হাঁস। অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য পাখি ছিল ময়ূর, পায়রা, তিতির, বক। পশুদের মধ্যে বাঘের দাম ছিল সাত টাকা, তিনটি হরিণ পাঁচ টাকা, চোদ্দটি ছাগল দশ টাকা। হাতি, ঘোড়াও ছিল বিক্রয়যোগ্য পণ্য। পাটনা থেকে আসত ঘোড়া। কুটির শিল্পজাত তিনখানি থান কাপড়ের মূল্য ছিল এক টাকা। মহাজনকে সুদ বাবদ (দাদনের জন্য) দিতে হত টাকা প্রতি 'পাই-পাই' অর্থাৎ কাপড়েরা বিক্রয়মূল্য দাঁড়াত দু খানার পনেরো আনা। ধাতব শিল্পের মধ্যে ছিল কাঞ্চন, মোহর, সোনা, রূপা, তামার ব্যবহার এবং অলঙ্কার। পিতল-কাঁসার থালা, ঘটি, গাড়ুর নির্মাণের কথা আছে। ব্যক্তি উদ্যোগে 'অর্জুনের হাট' প্রতিষ্ঠার সমাচার মেলে। এই হাটে এক কড়ায় পাঁচ সের চাল, তিন কড়ায় এক সের আটা, পাঁচ কড়ায় এক সের ঘি পাওয়া যেত। মল্লরাজের বাণিজ্য চিত্রে পাঠান সহ ভিনদেশি মুসলমান সওদাগরদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘাগরা, সরা, সানকির ব্যবহার ও কেনাবেচা ছিল। ঘাগরার দাম এক আনা, সরার দাম এক কড়া, সানকির দাম পাঁচ গণ্ডা। এক টাকায় একত্রে সাতটি ঘাগরা, যাটটি সরা, তেত্রিশটি সানকি পাওয়া যেত।

মঙ্গলকাব্যের বণিক

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে সন্ন্যাসী উপস্থিতি ও সাতের দশকে কোম্পানীর সামরিক অভিযানে বাঁকুড়া থেকে এদের বিতাড়নের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক তাৎপর্য ছিল। পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত সন্ন্যাসী উপস্থিতি, মঠকেন্দ্রিক বাণিজ্য, অন্তর্দেশীয় ও নেপাল-ভূটান-তিব্বতের মতো দেশে সোনা-রূপা-মশলা-বস্ত্র-কস্তুরী ও সুগন্ধী দ্রব্যাদির আদান-প্রদান, তীর্থপথ বরাবর বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ব্যাপ্তি তৎকালীন বিভিন্ন কোম্পানীর নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। এই অনুৎপাদক শ্রেণির ধনের উৎস ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গের আনুকূল্য-অনুদান, তীর্থপথে আমজনতার থেকে আদায় (কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোর-আদায়) ও তেজারতি ব্যবসা। বাঁকুড়ার উপর দিয়ে এদের সাগর ও পুরীগামী তীর্থযাত্রা সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছিলেন, '....various sects of them travel at fixed periods on religious Pilgrimages to...Gangasagar, besides those who in all dry months of year pass through provinces on to Jaggernauth'।[৯৬ক] ময়মনসিং-মালদা-মুর্শিদাবাদ-বেনারস-মির্জাপুর-নাগপুর

বাণিজ্য প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ শরিক ছিলেন বেনীগিরির মতো সন্ন্যাসীরা।[৯৬খ] বীরভূম-বাঁকুড়ার বস্ত্রশিল্পেও এদের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ছিল। সুদের হার ছিল ৩.২ থেকে ৬.৪ শতাংশ। তবে কোম্পানী আরোপিত ১-৩.২ শতাংশ সুদের রেগুলেশন, জমিদার ও জনগণের উপর কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান আধিপত্য, সন্ন্যাসী নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য উদ্যোগের প্রতি কোম্পানীর বিরূপতার কারণে সত্তরের দশকেই বাঁকুড়ার বাণিজ্য মানচিত্রে সন্ন্যাস-প্রভাব অস্তমিত হয়।[৯৬গ]

মল্লবাণিজ্য ও আর্যা (গাণিতিক পাঠ)

আর্যাগুলিতে তৎকালীন বিপণন ও বাণিজ্যের একটি ধারণা মেলে। 'মুদি' 'বেনে', 'সাধু বা মহাজন', 'কারবারি', 'সদাগর' এই পাঁচ শ্রেণির ব্যাপারীর সন্ধান মেলে। মুদি, বেনেরা (গন্ধবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত গোলদারি দোকানদার) ছিলেন স্থানীয় স্তরের ব্যবসায়ী। অন্যদিকে সাধু (মহাজন), কারবারি ও সওদাগরেরা ছিলেন বৃহত্তর অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যে যুক্ত। কারবারি বা 'কাবাডি'রা ছিলেন মূলত বিপণন ব্যবস্থার মধ্যস্বত্বভোগী। এরা উৎপাদক ও কৃষকদের কাছ থেকে কম মূল্যে সামগ্রী কিনে (পাইকার দরে) গুদামজাত করতেন ও স্থানীয় দোকানগুলিও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বেশিমূল্যে বিক্রয় করতেন (খুচরা দরে)। এই ধারা এখনও অব্যাহত। ক্রয়বিক্রয়ে বাটা ছাড় ছিল। অন্তঃ জেলা, আন্তঃজেলা এমনকি আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে জেলার বণিকরা বলদের পিঠে (বা সগড়াট গোশকটে) ছালা ভর্তি চাল, গম, পান, কলাই, সরিষা, হরিতকী, পিতল-কাঁসার বাসনপত্র বাইরে চালান করত। জেলায় আসত সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা, লবণ (মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে), কাগজ, ঘোড়া।[৯৭] কৃষি-শিল্প, বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে মল্লভূমে বৃত্তিনির্ভর সামাজিক গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেছিল। যেমন ব্রাহ্মণ, তামিল, কোটাল, কানুনগো, বারুই, গন্ধবণিক, কলু, তিলি, গোয়ালা, তন্তুবায়, পোদ্দার, কাঁসারি, মহাজন, সূত্রধর (নৌ নির্মাতা), মাঝি, তাম্বুলি, কেওট (মৎস্যশিকার), কুম্ভকার প্রভৃতি। জেলার কেনাবেচা চলত বিনিময় প্রক্রিয়ায়। মহাজনী প্রথার চল ছিল। সুদের হার ছিল বছরে টাকায় বারো আনা, অর্থাৎ বার্ষিক ৭৫ শতাংশ। প্রাক ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত আমদানি রপ্তানীর নিরিখে জেলায় বাণিজ্য স্থিতি ছিল জেলার অনুকূলে।

বাঁকুড়ায় মল্লোত্তর বাণিজ্যধারা গ্রন্থিত আছে হরচন্দ্র ঘোষের (১৮৩২-১৮৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বাঁকুড়া আদালতের বিচারক ছিলেন) A Topographical and Statistical Sketch of Bancoorah, ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের ১৮৭৬ খ্রিঃ প্রকাশিত Statistical Account of Bengal, Volume-IV -এর মতো পুস্তকে। ১৯২৫ খ্রিঃ প্রকাশিত ও'ম্যালীর জেলা গেজেটিয়ার্সও একটি মূল্যবান তথ্যসূত্র।

শহর বাঁকুড়ায় বাণিজ্যিক বিস্তার

সামন্তরাজ শাসনের অন্তভাগে সামন্তরাজ আনুকূল্যে রাজগ্রামের পাশাপাশি নতুন চটিতে রাজগ্রাম আগত বণিকদের সুবিধার্থে বিশ্রামস্থল গড়ে তোলা হয়। বর্ধমান থেকে আগত সোনামুখী-বেলিয়াতোড় পথে বলদবাহিত বা সগড়গাড়ি বাহিত ছোলা-গম-মুসুর ডাল-রবিশস্য বিনিময় প্রক্রিয়ায় পুরুলিয়া, দক্ষিণ বাঁকুড়া, বাঁকুড়ার অন্যান্য অংশের লাক্ষা-তসর ও বনজ সম্পদ নিয়ে ফিরে যেত এই বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে। ১৮০৭ খ্রিঃ ব্রিটিশ শাসকেরা বাঁকুড়া শহরকে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললে জেলার বাণিজ্যিক ভারকেন্দ্র ক্রমশ বাঁকুড়া শহরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। শহরের বিপুল সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মি, সিপাই, কয়েদিদের প্রয়োজনে বাঁকুড়া বাজারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। প্রারম্ভিক স্তরে শহরের যোগান ব্যবস্থা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ছিল এলাকার মণ্ডল ঘাটোয়াল ও 'চৌধুরী' জাতিগোষ্ঠীর হাতে। কোম্পানী এই স্থানীয় একাধিপত্য ভাঙতে জেলা ও জেলার বাইরের বণিকদের শহরে প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রতিষ্ঠাতে উৎসাহিত করে। এই প্রয়াস ছিল বাঁকুড়ার সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের ইঙ্গিত আভাসিত।

বাঁকুড়া শহরে এরপর 'পিরি' তাম্বুলি ব্যবসায়ী (পরে এরা মেদিনীপুর শহরে চলে যায়), রাজগ্রামের তন্তুবায় 'দত্ত' ও তাম্বুলি 'কুণ্ডু' বংশীয়রা বাঁকুড়া শহরে ব্যবসা সম্প্রসারিত করে। বর্ধমান থেকে ১৮২০ খ্রিঃ নন্দকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় (পরে সানবান্দায়) বসতি স্থাপন করে। তাছাড়া আসেন কোতলপুরের গন্ধবণিক ঠাকুরদাস, রাজগ্রামের বা রাহাগ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় 'পাঁজা', কোতলপুরের গন্ধবণিক 'ভদ্র', লেগোর 'তিলি' জাতির 'খাঁ' বংশীয় বণিকরা। কাঁথি-পিছাবনি থেকে লবণ এনে বর্তমান নুনগোলা রোডে বড় বড় আড়ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাঁজা ও ভদ্র বণিকরা। ১৮৩০ খ্রিঃ নাগাদ বর্ধমান, কোতলপুর, বীরসিংহপুর, বিষ্ণুপুর, ওন্দা ইত্যাদি স্থান থেকে বাদশাহী অহল্যাবাঈ সড়ক ধরে মালপত্র বোঝাই (চাল, ডাল, সরিষা, মালমশলা, নুন) গরু-মোষগাড়ি রাণীগঞ্জ মোড়-রাসতলা-নতুনচটী কর্মচঞ্চল করে তোলে। হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর সময়কালের (১৮৩২-৩৮ খ্রি ঃ) বাঁকুড়ার অর্থনীতি নিয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করেছিলেন। এ সময় ছোটনাগপুর, সিংহভূম, সুরগুজি ইত্যাদি জঙ্গল জেলা থেকে বলদের পিঠে আসত লোহা, সরিষা, তিল, পোস্ত, খয়ের কোচরা তেল, ভয়সা ঘি। আসত চাল, অল্প বর্ধমানের আলু। জেলার উৎকৃষ্ট গুড় কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হত। জঙ্গল জেলাগুলিতে লবণ যেত বাঁকুড়া থেকে।

হান্টারের বিবরণ

তিনের দশকের এই বাণিজ্যিক স্থিতি সাতের দশকে হান্টারের বিবরণ অনুসারে জেলার বাণিজ্যিক স্বার্থের অনুকূল ভূমিকা নিয়েছিল। কারণ চাল উৎপাদনের ঘাটতি পূরণ করে এই দশকে হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বাঁকুড়া রপ্তানী শুরু করেছিল। এর কারণ ছিল ১৮৪০-৫০ খ্রিঃ থেকে জঙ্গল এলাকার পরিবর্তে কৃষি এলাকা বৃদ্ধি ও সে কাজে সাঁওতালদের অবদান। এছাড়া রপ্তানী হত তৈলবীজ, লাক্ষা, তুলা, তাঁত -রেশমবস্ত্র ইত্যাদি। আমদানি হত লবণ, তামাক, মশলা, সুপারি ও বিভিন্ন ডাল। অনুকূল বাণিজ্য প্রভাবে জেলায় অর্থের আগমন ও সঞ্চয় ঘটেছিল, যারা কিয়দংশ ব্যায়িত হয়েছিল শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে। এই সময়ের চারটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য জনপদ ছিল বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, রাজগ্রাম, বড়জোড়া।

হান্টার সাতের দশকে বাঁকুড়ায় আটজন মুসলিম সওদাগরের উপস্থিতির কথা বলেছেন।এদের অবস্থান ছিল সম্ভবত কেরাণীবাজার-কাজী মহল্লার সওদাগর গলিতে। মল্ল সময়ে পাঠান বণিকদের কথা ইতিমধ্যে বিবৃত। মল্ল শাসনের অন্তভাগে উত্তরবঙ্গ ও উত্তরভারতীয় ফকির-সন্ন্যাসী দলের বিষ্ণুপুর-সোনামুখীতে আগমন ছিল মূলত ব্যবসায়িক কারণে। বস্ত্র ব্যবসায়ে এদের বিনিয়োগ ছিল। কোম্পানী শাসনে এদের বিনিয়োগ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে জীবিকা উচ্ছিন্ন হয়ে এরা বিদ্রোহী হয়। কোম্পানী এদের বিষ্ণুপুর থেকে বিতাড়িত করে। হাম্বিরের সময়কালে মোঘল সৈন্যের আগমন ও অবস্থিতি, তার আগে লোহানী-আফগান-পাঠান সৈন্যের (রঘুনাথ সিংহের সময় ওড়িয়া পাঠান রহিম খান) আগমন ও অবস্থিতি এবং তাদের চাহিদার কারণে এই অঞ্চলে রেশম পাগড়ীর উৎপাদন শুরু হয়। এখনও এখানকার পাগড়ী পাকিস্তান-আফগানিস্থানে রপ্তানী হয়। উল্লেখ্য স্বাধীনোত্তরকালে বিষ্ণুপুর-সোনামুখীতে জিয়াগঞ্জ-বালুচর গ্রামের অনুকরণে বালুচরী শাড়ীর উৎপাদন শুরু হয়েছিল। যা এখানকার বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষতা ও ধারাবাহিকতার প্রমাণ। মোঘল স্বর্ণমুদ্রা বাঁকুড়ায় প্রচলিত ছিল।

ও'ম্যালীর ভাষ্য

১৯০৮ খ্রিঃ ও'ম্যালীর বিবরণে জেলার রপ্তানী দ্রব্যাদি ছিল ধান-চাল, পিতল-কাঁসার বাসন-কোসন, রেশমবস্ত্র, সুতা, চামড়া, পশুর শিং ও লাক্ষা। আমদানি করা হত কয়লা, লবণ, মশলা, কলের সুতা, বিলাতী বস্ত্র। ও'ম্যালীর মতে এ সময় জ্বালানী হিসাবে কয়লা ও কেরোসিনের প্রচলন ঘটেছিল। এছাড়া জেলায় গো-মহিষাদির কেনাবেচা জনপ্রিয় ছিল। জে আর ব্ল্যাকউডের তথ্যানুসারে ১৯১৫ খ্রিঃ বিহার, উত্তর ভারত

থেকে আমদানীকৃত গরু ও মোষের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৪ ও ১১৬৮৮। সদর মহকুমায় সবচেয়ে বেশি মোষ আমদানি ছিল গঙ্গাজলঘাটি (২৭০৮), খাতড়া (২২১৭), বাঁকুড়া থানায় (২১০৮)। বিষ্ণুপুর মহকুমায় কোতলপুরে ১৬৪৯টি, বিষ্ণুপুরে ৮৭৩টি, ইন্দাসে ৫৮৭টি। জেলার সাপ্তাহিক (শুক্রবার) হাট ছিল কোতলপুরে। দৈনিক বিক্রি ছিল ৪০০ টাকার।[৯৮] হরচন্দ্রের সময় জেলা গুড় রপ্তানি করলেও, হান্টারের সময় তা লাল চিনি রপ্তানীতে নেমে আসে ও ও'ম্যালীর সময় তাও বন্ধ হয়ে যায়। সমাপ্তি ঘটে বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের।

রেল বাণিজ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকেই চারটি বাঁকুড়া শহর সংযুক্ত মুখ্য সড়কের পূর্ণতা (রানীগঞ্জ-মেজিয়া-গঙ্গাজলঘাটি-বাঁকুড়া, বর্ধমান-খণ্ডঘোষ-সোনামুখী-বাঁকুড়া,বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-মেদিনীপুর-ওড়িষা, কলকাতা-কোতলপুর-বিষ্ণুপুর-ওন্দা-বাঁকুড়া- রঘুনাথপুর-উত্তর পশ্চিম সীমান্ত), আটের দশক থেকে শহরে মাড়োয়ারী আগমন, ১৯০৩ খ্রিঃ ১লা ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের সাথে বাঁকুড়া শহরের সংযুক্তি বাঁকুড়ার বাণিজ্যকে বহুজাতিক ও বহুমাত্রিক রূপ দেয়। রামানুজ করের হিসাবে এই প্রক্রিয়া বাঁকুড়ার বাণিজ্য স্বার্থের অনুকূল ছিল না। ১৯২৫ খ্রিঃ প্রকাশিত তাঁর হিসাবে জেলার আমদানি দ্রব্য ছিল দু কোটি টাকা মূল্যের। এর মধ্যে ৬০ লক্ষ টাকার বিদেশি বস্ত্র, ২০ লক্ষ টাকার বম্বে মিলের সুতা, ৬ লক্ষ টাকার গুড় ও চিনি, ৫০০০০ টাকার পটল, ১ লক্ষ টাকার পান। আমদানি হত বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ থেকে ডাল; নেপাল-বিহার- উত্তরপ্রদেশ-অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ঘি; মাদ্রাজ থেকে বাদাম তেল মেশানো ঘি; বিহার (গয়া)-মাদ্রাজ (বিশাখাপত্তনম) থেকে গুড় (ভেলি); পাঞ্জাব-দিল্লি-কানপুর থেকে ময়দা; আগ্রার জিরা; কলকাতার জাভা-চিনি-মিছরি, কেরোসিন, লবণ, বাতি, কাগজ, ঔষধ; বিহারের আলু-পেঁয়াজ; উত্তরপ্রদেশের পোস্ত, বিহারের (আরা, পাটনা) ফুলকপি, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের পটল, কাশীর কুল ও পেয়ারা, বিহার-ওড়িষা-মাদ্রাজের আম; কলকাতার পেস্তা, কিসমিস, খেজুর, সাবু, বার্লি; ঝরিয়ার কয়লা, নাগপুরের বিড়ি; মেদিনীপুরের খৈল, সুপারি, লোহার কড়ি-বরগা-যন্ত্রপাতি, করগেট শীট, মণিহারী দ্রব্যাদি।

রামানুজ করের বিশ্লেষণ

রামানুজ করের হিসাবে জেলা থেকে হরিতকীর রপ্তানী বিশ হাজার টাকার বেশি নয়। বাঁকুড়ার রেশমবস্ত্র বোম্বাই, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, সিংহল, ব্রহ্মদেশে; পিতল-কাঁসা-রাং-তামা-জার্মান সিলভারের বাসন বিহার-যুক্তপ্রদেশ-কলকাতায়; কাঠের মালা পুরী,

বৈদ্যনাথ, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থে রপ্তানী হয়। চাল রপ্তানী হত ঝরিয়া, কলকাতা, ভিজগপট্টম, কোকনদ জেলায়। আর যেত খড়্গাপুর, টাটানগর, আসানসোল, দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, ব্যারাকপুর সহ হুগলি শিল্পাঞ্চলে। তসর ও পাটদ্রব্য বোম্বে, মাদ্রাজ, রেঙ্গুনে; লোকপুরের মেষলোমের চাদর কলকাতা প্রভৃতি স্থানে; মেষলোম মির্জাপুর, গয়ায়; পিতল-কাঁসা-জার্মান সিলভার-রাং-তামার জিনিসপত্র আসাম, কলকাতা, ঢাকা, বিহার, ওড়িষা, ছোটনাগপুর, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মাদ্রাজ, নেপাল, সিকিম, ভূটান ইত্যাদি স্থানে; রঙ ও চামড়ার কাজে প্রয়োজনীয় হরিতকী রানীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে; বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-পিয়ারডোবা থেকে ছানা জেলার বাইরে; পিয়ারডোবা থেকে ঘাটাল, কলকাতায় জ্বালানী কাঠ; চামড়া ও জুতা কলকাতা, মেদিনীপুর, খড়্গাপুর, জামসেদপুর, পুরুলিয়া, রাঁচী প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হত। বাঁকুড়ায় চর্মশিল্পে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসয়ী ছিলেন মুন্সি আলি জামিন। পরে মহম্মদ হুসেন, খোদাবক্স, একরাম খাঁয়ের মতো পাঞ্জাবী বণিকরা বাঁকুড়ার চর্মশিল্পীদের কাজ পাঞ্জাবে জনপ্রিয় করে তোলেন। এছাড়া লাক্ষা, তাঁত রেশমের বাণিজ্য পূর্বে বিবৃত হয়েছে। চন্দ্রকোণাবাসী শ্যামকিশোর সিংহের মতো অনেকেই সোনামুখীর রেশমশিল্পে বিনিয়োগ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। নীল উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যাপারী ও বণিকদের ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর। তবে নীলচাষে সহায়তা করে ধনসঞ্চয় করেছিল অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ও হদলনারায়ণপুরের মণ্ডল পরিবার। দেশীয় উদ্যোগপতিদের একাংশ সমাজ হিতৈষণামূলক কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। যেমন সোনামুখীর লঞ্চ পরিবহন ব্যবসায়ী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; কয়লাখনি ব্যবসায়ী রসরাজ বিশ্বাস, হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোডার্মা-গিরিডির অভ্র ব্যবসায়ী শুঁড়ি পুকুরের সত্যকিঙ্কর সাহানা, কোতলপুরের কাঠ ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে, ঠিকাদার কেনারাম দে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ। ১৮৭৪ খ্রিঃ মন্বন্তরে ত্রাণ সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন আলি জামিন। ব্রিটিশ শাসনে কোনো সরকারি বিপণন ব্যবস্থা প্রসার লাভ না করায় পুঁজিবাদী সংগ্রহ তন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঁকুড়ায়।[৯৯] যেমন উৎপাদকের কাছে ধান-চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে, কৃষকের কাছে আসত পাইকার-ফরিয়ার দল। স্থানীয় দোকানদার একাংশ বিক্রয়ের পর এই ধান যেত আড়তদার-গোলদারদের কাছে। বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে বাঁকুড়ায় অনেক চালকল (ঢেঁকিছাঁটা চাল) গড়ে ওঠে। এই চালকল মালিকরা ছিল এই শ্রেণিভুক্ত। মহাজন- কারবারী-বণিক-সওদাগর শ্রেণি চাল বিক্রয়ে-রপ্তানীতে অংশ নিত সড়ক-নদী ও রেলপথে। উল্লেখ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রেল ও ট্রাক পরিবহনের সুবিধা যুক্ত হয়েছিল বাঁকুড়া। ফড়িয়া-আড়তদারদের ধান বিক্রিতে মণ প্রতি লাভ ছিল ১-২ আনা। চাষীর থেকে ধানকল বা স্টেশন পর্যন্ত

গরুরগাড়ি ভাড়া ছিল মণ প্রতি দিনে চার আনা, বর্ষায় আটআনা। মহাজনী-দালালি কমিশন ছিল ২ পয়সা।

হরচন্দ্র ঘোষ ও নৌবাণিজ্য

১৯০৩ খ্রিঃ নাগাদ বাঁকুড়ার নৌবাণিজ্যের ঐতিহ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ ধারার অবসান ঘটেছিল। ১৮৩৮ খ্রিঃ হরচন্দ্র বাঁকুড়ার নৌবাণিজ্যের অপ্রতুলতারা কথা বললেও ১৮৭০ খ্রিঃ হান্টার ১১৯৯ জন মাঝি, ১৮৮১ খ্রিঃ সেনসাসে ১২১ জন নৌবাসীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রাক ব্রিটিশ পর্বে নদীকেন্দ্রিক যে বাণিজ্যঘাটগুলির সংবাদ পাওয়া যায় তা হল দ্বারকেশ্বরে সোনাতাপল, বহুলাড়া, এক্তেশ্বর, ধরাপাট, দনামনা বা দোমহনার ঘাট, মুণ্ডমালার ঘাট, সোমসারঘাট প্রভৃতি। কাঁসাই-শিলাই-জয়পণ্ডার অম্বিকানগর, পরেশনাথ, আটবাইচণ্ডী ইত্যাদি। অড়কাষায় কেলাইঘাট, কাছেঘাট, আহন্দার ঘাট ইত্যাদি। একাধিক গুঁড়িকে বেঁধে ভেলার মতো করে পণ্য বোঝাই করে দেশান্তরে পাঠানো হত। বাঁকুড়ায় নৌকা নির্মাণ শিল্পের উল্লেখ আগে করা হয়েছে। প্রায় পাঁচশ মণ ওজনের মালপত্র ও মাঝিমল্লা বহনক্ষম নৌকা জেলায় তৈরি হত। নৌকা তৈরির উপযুক্ত কাঠ তাল, শাল, গামার, অর্জুন জেলায় সহজলভ্য ছিল। চূড়াবান্দের সদারাম মাঝি ছিলেন এমনই এক নৌকার মালিক।[১০০] আগেই বিবৃত হয়েছে নন্দ-মৌর্য সময় থেকে অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ত বাঁকুড়া ভূমির বৈদেশিক বাণিজ্যে মুখ্য বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত। দারকেশ্বর ও তৎকালীন দামোদর নদ দিয়েই এ বাণিজ্য সম্ভব ছিল। দামোদর নদের পথ পরিবর্তনের ইতিহাসেই তা উপলব্ধ হবে। তাম্রলিপ্ত পরবর্তী নৌবন্দর হিসাবে বাঁকুড়া বাণিজ্যের শরিক ছিল দ্বারকেশ্বর গতিপথে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা, ও দামোদর নদের হুগলি-তাম্রলিপ্ত। 'বাঙালীর ইতিহাসে' নীহাররঞ্জন রায় দামোদরের ইতিকথা বর্ণনায় বলেছেন, 'আমাদের সমসাময়িক কালে গঙ্গা ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহে দামোদরের প্রধান প্রবাহটি দক্ষিণবাহী হয়ে হাওড়া জেলায় প্রবেশ করেছে ভূরশুট (প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ) গ্রামের কাছে। সেখান থেকে আমতা হয়ে বাগনানের ভেতর দিয়ে এই প্রবাহ এসে পড়েছে ভাগীরথীতে, ফলতার উল্টোদিকে। অথচ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এই প্রবাহটি প্রধান প্রবাহপথ ছিল না, সে প্রবাহপথ ছিল যাকে বলা হয় 'কানা দামোদর' বেয়ে। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের একটি নকশায় এই কানা দামোদর বেশ বড় নদ এবং এই নদ ভাগীরথীতে এসে পড়ত উলুবেড়িয়ার উত্তরে। সে প্রবাহ এখনও আছে, কিন্তু ক্ষীণতর। দা-বারোস ও ব্লেকের (Blake) নকশায় (যথাক্রমে ১৫৫০ ও ১৬৫০) দেখছি, দামোদর দু-মুখী হয়ে ভাগীরথীতে এসে পড়েছে, একটি মুখ ফলতার উল্টোদিকে, মানংপয়েন্ট ফোর্টের কাছে, Pistola বা পিছলদহ গ্রামের একটু উত্তরে।

আর একটি মুখ উলুবেড়িয়ার উত্তরে সিজুবেড়িয়া খাল বা কানা দামোদর পথে ভাগীরথীতে। ফান ডেন ব্রোকের নকশায় (১৬৬০) কিন্তু দামোদর সম্বন্ধে বিচিত্র এবং নতুন খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ নকশায় দেখছি দামোদরের প্রধান প্রবাহ সোজা দক্ষিণবাহী হয়ে এসে পড়েছে রূপনারায়ণে হাওড়া জেলার বাক্সী খালের কাছে। ক্ষীণতর দ্বিতীয় একটি শাখা দামোদরের বর্তমান প্রবাহ পথ দিয়ে সোজা চলে গেছে ভাগীরথীতে। আর তৃতীয় একটি প্রশস্ত প্রবাহ বর্তমান শহরের পূর্বদিক স্পর্শ করে, বোধহয় গাঙুর নদীর প্রবাহ পথ বেয়ে সোজা গিয়ে পড়েছে ভাগীরথীতে কালনার কাছে। দামোদরের এই শাখাটি কেতকী দাস ক্ষেমানন্দের বাঁকা দামোদর, যার জল সম্পর্কে ক্ষেমানন্দ বলেছেন, 'গঙ্গার জলে মিলিয়ে গেল।' (উল্লেখ্য ক্ষেমানন্দ বর্ণিত বেহুলা সঙ্গে লক্ষীন্দরের শবযাত্রা পথ ছিল চাঁপাতলা (কসবাই চম্পা)-কোতরবন্দ-দুবরাজপুর-নবখণ্ড-বাঁকানদী (দামোদর)- পুজুটি-গোবিন্দপুর-জগতিঘাট-শিআল্যা-ওকমানপুর-বোদল্যা-হাসানবাটি নারকেলডাঙ্গা-বৈদ্যপুর-ত্রিবেণী।) বিশেষজ্ঞদের মতে বাঁকা দামোদর, কানা দামোদর, বেহুলা, গাঙুর, কুন্তী ইত্যাদি নদীগুলি বিভিন্ন সময়ে দামোদরের শাখা নদী বা প্রাচীন প্রবাহপথ ছিল। ১৭৭০ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধমান হয়ে কালনার কাছে ভাগীরথীতে দামোদরের প্রধান প্রবাহ মিশত যা ১৭৭০ খ্রিঃ বন্যায় পরিবর্তিত হয়। এরপর বর্ধমানের সেলিমাবাদে বিভাজিত ধারার একাংশ কৃষ্ণপুর, রাজবলহাট, ফলতা-উলুবেড়িয়া হয়ে ভাগীরথীতে মিশত ও অপ্রধান শাখাটি চন্দননগর হুগলির পশ্চিমে নয়াসাগর-গঙ্গায় পতিত হত। একইভাবে বাঁকুড়া থেকে দামোদর নদবাহিত বাণিজ্যধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। চাঁদসদাগরের মতো রাঢ় বণিকদের নদীবাণিজ্য পথ ছিল এগুলিই।

বাণিজ্য ও উন্নয়ন

হরচন্দ্র, হান্টার, ও'ম্যালী ও রামানুজের চিত্রে জেলার চালচিত্র ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফারাক বিভিন্ন সংখ্যাতত্ত্বে ধরা পড়ে। ১৮৭২ খ্রিঃ যেখানে জেলায় চারটি মাত্র বাজার (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, রাজগ্রাম, বড়জোড়া) গড়ে উঠেছিল, রামানুজের সময়কালে (১৯২০-২৫ খ্রিঃ) অসংখ্য ছোট বড় বাজার গড়ে উঠেছিল। যেমন-ছাতনা, শুশুনিয়া, উপরডিহি, ঝাঁটিপাহাড়ী, কেঞ্জাকুড়া, ওন্দা, খামারবেড়িয়া, গামিদ্যা, বড়জোড়া, রামসাগর, অযোধ্যা, বেলিয়াতোড়, সোনামুখী, ইন্দাস, বোয়াইচণ্ডী, ইন্দপুর, খাতড়া, ফুলকুসমা, অম্বিকানগর, গঙ্গাজলঘাটি, মালিয়াড়া, সিমলাপাল, লক্ষ্মীসাগর, কোতলপুর। সরকার পোষিত কর্মিসংখ্যা ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ২৩৮১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২১ খ্রিঃ হয়েছিল ৫১১৫ জন। জনজীবনে সমৃদ্ধি, সঞ্চয় ও আভিজাত্য প্রমাণিত হয় উচ্চ আয়ের পরিবার পোষিত ঝি ও পাচকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে পাচক-পাচিকা ২২৫, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বেড়ে দাঁড়ায় ১০১৮ ও ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ৬১৪০-এ।

ঝি-চাকরের সংখ্যা ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৪০৮ থেকে, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়ায় ৪২৯৬ এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ৪৯৫৭-তে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর একাধিপত্য আলগা হতে থাকায় দেশীয় উদ্যোগপতি ও বণিকদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এই আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের ফলে সাধারণ মানুষও উপকৃত হয়েছিল। এই শতাব্দীর শেষে জেলাশাসক রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের (১৮৯৯-১৯০২ খ্রিঃ, বাঁকুড়ায়) উপলব্ধিতে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'There has been, on the whole, an increase in the property of the people. They evince a growing desire to provide themselves with better food, better clothing and better appliances generally. Gold and silver ornaments are more common than ten years ago. Brass utensils have usurped the place of earthen pots; extensively usued. Brick built houses are springing up everywhere, and articles of food which were formerly luxuries are now in common use.'

তাৎপর্য বিশ্লেষণ :

সুবিস্তৃত পরিসরে আলোচিত বাণিজ্য কাহিনি, সীমাবদ্ধ বিগত শতাব্দীর চারের দশক পর্যন্ত। মুক্ত ভারতের ও তার অঙ্গরাজ্যের শিল্প বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে তার নয়া রাষ্ট্রনীতির মোড়কে। তবে দেশের সব অঞ্চলের এই সমযাত্রার তাল, লয়, সুর অবশ্যই নির্ণীত হয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পশ্চাৎগামিতা ও অগ্রগামিতার নিরিখে। বাঁকুড়ার অর্থনীতি সেই অর্থে যাত্রা শুরুর ক্ষণে ছিল ঐতিহাসিকভাবেই পশ্চাদ্‌বর্তী।

প্রাক্-ব্রিটিশ বাণিজ্য গৌরব

ভৌমশাসন সূচনা পর্বেও বাণিজ্য জনপদগুলি গড় উঠেছিল মুখ্য নদীসমূহের সন্নিকটে। প্রাগৈতিহাসিককালে যেমন জীবন ও জনপদ পুষ্ট হয়েছিল নদী ও উর্বর নদী উপত্যকায়, তেমনি বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিও গড়ে উঠেছে নদীস্রোতের সন্নিকটে। অনৈতিহাসিক সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি ঐতিহাসিক সময়ের সূচনায় বদ্ধ অর্থনীতিতে পর্যবসিত হয়।[১০০ক] এই অর্থনীতিরই নির্যাস হল প্রত্যেক জনপদে নিজ প্রয়োজনে শস্য উৎপাদন, স্থানীয় কার্পাস বস্ত্রবয়ন ও মৃৎপাত্র নির্মাণ। সন্নিহিত অঞ্চলেই প্রাত্যহিক পরিষেবা মিলত বিনিময় প্রক্রিয়ায়। ক্রমে কৌম রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন (মূলত দশম শতকের পর) রাঢ়ের এই অংশে আধা সামন্ততান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সূচনা ঘটায়। অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর বিশ্লেষণ ছিল, 'উপজাতীয় কৌম সর্দারতন্ত্র থেকে সংগঠিত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ ছিল প্রধান চালিকাশক্তি, উপজাতীয় জীবনের এ পর্বান্তরকে সম্ভব করেছিল

উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা। চাষাবাদের ক্ষেত্র পরিবর্তনজনিত উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও দূরদেশের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির ফলে নূতন বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ....closed economy বা বদ্ধ অর্থনীতির অচলায়তন ভেঙ্গে দিয়েছিল।'[১০১] এই ভাঙনের ইঙ্গিত ছিল অনেক আগেই। খ্রিস্টিয় ২য় শতক পর্যন্ত পেরিপ্লাস অব ইরিট্রিয়ান সি, টলেমি, দিওদোরুস, ফুর্তিউস, প্লুটার্ক-এর বিবরণ থেকে বাংলার রপ্তানী দ্রব্য জানা যায় তেজপাতা, কার্পাস, কৌষিক সূক্ষ্ম, শ্বেত ও সুবর্ণ বস্ত্র, মণিরত্ন, হীরক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বজ্রভূমিতে হীরক-রত্নের উৎপাদনের কথা আছে। মেগাস্থিনিস মগধ ও সন্নিহিত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ধান, মিলেট, ইক্ষু ও শীতকালীন গম, বার্লি, ডালশস্য উৎপাদনের প্রাচুর্যের কথা বলেছেন। মার্কোপোলো বাংলায় (১২৫০-১৩২৩ খ্রিঃ) জটামংসী, আদা, ইক্ষু, গম, তিল, চিনি, সর্ষপ, নানাজাতীয় কলাই ও কলা প্রচুর উৎপন্ন হত বলে জানিয়েছিলেন।[১০২] কৃষি নির্ভর শিল্প ছাড়াও ভবিষ্যপুরাণে ইঙ্গিত আছে রাঢ় তামা-লোহা-টিন শিল্পে, কামানের মতো অস্ত্র নির্মাণে (হাম্বিরের সময়েই মোঘল অনুমতি ছিল), বস্ত্রবয়ন শিল্পে, শালকাঠ রপ্তানীতে অগ্রগণ্য ছিল।[১০৩] অধ্যাপক গৌরপদ সেন মল্ল সময়ে শিল্প হিসাবে (১) কৃষিনির্ভর শিল্প (২) প্রস্তর শিল্প (৩) মৃৎশিল্প (৪) ধাতু শিল্প ঃ লোহা-তামা-কাঁসা-রূপ-সোনা-পিতল-অষ্টধাতু (৫) দারুশিল্প (প্রান্তিক অন্ত্যজ ডোম-বদরা কর্তৃক বাঁশবেতের কাজ সহ) (৬) শঙ্খশিল্প (৭) শোলা-পট শিল্প (৮) বয়ন শিল্প (৯) ইমারতি শিল্প (১০) দুগ্ধ-মিষ্টান্ন শিল্প (যাদব নগরের মতো দুগ্ধ জনপদ ও ব্লাকউডের গরু মহিষের হিসাব দ্রষ্টব্য) (১১) ভেষজ শিল্প (১২) সুরা শিল্পের উল্লেখ করেছেন। বিশেষ উৎপাদিত দ্রব্য ছিল 'অম্বরী তামাক', 'ধূপছায়া' রঙিন বস্ত্র, রেশম-সুতি মিশ্রিত 'খুটনী' শাড়ি। দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম, কাপালিক গোত্রের সুতিবস্ত্রের মধ্যে চতুর্থটির উৎপাদন ছিল সর্বাধিক। অধ্যাপক সেন (মল্লভূম ঃ জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা) মল্লভূম থেকে ক্ষীরপাই-ঘাটাল হয়ে দক্ষিণের জেলাগুলিতে এবং রাজগ্রাম-কেঞ্জাকুড়া হয়ে পশ্চিমের জেলাগুলিতে লাক্ষা, মধু, ভেষজ, বনৌষধি, রেশম-কার্পাসজাত বস্ত্র, পেতলের বাসন কোসন, শঙ্খ ও স্বর্ণশিল্প সামগ্রীর রপ্তানীর কথা বলেছেন। বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' ও কবিকঙ্কনের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ রাঢ় থেকে দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটে সমুদ্র বাণিজ্যের দ্রব্যাদি ছিল (১) গুয়া বা গু বাক (২) পান (৩) নারিকেল (৪) লবণ (পাথুরে লবণের পরিবর্তে বঙ্গে কদর ছিল সামুদ্রিক লবণের)। গুজরাট-মহারাষ্ট্রের সুপারক বন্দর দিয়ে রপ্তানী হত বাঙলা-আসামের সুপারি (অষ্টম-নবম শতকে নাব্যতার কারণে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনে এই বন্দরের গুরুত্ব বাড়ে)।

মোটের উপর মল্লশাসন পর্যন্ত জেলাবাসীর জীবন, দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষ জর্জরিত ছিল না। গভর্নর ভেরেলস্ট আলিবর্দীর সময়কার সামাজিক-আর্থিক চিত্র সম্পর্কে বলেছেন,

"The farmer was easy, the artisans encouraged, the merchants enriched....." অথচ পলাশি যুদ্ধোত্তর বাংলায় (তথা বাঁকুড়ায়) ইংরেজের বাণিজ্যিক একাধিপত্য কায়েমের মরিয়া প্রচেষ্টায় জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ০৭/০৪/১৭৭৩ তারিখে কোম্পানীর স্থানীয় প্রশাসন কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে এই ভয়াবহ অবস্থার কথা জানিয়ে লিখেছিল, "abuses have rather increased....added to the miseries of the country."

ইংরাজ আগমন ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়

পলাশি যুদ্ধের অব্যাবহিত (১৭৫৭ খ্রিঃ) পরেই দেশীয় বিনিয়োগ প্রায় অন্তর্হিত হয়। কেবল ইংরেজ অনুমোদিত কিছু দেশীয় দালাল (বার্ষিক দালালি নথিভুক্তি ফি ছিল ৩০০০ টাকা) টিকে থাকে। দেশীয় ও অন্যান্য ইউরোপীয় উদ্যোগপতিদের উপর নেমে আসে কঠিন আঘাত। শ্রমিক ও শিল্পীদের প্রলোভিত বা আতঙ্কিত করে কোম্পানীর কাজে লাগানো হয়। এই অত্যাচার সম্পর্কে এন. কে. সিনহা Economic Histroy of Bengal-এ লিখেছেন (পৃঃ ১৯, খণ্ড-১), "The winder of raw silk called Nankews had been treated with such injustice that instances were known of cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk.....It was common things for company's sepoys to be sent by force of arms to break open the houses of the Armenian merchant's establishment.....forcibly take the Nankews from their work and carry them away to the Engslih factory" উল্লেখ্য ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চের একটি নির্দেশনামায় মূল্য বাড়িয়ে বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে শ্রমিক-শিল্পীদের কোম্পানীর সাথে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ১৭৫৫ খ্রিঃ বাংলা থেকে বিদেশগামী বাণিজ্যতরীর দুটি ছিল ফরাসিদের, তিনটি ওলন্দাজদের, একটি দিনেমারদের। সেখানে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানীর (অন্য রাজ্যে ও দেশে) মাত্র ৬০ লক্ষ টাকার মতো ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছাড়া অন্য বণিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের।[১০৩] বস্ত্র রপ্তানী, চিনি ও লবণ রপ্তানীতে বাংলার মুখ্য অবস্থান কোম্পানী শাসনের প্রথম তিন-চার দশকেই শেষ হয়ে যায়। লবণ আসতে থাকে পশ্চিম ভারত, চিনি জাভা থেকে, বস্ত্রাদি ইংলন্ড থেকে। সুরাটের কোম্পানী কারখানার অধিক্ষকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৭৬৫ খ্রিঃ বাংলা থেকে বস্ত্রাদি রপ্তানী হয়েছে ২৫৭৬৫০ টাকা মূল্যের ১৯৫ বেল। ১৭৮৯ খ্রিঃ তা কমে দাঁড়ায় ৩১২০ টাকার ৫ বেলে। বস্তুত তখনই বাংলার বস্ত্রশিল্পের অন্তরাগ রচিত হয়ে গেছে। মল্লশাসন পর্যন্ত বাণিজ্যধারা জেলার অনুকূলে থাকলেও কোম্পানী শাসনে তা বিঘ্নিত হয়। শুল্ক দপ্তরের হিসাবে ১৭৯৫ খ্রিঃ মে মাস থেকে ১৭৯৬ খ্রিঃ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলা থেকে বাৎসরিক রপ্তানী ছিল ৯৮৪২৩৫৯

টাকা ও আমদানি ছিল ১১২৯৩৪৫৩ টাকা। অর্থাৎ বাংলার বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল ১৪৫১০৯৪ টাকা এবং সমানুপাতে বাঁকুড়া জেলারও। বাণিজ্যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দেশের সম্পদের অপসারণও চলতে থাকে অবাধে। কার্ল মার্কস এইভাবে অন্যের ধনে নিজ দেশে পুঁজির বিস্তারের তত্ত্বের কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'the treasures floated back to the mother country and were thus formed into capital.' জেমস গ্রান্টের হিসাবে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে এমন মূলধন অপসারণ ছিল দুই কোটি টাকা মূল্যের। ১৭৮৭ খ্রিঃ অযোধ্যার নবাব কোম্পানীর এই ধ্বংসাত্মক নীতি সুন্দরভাবে একটি প্রতিবেদনে তুলে ধরেছিলেন। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ, "Previous to the introduction of the Company's investment the trade of the province of Oude was conducted by the native merchants without any interference on the part of the Government. The markets were open to purchasers of every denominaotion and the merchant and manufacturer met upon terms of perfect equality. The price of the goods was decided upon the true mercantile principle of one finding it his interest to buy and the other to sell. Advances were seldom given but for the provision of some rare commodities. The introduction of the Company's Investment caused a revolution in the trade of the country which has operated greatly to its detriment by the establishment of a system highly unfavourable to the manufacturer and secondly the exclusion of the native merchants." পলাশি যুদ্ধোত্তর বাংলার চিত্র ছিল একই রকমের। মূলধনের অপসারণ সম্পর্কে কোম্পানী আধিকারিক ফিলিপ ফ্রান্সিস মন্তব্য করেছিলেন (১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে), 'to make their fortune as quickly as possible and carry it out of the country." কিন্তু অচিরেই ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পারেন এই নীতি, যা এদেশকে গভীর দারিদ্র ও যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করেছে, তা দূরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূল হবে না। এই উপলব্ধি থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই কোম্পানীর বাণিজ্য একাধিপত্যের অবসান ঘটানো হয়।

ব্রিটিশ বেনিয়াতন্ত্র

বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসকদের আনুকূল্যেই বাঁকুড়ার অর্থনীতি ও বাণিজ্য আধাসামন্ততান্ত্রিক বাঁধন থেকে পুঁজিনির্ভর অর্থনীতিতে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু প্রারম্ভিক দশকগুলিতে দেশীয় উদ্যোগগুলিতে ব্রিটিশ একাধিপত্যের নীতিতে দেশীয় উদ্যোগগুলি ধ্বংস হতে বসে। এ সময় ব্রিটিশ বাণিজ্যের মূল পরিচালক ছিল বাঁকুড়ায় সোনামুখীর কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট। রেসিডেন্ট অফিসের রেসিডেন্ট, সিনিয়র মার্চেন্ট, জুনিয়র

মার্চেন্ট, ফ্যাক্টর, সাব ফ্যাক্টরের মতো বেতনভুক ও কমিশনড্ এজেন্টরা এই বাণিজ্য ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচ-ছয়ের দশকে সোনামুখী কুটির রেসিডেন্ট ছিলেন জে. বি. স্মিথ। এরপর হেভেন সাহেব ও জর্জ ক্র্যাবট এই কেন্দ্রের দায়িত্ব সামলান। এরপর জন চীপ সোনামুখীর দায়িত্বে এলে বাঁকুড়া-বীরভূমের বাণিজ্য চিত্রে উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। চীপের কর্মদক্ষতা ও জনপ্রিয়তা সাধারণ মানুষের কাছে তাঁকে 'মহামতি চীপ' হিসাবে পরিচিতি দেয়। সাধারণ মানুষও বিচার প্রত্যাশায় জেলা প্রশাসনের কাছে না গিয়ে মহামতি চীপের দরবারে হাজিত হত। জেলাশাসক কিটিং যেখানে বার্ষিক খরচ করতে পারতেন সর্বোচ্চ ৩০০০ পাউন্ড, চীপের ক্ষমতা ছিল ৪৫০০০ পাউন্ড - ৬৫০০০ পাউন্ড। কিটিং-এর কর্মি নিয়োগের ক্ষমতা ছিল কোম্পানীর অনুমোদন সাপেক্ষ অথচ চীপ কর্মি নিয়োগ করতেন অবাধে। কিটিং-এর আবাসন ছিল মাটির ও বৃষ্টিক্ষত আচ্ছাদনের নিচে। চীপ থাকতেন প্রাসাদতুল্য সুরম্য বাংলোয়।[১০৪] এর কারণ ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের বেনিয়া মনোবৃত্তি এবং প্রশাসনিক সেবার চেয়ে আপন বাণিজ্য-স্বার্থ সুরক্ষিত করার তাড়না। চীপের পরবর্তী কমার্শিয়াল রেসিডেন্টরা হলেন কলিন শেক্সপীয়র ও জে. পি. এরস্কিন।

বৃত্তি বিবর্তন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটিশ শাসকরা বাণিজ্য একাধিপত্যের নীতি পরিত্যাগ করলে দেশীয় শিল্পোদ্যোগী ও বণিকরা উৎসাহিত হয়। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনুষ্ঠিত আদমসুমারিতে (১৮৭২ খ্রিঃ) এই চিত্র ধরা পড়ে। এই সময় কুমোর (মৃৎশিল্পী) ছিলেন ২২৭৫০, কামার৪৫১৮, শাঁখারী ৪৭৯, স্বর্ণকার ১৫০৬, সুনড়ি ১২৬৫৭, সূত্রধর ৪৬১০, তেলি ৪১৩২২, কুলু ১৩০৬৪, পাটওয়া তাঁতি ৪৩৯, তাঁতি ১৬৫১০, অন্যান্য তাঁতি ৩৩১, মাঝি-মল্লা-মেছুয়া ১২০৮১ জন। এর পরবর্তী জনগণনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছিল যে মল্ল আমল পর্যন্ত সমাজে যে বৃত্তিভিত্তিক বর্ণ-শ্রেণি তৈরী হয়েছিল, তা ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী কাঠামোর চাপে ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। এসময় বাণিজ্য ক্ষেত্রে গন্ধবণিক ছিলেন ৬৬২৬ জন, সুবর্ণ বণিক ৫২৫৯, ক্ষেত্রী ৪৯৭, মাড়োয়ারি-আগরওয়াল ৭৯, তাম্বুলি ১২০৩৪ জন।[১০৫] পরবর্তী দশকে (১৮৮১ খ্রিঃ) জনগণনায় বৃত্তিজীবীদের সংখ্যা দাঁড়ায় বৈশ্য ১৯৯৩, গন্ধবণিক ৯২৩২, সুবর্ণ বণিক ৭৩৯২, গোয়ালা ৬২০৬২, ক্ষেত্রি ৩৭৭০, কামার-লোহার ৪১১৪৯, কুমোর ৯৪৯৬, তাম্বুলি ১৬৭০৭, তাঁতি ৩০২৯৮, তেলিকলু ৯২১৯৭।[১০৬] অবশ্য এই তথ্যাদি ১৮৭২ খ্রিঃ জনগণনার সঙ্গে তুলনীয় নয় কারণ ১৮৭২ খ্রিঃ বাঁকুড়া জেলার বর্তমান রূপ ছিল না। ১৯০১ খ্রিঃ জনগণনায় গোয়ালার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫৭৮৭, গন্ধবণিক ১৩৪১৩, কামার-লোহার ৪৫৯৫০, শাঁখারী ১৪৪১, সুবর্ণবণিক ১০০১৬, তাম্বুলি ১৮৭৫৭, তাঁতি ২৮৮৩৪, তিলি ৭৩৫৯৬, কলু ২২৭৩৯,

ক্ষেত্রী ৬৬৯০। ১৮৯১ খ্রিঃ ও ১৯০১ খ্রিঃ বৃত্তিভিত্তিক জনসংখ্যায় তাঁতির সংখ্যা হ্রাসের কারণ সম্ভবত এই শিল্পের তৎকালীন জীর্ণদশা এবং অন্য বৃত্তি গ্রহণ। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জনগণনায় বাঁকুড়ায় গোয়ালা ছিল ৬৭২৩৩, গন্ধবণিক ১৩৪০১, কামার ২৩৬৭৮, লোহার ২৫৩৫৯, সুবর্ণবণিক ৯২৩২, তাম্বুলি ১৯৩৬৯, তাঁতি ২৮৪৭৯, তিলি ৭৫৩০২, কলু ২১৯৫৮। এই পরিসংখ্যানটিতেও দেখা যায় তাঁতির সংখ্যা হ্রাস অব্যাহত। সঙ্গে যোগ হয়েছে সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিকদের সংখ্যা হ্রাস। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঐতিহ্যশালী বৃত্তিগুলিতে মানুষের যোগদান কমছিল বিভিন্ন কারণে।

দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সব বৃত্তিভোগীদেরই সংখ্যা কমে যায়, একমাত্র লোহার ছাড়া। সংখ্যাগুলি হল গোয়ালা ৬৩৯২৫, গন্ধবণিক ১২৮৪০, কামার ১৯৫০৭, লোহার ৪১৪৮৬, সুবর্ণ বণিক ৮৯০৬, তাম্বুলি ১৮৮৭১, তাঁতি ২৪২৮৩, তিলি ৬৪৫৭৫, কলু ১৯৪৫৬। লোহার বৃত্তিতে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভবত লৌহদ্রব্যের চাহিদা ও কদর বৃদ্ধির কারণে।

ক্রমশ জাতি বৃত্তির রাশ আলগা হচ্ছিল এবং লাভজনক পেশাতে ভিড় বাড়ছিল। ১৯২৫ খ্রিঃ প্রকাশিত রামানুজ করের বাঁকুড়া জেলার বিবরণে দেখা যায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে যুক্ত হয়েছে ১০৪৯০৯ জন, বস্ত্র উৎপাদনে (সুতির) ২৩৪৭৬ জন ও রেশমে ৩২৪০ জন, ধান চাল প্রক্রিয়াকরণে ১৪৯০৯, কাষ্ঠ ব্যবসা ও ছুতার কার্যে ১০৮৮৮ ও ৩২৪৮ জন, লোহা, পিতল-কাঁসা, অন্য ধাতুশিল্পে যথাক্রমে ৪৬৪১, ৭৮২২, ৪৭ জন, মৃৎশিল্পে ও কুমোরের কার্যে ৪৯৫৩ ও ৫৬৮৩ জন, ঝুড়ি-চাটাই-মাদুর শিল্পে ৭৫১০, চর্মশিল্পে ৩২৪০ জন, পোষাকশিল্পে ও দর্জি কার্যে ৮৭৬৬ ও ৭০৪৮ জন, স্বর্ণালঙ্কারে ৬৯২৭ জন, পরিবহনে গাড়োয়ান ৪৯৪৩ জন, নাপিত কার্যে ৪২১১ জন।

স্পষ্টতই অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশ শোষণ ও শাসনের অভিঘাত কাটিয়ে প্রাক্-ব্রিটিশ বাণিজ্য গৌরব আর ফিরে আসেনি। জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই প্রাত্যাহিক জীবন-জীবিকা সংযুক্ত বৃত্তিগুলিকে আঁকড়ে ধরে জীবনধারণে সচেষ্ট হয়। চন্দ্রকান্ত রায়, ভাগ্যবন্ত খাঁ, চাঁদ সাগরের সমতুল বণিক বাঁকুড়ার বাণিজ্য বৃত্তে ফিরে আসেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছিল মাড়োয়ারী বহিরাগতদের হাতে। ক্রমে এরাও বাঁকুড়ারবৃত্তে অন্তর্গত হয়ে জনহিতকর ভূমিকা নেয়। অনেক স্বদেশি উদ্যোগপতিও জেলাগঠনে সক্রিয় শরিক হন। উল্লেখ্য মাড়োয়ারিদের সক্রিয়তা বাঁকুড়ার বাণিজ্যের ধারাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিস্তৃত করেছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই।

উপসংহার

রামানুজ করের হিসাবে বাঁকুড়া জেলায় কৃষিকার্যে প্রতিপালিত হত ৭৮৫৭৮২জন, শিল্পের দ্বারা ৯৪৪৬১ জন, ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা ৪৮১৮৮ জন। সুতরাং বাণিজ্যিক

সমৃদ্ধি-অধঃপতন জেলাবাসীর এক বলিষ্ঠ অংশকে প্রভাবিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। তবুও বাঁকুড়ার দারিদ্র ও সীমিত ক্রয়ক্ষমতার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার বিপণন ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেনি। শহর ও স্বচ্ছল শ্রেণি বাণিজ্যের সুফল যেভাবে ভোগ করেছে, গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি সেই অর্থে বাণিজ্য আলোড়িত ছিল না। তবুও বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর আগ্রাসী ভোগবাদী জীবনধারার বাইরে এখন কোনো জনপদই আর অন্তরিত নয়। সুতরাং বর্তমান সময়ে শিল্প-বাণিজ্যের প্রত্যাশিত স্রোতধারায় পুষ্ট হয়েই আগামী দিনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাহিদা পূরণ সম্ভব। অতীত বাণিজ্য গৌরবের ছায়াপথ হয়তো একদিন উজ্জ্বল আলোকমালায় সত্যি হয়ে ফিরে আসবে বাঁকুড়ায়।

তথ্যসূত্র :

১। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব, ১ম খণ্ড, (কলি-১৯৮০) পৃঃ ৩৮৬।

২। তদেব, পৃঃ ১১৮-১১৯।

৩। চৈতন্য চরিতামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮।

৩ক। বাণভট্ট, কাদম্বরী; ই-সিং, ৬৭২-৬৯৩ খ্রিঃ।

৪। সিংহ মাণিকলাল, রাঢ়ের মন্ত্রযান (পৃঃ ৪২-৪৩), Report of a Tour in Bengal Provinces 1872-73 by JD Beglar under Superintendance of Major General Cunnighham CSI.......Vol.-III, Calcutta, 1876, Page-50).

৫। Megathenes & Arrian, J.W. MC CRINDLE (London 1877).

৬। A record of Buddhist Kingdoms - James Leggo, Oxford 1886.

৭। Buddhist Records of Western Countries - Samuel Beal, London 1906.

৮। J. Takakusu, I-Ising's A record of the Buddhist Religions as Practised is India & Malay Archipelago, Oxford, 1896.

৯। চক্রবর্তী নরহরি, ভক্তিরত্নাকর (কলি-১৯৪০) পৃঃ ৭৮, সাহা পি. কে. সাম আসপেক্ট অব মল্ল রুল ইন বিষ্ণুপুর, পৃঃ ১৭৯, ১৭১।

১০। ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৪৮৯, দাস নিত্যানন্দ, প্রেমবিলাস (করিমপুর ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১৬৫।

১১। Abbe Raynal : History of Settlement and Trade in the East and West Indies, Vol-II, (Paris 1783) P-139, Tran. J.Justmound.

১২। ibid, Page-138.

১৩। ibid, Page-138.

১৪। জগমোহন, দেশাবলী বিবৃতি, অনুবাদ ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, নং ৫৫, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১৯।

১৫। প্রস্তাবনা, তীর্থভ্রমণ, যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯১৫।

১৬। Notes on a Tour in Manbhum in 1864-65, ASJ, Part-I, 1866.
১৭। বাঁকুড়ার বনকথা - সুদীপ্ত পোড়েল (বাঁকুড়ার খেয়ালী, ২০১২, পৃঃ-৬৬)
১৮। Bankura District Gazetteers, A.K. Banerjee P-313.
১৯। Routes, Old and New from Lower Bengal up the Country in Bengal Past and Present (July-Sep. 1924), C.E.A.W. Oldham, P-26.
২০। BDG, Amiya Kumar Bandopadhaya, Calcutta, 1968, P-314.
২১। মেদিনীপুর রেসিডেন্টকে লেখা চার্লস স্টুয়ার্টের পত্র, তাং ১৭/০৩/১৭৭৩।
২২। The Annals of Rural Bengal-W.W. Hunter, P.55-57 (London - 1868, Cal-1996).
২৩। বাঁকুড়া পরিচয়, চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ৫৬৯-৭৩।
২৪। The Economic life of a Bengal District, R.K. Gupta, Burdwan, 1984, P. 15-16.
২৫। W.W. Hunter, Annals of Rural Bengal (London 1868) P. 65-66.
২৬। Geological Survey of India, Part-I, M.P., W.B.
২৭। সিংহ মাণিকলাল, সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী (১ম পর্ব) পৃঃ ৭-৮।
২৮। বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ৩৮।
২৯। বিষ্ণুপুর তথ্যগ্রন্থ , বিষ্ণুপুর, ২০০৮ (পঞ্চায়েত সমিতি কৃত) পৃঃ ৩৮।
৩০। রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম রাঢ় গঃ সাঃ (২০০৩) পৃঃ ৪০।
৩১। সিংহ মাণিকলাল, সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী (১ম খণ্ড) পৃঃ ৯।
৩২। তদেব, পৃঃ ৮৪
৩৩। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ৬৩।
৩৪। বাঁকুড়া পরিচয় ১ম খণ্ড, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ, বাঁকুড়া, ২০১২, পৃঃ ১৩৪-৩৬।
৩৫। বাঁকুড়া পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩।
৩৬। বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি, চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া, ২০০২।
৩৭। মন্টু দাস, প্রসঙ্গ ঃ পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা, বাঁকুড়া, ১ম সং, ২০০৩।
৩৮। বাঁকুড়া পরিচয় (২০১২) পৃঃ ৩৭।
৩৯। Smith Vincent, Early History of India, Oxford 1914, Page-162.
৪০। Puratattva No. XXXVII 2006-07 P.54
৪১। ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি (১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৬) পৃঃ ৪০৯।
৪২। বাঁকুড়া পরিচয়, পৃঃ-১২৫।
৪৩। Kramrisch, S (1933), Indian Sculpture, Calcutta, P-205.
৪৪। Ray, N.R. Sculpture in The History of Bengal (R.C. Majumdar) (Daka 1943-71) P.520-7.
৪৫। Saraswati, S. K., (Cal-1957) Survey of Indian Sculpture, Early Sculpture of Bengal; Biswas, S. S., (Delhi-1981) Terracotta Art of Bengal.
৪৬। Banerjee A.K., (Calcutta 1968) W.B. District Gazetteers, Page-69.
৪৭। ibid, Page-67.

৪৮। চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দ, বাঁকুড়া জেলার সদ্যপ্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন শিলালিপি এবং এই সময় পত্রিকা, কলিকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

৪৯। কর রামানুজ, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, বাঁকুড়া, ১৯২৫, পৃঃ-১০৯।

৫০। কর রামানুজ, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, পৃঃ-১০২।

৫১। সিনহা এন. কে., ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (খণ্ড-১) কলি-১৯৬২, পৃঃ-৩৮।

৫২। চ্যামবনকে লেখা জেলাশাসকের পত্র তাং ২১/০৫/৮৭, ৩০/০৫/৮৭ এবং জেলাশাসককে চীপের পত্র তাং ২৩/১১/১৭৯০; প্রাদেশিক সরকারকে জেলা শাসকের পত্র তাং ০৫/০৭/১৭৯৩।

৫৩। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ১২/০৫/১৭৯৫।

৫৪। কমার্শিয়াল রেসিডেন্টকে জেলাশাসকের পত্র, তাং ২৫/০৩/১৮৪৩।

৫৫। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ০৭/০২/১৭৯২।

৫৬। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ১৫/০৬/১৭৮৯।

৫৭। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ২৫/০৩/১৮০০।

৫৮। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ১৭/০৭/১৭৮৭।

৫৯। তদেব, তাং ২৭/০৩/১৮০১

৬০। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ১৭/০৩/১৮০৯।

৬১। কর রামানুজ, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, পৃঃ ৯২।

৬২। তদেব তাং ০৭/০৬/১৮৩১।

৬৩। তদেব তাং ০৫/০৫/১৮২০।

৬৪। শিল্প দপ্তরের এক সচিবকে লেখা সিউড়ি সমাহর্তার জানুয়ারির ১৮৬২-র পত্র।

৬৫। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ০৫/০৫/১৮২০।

৬৬। তদেব তাং ০৭/০৬/১৮৩১।

৬৭। তদেব।

৬৮। পোড়েল সুদীপ্ত, বাঁকুড়ার বনকথা, খেয়ালী ২০১২, পৃঃ ৪৪,৬০।

৬৯। রায় প্রফুল্লচন্দ্র, আত্মচরিত, কলিঃ ২০০৬, শৈব্যা, পৃঃ ৩২২।

৭০। রায় প্রফুল্লচন্দ্র, আত্মচরিত, কলিঃ ২০০৬, শৈব্যা, পৃঃ ৩২২।

৭১। ম্যাজিস্ট্রেট রক্ষিত নীলকুঠি রেজিস্টার, তাং ২৪/০৮;১৮২৯।

৭২। বিচার সচিবকে ম্যাজিস্ট্রেটের পত্র, তাং ২১/০১/১৮৩০।

৭৩। বাঁকুড়ার খেয়ালী, ২০০৮, (প্রবন্ধ রথীন্দ্রমোহান চৌধুরী), পৃঃ ৪৬।

৭৪। কর রামানুজ, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, পৃঃ ১০০।

৭৫। ১৮৩৭ খ্রিঃ ক্ল্যাফোর্ডের নোট। তিনি বলেন লাক্ষা, ‘largely used in the arts in England’

৭৬। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ১৪/০২/১৭৯২।

৭৭। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ১৩/০৬/১৭৯৭।

৭৮। তদেব।

৭৯। বোর্ড অব রেভেন্যুকে জেলাশাসক, তাং ১১/১২/১৭৯২।

৮০। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ৩০/০৫/১৭৯৩।
৮১। বীরভূম কালেকটর কোম্পানী পত্রাচার, তাং ০২/০৫/১৮০০।
৮২। বোর্ড অব ট্রেড প্রতিবেদন, তাং ৩০/০৫/১৭৯৩।
৮৩। জেলাশাসকের পত্র বোর্ড অব রেভেন্যুকে, তাং ১১/১১/১৭৯২।
৮৪। বোর্ড অব রেভেন্যু তাং ১৫/০৬/১৭৮৯।
৮৫। Indian Co-operative Union, Report on the Marketing of Handicrafts, New Delhi '55 Chapter (IV) Sec. 236.
৮৬। State Statistical Bureau, Cal '63, Report on pottery Industry.
৮৭। প্রবাসী, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ চৈত্র ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ৫৪৬-৫৪৯।
৮৮। কর রামানুজ, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ।
৮৯। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পৃঃ ১৩৫।
৯০। গঙ্গারাম, মহারাষ্ট্রপুরাণ।
৯১। বিদ্যালঙ্কার বাণেশ্বর, চিত্রাচম্পু।
৯২। Holwell, J.Z. Interesting Historical Events, London 1772, P-121-122.
৯৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মদনমোহন বন্দনা।
৯৪। চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দ, ফকিররামের সত্যপীরের পাঁচালি, বিষ্ণুপুর—২০১২, পৃঃ ৮।
৯৫। ভট্টাচার্য তরুণদেব, পুরুলিয়া, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৯৯
৯৬। লেখকের ক্ষেত্রসমীক্ষা। সাথে ইন্দাসের তৎকালীন বিডিও অয়ন দাস।
৯৬ক। President's Minute to the Board, Secret, dt. 21/01/1773.
৯৬খ। Bhadra Goutam, Social Groups and Relations in the Town of Murshidabad, IHR, Vol-II, No.-2 Jan. 1976.
৯৬গ। Bhattacharya Ananda, Reconsidering the Sannyasi Rebellion, Social Scientist-2012.
৯৭। পালিত হেমেন্দ্রনাথ, শুভঙ্করী রাঢ়বঙ্গের গণিত পদাবলী, বর্ধমান, '০১, পৃঃ ৩০-১০৪।
৯৮। Blackwood J.R. Survey & Census of the Cattle of Bengal, 1915.
৯৯। জেলাশাসক হার্টের প্রতিবেদন, ১৯২৬ খ্রিঃ।
১০০। পালিত হেমেন্দ্রনাথ, শুভঙ্করী রাঢ়বঙ্গের গণিত পদাবলী, বর্ধমান, ২০০১, পৃঃ ৩১।
১০০ক। সাহা শক্তিনাথ, বঙ্গীয় অর্থনীতির ধারা, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ৭৩।
১০১। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৪৯৯।
১০২। চৌধুরী রথীন্দ্রমোহন, পৃঃ ১৯, ৬৮।
১০৩। Grant James, Analysis of the Finances of Bengal, Calcutta, 1786.
১০৪। Hunter W.W., Annals of Rural Bengal, Calcutta, 1868.
১০৫। Beverly H.B., Report on Census of Bengal, 1872, Calcutta.
১০৬। O'donnel, C.J. Census of the Lower Provinces of Bengal, 1891, Calcutta.

পরিশিষ্ট

সারণি - ১ : সরকারের রাজস্ব (১৮৯২-১৯১১) : বাঁকুড়া

অর্থবর্ষ	মোট রাজস্ব (টাকা)	আয়কর (টাকা)	আয়করদাতাদের সংখ্যা (জন)	যাহাদের বার্ষিক আয় ২০০০৲ বেশী	যাহাদের বার্ষিক আয় ১৫০০-২০০০৲ মধ্যে
১৮৯২-৯৩	৮৫৮১৫৫	১৪৩৬৬	৭৯৫	৩৪	৪৩
১৮৯৩-৯৪	৮৬৫০৯৮	১৪৩৯৫	৮১৩	৩২	৪৩
১৮৯২-৯৩	৮৫৮১৫৫	১৪৩৬৬	৭৯৫	৩৪	৪৩
১৮৯৩-৯৪	৮৬৫০৯৮	১৪৩৯৫	৮১৩	৩২	৪৩
১৮৯৪-৯৫	৮৮৭৪৫৩	১৪২৪৭	৭৯১	৩৫	৪৩
১৮৯৫-৯৬	৮৮৪৩০৩	১৫৩২২	৮৪৭	৩৮	৪৫
১৮৯৬-৯৭	৯১৪০৩	১৫৯৯১	৮৭২	৪৩	৪০
১৮৯৭-৯৮	৯৪৯৬৬৯	১৬২১১	৮৫৭	৪৯	৩৮
১৮৯৮-৯৯	৯৪৫৫৭৩	১৭৬৪২	৮৬০	৪০	৩৬
১৮৯৯-১৯০০	৯৫৩৭৯০	১৭১৪০	৯০৩	৪৯	৩৭
১৯০০-০১	৯৬২৮৮৮	১৭১৮২	১০২৭	৪০	৩৫
১৯০১-০২	৯৮১০৬৯	১৮৩২৬	১০৮৯	৫২	৪২
১৯০২-০৩	১০১৩৩৮৮	২৩০৬৭	১১০১	*	*
১৯০৩-০৪	১৯১২৫৮০	১৫৭১৫	৩৭৪	*	*
১৯০৪-০৫	১০১৪৮১৪	১৮২২৪	৪১৩	*	*
১৯০৫-০৬	১০৩০৭০	১৭২১২	৪০০	*	*
১৯০৬-০৭	১০৩২৪৫০	২০৬৩৮	৪৬৩	*	*
১৯০৭-০৮	১০৭৮২৫৪	১৯৫১৯	৪৬৭	*	*
১৯০৮-০৯	১০৯৯৭০৬	২০৫৭৩	৪৬৭	*	*
১৯০৯-১০	১০৯৫৩৮৮	২১৬৭৪	৫০৫	*	*
১৯১০-১১	১০৭৪০৩০	২১৫৮২	৫১০	*	*

* ১৯০২-১১ পর্যন্ত বার্ষিক আয় সংক্রান্ত কোনো নথি পাওয়া যায়নি।

সারণি-২ : স্ট্যাম্প বাবদ আদায় : বাঁকুড়া

১৮৯২-৯৩	সাল	২১৫৮৫১
১৮৯৫-৯৬	সাল	২১৮০৮৪
১৮৯৯-১৯০০	সাল	২১৮০৭৪
১৯০০-০১	সাল	২৭৯৩৭৩
১৯০১-০২	সাল	২৮৭৯৯৩
১৯০৪-০৫	সাল	২৯৮৫৯৫
১৯১০-১১	সাল	৩২৮৭৫৪

সারণি - ৩ : আবগারি বিভাগের শুল্কবাবদ আয় (১৮৯২-১৯১১) : বাঁকুড়া

১৮৯২-৯৩	৬৮১৭১্	১৯০২-০৩	১০৬৮২০্
১৮৯৩-৯৪	৬৫৫৭৭্	১৯০৩-০৪	১০৬৮২২্
১৮৯৪-৯৫	৭১৮৭৪	১৯০৪-০৫	১০৬৭০৩্
১৮৯৫-৯৬	৮১৪৯০্	১৯০৫-০৬	১১৫৭৭৯্
১৮৯৬-৯৭	৮২৪২১	১৯০৬-০৭	১২০১২১্
১৮৯৭-৯৮	৮১৫৭৪্	১৯০৭-০৮	১১১৬৫০্
১৮৯৮-৯৯	৮৬১৯১্	১৯০৮-০৯	১১৯০০৪্
১৮৯৯-১৯০০	৯৩২৭২্	১৯০৯-১০	১২৪২০২্
১৯০০-০১	৯৪৭৮৩্	১৯১০-১১	১২৬৭৪৯্
১৯০১-০২	১০০৮১৫		

সারণি - ৪ : বাঁকুড়া জেলায় সরকারের আয় (১৯১১-১৯২১)

সাল	ভূমিরাজস্ব (টাকা)	স্ট্যাম্প (টাকা)	আয়কর (টাকা)	আবগারী (টাকা)	অন্যান্য (টাকা)	রোড ও পাবলিক সেস্ (টা.)	মোট আয় টাকা)
১৯১১-১২	৪৯০৩৯৮	৩৫০০৬২	২২৭২৩	১২৪৬২৫	৩৭৮৪২	৮৩৯৪২	১০৭৫৫৩৪
১৯১২-১৩	৪৯১২০৬	৩৬৯৯২৬	২২৩৮২	১৫১৪২২	৩৮৪৯	৮৫৬২৪	১১২৪৪০৯
১৯১৩-১৪	৪৯০৮০৮	৩৭৪১৫৩	২৭৫৩১	১৭২০১৫	১১৪৮	৮৭৭৭০	১১৫৩৪২৫
১৯১৪-১৫	৪৯০৮৪৪	৩৪০৬৬০	৩১৯৫৮	১৮৯৩১৪	৬২২	৯০৩০২	১১৪৩৭০০
১৯১৫-১৬	৪৮৯০২৯	৩৬৭৮৪৩	৩৪৪৯	১৭৪৮৩১	১৯১৩	৮৩৯০০	১১৫২৪১৫
১৯১৬-১৭	৪৮৯৯৮১	৩৫৭১৯৬	৪৪৪৯৬	১৭৭৬১৯	৩৬৪	৮৩৬০১	১১৫৬৯৭
১৯১৭-১৮	৪৮৯৫১৮	৪০৩৪৭২	৪৮৩৮৯	১৯৪৬৭৬	১০৮৮	৮৪৮৬৫	১২২২০০৭
১৯১৮-১৯	৪৮৯২৭২	৩৬০৮৬	৩৮০৭২	২২১৫৭৬	১১৩১	৭৮৭১৬	১১৯৭৮৫৩
১৯১৯-২০	৪৮৯১০২	৪৭০২৩৫	৩৪৪৭১	২২৩২৫৭	৯০৫১	৪৫৯৪৬	১৩০৩৯৭৬
১৯২০-২১	৪৮৮৮৫৭	৪৪৩৯৮৮	৩৪১৯৫	২৮৫১২৫	৬১	৮৬০৭০	১৩৪২৮৮৬

সারণি - ৫ : নির্ধারী (Assessee) বা আয়কর দাতার সংখ্যা (১৯১১—২০ খ্রি.)

১৯১১-১২	সাল	৫৪৪
১৯১২-১৩	সাল	৫৫৭
১৯১৩-১৪	সাল	৬২৪
১৯১৪-১৫	সাল	৬৬১
১৯১৫-১৬	সাল	৭০৩
১৯১৬-১৭	সাল	৮৫০
১৯১৭-১৮	সাল	৯০৯
১৯১৮-১৯	সাল	৮০২
১৯১৯-২০	সাল	৩০৬
১৯২০-২১	সাল	৩৪১

সারণি - ৬ : বাঁকুড়া জেলায় সরকারের আয় (১৯১১-১৯২১)

অনটনের বছর	সরকারি সাহায্য	সমিতিগত ও ব্যক্তি উদ্যোগ	সর্বোচ্চ ধানের দাম
১৮৬৬	ত্রাণ প্রাপক, জুলাই-এ ৫০০০, আগস্টে ৫১৭৫, সেপ্টেম্বর ৮২২৩, অক্টোবর ১৪৮১৮। মোট ১০৭৮২৮ জন খয়রাতি সাহায্য ও ২১৩৬৫ জন ত্রাণের কাজ পায়।	বিষ্ণুপুর শহর ও সন্নিহিত এলাকায় ত্রাণ কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।	৩/৪ সের টাকায়
১৮৭৪	মে মাসে ত্রাণ প্রাপক ১২০০০ (খয়রাতি ৯০০০, টেস্টত্রাণ ৩০০০) জুলাই-এ ৩৩০০০। ভূমি উন্নয়ন ও কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪৪৬৬০ টাকা। মে মাসে আউশ ধানে বীজ বিতরণ করা হয়। জুলাইয়ে ত্রাণ কাজ পান ৪১০০, যা ১৩০০০০ টাকার। তৈরী হয়েছিল সেতুসহ ১৪০ মাইল রাস্তা।	জমিদার দামোদর সিং, চাঁদ রায় ব্যবসায়ী আলি জামিন ত্রাণে অংশ নেন। ৯০০০ কারিগরকে সাহায্য করা হয় ৮৫০৯০ টা. উপকরণ ও মজুরি দিয়ে। তাঁতিদের ৬৩০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়।	১১.৫ সের / টাকা

অনটনের বছর	সরকারি সাহায্য	সমিতিগত ও ব্যক্তি উদ্যোগ	সর্বোচ্চ ধানের দাম
১৮৮৫	জুন মাসে প্রত্যহ গড়ে ২৮৬০ জনকে খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হত, ১০ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের খয়রাতী প্রাপক ছিলেন ১৩৬৩৫। সোনামুখী থানায় ১৫০০০ টাকার কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছিল।	কালেকটর সি এন স্যামুয়েলসের রিপোর্টে দেখা যায় বাঁকুড়ার হরি দত্ত, বিষ্ণুপুরের উন্মেশ চৌধুরী, বীরসিংহপুরের ক্ষেত্র ব্যানার্জীরা ত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন।	
১৮৯৭	এ বছর খয়রাতী সাহায্য ছিল ৮৫৫২০৫ ও টেস্ট রিলিফের কাজ পেয়েছিল ৩১৮৫৭৭ জন।	শালতোড়া বেঁকার রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় প্রতিদিন ৫০০ লোককে অন্নপ্রদানের ব্যবস্থা করেন। জেলাশাসক এম চ্যাটারটন এই ত্রাণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন।	
১৯০৮	জানুয়ারিতে ৩৮২৫০, ফেব্রুয়ারিতে ৪৬৫৯০, মার্চে ১৩০৬২০, এপ্রিল ১৬৭৬৭০, মে ১৮০০০০, জুনে ১৭৪০৯০, জুলাইয়ে ১৭৪১৫০, সেপ্টেম্বর ৬০১৫০। ৬ শতাংশ সুদে ৬ বছরে পরিশোধযোগ্য ভূমি উন্নয়ন ঋণ ছিল ৮৭৬৭৬ টা.। কৃষিঋণ ছিল ৭০৪৮৪ টাকা। টেস্ট রিলিফে মাঝারি শক্ত ২০০ সিএফটি মাটি কাটার মজুরি ছিল ৬.৫ আনা। ২৭ জানুয়ারি ৪টি কাজে যুক্ত ছিল ২০০২ জন।	গিসবর্ন-এর ম্যানেজার নীলকর লিডিয়ার্ড রাইপুর বাংলো ত্রাণ কাজে ছেড়ে দেন। রাইপুর-খাতড়া-সিমলাপাল ত্রাণ কমিটির সংগ্রহ করেছিল ২২৫ টা. ১৩ আ. ১১৭ টা. ৮ আ. ৬ পাই, ১৯১ টাকা। বাঁকুড়া ত্রাণ কমিটি সংগ্রহ ছিল ৬২৭ টা. ৯ আ. ৬ পাই। ১৯৭ টি ভদ্রলোক রিলিফ, তাঁত রিলিফ, চাল, কাপড় বীজ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।	

অনটনের বছর	সরকারি সাহায্য	সমিতিগত ও ব্যক্তি উদ্যোগ	সর্বোচ্চ ধানের দাম
১৯১৬	অনটনগ্রস্থদের শুভঙ্করী খালের সংস্কার ও দশ আনি, ছ-আনির মুখ বাঁধাইয়ের কাজে লাগান হয়।	রেভঃ মিচেল, গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া সম্মেলনী ত্রাণকাজ করে। জেলাজজ সি টিন্ডাল তাঁত রিলিফ কমিটি গঠন করেন।	
১৯১৯	১০ ফেব্রুয়ারি জি আর বিলি শুরু। ১৫ মে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা। একদিনে সর্বাধিক জি আর প্রাপক ছিলেন ১৬০৫৪ ও রিলিফ কাজে উপস্থিত ছিল ১৮০৬৭। তাঁতীদের ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। জেলাবোর্ড ২৮১৪ মন বার্মা চাল আমদানি করে।	জেলাশাসক ভাস, রেভাঃ ব্রাউন, রেভঃ স্পুনার, এ জহার হোসেন, বসন্ত নিয়োগী, প্রসন্ন ব্যানার্জী, সত্য সাহানা, রামনাথ মুখার্জীদের নিয়ে ৫৩ জনের জেলা চ্যারিটেবল ফেমিন রিলিফ ফান্ড গঠিত হয়। এডগার মেমোরিয়াল হলে (উল্লেখ্য ১৯১১ খ্রি. এই হলের উদ্বোধন করেছিলেন জেলাশাসক এ আহমেদ) ১৮ই জানুয়ারি ২৯৩৭০ টাকা আদায় হয়।	

সারণি - ৭ : বাঁকুড়ার পির স্থান ও পিরের বিবরণ

পীর স্থান	পীরের নাম	আদি দেশ ও আগমন কাল	উরস ও উৎসবের তাং	বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বাস
নারকেলডাঙ্গা (বাগডোবা) কোতলপুর	হজরত শাহ নুর মোহাম্মদ আলায়হে	পঞ্চদশ শতক (মতান্তরে সপ্তদশ শতক)	৩রা ফাল্গুন	পির পুকুরে স্নান বা ভেষজ ওষুধে বন্ধ্যাত্ব নিরসনের মানত।
কোতলপুর উত্তরপাড়া	হজরত সৈয়দ হামিদ উদ্দিন শাহ আলি বাজ রহমতুল্লাহ ও হজরত রওশন আলি	গুজরাট, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে	৭ বৈশাখ, ২৬ কার্তিক, ৪ অগ্রহায়ণ, ২৭ শে ফাল্গুন	এক মল্লরাজপুত্রকে বজ্রাঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে বালসিতে ১৫০ বিঘা জমি পান। দুই পির 'পির কেবলাই' বলে খ্যাত।
কোতলপুর মিরেপাড়া	শাহ ইমাম	ঊনবিংশ শতাব্দী	ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার	পিরের নৈশ ঘোড়া সওয়ারীর অলৌকিক ক্ষমতা।
১) কোতলপুর মিরেপাড়া ২) পাথরচটি	১) শাহ বাটুল ২) শাহ ইসমাইল গাজি	ঊনবিংশ শতাব্দী	২রা মাঘ	রোগ আরোগ্যে মানত।
লোগো-মাধবগঞ্জ			গাজনের দশ দিন আগে	
কুলাহার (দেশড়া-কোয়াপাড়া পঞ্চায়েত)	শাহ শহীদ		পৌষ সংক্রান্তি ও পয়লা মাঘ	পিরপুকুরে বোবা শিশুকে স্নান করালে ক্রমে বাকশক্তি ফিরে আসে।

পীর স্থান	পীরের নাম	আদি দেশ ও আগমন কাল	উরস ও উৎসবের তাং	বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বাস
যমুনা গ্রাম	ইসমাইল গাজি			রোগ আরোগ্যে মানত, ৫২ বিঘা ভূমিদান করেছিলেন মল্লরাজ।
গোপীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	শাহ ইসমাইল		চৈত্রমাসের দ্বিতীয়ার্ধের এক বৃহস্পতিবার	
জয়পুর থানার ১) লোকপুর ২) নারকেলডাঙ্গা ৩) মদনমোহনপুর ৪) বৈতল	১) ইসমাইল গাজি ২) সৈয়দ হজরত নুর মহম্মদ ৩) কালো শাহ	মক্কা, উত্তরভারত	১১-১৩ ফাল্গুন ১০ চৈত্র	নবান্ন, দোলপূর্ণিমায় মানতের জন্য সমাগম। এই 'ধাওড়ে পিরের আস্তানা'য় নানা কামনায় মানত।
ময়নাপুরের উসকানচক	শাহাদন শাহ		২১ ফাল্গুন	
বিষ্ণুপুর কুরবানতলা	হজরত কুরমান শা	উত্তরপ্রদেশ, অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে	চান্দ্রমাসের ১৫ই জেলহজ তারিখ	বাঘের পিঠে ঘুরে বেড়াত, মনস্কমনা পূরণে মানত, বীর হাম্বীরের পুত্রলাভ হয় তাঁর আশীর্বাদে, চৈতন্য সিংহ (১৭৫ বিঘা) ও শাহ আলম নিষ্কর ভূমিদান করেন।

পীর স্থান	পীরের নাম	আদি দেশ ও আগমন কাল	উরস ও উৎসবের তাং	বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বাস
১) বিষ্ণুপুর কবরডাঙ্গা মহল্লা ২) পোকাবাঁধ	ঘোড়ালি বাবা, সত্যবাবা		ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি ভাদ্র মাসে	মহরমের তাজিয়া এখান প্রথামাফিক রাজবাড়িতে যায়, লোকে মনস্কামনা পূরণের আশায় এখানে আসে।
সোনামুখীর সত্যপীরতলা	বড় পীর			মনস্কমনায় মানত।
রাধামোহনপুর সোনামুখী	হাফিজুর চিস্তি, নিগিন শা		১৫ই মাঘ	মনস্কামনায় মানত।
পাত্রসায়ের ফকিরডাঙ্গা	হজরত ভড়ং শাহ হড়ংবাবা	অষ্টাদশ শতক	চৈত্র গাজন ও মকর সংক্রান্তির আগের বৃহস্পতিবার, ২১শে চৈত্র-২৪শে চৈত্র	
পাত্রসায়ের রসুলপুর	হজরত শা চিনকি পীর আজগোবী	১৭৯৫ সাল	ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবার	মল্লরাজ নিষ্কর ভূমি দিয়েছিলেন, রাজার চর্মরোগের নিরাময় হয় পিরের আশীর্বাদে।

পীর স্থান	পীরের নাম	আদি দেশ ও আগমন কাল	উরস ও উৎসবের তাং	বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বাস
ইন্দাসের রোল	শাহ মাদার	আরব, অষ্টাদশ শতকে	ফতেহা দোয়াজে উরস উৎসব	পীরের সম্মানে এলাকার সব বাড়ি একতলা। মল্লরাজ নিষ্কর জমি দেন। শাহমাদার ও বন্দেগি শাহ হলেন দুই পীর। এরা হজরত শিষ্য ওসমানের বংশধর।
১) ইন্দাসের করিশুন্ডায় ২) হায়াৎনগর ৩) চকসুকুর ৪) বিহার ৫) লাখিপুর	সৈয়দ শাহ হোসেন কিরমানি	বাগদাদ-কিরমান, ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে	১) ফাল্গুন- চৈত্র মাসের বিভিন্ন দিন। ২) ২৯শে ফাল্গুন	চৈত্র মাসের একাধিক দিনে মল্লরাজকে গঙ্গাস্নান করান বলে কথিত গ্রামবাসীরা পিরের সম্মানে এক তলায় রাত্রিবাস করে।
ইন্দাস পরীক্ষাপাড়া	বন্দে শাহ মিঞা		ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি	মনস্কমনায় মানত।
ইন্দাস	চিচিঙ্গা বন্দেগি শাহ	আরব, অষ্টাদশ শতকে	ফতেহা দোয়াজে উরস উৎসব	মল্লরাজের দানকৃত জমি একটি জৈন স্মৃতির 'সরাক' পুরুর নামে অভিহিত। পীর মল্লারাজকে দৈববলে কৃষ্ণের নাচ দেখান। সন্তান কামনায় মানত। সুসিদচক, বলাইচক, কানাইচক সহ বহু আইমা সম্পত্তি।

পীর স্থান	পীরের নাম	আদি দেশ ও আগমন কাল	উরস ও উৎসবের তাং	বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বাস
ইন্দাস গ্রাম	লস্কর পির			সন্তান লাভের আশায় মানত হয় পূর্ণিমা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বাড়ির জানলা বন্ধ রাখা হয় এই বিশ্বাসে যে সেসময় পির রাস্তায় হাঁটেন।
ইন্দাসের শেখডাঙ্গা শিয়ুলিয়া	হালিমা বিবি		মহরম মাসের ৭ তারিখ	কেউ ঘরে তালা দেয়না এই বিশ্বাসে যে পীর রাত পাহারা দেন। তাঁর সম্মানে এলাকাবাসী একতল বিশিষ্ট গৃহে থাকে।
রাইপুর	মিরণ শাহ (জালাল শাহ, বুলবুল শাহ, কাজল শাহ)	উত্তরপ্রদেশ	২৭, ২৮, ২৯ শে ফাল্গুন	বর্গীদের বিরুদ্ধে এই পির লড়াই করেছিলেন বলে একাংশের ধারণা। একাজে মীর আলি আসগর কোবরা নামক ৬-৭ শত সেনার নায়ক এক পীরের নাম পাওয়া যায়।
বাদুলাড়া-জিরাবাইদ বাঁকুড়া থানা	পির আসরাফি	কাশ্মীর, ঊনবিংশ অন্তভাগে (মতান্তরে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে)	৮ই চৈত্র	মনস্কমনা পূরণে মানত।
বড়জোড়া আশুড়িয়া, নড়ত, কাটাবাঁধ-পীরপুকুর	১) শাহ ইসমাইল গাজি লস্কর, চিরাগ	পূর্ববঙ্গ	পৌষপার্বণ	কাঁটাপুকুরে ৩৫৬ বিঘা পীরোত্তর জমি। চিরাগ রাতের বিষ্ণুপুরে আলো জ্বালিয়েছিলেন বলে কথিত।

পীর স্থান	পীরের নাম	আদি দেশ ও আগমন কাল	উরস ও উৎসবের তাং	বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বাস
ওন্দা-বীরসিংহপুর	নাঘিংষীবাবা	আরব		পীরপুকুরের প্রয়োজনীয় বাসনপত্র আপনি উঠে আসত ও মিলিয়ে যেত বলে প্রচারিত।
ইদগা মহল্লা, নুনগোলা রোড, সওদাগর গলি, ষোলআনা রোড	খাকী শাহ			

সারণি - ৮ : বাঁকুড়ায় অপরাধতত্ত্ব

সাল	খুনের সংখ্যা	ডাকাতির সংখ্যা ডাকাতির চেষ্টা	জীবন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ	চুরির সংখ্যা	গরু চুরির সংখ্যা	মোট অপরাধের সংখ্যা	দণ্ডিতের সংখ্যা
১৮২৩	৩৩		২২২৩			২১৪৮	৭৬০ (প্রায়)
১৮২৬	৫০ (প্রায়)		৩২৯৩			৩০৬৮	১০৯০ (প্রায়)
১৮৩৬						৪৩১	৭৯৩
১৮৪৫		২৯ ও ৬	৩৩৫	২১৩	১২	৭৩৫	৬৪০
১৮৪৬		১৬ ও ২	৮০৪	৩৪৫	৩৪	৮০৪	১৪৫০
১৮৪৭		১০	১৩২৩				

১৮৩৬ সাল ও ১৮২৩-২৫ সালের মধ্যে অপরাধিত্বের তুলনামূলক তথ্যাদি :

সাল	১৮২৩-২৬ সালের গড়	১৮৩৬ সাল
মারাত্মক অপরাধের ঘটনা :	১১২৯	১০৬
মারাত্মক অপরাধে জড়িতের সংখ্যা :	২২০৮	২৮০
মারাত্মক অপরাধে জড়িতদের মধ্যে দণ্ডিতের সংখ্যা :	৮৩৩	১৮২
সাধারণ অপরাধের ঘটনা :	১৫৩৫	৩২৫
সাধারণ অপরাধে জড়িতের সংখ্যা :	৩০৬৩	৮৮৬
সাধারণ অপরাধে জড়িতদের মধ্যে দণ্ডিতদের সংখ্যা :	১৫০৬	৬১১

বাঁকুড়ার জেলে বন্দী কয়েদীদের (১৮৫৭-১৮৭১) সংখ্যা :

১৮৫৭ সালে ৩৬৯, ১৮৫৮ সালে ৪৭৬, ১৮৫৯ সালে ৪৮৩, ১৮৬০ সালে ৩৬০, ১৮৬১ সালে ৩২১, ১৮৬২ সালে ৩৮২, ১৮৬৩ সালে ৪২৮, ১৮৬৪ সালে ৪০৯, ১৮৬৫ সালে ৪৯৭, ১৮৬৬ সালে ৬৫০, ১৮৬৭ সালে ৫৫৭, ১৮৬৮ সালে ৫৩২, ১৮৬৯ সালে ৪২২, ১৮৭০ সালে ৩৬৯, ১৮৭১ সালে ২৮৭।

সারণি-৯ : বাঁকুড়ার অস্থলগুলির বিবরণ

১) দুর্জন সিংহের আমলে ১৬৯৩ সালে সূচিত বড়জোড়া-দধিমুখার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অস্থল। শেষ মহন্ত আনন্দকিশোর দেব গোস্বামী।

২) চৈতন্য সিংহের সময়ে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দপুর-বেলুট অস্থল। প্রতিষ্ঠাতা রাজপুতনা-কদম্বখণ্ডীর ধর্মদাস। এরা ছিলেন রামানন্দপন্থী।

৩) ১৮০০ সালে বেলিয়াতোড়ে শাখা-অস্থলের ও গোপাল-সঞ্চর্ষণ দাস নাম্নী মহন্তর খোঁজ মেলে। এদের সাথে জমিদার রায় বাড়ির ধর্মীয় সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

৪) চৈতন্য সিংহের সময়ে ডাকাইসিনি (বড়জোড়া) অস্থলটি গড়ে ওঠে রামাউৎ দুজন সম্প্রদায় (মতান্তরে নিম্বার্ক বৈষ্ণব) দ্বারা। শেষ মহন্ত গোপাল দাস।

৫) মাঞ্চিমুড়া ও খাটিল্যায় (বড়জোড়া) দুটি শাখা অস্থল প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬) ওন্দার খামারবেড়ায় রামানুজদাস নাগা (মতান্তরে ১৭৩০ সালে লক্ষণ দাস নাগা) রামানুজপন্থী এই অস্থলটির পত্তন করেন। পরে সেটি ঝিলমিল-তালগড়ায় বিষ্ণুদাস মহন্তের আশ্রমে স্থানান্তরিত হয়।

এছাড়া মনোহরপুর সত্যায়তনের (জাতিভেদ বিরোধী ক্ষেত্রপাল আন্দোলনের স্রষ্টা) মতে অনেক আশ্রম গড়ে উঠেছিল। যার প্রভাবে গড়ে উঠেছিল যজমানী প্রতিষ্ঠান।

গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয় কুমার দত্ত	পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা (কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শকাব্দ)
অক্ষয় কুমার মৈত্র	গৌড়ের কথা (পুনঃপ্রকাশ, কলিকাতা-১৯৮৩)
অক্ষয় কুমার মৈত্র	গৌড়লেখমালা (কলকাতা-১৯৯২)
অক্ষয় কুমার কয়াল (স.)	রূপরামের কাব্য (কলিকাতা - ২০১১)
অচিন্ত্য জানা	আদিবাসী সাঁওতাল (বাঁকুড়া-১৯৯৭)
অচিন্ত্য জানা	বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে লোকশিল্প (বাঁকুড়া-১৯৯৯)
অচিন্ত্য জানা	লোকায়ত সংস্কৃতি (বাঁকুড়া-১৯৯৩)
অচিন্ত্য জানা	সমবায় আন্দোলনে বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-১৯৯৯)
অতুল সুর	বাঙলার সামাজিক ইতিহাস (কলিকাতা-১৯৭৬)
অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	মধ্য যুগের বাঙলা ও বাঙালী (কলিকাতা-১৯৮৬)
অভয়চরণ দাস	ইন্ডিয়ান রায়ত, ল্যান্ড ট্যাক্স, পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যান্ড দ্যা ফেমাইন (কলকাতা-১৮৮১)
অভয়পদ মল্লিক	হিস্ট্রি অব বিষ্ণুপুররাজ (ক্যালকাটা-১৯২১)
অমলেন্দু মিত্র	রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (কলিকাতা-২০০০)
অমলেশ ত্রিপাঠী	ট্রেড অ্যান্ড ফাইনান্স অব বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ১৭৯৩-১৮৩৩ (কলকাতা-১৯৭৯)
অমরেন্দ্রনাথ রায়	বাংলার পূজাপার্বণ (কলকাতা-১৯৫০)
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (স.)	বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র (কলিকাতা-১৩৯০ বঙ্গাব্দ)
অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (ক্যালকাটা-১৯৬৮)
অমিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি (কলিকাতা-১৯৭১)
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাঁকুড়ার মন্দির (কলিকাতা-১৯৭১)
অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (কলিকাতা-১৪১৬ বঙ্গাব্দ)
অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (স.)	দ্বিজ কবিচন্দ্রের কপিলামঙ্গল (বিষ্ণুপুর-২০১২)
অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (স.)	শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঁকুড়ালক্ষী (বিষ্ণুপুর-২০১৬)
অরুণ কুমার মজুমদার	প্রাচীন জরিপের ইতিহাস (কলকাতা-১৯৯৫)
অশোক দত্ত	চ্যালকোলোথিক কালচার ইন বেঙ্গল-এ স্টাডি অন সেটেলমেন্ট এ্যান্ড ট্রানজিসন (নিউ দিল্লী-১৯৯০)
অশোক মিত্র	পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (দিল্লী -১৯৬৮)

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় খন্ড (পুনঃমুদ্রণ কলিকাতা-১৯৯৯)
আচার্য প্রজ্ঞানন্দ তর্করত্ন	মার্কণ্ডেয় পুরাণ (নবভারত প্রকাশন, কলকাতা-১৩৯০ বঙ্গাব্দ)
আনন্দ ভট্টাচার্য	সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (কলিকাতা-২০১০)
আব্দুল করিম	মুর্শিদকুলি খান অ্যান্ড হিজ টাইমস (ঢাকা-১৯৬৩)
আব্দুস সালাম (অনুবাদ)	রিয়াস-উস-সালাতিন (গুলাম হুসেন সালিম লিখিত) (ঢাকা-১৮৯৩)
আর. কে. গুপ্ত	দ্যা ইকনমিক লাইফ অফ এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট (বর্ধমান-১৯৮৪)
আর বিদ্যারত্ন (স.)	নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস (মুর্শিদাবাদ ১৮৯১)
আর বিদ্যারত্ন (স.)	যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ (মুর্শিদাবাদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)
আলেকজাণ্ডার কানিংহাম	দ্যা অ্যানসিয়েন্ট জিওগ্রাফী অব ইণ্ডিয়া (প্র. প্র. ১৮৭১, পুনঃ প্রঃ দিল্লী-২০০৬)
আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (কলিকাতা-১৯৫৮)
ইউ এন ঘোষাল	অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অব অ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল (কলকাতা-১৯৩০)
ই. টি. ডাল্টন	ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৮৭২)
ই. সি. ডিমক	কৃষ্ণদাস কবিকাজের চৈতন্যচরিতামৃত (হাভার্ড বি. বি. প্রেস -১৯৯৯)
ই. সি. ডিমক-পি. সি গুপ্ত	গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ (হনলুলু-১৯৬৫)
ঈশ্বর ত্রিপাঠী	সাহিত্য ও অর্থনীতি (বাঁকুড়া-১৯৯৬)
উইলফ্রেড এইচ. স্কফ	পেরিপ্লাস অফ দ্যা ইরিট্রিয়ান সি (ফিলাডেলফিয়া ১৯১২)
উইলিয়াম উইলকক্স	অ্যানসিয়েন্ট সিস্টেম অব ইরিগেশন ইন বেঙ্গল (কলকাতা-১৯৩০)
উমাপদ রায় ও অন্যান্য (স.)	সংকলনে শুভঙ্কর (বাঁকুড়া-রামপুর-২০০৮)
এইচ আর গিব্বি (অনু.)	ইবন বতুতাস ট্রাভেলস ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা (লন্ডন-১৯২৯)
এইচ. এইচ. রিসলে	ট্রাইবস এ্যান্ড কাস্ট অব বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৮৯১)
এফ. এইচ. বি. স্ক্রাইন	লাইফ অব ডব্লু ডব্লু হান্টার (লন্ডন-১৯০১)
এইচ. এস. এম. ঈসাক ও চারুচন্দ্র সেন	প্লট টু প্লট এনুম্যারেশন ইন বেঙ্গল-১৯৪৪-৪৫ (ক্যালকাটা-১৯৪৬)
এইচ এস গ্যারেট	আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি (কলিকাতা-১৮৯১)
এইচ কুপল্যান্ড	মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (ক্যালকাটা-১৯১১)

এইচ. জ্যাকোবি	আচারাঙ্গ সূত্র (অনু.) (অক্সফোর্ড-১৮৮৪)
এইচ পি শাস্ত্রী	বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি-১৮৮৮)
এইচ.বি. বিভারলি	রিপোর্ট অন সেনসাস অব বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৮৭২)
এইচ জি রাভেরটি (অনু.)	মিনহাজউদ্দিনের তবকত-ই-নাসিরি (দিল্লী, পুনঃ প্রকাশ-১৯৭০, মূলপ্রকাশ-১৮৮১)
এইচ. বেভারিজ (অনু.)	আবুল ফজল-আকবরনামা (কলিকাতা-১৯৩৪)
এডোয়ার্ড সি ডিমক (অনু.)	কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত (হাভার্ড ১৯৯৯)
এ. দত্ত	দ্যা ট্রাইবস এ্যান্ড কাষ্ট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৯৫৩)
এন. আর. পট্টানায়েক	ল্যান্ড এ্যান্ড এগ্রিকালচার ইন মিডিয়াভাল ওড়িষা (১৯৯৭)
এন. কে. সিনহা	ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (দিল্লী-১৯৬০)
এফ.এইচ. বি স্ক্রাইন	মেমোর‍্যান্ডাম অন দ্যা মেটেরিয়াল কন্ডিশন অব দ্যা লোয়ার অর্ডারস ইন বেঙ্গল ডিউরিং দ্যা টেন ইয়ারস ফ্রম ১৮৮১-১৮৯২ (ক্যালকাটা-১৮৯২)
এফ. ডব্ল্যু. রবার্টসন	ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্যা সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অফ বাঁকুড়া ১৯১৭-১৯২৪ (কলকাতা-১৯২৬)
এফ. ডি এ্যাসকোলি	আর্লি রেভেনিউ হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল এ্যান্ড ফিফথ রিপোর্ট (অক্সফোর্ড ১৯১৭)
এফ. বি. ব্রাডলি বার্ট	দ্যা স্টোরি অফ এ্যান ইন্ডয়ান আপল্যান্ড (লন্ডন-১৯০৫)
এ. বি. কেইথ (অনু.)	ঐতরেয় আরণ্যক (দিল্লি-২০০৫)
এ্যাবে রাইনল	ফিলোজফিক্যাল এ্যান্ড পলিটিক্যাল হিষ্ট্রি অব দ্যা সেটেলমেন্ট এ্যান্ড ট্রেড অব দ্যা ইউরোপিয়ান ইন দ্যা ইষ্ট এ্যান্ড ওয়েষ্ট ইন্ডিজ (জাস্টামন্ড কৃত অনুবাদ, লন্ডন-১৭৭৭)
এম. আই. বোরাহ (অনু.)	মির্জানাথনের বাহরিস্থান-ই-ঘাইবি (কলকাতা-১৯৩৬)
এম. এস. রণধাওয়া	এ হিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার ইন ইন্ডিয়া (দিল্লী-১৯৮২)
এম চক্রবর্তী	এ সামারি অব দ্যা চেঞ্জেস ইন দ্যা জুরিডিকসন অব ডিস্ট্রিক্টস ইন বেঙ্গল ১৭৫৭-১৯১৬ (কলিকাতা ১৯৯৯)
এম. সি. ম্যাকালপিন	রিপোর্ট অন দ্যা কন্ডশন অব দ্যা সাঁওতাল ইন দ্যা ডিষ্ট্রিক্টস অব বীরভূম, বাঁকুড়া, মিদনাপুর অ্যান্ড নর্থ বালাসোর (ক্যালকাটা-১৯০৯)
এল. পি. সাইরেস	মেমোর‍্যান্ডাম অন দ্যা মেটেরিয়াল কন্ডিশন অব দ্যা পিপল অব বেঙ্গল ইন দ্যা ইয়ারস ফ্রম ১৮৯২-৯৩ টু ১৯০১-০২ (ক্যালকাটা-১৯০২)

এল.এস.এস. ও' ম্যালী	বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (ক্যালকাটা-১৯০৮)
এল.এস.এস.ও'ম্যালী	বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (কলিকাতা-১৯১০)
এল.এস.এস.ও'ম্যালী	মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (কলি-১৯১১)
এলিয়ট ও ডওসন (অনুবাদ)	জিয়াউদ্দিন বরণীর তারিখি-ই-ফিরোজশাহি (লন্ডন-১৮৭১)
এস. এস বিশ্বাস	আর্লি স্কালপচার অব বেঙ্গল (দিল্লী-১৯৮১)
এস. কে. সরস্বতী	সার্ভে অব ইন্ডিয়ান স্কালপচার (ক্যালকাটা-১৯৫৭)
এস বি চৌধুরী	সিভিল ডিস্টারবেন্স ডিউরিং দ্যা ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া ১৭৬৫-১৮৫৭ (কলিকাতা-১৯৫৫)
এস সি মুখোপাধ্যায়	ব্রিটিশ রেসিডেন্টস অ্যাট দ্যা দরবার অব নবাব অব মুর্শিদাবাদ ১৭৫২-৭২ (দিল্লী-১৯৮৮)
এস সি মজুমদার	রিভারস অব দ্যা বেঙ্গল ডেল্টা (কলকাতা-১৯৪১)
এস সি সরকার	সাম অ্যাসপেক্টস অব দ্যা আরলিয়েস্ট সোসাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড-১৯২৮)
ওয়ালাটার হ্যামিলটন	অ্যা জিওগ্রাফিক্যাল, স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যান্ড হিস্টরিক্যাল ডিসক্রিপসন অব হিন্দোস্তান এ্যান্ড দ্যা এ্যাডজাসেন্ট কাউন্টিজ (ওরিয়েন্টাল পাবলিশার্স-১৮২০)
কানাইপদ রায়	উত্তর চব্বিশপরগণার সেকাল একাল (কলিকাতা-২০০৭)
কালিকিংকর দত্ত	শাহ আলম-২ অ্যান্ড দ্যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (ক্যালকাটা-১৯৬৫)
কালিকিঙ্কর দত্ত	স্টাডিস ইন দ্যা হিস্ট্রি অব বেঙ্গল সুবা ১৭৪০-৭০ (কলিকাতা-১৯৩৬)
কালিচরণ ঘোষ	ফেমাইন ইন বেঙ্গল ১৭৭০-১৯৪৩ (কলিকাতা-১৯৮৭)
কালীকান্ত রায়	বাঁকুড়া জিলা-ভূগোল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ (বাঁকুড়া, ১৯৩৬)
কৃষ্ণপ্রসাদ সেন ও যোগেশচন্দ্র রায়	চণ্ডীদাসচরিত (কলকাতা-১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)
কে এম ব্যানার্জী (স.)	পুরাণ সংগ্রহ (কলিকাতা-১৮৫১)
কে. এস. নিউম্যান	টাইপোলজি অব লিগাল ইনস্টিটিউসন (কেমব্রিজ ১৯৮৩)
কেয়ামুদ্দিন আহমেদ (স.) ও প্রভাত মুখোপাধ্যায় (অ.)	আল বেরুণী রচিত ভারত (নয়া দিল্লী-১৯৯৮)
গঙ্গাগোবিন্দ রায়	মল্লভূম কাহিনি (বিষ্ণুপুর-১৯৫৪)
গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (স.)	প্রসঙ্গ বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-১৯৯৯)
গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (স.)	বিষয় বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-২০০০)
গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (স.)	বাঁকুড়ার খেয়ালী (বাঁকুড়া ২০০৩-১৬)

গুরুসদয় দত্ত	এগ্রিকালচার অর্গানাইজেসন অ্যান্ড রুরাল রিকনস্ট্রাকসন ইন বেঙ্গল (ক্যালকাটা - ১৯৯৯)
গুরুসদয় দত্ত	ভিলেজ রিকনস্ট্রাকসন (ক্যালকাটা-১৯২৫)
গুলাম হোসেন সেলিম	রিয়াজ-উস-সালাতিন (আব্দুস সালাম কৃত অনুবাদ, কলিকাতা-১৭৮৮)
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	বাংলার লৌকিক দেবতা (কলকাতা-১৯৬৪)
গৌতম কুমার মণ্ডল ও নভনীত আচার্য (স.)	ভারতীয় সাহিত্য : লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান (কলিকাতা-২০০২)
গৌতম দে (স.)	পশ্চিম রাঢ় গবেষণা সাময়িকী (বাঁকুড়া ২০০৩)
গৌতম ভদ্র	জাল রাজার কথা বর্ধমানের প্রতাপ (কলিকাতা-২০০২)
গৌতম ভদ্র	মুঘল যুগের কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ (কলি-২০০৩)
গৌতম ভদ্র ও পার্থ চ্যাটার্জী	নিম্নবর্গের ইতিহাস (কলিকাতা-১৯৯৮)
গৌরপদ সেন	মল্লভূমি জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা (বর্ধমান-২০১১)
গৌরীপদ চ্যাটার্জি	হিস্ট্রি অব বগরী রাজ্য (দিল্লী-১৯৭৬)
চার্লস স্টুয়ার্ট	হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (লন্ডন-১৮১৩)
চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত	বিষ্ণুপুর মন্দির টেরাকোটা (কলিকাতা-১৯৮০)
চিত্রব্রত পালিত	পারসপেকটিভ অব অ্যাগ্রারিয়ান বেঙ্গল (কলিকাতা-১৯৮২)
চিত্রব্রত পালিত	টেনশন ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি ল্যান্ডলর্ড, প্ল্যান্টারস এ্যান্ড কলোনিয়াল রুল, ১৯৩০-১৮৬০ (কলকাতা-১৯৭৫)
চিত্ত মণ্ডল ও প্রথমা রায় মণ্ডল	বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত (কলিকাতা-২০০৩)
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	নন্দবংশ (সিউড়ি-১৯৩০)
জন আর. ম্যাকলেন	ল্যান্ড ল্যান্ড লোকাল কিংশিপ ইন এইটটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল (অক্সফোর্ড-১৯৯৩)
জন বিমস	ট্রাইবস এ্যান্ড কাস্ট ইন ওড়িষা (কটক-২০০৪)
জন বিমস	মেমোয়ার অব অ্যা বেঙ্গল সিভিলিয়ান (লন্ডন-১৯৬১)
জলধর হালদার (স.)	প্রত্নপরিক্রমা : মল্লভূম (বিষ্ণুপুর-২০০৮)
জয়কৃষ্ণ দাস	মদনমোহন বন্দনা (বিষ্ণুপুর ১৮৬১ সালের পাণ্ডুলিপি)
জি এ গ্রিয়ার্সন	লিঙ্গুইস্টিকস সার্ভে অব ইন্ডিয়া (দিল্লী-১৮৬৭)
জে এইচ লিটল	দ্যা কুঠি অব জগৎ শেঠ, বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্টস, খণ্ড-২৩, (কলি-১৯২১)
জে. আর. ব্ল্যাকউড	এ সার্ভে এ্যান্ড সেনসাস অব দ্যা ক্যাটল অব বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৮৬৩)
জন আর. ম্যাকলেন	ল্যান্ড এ্যান্ড লোকাল কিংশিপ ইন এইটটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল (অক্সফোর্ড-১৯৯৩)

জে.ই. গ্যাসট্রেল	জিওগ্রাফিক্যাল এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল স্কেচ অব বাঁকুড়া (ক্যালকাটা-১৮৭৮)
জে এন সমাদ্দার	বর্গী ইনভেসন অব বেঙ্গল (কলিকাতা-১৯২৫)
জে. জেড. হলওয়েল	ইন্টারেস্টিং হিষ্টোরিক্যাল ইভেন্ট রিলেটিভ টু দ্যা প্রভিন্স অব বেঙ্গল এ্যান্ড দ্যা এম্পায়ার অব হিন্দুস্থান (লন্ডন-১৭৬৫)
জে টাকাকুসু	ই. সিং রেকর্ড অব দ্যা বুদ্ধিষ্ট রিলিজিয়নস অ্যাজ প্র্যাকটিসড ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড মালয় আর্কিপেলাগো (অক্সফোর্ড-১৮৯৬)
জে ডি বেগলার	রিপোর্ট অব এ ট্যুর থ্রু দ্যা বেঙ্গল প্রভিন্স (ক্যালকাটা-১৮৭৮)
জে. ডব্ল্যু ম্যাকক্রিনডেল	মেগাস্থেনিস এ্যান্ড এ্যাড়িয়ান (লন্ডন-১৮৭৭)
জে. ডব্ল্যু ম্যাকক্রিনডেল	অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া এ্যাজ ডেসক্রাইব্ড ইন ক্লাসিক্যাল লিটারেচার বাই টলেমি (লন্ডন-১৯০১)
জে সি ঝা	দ্যা ভূমিজ রিভল্ট-১৮৩২-৩৩ (দিল্লী ১৯৬৭)
জে সি রাসেল	দ্যা পপুলেশন অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (জার্নাল অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি-১৯৬৯)
জে প্যাটারসন	বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (কলিকাতা-১৯০৫)
জে মার্শম্যান	হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (কলকাতা-১৮৫৭)
জেমস গ্রান্ট	এ্যানালিসিস অব দ্যা ফিনানসেস অব বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৭৮৬)
জেমস গ্রান্ট	দ্যা ফিফত রিপোর্ট (মাদ্রাজ - ১৮৬৬)
জেমস ফারগুসন	অন রিসেন্ট চেঞ্জেস ইন দ্যা ডেল্টা অব দ্যা গ্যাঞ্জেস (কলকাতা-১৯১২)
জেমস রেনেল	ডেসক্রিপশন অব দ্যা রোডস ইন বেঙ্গল এ্যান্ড বেহার (লন্ডন-১৭৭৮)
জেমস রেনেল	মেমোয়ার অব ম্যাপ অব হিন্দুস্থান (লন্ডন-১৭৮৮)
জেমস লেগো	এ রেকর্ড অব বুদ্ধিষ্ট কিংডম (অক্সফোর্ড-১৮৮৬)
জে লং	সিলেকশন ফ্রম দ্যা আনপাবলিশড রেকর্ডস অব গভর্নমেন্ট ফর দ্যা ইয়ার ১৭৪৮-১৮৬৭, খণ্ড-১ (ক্যালকাটা-১৮৬৯)
জে সি প্রাইস	দ্যা চুয়ার রেবেলিয়ান (কলিকাতা-১৮৭৪)
টি ওয়াটার (অনুবাদ)	উয়ান চোয়ান ট্রাভেল ইন ইন্ডিয়া (লন্ডন-১৯০৪)
টি গণপতি শস্ত্রী মহামহোপাধ্যায়	আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প (ত্রিবান্দ্রম-১৯২৫)
টি ম্যাক্সমূলার	স্যাকরেড বুক অব দ্যা ইষ্ট (অক্সফোর্ড-১৮৭৯-১৯০০)
ডব্লু কে ফারমিঙ্গার	ফিফথ রিপোর্ট (কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ ১৯৬২)
ডব্লু কে ফারমিঙ্গার	ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস মিদনাপুর (কলিকাতা-১৯০৯)

ডব্ল্যু. ডব্ল্যু হান্টার — স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্স অব বেঙ্গল (লন্ডন-১৮৭৫)
ডব্লু ডব্লু হান্টার — ইন্ডিয়ান মুসলমান (কলকাতা ১৯৫৪)
ডব্লু ডব্লু হান্টার — দ্যা এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৮৬৮)
ডি ডি কোসাম্বী — দ্যা কালচার অ্যান্ড সিভিলাজেসন অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (দিল্লী-১৯৬৫)
ডি সি সরকার — স্প্রেড অব এরিয়ানাইজেসন অব বেঙ্গল (জে.এ.এস, খণ্ড-১৮, ১৯৬২, সং-২)
ডেভিড জে ম্যাকাচ্চন — লেট মেডিয়াভাল টেমপেলস অব বেঙ্গল, ওরিজিন এ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন (ক্যালকাটা-১৯৭২)
তরুণদেব ভট্টাচার্য — পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া (কলিকাতা-১৯৮২)
তারকেশ্বর চট্টরাজ — অভিন্ন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর (কাটোয়া-২০১০)
তারাপদ সাঁতরা — বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতি (বাঁকুড়া-১৯৮৯)
তারাপদ সাঁতরা — মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র (কলিকাতা-১৯৮৩)
তারাশঙ্কর পাণিগ্রাহী — দি ব্রিটিশ রুল এ্যান্ড দ্যা ইকনমি অব রুরাল বেঙ্গল (দিল্লী - ১৯৮২)
তারিণী দাস ব্যানার্জী — জমিনদার এ্যান্ড রায়তস অব বেঙ্গল (কলকাতা-১৮৮৩)
তুষার কান্তি ঘোষ — সাত দশকের কথামালা (বাঁকুড়া-১৯৯৯)
দিল মহম্মদ — বিষ্ণুপুরের কুরবান শাহবাবা (বিষ্ণুপুর-২০০৭)
দিলীপ কুমার গোস্বামী — সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি (পুরুলিয়া-২০১৪)
দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী (স.) — গোবিন্দদাসের পড়চা (কলকাতা, ১৯২৬)
দীনেশচন্দ্র সেন — ব্যালাডস অব বেঙ্গল (দিল্লী - ১৯২৩)
দীপক কুমার অগ্নিহোত্রী — কিংবদন্তী ভাস্কর রামকিংকর বেইজ (বাঁকুড়া-২০০৬)
দীপক কুমার অগ্নিহোত্রী — সত্যব্রত রামানন্দ (বাঁকুড়া-২০০৪)
দুখভঞ্জন বন্দোপাধ্যায় — বাঁকুড়া জেলার তপশীলী জাতি উপজাতি (বাঁকুড়া-১৯৮৭)
দুর্গাচন্দ্র সান্যাল — বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস (কলিকাতা-১৩১৫ বঙ্গাব্দ)
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে — গণ আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ (কলিকাতা-১৯৯৭)
দুর্গাচরণ সান্যাল ও ফকির চন্দ্র দত্ত — বাঙলার সামাজিক ইতিহাস (কলকাতা-১৯০৮)
দেবপ্রসাদ জানা (স.) — অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (কলিকাতা-১৯৮৭)
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে — পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (কলিকাতা-১৯৮৭)
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে — বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক-বৈদিক প্রভাব (কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৬)
নগেন্দ্রনাথ বসু — বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (কলকাতা-১৯১৩)

নগেন্দ্রনাথ শেঠ	কলিকাতাস্থ তন্তু বণিক জাতির ইতিহাস (কলিকাতা-১৯৫০)
নরহরি কবিরাজ	পেজেন্ট আপরাইজিং অব বেঙ্গল (নিউ দিল্লী ১৯৭২)
নরহরি চক্রবর্তী	আর বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ভক্তিরত্নাকর (মুর্শিদাবাদ তৃতীয় মুদ্রণ-১৩৩২ বঙ্গাব্দ)
নমিতা মণ্ডল	বাঁকুড়া কেন্দ্রীক মল্লভূমির উপভাষা (বাঁকুড়া-১৯৮৯)
নিতিশ সেনগুপ্ত	ল্যান্ড অব টু রিভারস : দ্যা হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (পেঙ্গুইন-২০১৩)
নির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায় (স.)	রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ (কলিকাতা-২০০১)
নীরদবরণ সরকার	অ্যানালস অব বর্ধমানরাজ (কলকাতা রিভিউ-১৯১০)
নীহার রঞ্জন রায়	বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, ১ম খণ্ড (কলিকাতা-পুনঃমুদ্রণ - ১৯৮০)
নীলমনি চক্রবর্তী (স.)	মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিকঙ্কন চণ্ডী (কলকাতা-১২৭৫ বঙ্গাব্দ)
পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (স.)	জগদ্রামী রামপ্রসাদী রামায়ণ (বর্ধমান-১৯৮৮)
পঞ্চানন তর্করত্ন	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (কলিকাতা-১৮৯০)
পঞ্চানন মন্ডল	আরামবাগের পুরাতত্ত্ব (কলিকাতা-১৯৯২)
প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী (কলিকাতা-১৯৯৩)
পল গ্রীনো	আধুনিক বাংলার সমৃদ্ধি ও দারিদ্র দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪ (অক্সফোর্ড বি. বি. প্রেস-১৯৮২)
পশুপতি প্রসাদ মাহাতো	জঙ্গল মহল-রাঢ়ভূম ও ঝাড়খণ্ডের ভূমিব্যবস্থা (কলিকাতা-২০১১)
প্রভাসচন্দ্র দে	প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও বর্গীর হাঙ্গামা (বাণী-৩য় বর্ষ, ১৩১৭ বৈশাখ)
পার্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী	আদিশূর ও বল্লাল সেন (কলকাতা-১৮৭৭)
পি. সি. দাসগুপ্ত	এক্সপ্লোরিং বেঙ্গল পাস্ট (ক্যালকাটা-১৯৬৬)
পি. সি. গুপ্ত	প্রাগৈতিহাসিক বাঁকুড়া (২) শুশুনিয়ার (কোলকাতা-১৯৬৬)
প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী (স.)	কাঁসাই শিলাই (কলিকাতা-২০১১)
প্রদীপ কুমার বন্দোপাধ্যায়	বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বাঁকুড়া সংস্কৃতি (বাঁকুড়া ১৯৯৭)
প্রদীপ কুমার সিং	রাঢ়ের পদাবলী (বিষ্ণুপুর-১৩২২ বঙ্গাব্দ)
প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়	চাণক্য শ্লোক (কলিকাতা-২০১০)
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	বঙ্গ পরিচয় (কলকাতা-১৯৪২)
প্রভাত কুমার সাহা	সাম অ্যাসপেক্ট অব মল্ল রুল ইন বিষ্ণুপুর (কলিকাতা-১৯৭০)
প্রভাতরঞ্জন সরকার	সভ্যতার আদি বিন্দু রাঢ় (কলকাতা-১৯৮৮)
প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মহানাদ ও বাংলার গুপ্ত ইতিহাস (হুগলি-১৯৩১)

প্রভাস চন্দ্র রায়	পার্বত্য কাহিনি, সম্পা: সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত (কলিকাতা, ১৯০৭, পুনঃপ্রকাশ - ২০১১)
প্রশান্তকুমার বন্দোপাধ্যায়	বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ গীর্জা (বাঁকুড়া ১৯৯৪)
প্রশান্ত দাঁ (স.)	রূপতাপস যামিনী রায়, (কলিকাতা - ২০০৫)
ফকির নারায়ণ কর্মকার	বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনি, (কলি-১৯৭৯)
ফ্রান্সিস গেড্উইন	ন্যারেটিভ অফ দ্যা ট্রানজেকশন ইন বেঙ্গল (কলকাতা-১৭৮৮)
বদরুদ্দিন উমর	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক (কলিকাতা-১৯৮০)
বদরুদ্দীন উমর	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (ঢাকা-১৯৭৪)
বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (স.)	রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল বা ধর্ম্মপুরাণ (কলিকাতা-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (কলিকাতা-১৯১৬)
বাঁকুড়া জেলা পরিষদ	পশ্চিমরাঢ় বিবিধ প্রসঙ্গ বাঁকুড়া-১৯৯৯
বাঁকুড়া জেলা পরিষদ	বাঁকুড়া পরিচয় (চার খণ্ডে), কলিকাতা-২০১২
বাঁকুড়া জেলা পরিষদ	বাঁকুড়া পরিচয়, ১ম খণ্ড (বাঁকুড়া-২০১২)
বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার	চিত্রা-চম্পু (বর্ধমান-১৭৪৪) : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৫) প্রকাশিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ' দ্রষ্টব্য
বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার	চিত্রা-চম্পু (বামাচরণ চক্রবর্তী অনুদিত : বেনারস-১৯৪০), সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, বেঙ্গল পোস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্টস-১৯৮৩
বামাকান্ত চক্রবর্তী	বৈষ্ণবইজম ইন বেঙ্গল (কলিকাতা-১৯৮৫)
বি এইচ ব্যাডেন পাওয়েল	ল্যান্ড সিস্টেম অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া (পুনঃমুদ্রণ নিউইয়র্ক ১৯৭২)
বি এস দাস	চেঞ্জিং প্রোফাইল অব ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল (নিউ দিল্লি-১৯৮৪)
বি এস দাস	সিভিল রেবেলিয়ান ইন দ্যা ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল (কলকাতা-১৯৭৩)
বিক্রম সরকার	ভারতে ভূমি সংস্কার (দিল্লী-১৯৮৯)
বিজয় পান্ডা	উৎকল ইতিহাস (কলিকাতা-২০০৪)
বিজয় পান্ডা	মানভূমি লোক সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ (কলিকাতা-২০০৪)
বিজিত কুমার দত্ত (স.)	মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল (কলকাতা-১৯৬০)
বিধূভূষণ ভট্টাচার্য	রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনি (কলিকাতা-২০০৯)
বিনয় ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড (কলিকাতা-১৯৭৬)
বিনয় ভূষণ চৌধুরী	পিজান্ট হিস্ট্রি অব লেট প্রি-কলোনিয়াল এ্যান্ড কলোনিয়াল ইন্ডিয়া (নিউ দিল্লী-২০০৮)

বিনয় ভূষণ চৌধুরী	বাংলা ও বিহারের কৃষক উৎখাতের ইতিহাস ১৮৮৫-১৯৪৭, (কলিকাতা-২০০৮)
বিনয় ভূষণ চৌধুরী (অন্যান্য)	বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন (কলিকাতা-১৯৯৬)
বি পি রায়	ল্যাটার ভেডিক ইকনমি (দিল্লী-১৯৮৪)
বিপুল সিং	দ্যা আর্টিসান অব আইটটিন সেঞ্চুরি ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া (দিল্লি, ১৯৬৯)
বি ফোলি	রিপোর্ট অন দ্যা লেবার ইন বেঙ্গল (কলিকাতা-১৯০৬)
বিমানবিহারী মজুমদার	ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (কলকাতা-১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)
বি সি লাল	হিস্ট্রিক্যাল জিওগ্রাফি অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (দিল্লি-১৯৫৪)
বিহারীলাল দে	বেঙ্গল পিজেন্ট লাইফ (কলিকাতা-১৮৭৪)
বিহারীলাল সরকার	বঙ্গে বর্গী (কলি, পুনঃমুদ্রণ - ২০১৫)
বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত সমিতি	বিষ্ণুপুর : তথ্যগ্রন্থ (বিষ্ণুপুর-২০০৪)
বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য	পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (কলিকাতা-১৯৮৫)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-১৯৬৪)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস	ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা-৫০ কলিকাতা-১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)
ভলেন্টাইন বল	জে বি টাভার্নিয়ের ট্র্যাভেল ইন ইন্ডিয়া (লন্ডন-১৮৮৯)
ভব রায়	রাঢ় বাংলার মাটি মানুষ ও সংস্কৃতি বর্দ্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া সংস্কৃতির রূপরেখা (কলিকাতা-১৯৯১)
ভিনসেন্ট স্মিথ	আকবর দ্যা গ্রেট মোঘল ১৫৪২-২৬০৫ (অক্সফোর্ড-১৯১৭)
ভিনসেন্ট স্মিথ	আরলি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড-১৯১৪)
ভ্যান্সিটার্ট হেনরী অরিজিনাল	পেপারস বিলেটিং টু দ্যা ডিস্টারবেন্স ইন বেঙ্গল (লন্ডন-১৭৬৫)
ভ্যান্সিটার্ট, হেনরী	ন্যারেটিভ অব দ্যা ট্রানজাকসন ইন বেঙ্গল, ভল্যুম-৩, (লন্ডন-১৭৬৪)
মন্টু দা (স.)	কতরূপে দেখেছি তোমায় (বাঁকুড়া-১৯৯১)
মনোরঞ্জন চন্দ্র	মল্লভূম বিষ্ণুপুর (কলিকাতা-২০০৪)
মহাশ্বেতা দেবী	অরণ্যের অধিকার (কলিকাতা-১৪১৬)
মাণিকলাল সিংহ	পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি (কলিকাতা-১৯৭৮)
মাণিকলাল সিংহ	রাঢ়ের মন্ত্রযান (কলিকাতা-১৯৭৯)
মাণিকলাল সিংহ	সুবর্ণরেখা ইহতে ময়ূরাক্ষী (কলিকাতা-১৯৭৯)

মণিকলাল সিংহ — কাঁসাই সভ্যতা (কলিকাতা-১৯৫৪)
মাণিকলাল সিংহ — রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (কলিকাতা ১৯৮২-৮৩)
মিহির কুমার রায় — বাঁকুড়া জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা (বাঁকুড়া-১৯৮৭)
মিহির চৌধুরী কামিল্যা — রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা (কলিকাতা-১৯৯১)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার — রাজাবলী (কলকাতা-১৮০৮)
মেঘদূত ভুঁই — রাঢ়ের আলোকে মোলবোনা (বাঁকুড়া-২০১৫)
মোরল্যান্ড, ডব্ল্যু এইচ — দ্যা অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মুসলিম ইন্ডিয়া (কেমব্রিজ ১৯২৯)
যতীন্দ্রনাথ মিত্র — দ্যা রুইনস অব বিষ্ণুপুর (কলকাতা-১৯৪০)
যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী — বর্ধমান ইতিহাস সংস্কৃতি (কলকাতা-১৯১৬)
যদুনাথ ভট্টাচার্য — কালাপাহাড় (কলিকাতা-১৯০৭)
যদুনাথ সর্বাধিকারী — তীর্থভ্রমণ (কলিকাতা-১৯১৫)
যদুনাথ সরকার — ফল অব মুঘল এম্প্যায়ার ১৭৩৯-১৭৫৩ (দিল্লী-১৯৩২)
যদুনাথ সরকার — মুঘল এ্যাডমিনিস্ট্রেসন (কলি-১৯২৪)
যদুনাথ সরকার — স্টাডিস অব মুঘল ইন্ডিয়া (ক্যালকাটা-১৯২৯)
যোগেশচন্দ্র বসু — মেদিনীপুরের ইতিহাস (কলিকাতা-১৯৩৯)
রতন কবিরাজ — মদন মোহন বন্দনা (বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ, এমএস-৩২৪)
রজতকান্ত রায় — পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ (কলিকাতা-১৯৯৪)
রজনীকান্ত চক্রবর্তী — গৌড়ের ইতিহাস (কলিকাতা-১৯৯৯, মালদা-১৯০৯)
রবীন্দ্রনাথ সামন্ত — বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা (কলিকাতা-১৯৮১)
রমাপ্রসাদ চন্দ্র — গৌড়রাজমালা (কলকাতা-১৯১২)
রমেশচন্দ্র দত্ত — ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (লন্ডন-১৯০২)
রমেশচন্দ্র দত্ত — পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল (কলিকাতা-১৮৭৪)
রমেশচন্দ্র দত্ত — দ্যা আবরজিনাল এলিমেন্ট ইন দ্যা পপুলেশন অব বেঙ্গল (কলকাতা-১৮৮২)
রমেশচন্দ্র দত্ত — ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া (কলকাতা-১৯৬০)
রমশেচন্দ্র মজুমদার — জগমোহন-দেশাবলী বিবৃতি (কলিকাতা-১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)
রমেশচন্দ্র মজুমদার (স.) — সন্ধকের নন্দীর রামচরিত (কলকাতা-১৯৩৯)
রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় — চন্ডীমঙ্গল (বর্ধমান-২০০১)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী — বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি (বাঁকুড়া-২০০২)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী — বাঁকুড়ার মুসলমান (বাঁকুড়া-২০১৪)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী — অতীত বাঁকুড়ার আর্থচিত্র (বাঁকুড়া-২০১২)

রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী — বাঁকুড়া সন্ধান (বাঁকুড়া-২০১৪)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী — নয়া বাঁকুড়ার গোড়াপত্তন ও বিকাশ (বাঁকুড়া-২০১৪)
রণজিৎ গুহ — এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্ট অব পেজান্ট ইনসারজেন্সি ইন কলনিয়াল ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড-১৯৮৩)
রণজিৎ গুহ — সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ (অক্সফোর্ড, ফোর্থ ইমপ্রেশন, ১৯৯৯)
রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী — পঞ্চকোটের ইতিহাস (পুরুলিয়া, ২য় সং, ২০০৩)
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস (কলিকাতা-২০১৫/১৭
রাধাকমল মুখার্জী — দ্যা চেঞ্জিং ফেস অব বেঙ্গল-এ স্টাডি ইন রিভারাইন ইকনমি (কলিকাতা-১৯৩৮)
রাধাগোবিন্দ বসাক (অনুবাদ) — কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (কলকাতা-১৯৭০)
রাধাগোবিন্দ বসাক (অনুবাদ) — রামচরিত (কলকাতা-১৯৭০)
রামশরণ শর্মা — ফিউডালিজম ইন ইন্ডিয়া (দিল্লী-২০০৫)
রামকৃষ্ণ দাস — বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (বাঁকুড়া-১৯৮২)
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় — শিল্প ও সংস্কৃতি - বাঁকুড়া (কলকাতা-২০০৩)
রামানুজ কর — বাঁকুড়া জেলার বিবরণ (কলিকাতা-১৯২৫)
রূপেন চট্টোপাধ্যায়, নীহার হাজরা, গৌরপদ সেন (স.) — বাঁকুড়া পরিচয় (বাঁকুড়া জেলা পরিষদ-২০১২)
র‍্যামসবোথাম, আর বি — ল্যান্ড রেভেন্যু সিস্টেম অব বেঙ্গল (কলকাতা-১৯২৬), আমিনি রিপোর্ট-১৭৭৬
লঙ্কা সুন্দরম — মুঘল এ্যান্ড রেভেন্যু সিস্টেম (ইংল্যান্ড-সুরে ১৯২৯)
লীলাময় মুখোপাধ্যায় — জেলার নাম বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-১৯৮৩)
লীলাময় মুখোপাধ্যায় — প্রসঙ্গ বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-১৯৭৮)
লীলাময় মুখোপাধ্যায় — বিষয় : বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-১৯৮৫)
লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র — বাঁকুড়া (কলিকাতা-২০০২)
শক্তিনাথ সাহা — বঙ্গীয় অর্থনীতির ধারা (কলিকাতা-১৯৯৩)
শশাঙ্কশেখর বন্দোপাধ্যায় — সানবান্ধা গ্রামের ইতিবৃত্ত (বাঁকুড়া-১৯৪০)
শান্তি সিংহ — লোকসংগীত ঝুমুর (রাজ্য সংগীত আকাডেমী-১৯৯৭)
শিবনাথ শাস্ত্রী — রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা-১৯০৩
শুচিব্রত সেন — সাঁওতাল অব জঙ্গলমহল— এ্যান এগ্রারিয়ান হিস্ট্রি (কলিকাতা-১৯৮৪)
শেখর ভৌমিক — যোগেশচন্দ্র, রামানন্দ, সত্যকিঙ্কর ও এক আঞ্চলিক সত্তার নির্মাণ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৪১২)

শেখর ভৌমিক (স.)	শ্যামধন মুখার্জী রচিত হিস্ট্রি অব মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর-১৮৬৪), পুনঃপ্রকাশ কলিকাতা-২০০৬
শেখর ভৌমিক (স.)	সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা (কলিকাতা-২০০৬)
শেখর ভৌমিক (স.)	হিজলীর বৃত্তান্ত (প্রথম প্রকাশ ১৮৬২ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়), কলিকাতা-২০০৫
শৈলেন দাস (স.)	বাঁকুড়ার ইতিহাস সংস্কৃতি (বাঁকুড়া-১৯৯৭)
শৈলেন দাস (স.)	লোকসংস্কৃতি (বাঁকুড়া-১৯৯৯)
শৈলেন দাস (স.)	লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে (বাঁকুড়া-২০০১)
শৈলেন দাস (স.)	লোকসংস্কৃতি ও আমরা (বাঁকুড়া-১৯৯৮)
শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষাল	গৌড় কাহিনি (কলকাতা-১৯৫০)
শ্রমিক সেন (স.)	এক নজরে বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-২০০১)
সঞ্জয় মুখার্জী (স.)	জঙ্গলমহল (কলিকাতা-২০১৩)
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	জাল প্রতাপচাঁদ (কলিকাতা-১১৯৭ বঙ্গাব্দ)
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বাংলার রায়ত, তাদের অধিকার ও কর্তব্য (কলিকাতা-১৯৬৪)
স্ট্যানলি লেন পুল	রুলারস অব ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড - ১৯০১)
সন্ধাকর নন্দী	রামচরিত (কলকাতা-১৯৫৩)
সত্যকিংকর সাহানা	আর্য্যাশতক (কলিকাতা-১৯৫৫)
সনৎকুমার মিত্র	পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা (কলিকাতা-১৯৮০)
সন্ধ্যা দাস	বাঁকুড়া মহকুমার কথ্যভাষা (বাঁকুড়া-১৯৯৬)
স্বরূপা বসু	নোশন অব নেশনহুড ইন বেঙ্গল (বোস্টন-২০০৯)
স্থবির প্রজ্ঞানানন্দশ্রী	পশ্চিম বাংলার বুদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি (কলিকাতা-১৯৮৭)
স্যামুয়েল বিল	বুদ্ধিস্ট রেকর্ডস অব ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ (লন্ডন-১৯০৬)
সি. ইউ. আইখসন	কালেকশন অব ট্রিটিজ এ্যান্ড সনদ রিলেটিং টু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, সেকেন্ড পার্ট (ক্যালকাটা-১৯০৯)
সি. ই. এ. ডব্লু ওল্ডহাম	রুটস ওল্ড এ্যান্ড নিউ ফ্রম লোয়ার বেঙ্গল আপ দ্যা কান্ট্রি ইন বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট (১৯২৪)
সি ই ব্যাকল্যান্ড	বেঙ্গল আন্ডার দ্যা লেফটেন্যান্ট গভর্নরস (ক্যালকাটা-১৯০১)
সি. জে. ওডোনেল	সেনসাস অব দ্যা লোয়ার প্রভিন্সেস অব বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৮৯১)
সি ডি ফিল্ড	ল্যান্ডহোল্ডিং এ্যান্ড দ্যা রিলেশন অব ল্যান্ডলর্ড এ্যান্ড টেনান্ট (কলকাতা-১৮৮৩)
সুভাষ চন্দ্র ব্যানার্জী	পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক সাহিত্য (কলকাতা-১৯৬৯)
সুকুমার ভট্টাচার্য	দ্যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ্যান্ড দ্যা ইকনমি অব বেঙ্গল, (লন্ডন-১৯৫৪)

সুকুমার মুখোপাধ্যায় (স.)	মনোভূমি বাঁকুড়া পত্রিকা (বাঁকুড়া-২০০৭)
সুকুমার সিনহা ও হিমাদ্রি ব্যানার্জী	বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট লেটার ইস্যুডঃ ১৮০২-৬৯ (ক্যালকাটা-১৯৮৯)
সুকুমার সেন (স.)	কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (দিল্লী-১৯৬৩)
সুকুমার সেন (স.)	মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল, দিল্লী-১৯৭৫
সুখময় চট্টোপাধ্যায়	বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসের আদিপর্ব ও শুশুনিয়া পর্বতলিপির বিবরণ (বাঁকুড়া-১৯৮৫)
সুগত বসু	অ্যাগ্রারিয়ান বেঙ্গল : ইকনমি, সোসাল স্ট্রাকচার, এ্যান্ড পলিটিকস ১৯১৯-১৯৪৭ (কেমব্রিজ-১৯৮৬)
সুগত বসু	ক্রেডিট মার্কেট এ্যান্ড এগ্রারিয়ান মার্কেট অব কলোনিয়াল ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড-১৯৯৪)
সুগত বসু (অন্যান্য)	বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন (দিল্লী-১৯৯৬)
সুগত বসু	রুরাল বেঙ্গল সিনস ১৭৭০ (কেমব্রিজ - ১৯৯৩)
সুদীপ্ত পোড়েল	আত্মপরিচয় : বাঁকুড়া-১ (বাঁকুড়া-২০০৫)
সুদীপ্ত পোড়েল	বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসন (বাঁকুড়া-২০০২)
সুদীপ্তা মুখার্জী	অ্যাগ্রারিয়ান ডিসকনটেন্ট ইন মানভূম ডিস্ট্রিক্ট (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি-১৯৯০)
সুধন কুমার মিত্র	ওয়েসলিয়ান টু হায়ার লার্নিং, মেথডিস্ট ইন বেঙ্গল (দুর্গাপুর - ২০০৭)
সুধীর কুমার করণ	সীমান্ত বাংলার লোকযান (কলিকাতা-১৩৭১ বঙ্গাব্দ)
সুধীর কুমার মিত্র	হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ (কলিকাতা-১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)
সুধীর পালিত	বাঁকুড়া জেলার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত (বাঁকুড়া-১৯৩১)
সুধীর রঞ্জন দাস	রাজবাড়ীডাঙ্গা (কলিকাতা-২০০৩)
সুনীল চট্টোপাধ্যায়	প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (কলিকাতা-১৯৮৩)
সুনীল সেন	ভারতে কৃষি সম্পর্ক (নয়া দিল্লী-১৯৭৯)
সুপ্রকাশ রায়	ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (কলিকাতা-১৯৬৬)
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়	বাংলার আর্থিক ইতিহাস (কলিকাতা-২০১১)
সুবোধ ঘোষ	ভারতের আদিবাসী (কলিকাতা-১৯৯৫)
সুব্রত রায়	বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ১৯২৩-২৪ (বাঁকুড়া-১৯৮৪)
সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সুদীপ্তা মুখার্জী চক্রবর্তী	মানভূমের চুয়ার বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের যুগ (কলিকাতা-২০১২)

সুরঞ্জন দাশ — কম্যুনাল রায়টস ইন বেঙ্গল, ১৯০৫-১৯৪৭ (দিল্লী-১৯৮৭)
সুশোভন সরকার — রামমোহন অন ইন্ডিয়ান ইকনমি (ক্যালকাটা-১৯৬৩)
সৈয়দ নুরুল হাসান — থটস অন অ্যাগ্রারিয়ান রিলেসনস ইন মুঘল ইন্ডিয়া (দিল্লী-১৯৯০)
সৈয়দ মহম্মদ রেজা খাঁ — দ্যা ট্রানজিসন ইন বেঙ্গল ১৭৫৬-১৭৭৫ (কেমব্রিজ-১৯৬৯)
হরচন্দ্র ঘোষ — অ্যা টোপোগ্রাফিক্যাল এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল স্কেচ অব বাঁকুড়া [(গৌতম চট্টোপাধ্যায় অ্যাওকেনিং ইন বেঙ্গল ইন আর্লি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি (কলকাতা-১৯৬৫)]
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম (এস কে চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রচনাবলী, কলকাতা-১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত (কলিকাতা-১৯১০)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা কলিকাতা-১৪১৩ বঙ্গাব্দ (তৃতীয় সংস্করণ)
হরশঙ্কর ভট্টাচার্য — জমিনদার ও পাটনিদার (বর্ধমান-১৯৮৫)
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় — ছাতনার কথা (ছাতনা-১৪০৩ বঙ্গাব্দ)
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় — বাঁকুড়ার ইতিবৃত্ত (কলিকাতা-১৯৯৯)
হরিনাথ ঘোষ — লাল সিং পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের এক অধ্যায় (পুরুলিয়া-১৯১৩)
হরিসাধন দত্ত — বাঁকুড়া দর্পণ (মেদিনীপুর-১৯৯৮)
হরেকৃষ্ণ মাহাতাব — হিস্ট্রি অব বড়িষা (লক্ষ্ণৌ-১৯৪৭)
হিতেশরঞ্জন সান্যাল — বাংলায় সামাজিক গতিময়তার ইতিহাস (অনুবাদ : মনস্বিতা সান্যাল, কলিকাতা-২০১৫)
হিমাংশু দে — বাঁকুড়া শহরের ইতিবৃত্ত (বাঁকুড়া-১৯৯৯)
হেমচন্দ্র পালিত (সং) — রতন কবিরাজের মদনমোহন বন্দনা (প্রবাসী-১৩৪১)
হেমেন্দ্রনাথ পালিত — শুভঙ্করী রাঢ় বঙ্গের গণিত পদাবলী (বর্ধমান-২০০১)
হ্যামিল্টন, উইলিয়াম — এ জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্যাটিসটিকাল এ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ডেসক্রিপশন অব হিন্দুস্থান অ্যান্ড দ্যা এ্যাডজাসেন্ট কান্ট্রিজ (লন্ডন ১৮২০)

(**অন্যান্য তথ্যসূত্র** : জাতীয় গ্রন্থাগার বিশেষত সংবাদপত্র বিভাগ, রাজ্য আর্কাইভস, ভূমি সংস্কার দপ্তরের গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মহাকরণ গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া জেলা রেকর্ডঘর ও আর্কাইভস-এ রক্ষিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও নথি)

শব্দ সূচি

খ

গ

ঘ

চ

ছ

থ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ম

য

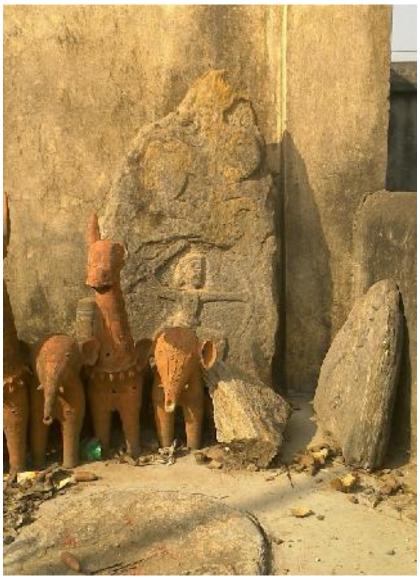
র

ল

শ

স

হ



প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেগালিথ (মোলবোনা)



৩০০-৫০০ সালে চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া পর্বত-লিপি (শুশুনিয়া পাহাড়, ছাতনা)



১৪৭৬ সালে ছাতনা রাজ উত্তর হাম্বীরের নির্মিত ছাতনা বাসুলীমাতার মন্দিরের সংস্কৃত রূপ



ছাতনা রাজবাড়ী প্রাঙ্গন



১১শতকে নির্মিত অম্বিকানগর-পরেশনাথের মন্দির



পরেশনাথ মন্দিরে রক্ষিত পার্শ্বনাথের মূর্তি



১১ শতকে নির্মিত হাড়মাসরার জৈনমন্দির



হাড়মাসরায় বৃক্ষপদমূলে পূজিত জৈনমূর্তি



ধারাপাট মন্দির গাত্রে প্রোথিত দিগম্বরের মূর্তি (১১ শতকের)



ধারাপাট মন্দির গাত্রে প্রোথিত দিগম্বরের মূর্তি (১১ শতকের)





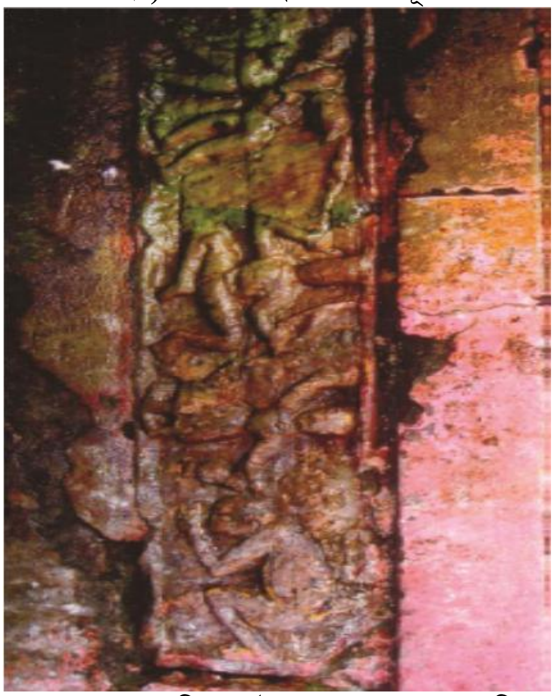
সাতপাট্টায় প্রাপ্ত ও রক্ষিত তীর্থঙ্করের মূর্তি(১১ শতকের) মন্ডলকুলির জৈনমূতি ? (১১ শতকের)



শ্যামচাঁদ মন্দির (১৬০৩) সন্নিকটে ধারাপাট দশ-মন্দির



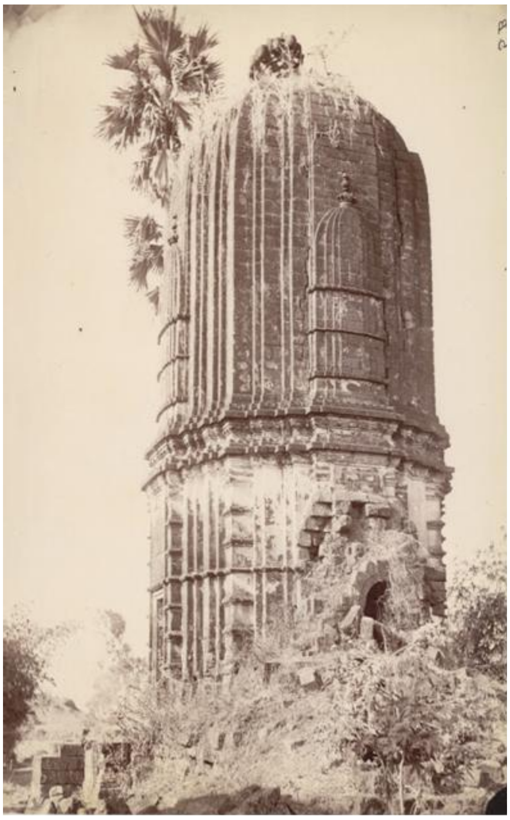

১১-১২ শতকের এক্তেশ্বর মন্দির (জে ডি বেগলার কর্তৃক ১৮৭২ সালের ছবি)   এক্তেশ্বর মন্দিরের মূর্তি

রানিবাঁধ-দ্বারগ্যেড়ায় প্রাপ্ত ১২ শতকের জৈন আদিনাথের মূর্তি   ৭-৮ শতকের শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে রামায়ণের প্রস্তর চিত্র



১৫-১৬ শতকের সোনাতাপল (ওন্দা থানা) সূর্য মন্দির



১৫-১৬ শতকের ছিনপুরের ল্যাটেরাইট মন্দির (জে ডি বেগলার কর্তৃক ১৮৭২ সালের ছবি)



১১-১২ শতকের বহুলাড়া সিদ্ধেশ্বর মন্দির (দেওয়াল গাত্রে প্রোথিত জৈন মূর্তি সহ)



১৫-১৬ শতকের জৈন-শৈব মন্দিরের উপর (ধ্বংশপ্রাপ্ত) ১৯৩৫ সালে সম্পূর্ণ মোলবোনা শিব-মন্দির



মোলবোনা মন্দির প্রাঙ্গনে প্রাচীন মূর্তি



বাঁকুড়ায় ধর্মপূজা (মাটির ঘোড়া তৈরীতে পাঁচমুড়া বিখ্যাত)



রানিবাঁধের দ্বারিকগোড়ায় মাটির নিচ থেকে প্রাপ্ত দিগম্বর মূর্তি



হিড়বাঁধে প্রাপ্ত জৈন মূর্তি



মন্দিরময় মন্দির নগর বিষ্ণুপুর



৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দির - নবরূপে



১৩৪৬ সালে (মতান্তরে ১৫৬৫-১৬২০-র মধ্যে) প্রতিষ্ঠিত ডিহড়ের শৈলেশ্বর ও শরেশ্বরের মন্দির



১৬২২ সালে প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বরের মন্দির



মল্লেশ্বরের মন্দিরের শিবের বাহন ষাঁড়



১৬০০-১৬২২ সালের মধ্যে নির্মিত বিষ্ণুপুর রাসমঞ্চ



১৬৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের শ্যামরাই মন্দির



১৬৫৫ সালে নির্মিত বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা (কেষ্ট রায়) মন্দির



জোড়মন্দিরের গাত্রে প্রমোদতরীর টেরাকোটা প্যানেল





সপ্তদশ শতকে নির্মিত বিষ্ণুপুরের নন্দলাল মন্দির

১৬৫৬ সালে নির্মিত বিষ্ণুপুরের কালাচাঁদ মন্দির



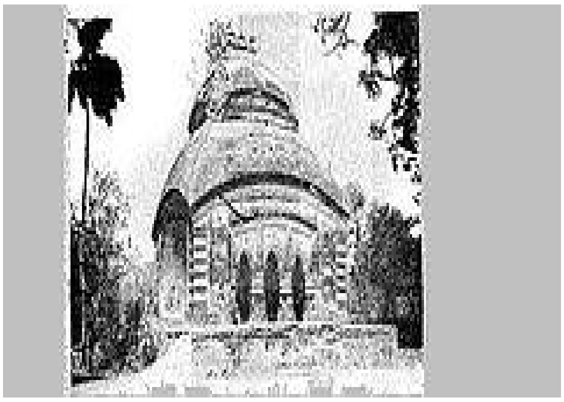
১৬৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত লালজি মন্দির



৭ম শতকে নির্মিত বিষ্ণুপুরের প্রস্তর রথ



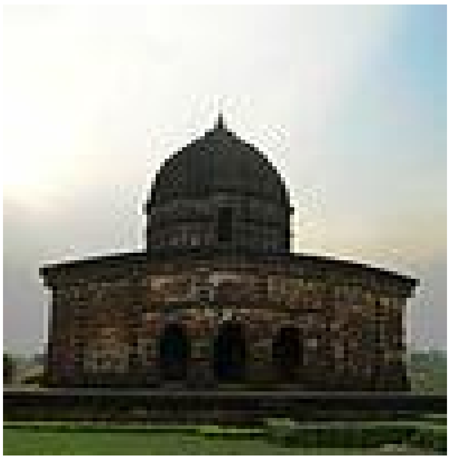
১৬৬৫ সালে নির্মিত বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দির



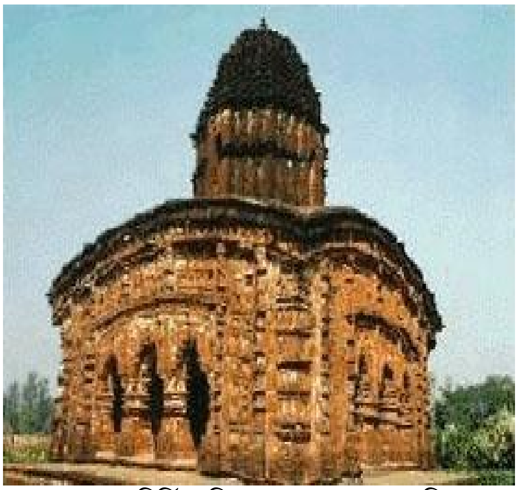
১৬৯৪ সালে নির্মিত বিষ্ণুপুরের মদনগোপাল মন্দির (পুরান ছবি)



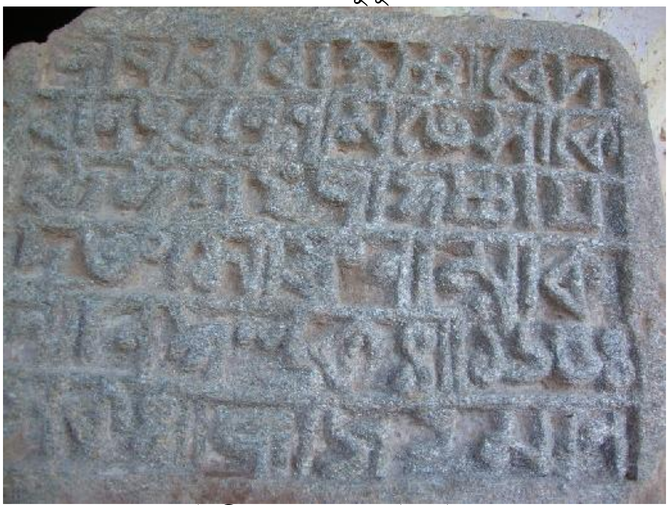
১৭২৬ সালে নির্মিত বিষ্ণুপুরের জোড় মন্দির



১৭২৯ সালে নির্মিত বিষ্ণুপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দির



১৭৩৭ সালে নির্মিত বিষ্ণুপুরের রাধামাধব মন্দির



১৭৩২ সালে রাজহাটি-বীরসিংহপুরের ল্যাটেরাইট বিষ্ণুমন্দিরের (এখন ধ্বংশপ্রাপ্ত) মন্দিরলিপি



বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবাড়ীর ছোট ও বড় দুয়ার



১৭৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত রাধেশ্যাম মন্দির



রাধেশ্যাম মন্দিরে অনন্ত শয়ানে বিষ্ণু



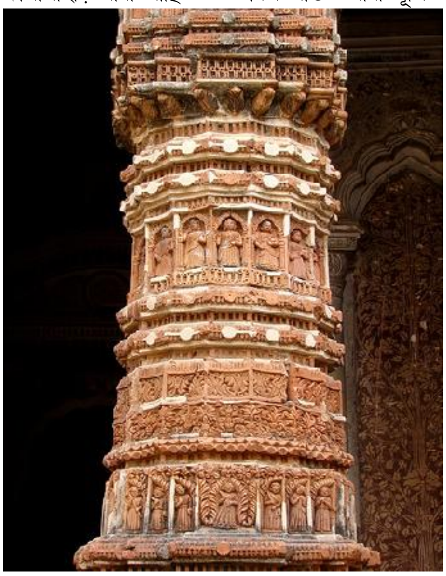
ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বিষ্ণুপুরে উৎপদিত/আনীত দলমাদল কামান



১৫ শতকের স্বর্ণমুখী দেবী (সোনামুখীর) --
কালাপাহাড় দ্বারা লাঞ্ছিত ও ভাস্কর পন্ডিত দ্বারা পূজিত



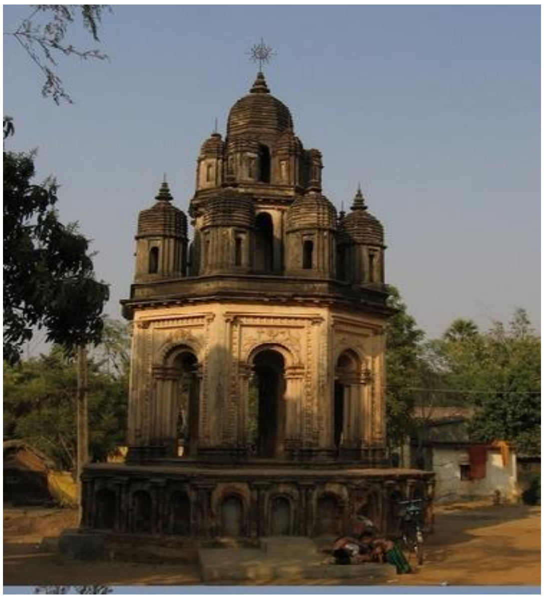
সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির (১৮৫৪ সালে তন্তুবায় কানাই রুদ্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত)



শ্রীধর মন্দিরের স্তম্ভের টারাকোটার কাজ



শ্রীধর মন্দিরের গাত্রে মহিষাসুর মর্দ্দিনী প্যানেল



সোনামুখী ডিভুশূটের রাসমঞ্চ



সোনামুখী-গোপালবেদের ধ্বংশপ্রাপ্ত মন্দির



ইন্দাস থানার দীঘলগ্রামের রায় পরিবারের বিষ্ণু!মন্দির(১৭৬৫সালের)



ইন্দাসের সরকারপাড়ার নবরত্ন মন্দির (১৭৯৪ সালের)



সোনামুখী রাধামাধব মন্দির



জয়পুর দেপাড়ার রাসমঞ্চ



জয়পুর দেপাড়ার টেরাকোটা বিষ্ণু মন্দির



উনিশ শতকে নির্মিত হদলনারায়ণপুরের নবরত্ন মন্দির (ছোটোতরফ)



হাড়মাসরার নবরত্ন বিষ্ণুমন্দির



হাড়মাসরার একচালা মন্দির



উনিশ শতকে নির্মিত কোতলপুর ভদ্রমহলের রাসমঞ্চ ও গোবর্ধন মন্দির



১৭৪০-৮০ সময়কালে নির্মিত অম্বিকানগর রাজবাড়ী বিষ্ণুপুরে সংলগ্ন অম্বিকা মন্দির



ধ্বংশের পথে মল্ল রাজবাড়ী



জিরাবাইদ-বাদুল্লাড়ায় (বাঁকুড়া থানা) আমীর হাসান শাহ(আসরাফি)-র দরগা-দেড়শত বছরর পুরান



ইন্দাস-কড়িশুন্ডা পঞ্চায়েতের বেলবাঁদি গ্রামের মসজিদ(১৮-শতকের প্রথম দিকের)



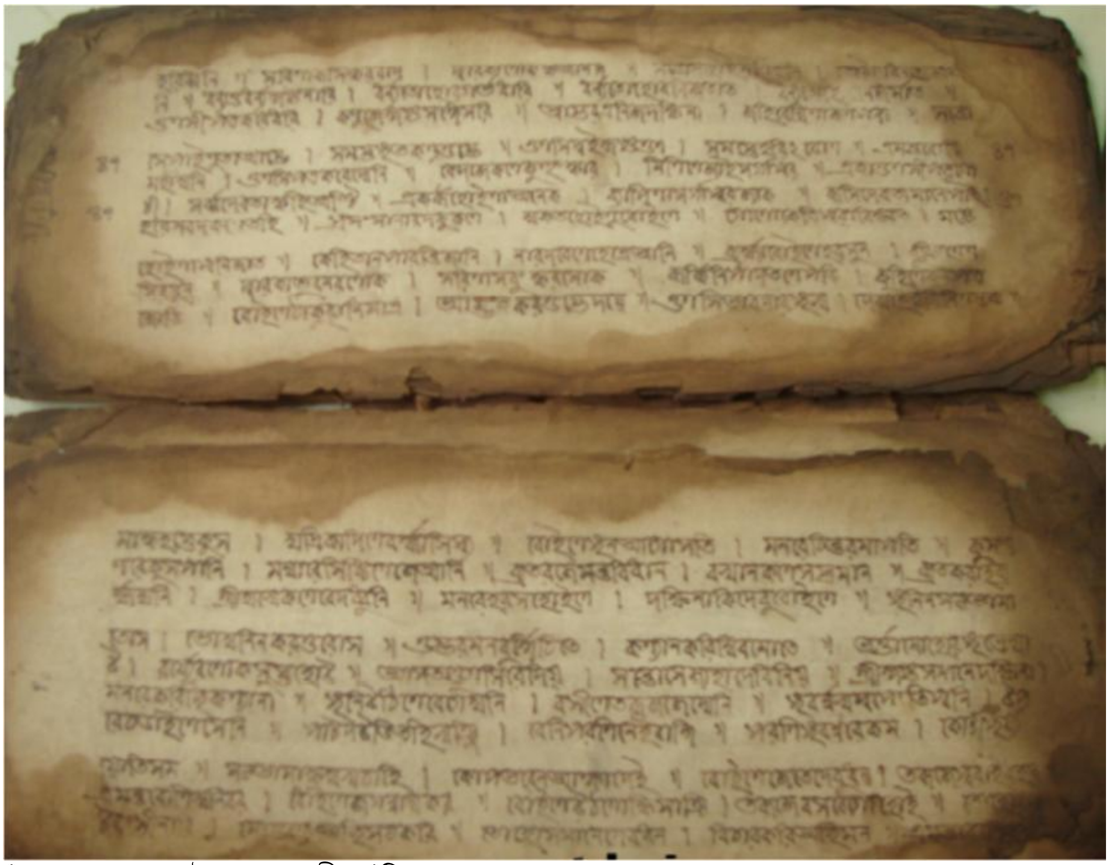
অষ্টাদশ শতকে নির্মিত কোতলপুর ভদ্রপরিবারের জমিদার বাড়ী



১৮৩০-৬৫ সালের ওন্দার সিমাফোর টাওয়ার



১৯১১ সালে উন্মুক্ত বাঁকুড়া সমাহর্তার কার্যালয়ের সন্নিকটে এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল



বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত তুলোট কাগজে প্রাচীন পুঁথি





শ্রাবণের শেষদিনের ৫০০বছরের পুরান ঝাপান উৎসব (হাম্বীরের রাজ্যজয়ের সম্মানে সূচিত)   সাঁওতাল রমণীদের দেওয়ালচিত্র





টুসু ভাসানের (বিসর্জনের) চিত্র   বড়জোড়া থানার মন্দির